। তৃতীয় লহর ।

শ্রীরাজমালা।

[ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত]

তৃতীয় লহর

সটীক ও সচিত্র

পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ বিরচিত

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত

“যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাত্তপণো যথা।
তথৈব সোহ ভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ।।”

রঘু।

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা

শ্রীরাজমালা

(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত)

তৃতীয় লহর

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ২০২০

ISBN : ৯৭৮-৯৩-৮৬৭০৭-৬২-৮

মূল্য ঃ ১২০০ (এক হাজার দুই শত টাকা)

টাইপ ও সেটিং ঃ ধ্রুব দেবনাথ

মূদ্রন ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা

শ্রীরাজমালা বা রাজমালা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রাজবংশের এই ইতিকথা প্রথম লহর থেকে চতুর্থ লহর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ রাজাদেশে নিবিষ্টচিত্তে সম্পাদনা করেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য রাজধানী আগরতলায় রাজমালা কার্যালয় ছিল এবং সেখান থেকে এই মহান গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। রাজ-আমলে এই মহাকাব্যিক রাজ-ইতিহাস জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে। পার্বত্য ত্রিপুরাসহ চাকলা রোশনাবাদের রাজভক্ত জনসাধারণের প্রতিটি গৃহে এই গ্রন্থ শোভিত হত। রাজন্যবর্গের এই সুবৃহৎ বিস্ময়কর ইতিহাস শুধুমাত্র রাজাদের কীর্তিকাহিনী নয়, ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে এই সুমহান আকরগ্রন্থে, যা চিরকালীন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আছে অত্যন্ত মোহনীয়ভাবে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান হিসেবে প্রতিভাত।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের পর প্রথমবার ২০০৩ ইংরাজীতে এই দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাচীন জনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এক সহস্র কপি ছাপানো হয়।

বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আবারও সুধী পাঠক সমাজের জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শ্রীরাজমালার লহর চতুষ্টয় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান অংশটি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীরাজমালার তৃতীয় লহর। উক্ত লহরটির প্রকাশনা সাল ১৩৪১ ত্রিপুরাবদ্ধ (1931-A.D.)।

আশা করি, শ্রীরাজমালার পুনর্মুদ্রিত তৃতীয় লহরখানি সকল অংশের মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে সমর্থ হবে।

ইতি
ভবদয়ী

২০.০৬
২০২০

আগরতলা
২০ জুন, ২০২০ইং

(ধনঞ্জয় দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার।

শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব।

সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রয়ং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্॥
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যামাহবয়েত্তথা॥

রাজমালা প্রচারের অনুষ্ঠাতা—
স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য।

নিবেদন

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের অপার করুণায় রাজমালার তৃতীয় লহর প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজমালা সম্পাদনের কার্য্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই সেই কার্য্যের অধিকতর জটিলতা অনুভূত হইতেছে। রাজমালা তৃতীয় লহরের সহিত পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, অথচ এমন অনেক বিষয় আছে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ইতিহাসের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে চেষ্টার ক্রটী ঘটে নাই, সময় ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়াছে, তথাপি ভ্রম ক্রটীর হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; আমাদের অক্ষমতা এবম্বিধ ক্রটীর একটী প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াও তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই, তন্মধ্যে 'বাহারিস্তান' এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা পাইলে, ঐতিহ্য ঘটনার বিশুদ্ধতা বিষয়ে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারিত। আমাদের কার্য্যের কাঠিন্য বিবেচনা করিয়া, সুধী সমাজ সর্ব্ববিধ ক্রটী মার্জ্জনা করেন, বিনীতভাবে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

রাজমালার দ্বিতীয় লহর মহারাজ অমরমাণিক্যের আদেশে রচিত হইয়াছিল। তদনন্তর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তদাত্মজ মহারাজ রামদেবমাণিক্যের অনুজ্ঞায় রাজপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজধরমাণিক্য, যশোধরমাণিক্য ও কল্যামাণিক্য নৃপতিত্রয় রাজমালার কলেবর পুষ্টির পক্ষে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কল্যাণমাণিক্যের পুত্র মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, অমরমাণিক্যের সংগৃহীত অংশের পরবর্ত্তী (মহারাজ অমরমাণিক্য, রাজধরমাণিক্য, যশোধরমাণিক্য ও কল্যাণমাণিক্যের) বিবরণ সংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামদেবমাণিক্যের রাজত্বকালে এই কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইহা রাজমালা রচনা কার্য্যে তৃতীয় বারের ফল। তৃতীয় লহর রচয়িতার স্থূল বিবরণ গ্রন্থভাগে 'মধ্যমণি'তে পাওয়া যাইবে। রাজমালার এই অংশ আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই লহর দ্বারা একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনার কৌতূহল নিবারিত হইবার আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ব দুই লহরের ন্যায় এই লহরের সম্পাদন কার্য্যেও পাঁচখানা পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরস্পর মিলাইয়া পাঠোদ্ধার করা গিয়াছে। যে-সকল স্থলে পাঠের অনৈক্যতা লক্ষিত হইয়াছে, তাহার পাঠান্তর পাদটীকায় প্রদান করা হইয়াছে। বাঙ্গালা রাজমালা ব্যতীত, সংস্কৃত রাজমালা, রাজরত্নাকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয় ও ত্রিপুর বংশাবলী প্রভৃতি হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহ যথাসাধ্য আলোচনা করা গিয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্য যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, পশচাদ্বর্ত্তী তালিকায় তাহার নাম প্রদান করা হইল। সেই সকল গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকগণের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব।

পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যে যে-সকল মহাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম, এবারও তাঁহাদের প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য প্রদান দ্বারা আমাকে ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম্-এ, বি-এল্; এফ্, ই, এস্; এম, আর্, এ, এস্, মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই খণ্ড সম্পাদিত হইল। এতৎসম্বন্ধীয় কায সনির্ব্বাহ পক্ষে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন। ঢাকা মিউজিয়ামের সুযোগ্য কিউরেটর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহাশয় নানাবিধ ইতিহাসঘটিত প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান দ্বারা আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ ত্রিপুরা রাজ্যস্থ উদয়পুর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী এম্-এ; ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত বিহিরগাঁও নিবাসী সুহৃদয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ, ত্রিপুরা জেলার বুড়িচঙ্গ নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চাকলা রোশনাবাদ দক্ষিণ বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজারী আপিসের মুন্সী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক মহাশয় ব্যক্তি হইতে বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি। চাকলা মধ্য বিভাগের ডিপুটী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ, মহাশয়, কল্যাণপুরের বিলুপ্ত মন্দিরের ফটো প্রদান দ্বারা বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উদয়পুর ও অমরপুরে সংস্থিত প্রাচীন কীর্ত্তির চিত্র ও বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে অমরপুরের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত জয়সিংহ দেববর্ম্মণ বি-এ, মহাশয় ও উদয়পুরের নায়েব স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দেববর্ম্মণ মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই লহরের প্রুফ সংশোধন কার্য্যে আমার সরকারী স্নেহভাজন শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত অন্য যে-সকল ব্যক্তি আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিলে আমাকে কৃতঘ্ন হইতে হইবে। রাজমালা সম্পাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই, মহাশয়ের সহিত এতদ্বিষয়ক নানা কথার আলোচনা করিবার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম; তৎকালে তিনি ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশপূর্ণ মূল্যবান বাক্যাবলী, কার্য্যক্ষেত্রে আমার পথপ্রদর্শক হইয়াছে। রাজমালার সম্পাদন কার্য্য শেষ করিয়া, এমন উপকারী মহৎ ব্যক্তির হস্তে তাহা অর্পণ করিতে সমর্থ হইলাম না, এই দুর্ব্বিষহ ক্ষোভ জীবনে কখনও বিদুরিত হইবার নহে। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্বর্গীয় রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুর বি-এ, মহোদয়ের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজকার্য্যে নিয়োজিত থাকাকালে রাজমালার সম্পাদন কার্য্যে সর্ব্বদা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও শেষ জীবন পর্য্যন্ত এই কার্য্যের সংবাদ লইতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাকে কার্য্যটী শেষ করিয়া দেখাইতে না পারায়, নিতান্তই অনুতপ্ত হইয়াছি। এতদুভয়ের মহৎ আত্মার সদগতি হউক, পরমকারুণিক পরমেশ্বরর সদনে কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

'হস্তী-বিজ্ঞান' শীর্ষক নিবন্ধে সন্নিবেশিত বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের পিলখানার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বসন্তলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবরআলী হাজারী হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি; এতদ্ব্যতীত স্বয়ং দুইবার হস্তী খেদার কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাও এই নিবন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের

আয়তন বৃদ্ধির ভয়ে অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ ইচ্ছানুরূপ সন্নিবেশের অন্তরায় ঘটিয়াছে ; সুতরাং ইহা সকলের তৃপ্তিকর হইবার আশা করা যাইতে পারে না।

রাজমালা তৃতীয় লহরে যে-সকল ব্যক্তি ও স্থানের নামোল্লেখ আছে, সেই সকলের পরিচয় বা বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে নিতান্তই দুরূহ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেনাপতিগণের নামটী পর্য্যন্ত পাইবার উপায় নাই। রণগিরিনারায়ণ, রণভীমনারায়ণ, গজঝম্পনারায়ণ, বীরঝাম্পনারায়ণ, শত্রুমর্দ্দননারায়ণ, সমরবীরনারায়ণ প্রভৃতি নামে তাঁহারা পরিচিত ছিলেন। এগুলি প্রকৃত নাম নহে—উপাধি। ইঁহার কার্য্য তৎপরতার দরুণ দরবার হইতে এই সকল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সে-কালে নামের পরিবর্ত্তে উপাধি দ্বারাই তাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন। এখন তাঁহাদের উপাধি ব্যতীত অন্য পরিচয় বা বংশ-বিবরণ পাইবার উপায় নাই। স্থানের নামগুলির মধ্যে কালপ্রবাহে অনেক নাম পরিবর্ত্তিত ও পূর্ব্ব নাম বিলুপ্ত হওয়ায় প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে এই কারণে স্থানসমূহের সম্যক বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে অসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় লহরের প্রচার কার্য্যে মুদ্রাযন্ত্র লইয়া নিতান্তই অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছিল। এবং তদ্দরুণ কার্য্যে নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের সদয় দৃষ্টি ও কর্ত্তৃপক্ষের মহানুভূতির দরুণ সর্ব্ববিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৃতীয় লহর জনসমাজে প্রকাশিত হইল, এইভাবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলে কৃতার্থম্মণ্য হইব। শ্রীভগবান এই কার্য্যে সহায় হউন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন।

আগরতলা—'রাজমালা' কার্য্যালয়,
রাসপূর্ণিমা—১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

প্রমাণ-পঞ্জী

[যে-সকল গ্রন্থাদি হইতে তৃতীয় লহর সম্পাদন কার্য্যে প্রমাণ বা উপাদান গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা]

সংস্কৃত গ্রন্থাদি

অগ্নিপুরাণ।
অঙ্গিরসংহিতা।
অনন্তসংহিতা।
অমরকোষ।
আদিত্যপুরাণ।
কর্ম্মলোচন।
কামন্দকীয় নীতিসার।
কায়স্থকুলদীপিকা।
কালিকাপুরাণ।
কালীপুরাণ
কুলার্ণব।
কূর্ম্মপুরাণ।
গরুড়পুরাণ।
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।
চাণক্যনীতি।
জলাশয়োৎসর্গ তত্ত্ব।
তন্ত্রচূড়ামণি।
তন্ত্রসার।
দানকমলাকর।
দানসাগর।
দিগ্বিজয় প্রকাশ।
দেবীপুরাণ।
দ্বিরূপকোষ।
নীতিময়ূখ।
পদ্মপুরাণ।
প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব (রঘুনন্দন)।
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক (শূলপাণি)।
প্রায়শ্চিত্তেন্দু শেখর (কাশীনাথ)।
বহ্নিপুরাণ।
বরেন্দ্রব্রাহ্মণ কুলপঞ্জী
বায়ুপুরাণ।
বাল্মীকি রামায়ণ।
বিষ্ণুপুরাণ।
বীরমিত্রোদয়।
বৃহন্নান্দিকেশ্বরপুরাণ।
বৃহৎপরাশর।
বৃহৎসংহিতা।
বৃহৎসামুদ্রিক।
ব্রহ্মপুরাণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
ভবিষ্যপুরাণ।
ভবিষ্যব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।
ভাবপ্রকাশ।
মঠপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব।
মৎস্যপুরাণ।
মনুসংহিতা।
মলমাস তত্ত্ব।
মহাভারত (মূল)।
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।
মার্কণ্ডেয়পুরাণ।
মেরুতন্ত্র।
মোহিনীকোষ।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।
যুক্তিকল্পতরু।

যোগযাত্রা।
যোগসার।
রাজনির্ঘণ্ট।
রাজবল্লভ।
রাজমালা (সংস্কৃত)।
রাজরত্নাকর (হঃ লিঃ)।
লক্ষণ কাণ্ড (হিমাদ্রি)।
শব্দকল্পদ্রুম।
শব্দরত্নাকর।
শব্দরত্নাবলী।
শুক্রনীতি।
শুদ্ধিতত্ত্ব।
সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।
সাধনমালা।
সূতসংহিতা।
হরিভক্তিবিলাস।
হারিতসংহিতা।
ক্ষিতীশ বংশাবলী।

বাঙ্গালা গ্রন্থাদি

অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা (গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র)।
উদয়পুর বিবরম (ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত)।
কাছাড়ের ইতিবৃত্ত (উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ)।
কায়স্থ কলিকা।
কৃষ্ণমালা (হস্তলিখিত)।
গৌর লেখমালা (রামানাথ চন্দ)।
চট্টগ্রামের ইতিহাস (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী)।
চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ (ব্রজসুন্দর মিত্র)।
চণ্ডী (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)।
চম্পক বিজয় (হস্তলিখিত—সেখ মনোহর)।
জগন্নাথপুরের ইতিহাস।
ঢাকার ইতিহাস (যতীন্দ্রমোহন রায়)।
তরপের ইতিহাস (ছৈয়দ আব্দুল আকবর)।
তবকাৎ-ই-নাসেরী (মীনহাজ—অনুবাদ)।
ত্রিপুর বংশাবলী (হস্তলিখিত—দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র)।
ত্রিপুরার স্মৃতি (শ্রীল শ্রীযুত বড়ঠাকুর বাহাদুর)।
ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস (শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)।
নব্যভারত (১৩১৪)।
প্রকৃতিবাদ অভিধান (রামকমল বিদ্যালঙ্কার)।
প্রবাসী (১৩২৬, প্রথম খণ্ড)।
প্রাচীন রাজমালা (হস্তলিখিত)।
ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায়)।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (নগেন্দ্রনাথ বসু)।
বাকলা (রোহিণীকুমার সেন)।
বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।
বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
বার ভূঞা (আনন্দনাথ রায়)।
বিচিত্রা (বৈশাখ, ১৩৩৫)।
বিজয়া পত্রিকা।
বিশ্বকোষ (নগেন্দ্রনাথ বসু)।
বৈদ্যকুল পঞ্জিকা।
ভারতী (ফাল্গুন—১২৯৯)।
ভুলুয়ার ইতিহাস।
ময়নামতীর গান (দুর্লভ মল্লিক)।
ময়নামতীর গান (ভবানী দাস)।
ময়মনসিংহ গীতিকা (দীনেশচন্দ্র সেন)।
ময়মনসিংরে ইতিহাস (কেদারনাথ মজুমদার)।
যশোহর খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্দ্র মিত্র)।
রাজমালা (হস্তলিখিত, রাজাবাবুর বাড়ীর)।
রাজমালা (কৈলাসচন্দ্র সিংহ)।
রাজমালা (১ম ও ২য় লহর)।
রামচরিত (সন্ধ্যাকর নন্দী)।

রিয়াজ-উস্-সলাতিন (অনুবাদ—রামপ্রাণ গুপ্ত)।
শিলালিপি সংগ্রহ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ)।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম)।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক গাঙ্গুলী)।
শ্রীহট্ট দর্পণ (মৌলবী মহম্মদ আহামদ)।
শ্রীহট্টের ইতিহাস (অচ্যুতচরণ চৌধুরী)।
শ্রেণীমালা (হস্তলিখিত)।
সন্দ্বীপের ইতিহাস (রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ও আনন্দমোহন দাস)।
সাহিত্য (বৈশাখ—১৩০১, কার্ত্তিক ১৩১৯)।
সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস (স্বরূপচন্দ্র রায়)।
সেক শুভোদয় (হস্তলিখিত)।

ইংরেজী গ্রন্থাদি

Ain-I-Akbari-Vol.II. (Col. H.S. Jarrett.)
Akbarnama-(Elliot.)
Akbarnama (N. Beveridge.)
Analysis of the Rajmala (J. A. S. B — Vol. XIX.)
Asiatic Researches — Vol. XIV. (Wilford.)
Assam District Gazetteers — Vol II (Sylhet.)
Barah Bhuyas of Bengal (J. Wise.) J. A. S. B — No. 3, 1874.
Catalogue of the Budhist Mss. (Bendall.)
Elliot's History — Vol VI
Geography and History of Bengal. (Blochmann.)
Hacklyt's Voyages — Vol. II.
History of Bengal (Stewart.)
History of Bakarganj (N. Beveridge.)
History of Manipur.
History of Tripura (E.F. Sandys)
History of the Rituals Rural Bengal.
Indian Antiquary — Vol. IV
Journal Asiatic Society of Bengal.
Oxford History of India — (V. A. Smiths.)
Paper No. 798, Dated 1st June, 1883.
Proc. Asiatic Society of Bengal —1877.
Report for the Search of Sanskrit-Manuscripts —1895-1900.
Statistical Account of Assam Vol.-II (Sylhet. Hunter.)
Statistical Accounts of Dacca, Faridpur & Backergunj (Hunter.)

পূর্ব্বাভাষ

রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরের সম্পাদন কার্য্যে যে পাঁচখানা পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সকল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনেই তৃতীয় লহর সম্পাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির একখানার সহিত অন্যখানার অনেকস্থলে বর্ণবিন্যাসের ঐক্য নাই; প্রত্যেক গ্রন্থের নকলকারী স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা বা প্রবৃত্তি অনুসারে বর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অধিকন্তু, এই সকল গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পরস্পর পাঠের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়; ইহাও নকলকারীগণের হস্ত-কৌশল বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা স্ব স্ব অবলম্বিত গ্রন্থের শব্দ বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া অনেকস্থলে শব্দ বিকৃতি ঘটাইবার নিদর্শনও বিরল নহে। এই সকল কারণে বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি অবলম্বন করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি; নিরুপায়স্থলে এবম্বিধ আচরণ অপরিহার্য্য। এই কার্য্য সুধী সমাজের মার্জ্জনীয় হইবে বলিয়া আশা করি। যে-সকল স্থলে পাঠের বৈষম্য পাওয়া গিয়াছে, পাদটীকায় তাহার পাঠান্তর প্রদান করা হইল।

রাজমালার পাণ্ডুলিপি বিষয়ক বিবরণ

রাজমালার তৃতীয় লহর খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই শতাব্দী বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির যুগ ছিল। বঙ্গভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিরোধের ফলে ভাষার এই শুভযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই শতকে কাণাহরি দত্ত মনসামঙ্গল রচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গভাষার যে যুগান্তর ঘটাইয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

তৃতীয় লহর রচনার পক্ষে সময়ের আনুকূল্য

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও মাণিক দত্তের চণ্ডীকাব্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সম্পদ। পূর্ব্বকথিত কাণাহরি দত্তকেই ইঁহাদের পথপ্রদশক বলিতে হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে-সকল মহাপুরুষ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠ রত্ন দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ডিদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও পদাবলী, বিদ্যাপতির পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সঞ্জয় কবির মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় সমুজ্জ্বল রত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজয় গুপ্ত, মুক্তারাম সেন, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রূপরাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজ অভিরাম, শ্রীকর নন্দী, মালাধর বসু প্রভৃতি বহু ব্যক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি। ইঁহারা মনসামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য ধর্ম্মমঙ্গল ও মহাভারত ইত্যাদি রচনাদ্বারা বঙ্গবাণীকে যে অমূল্য ভূষণে ভূষিতা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। দ্বিজ বংশীবাদন, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেনের মনসামঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল,

শঙ্কর কবীন্দ্র, দ্বিজ মধুকণ্ঠ ও ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাস, মাধবাচার্য্য, কবিচন্দ্র ও ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির মহাভারত এবং গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির সুললিত পদাবলী ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দান।

ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। এই শতকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, দ্বিজ কমললোচন প্রভৃতি অসংখ্য কবি মনসামঙ্গল, চণ্ডীকাব্য, ধর্ম্মমঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থদ্বারা বঙ্গভাষার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। এই শতাব্দীর দানের মধ্যে কৃষ্ণদাসের ভক্তমাল, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, অকিঞ্চন দাসের জগন্নাথ বল্লভ, বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির পদাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীতে ত্রিপুরায়ও সাহিত্য চর্চ্চার একটা সাড়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দমাণিক্যের আদেশানুসারে দেবাই পণ্ডিতের অনূদিত বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থই ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক। এই সময় রাজমালা তৃতীয় লহর রচনার পক্ষে কালের স্রোত যে বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

তৃতীয় লহরের ঐতিহাসিক মূল্য

রাজমালা তৃতীয় লহরের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় ; সম্ভবতঃ ঘটনার দীর্ঘকাল পরে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, এবম্বিধ ক্রটী ঘটিয়াছে। এই লহরে সন্নিবেশিত পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য-ইঙ্গিত সমূহের বিবৃতি 'মধ্যমণিতে' প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে, এই চেষ্টার ফল সুধীবর্গের বিচার্য্য।

বংশ পত্রিকা সম্বন্ধীয় কথা

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে ত্রিপুরেশ্বরগণের এক বংশলতা সংযোজিত হইয়াছে। তৎকালে এই বংশপত্রিকা সম্বন্ধে নিবেদন করা হইয়াছিল, — "এই কার্য্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে ; কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের শাখা-প্রশাখার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালে তাহার উদ্ধার সাধন নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও পূর্ণ বা নির্ভুল হইয়াছে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা চাইতে পারে না।"

কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। অনুসন্ধানের ক্রটী এবং নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ দ্বিতীয় লহরের প্রদত্ত তালিকায় কতিপয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ পড়িয়াছে এবং কতিপয় দূরবর্ত্তী শাখার ব্যক্তিবর্গের নাম (যাহা বংশপত্রিকায় সংযোজনের প্রয়োজন ছিল না) সন্নিবেশিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত এই সকল ক্রটী বর্জ্জন করিয়া, এস্থলে সংশোধিত বংশপত্রিকা প্রদান করা হইল। দ্বিতীয় লহরে সংযোজিত বংশাবলীর পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। সংশোধনের ফলে উক্ত উভয় বংশাবলীর মধ্যে বেশী পার্থক্য ঘটে নাই।

ত্রিপুর-বংশাবলী

(সংশোধিত)

[নামের বামপার্শ্বের অঙ্ক রাজগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপন]

১। **চন্দ্র**
↓
২। বুধ
↓
৩। পুরূরবা *
↓
৪। আয়ু
↓
৫। নহুষ
↓
৬। যযাতি
↓
৭। **দ্রুহ্যু** †
↓
৮। বভ্রু
↓
৯। সেতু
↓
১০। আনর্ত্ত (আরব্ধ বা আরদ্বান)
↓
১১। গান্ধার
↓
১২ ধর্ম্ম (ঘর্ম্ম)
↓
১৩। ধৃত (ঘৃত)
↓
১৪। দুর্ম্মদ
↓
১৫। প্রচেতা
↓
১৬। পরাচি (শতধর্ম্ম)
↓
১৭। পরাবসু

১৭
↓
১৮। পারিষদ
↓
১৯। অরিজিৎ
↓
২০। সুজিৎ (অসুজিৎ)
↓
২১। পুরূরবা (২য়)
↓
২২। বিবর্ণ
↓
২৩। পুরুসেন
↓
২৪। মেঘবর্ণ
↓
২৫। বিকর্ণ
↓
২৬। বসুমান
↓
২৭। কীর্ত্তি
↓
২৮। কনীয়ান
↓
২৯। প্রতিশ্রবা
↓
৩০। প্রতিষ্ঠা
↓
৩১। শত্রূজিৎ (শত্রুজিৎ)
↓
৩২। **প্রতর্দ্দন** ‡
↓
৩৩। প্রথম

---

* ইনি পিতা কর্ত্তৃক প্রয়োগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থান বর্ত্তমান কালো 'ঝুসী' নামে পরিচিত।

† ইনি পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরদ্বীপস্থিত কপিলাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন।

‡ ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে কাছাড়ে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। ইহার প্রযত্নেই কিরাতদিগকে জয় করিয়া বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।
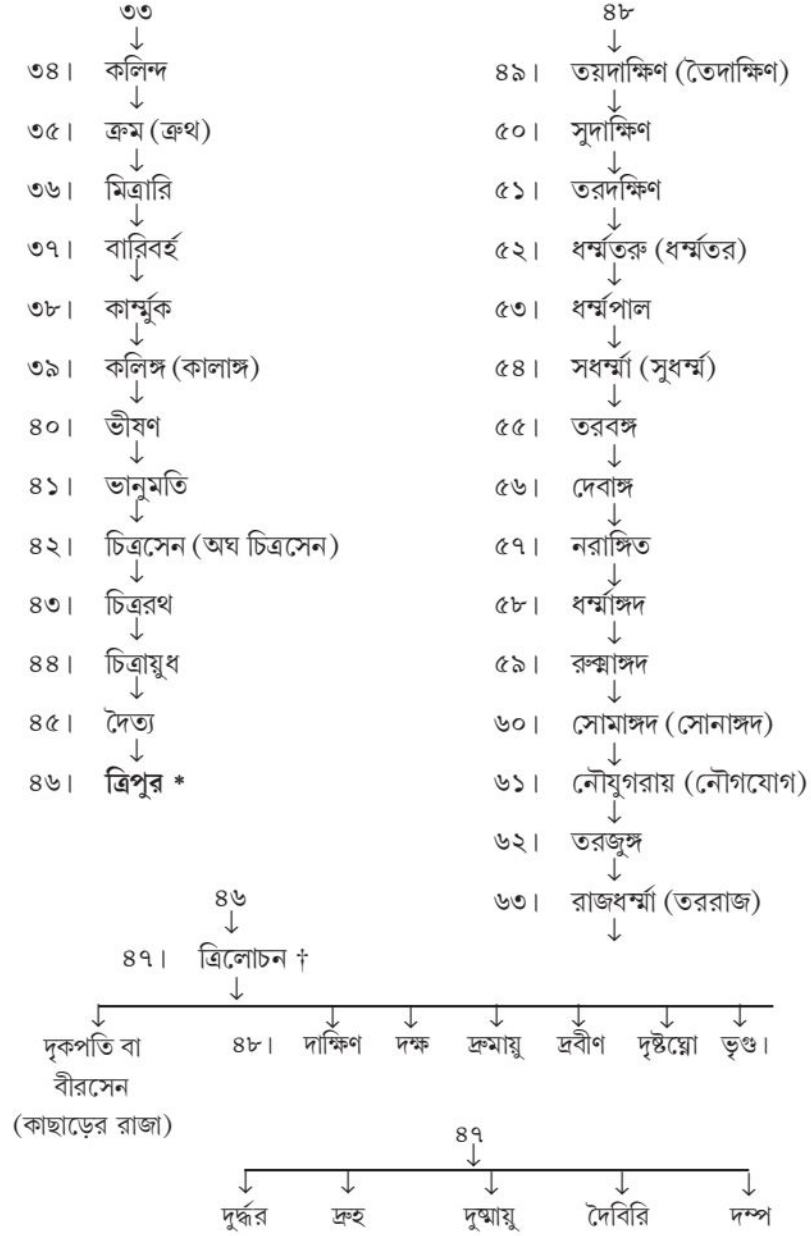
* ইঁহার সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে ; এবং ইনিই রাজ্যের 'ত্রিপুরা' নামের প্রবর্ত্তক।

† ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃক্‌পতি কাছাড়ে মাতামহের রাজ্যলাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন।

* ইঁহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

† এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেক হালাম ভাষাজাত এক একটি উপনাম গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির প্রভুত্ব ছিল ; রাজন্যবর্গের হালাম ভাষা নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবার ইহাই কারণ।

* ইঁহার সম্পাদিত তাম্রশাসনে "ধর্ম্ম পা" নাম লিখিত হইয়াছে।

১২২
↓
১২৩। রামচন্দ্র (খারং ফা বা কুরুঙ্গু ফা)
↓

১২৪। নৃসিংহ
(ছেংফণাই বা সিংহ ফণী)

১২৫। ললিত রায়
↓
১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা)
↓
১২৭। কমল রায়
↓
১২৮। কৃষ্ণ দাস
↓
১২৯। যশোরাজ (যশ ফা)
↓

১৩০। উদ্ধব (মোচং ফা)।

১৩১। সাধু রায়
↓
১৩২। প্রতাপ রায়
↓
১৩৩। বিষ্ণুপ্রসাদ
↓
১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর)
↓
১৩৫। বীরবাহু
↓
১৩৬। সম্রাট
↓
১৩৭। চম্পকেশ্বর (চাম্পা)
↓
১৩৮। মেঘরাজ (মেঘ)
↓
১৩৯। ধর্ম্মধর (ছেংকাছাগ্)
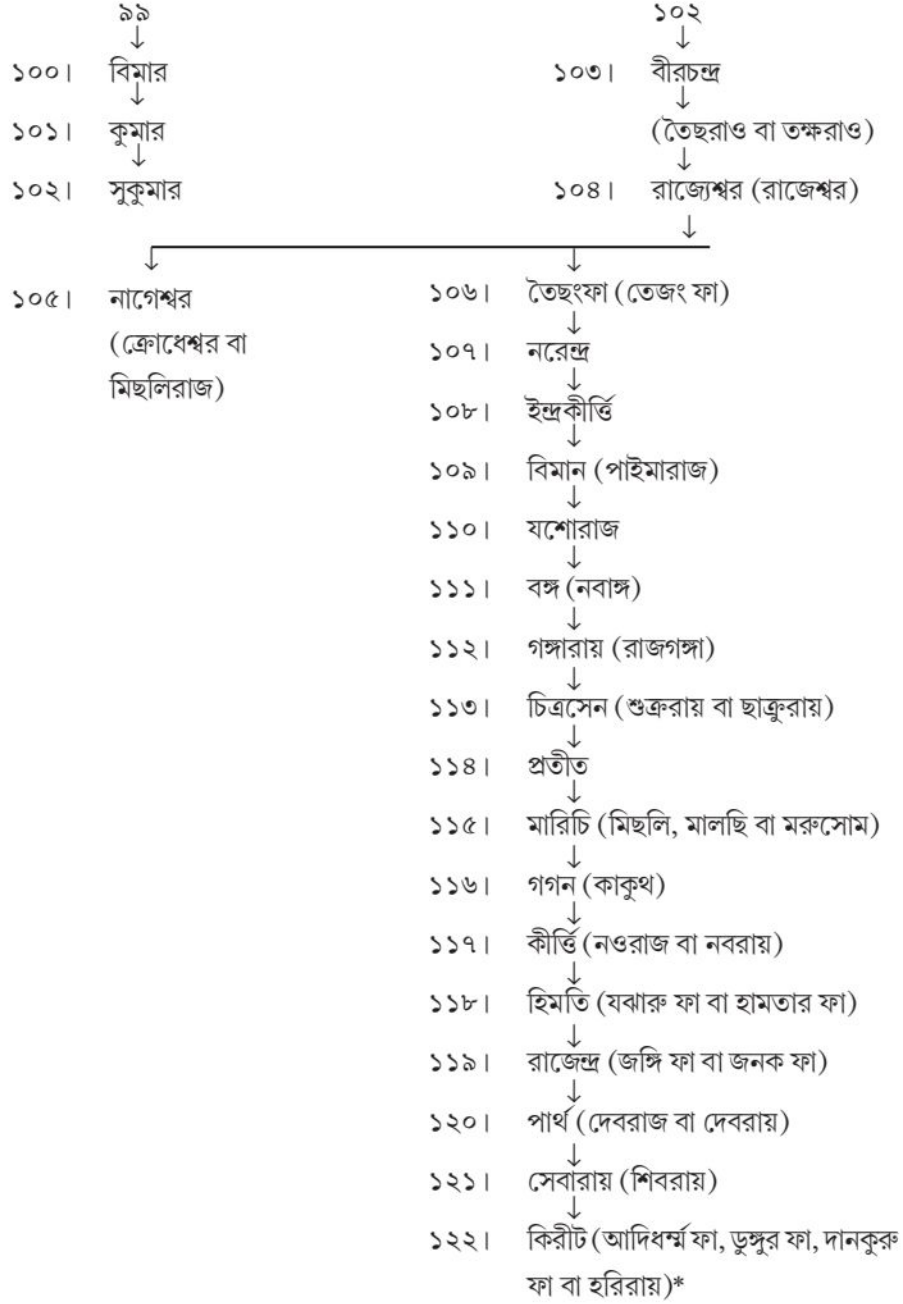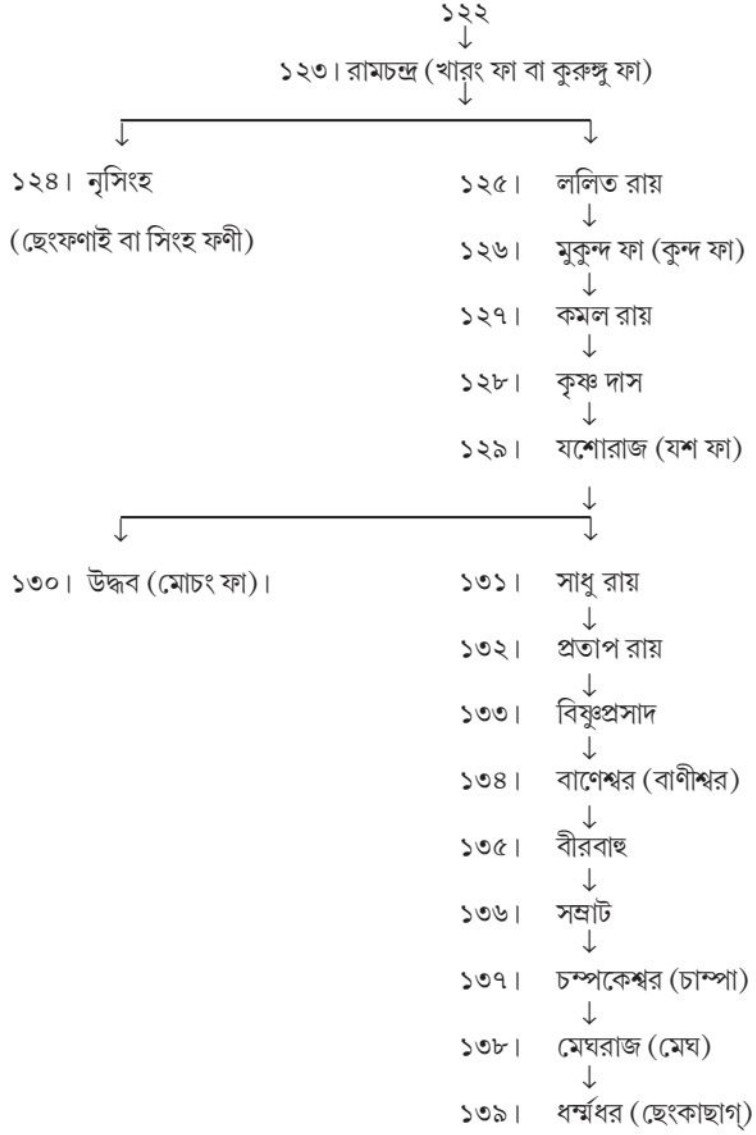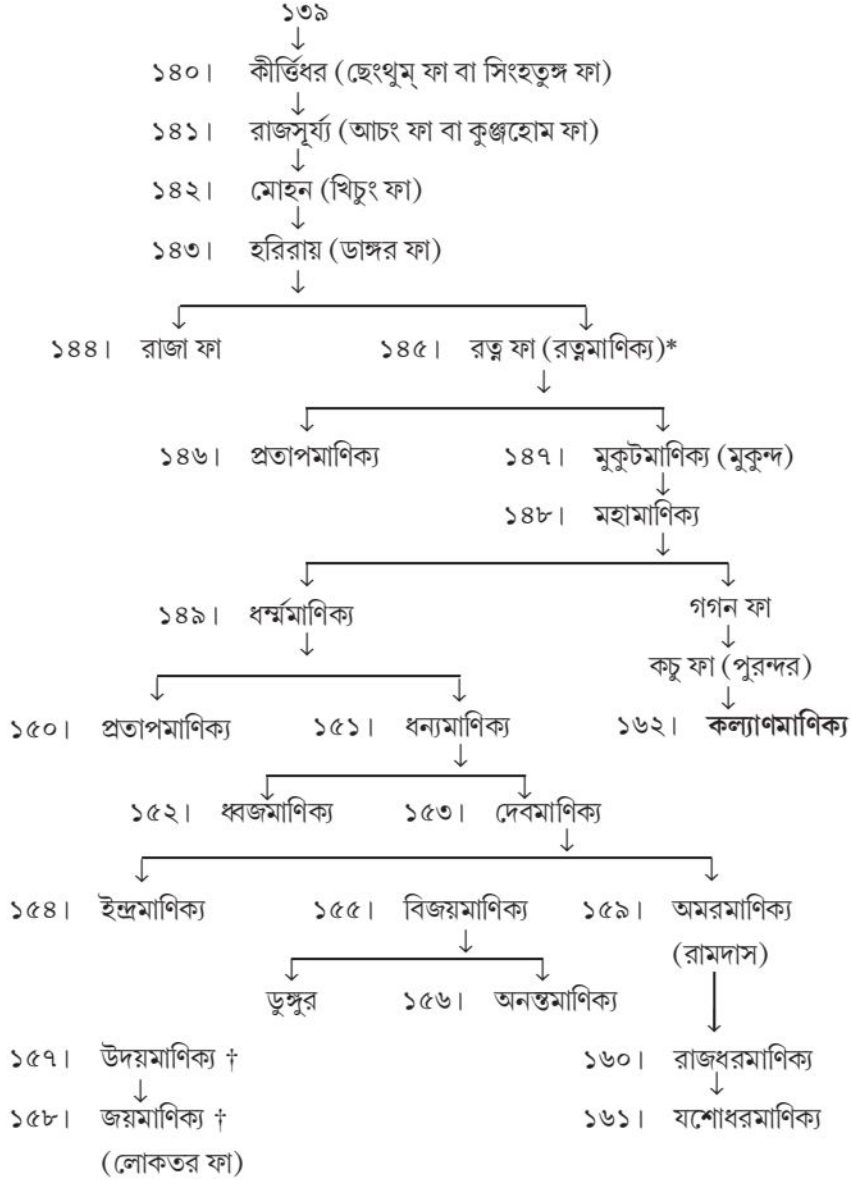
* এই সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইঁহার পরবর্ত্তী কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির 'ফা' উপাধি পাওয়া যায়।

† ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজা ভিন্ন বংশীয়।

বংশাবলী সম্বন্ধীয় কথা যখন তুলিতেই হইল, তখন রাজবংশ ব্যতীত, অন্য দুইটি প্রসিদ্ধ বংশের কথাও এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। রাজমালা প্রথম লহরের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে—

"রত্নমাণিক্যের লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান কালে তিনজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য বংশ সম্ভূত, ধন্বন্তরী গ্রোত্রজ জয় নারায়ণ সেন। অপর দুইজন কায়স্থ জাতীয়। * * * মহারাজ রত্নমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিবার পরে এই তিনজনকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। * * * তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত বাতিসা নিবাসী বৈদ্যগণ এই সময় রাজ-চিকিৎসকের পদ লাভ করেন।"

প্রথম লহরের সম্পাদন কালে, নানাস্থানে পত্রাদি লিখিয়াও বাতিসার বৈদ্যগণের বংশ-বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। ইদানীং ত্রিপুরা রাজ্যস্থ উদয়পুর বিভাগের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মহারাজ রত্নমাণিক্যের আনীত জয়নারায়ণ সেনের বংশ-পত্রিকাসহ অনেক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা আলোচনায় জানা যায়, জয়নারায়ণ সেন, মহারাজ রত্নমাণিক্যের কৃপায় রাজবৈদ্যের পদ লাভ করিয়া পৈতৃক বাসভূমি যশোহর জেলার অন্তর্গত বেন্দা গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ যাদবেন্দ্র সেন ও যাদবেন্দ্রের পুত্র ধন্বন্তরী সেন মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে বিশেষ প্রতাপান্বিত রাজবৈদ্য ছিলেন। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে লিখিত আছে,—

বাতিসার বৈদ্য বংশ

"ধন্বন্তরি নারায়ণ পিতা যাদু বৈদ্য।"

রাজমালা, — দ্বিতীয় লহর, ৬৩ পৃষ্ঠা।

এস্থলে যাদবেন্দ্রকে 'যাদু বৈদ্য' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে ; এবং তৎপুত্র ধন্বন্তরী সেনের 'নারায়ণ' উপাধি ছিল। এই উপাধি ত্রিপুরার সামন্ত, সেনাপতি ও চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 'নারায়ণ' উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এতদ্বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ কর্ত্তা ভ্রমে পতিত হইয়া ধন্বন্তরীকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়াছেন, এবং অন্য সূত্র না পাইয়া আমরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছি (রাজমালা— ২য় লহর, ২৫৬।২৬২ পৃষ্ঠা)। কুঞ্জবাবু এই বংশের প্রকৃত বিবরণ প্রদান দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও ভ্রান্ত পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত বাতিসা গ্রামে ও দাঁড়রা পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্বল্পমাদারী গ্রামে যে-সকল ধন্বন্তরী গোত্রজ বৈদ্য বাস করিতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত যাদবেন্দ্র সেনের (যাদু বৈদ্যের) বংশসম্ভূত। এই বংশের বংশ-পত্রিকাসহ বিশেষ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

আর একটী আলোচ্য বিষয়—বাতিসার বিশ্বাস বংশ। মহারাজ রত্নমাণিক্য লক্ষ্মণাবতী হইতে যে-সকল সুযোগ্য ব্যক্তিকে আনিয়া রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতরাজ অন্যতর ব্যক্তি। কটোয়ার অন্তর্গত কাটাদিয়া গ্রাম ইঁহার বাড়ী ছিল। ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রজ বাদ্যঘটী গাঁই। ত্রিপুরায় আগমন করিয়া পণ্ডিতরাজ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর আসন লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণও রাজদরবারে প্রতিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত ছিলেন, ইঁহাদের লব্ধ 'বিশ্বাস' উপাধিই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

বাতিসার বিশ্বাস বংশ

কুঞ্জবাবু এই বংশের উত্তরপুরুষ, তিনি পণ্ডিতরাজ হইতে গণনায় অধস্তন ১১শ স্থানীয়। ইনি কৃপা করিয়া বাতিসার বৈদ্য বংশের বিবরণের ন্যায় স্বীয় বংশের বৃত্তান্তঘটিত লিপিসহ বংশ-পত্রিকা প্রদান দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তদবলম্বনে চতুর্থ লহরের যথাস্থানে এই বংশের বিবরণ প্রদান করিবার সঙ্কল্প রহিল।

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য যেমন গৌরবময়, তেমনি সুবিস্তীর্ণ ছিল। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ এককালে এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তৎকালে উত্তর আরাকান ত্রিপুরার হস্তগত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমে সুন্দরবন পর্য্যন্ত, পূবের্ব মণিপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমা ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ লইয়া ত্রিপুরার বিস্তৃতি ছিল। এই সময় ত্রিপুরেশ্বর 'সম্রাট' পদবী লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন।

রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তন বিষয়ক স্থূল বিবরণ

এস্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে। রাজমালায় পাওয়া যায়, ত্রিপুরেশ্বর যুঝার ফা-এর পুত্র জাঙ্গে ফা নানা স্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

> "জাঙ্গে ফা নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা।
> নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদেব পূজা।।
> ফেণী নদী তীরে আর মোহরির তীরে।
> দেশের পশ্চিমে পূজে লক্ষ্মীপতি ধারে।।
> পূর্ব্বদিকে পূজে আদ্যে অমরপুরেতে।
> চতুর্দ্দশ দেব পূজে দৃঢ় ভক্তি মতে।।"
>
> রাজমালা — ১ম লহর, ৫৩ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃতাংশের—"পূর্ব্বদিকে পূজে আদ্যে অমরপুরেতে" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাবতী নগরীতে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করা হইয়াছিল, এবং সেই স্থান পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল। ব্রহ্ম রাজ্যের কিয়দংশ ত্রিপুরার হইয়া থাকিলেও সেই রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের হস্ত প্রসারিত হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত 'অমরপুর' অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত স্থান মহারাজ অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছে বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস, আমরাও এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা মহারাজ অমরমাণিক্যের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তৎকালে বর্ত্তমান 'অমরপুর' নামকরণ হয় নাই এই কারণেই কেহ কেহ রাজমালায় কথিত অমরপুরকে ব্রহ্মদেশের রাজধানী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মের রাজধানী 'অমরাবতী' নামও অধিক প্রাচীন নহে। রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বর্ত্তমান অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু স্থানের নাম তৎকর্ত্তৃক 'অমরপুর' রক্ষিত হইয়াছে, কিম্বা পূর্ব্ব হইতেই এই নাম প্রচলিত ছিল, পূর্ব্বোক্ত কারণে সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। মহারাজ উদয়মাণিক্য কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটীর 'উদয়পুর' নামকরণ হইবার কথা রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে, –– অমরপুর নামকরণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কোন কথাই পাওয়া যায় না। এই কারণে মনে হয়, উক্ত স্থান প্রাচীনকাল হইতেই 'অমরপুর' নামে অভিহিত থাকা বিচিত্র নহে, এবং মহারাজ জাঙ্গে ফা এই স্থানেই চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অথবা অন্য কোন স্থানের 'অমরপুর' নাম ছিল, কালপ্রভাবে সেই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা অনুমানসিদ্ধ হইলেও একমাত্র রাজমালার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানীতে ত্রিপুরার বিজয় ঘোষণা করিবার সাহস আমাদের নাই। উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ যে ত্রিপুরার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং রাজমালা প্রথম লহরে সন্নিবিষ্ট ৪ নম্বর মানচিত্র আলোচনায়ও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রাজমালার উদ্ধৃত বাক্যে ফেণী নদী, মোহরী নদী ও লক্ষ্মীপতি হাকর নামের সহিত অমরপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফেণী নদী দ্বারা বর্ত্তমান কালে রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারিত হইতেছে। মোহরী নদী ও লক্ষ্মীপতি এখনও রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা মনে হয়, ঐ সকল স্থানের ন্যায় অমরপুর, রাজধানী উদয়পুরের সন্নিহিত ছিল।

মুসলমানের আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে সুবিস্তীর্ণ ত্রিপুর রাজ্য উত্তরোত্তর ক্ষীণ কলেবর হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, পশ্চিম সীমা অনেক পূর্ব্বেই খর্ব্ব হইয়া, মেঘনা নদের তীর পর্য্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি স্থিরতর থাকে। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকাল হইতে ত্রিপুরার সমভূমি ক্রমশঃ মুসলমানের করকবলিত হইতেছিল। সমতল ক্ষেত্রের যে-সকল ভূ-ভাগ ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত বা জমিদারগণের অধিকৃত ছিল, রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তর্গত ঘটনার সমসাময়িককালে তাহা মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া কতিপয় জমিদারীতে বিভক্ত ও নানা ব্যক্তির হস্তগত হয়। যে অংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের

হস্তে ছিল, তাহা জমিদারীসূত্রে রাজ্যের অঙ্গীভূতভাবে রহিয়াছে। এতদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরে পাওয়া যাইবে। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের সময়ে রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, এবং তৃতীয় লহরের সময়ে সেই সীমা কতটা খর্ব্বীভূত হইয়াছে, এতৎসহ সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহা জানা যাইবে।

চট্টগ্রামের অবস্থা আলোচনা করিলে জানা যায়, কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজার রাজত্বের পর, দামোদর দেব নামক চন্দ্রবংশীয় এক রাজার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইবার কালে ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক ঐ প্রদেশ বিজিত ও ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। অতঃপর মঘ ও মুসলমান কর্ত্তৃক এই প্রদেশ বারম্বার আক্রান্ত ও বিজিত হইলেও কোন কোন সময় ত্রিপুরার হস্তগত ও কোন কোন সময় হস্তচ্যুত হইতেছিল। এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিয়াছে। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বের অবসানকালে ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ্ ফিছ সপ্তগ্রাম হইচে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তিনিও এইস্থানে যাইয়া পুর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা দেখিয়াছেন;* কিন্তু রাজমালা তৃতীয় লহরের সমসাময়িক সম্যককালে এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তগত ছিল না। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানরাজ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হইবার সময় হইতে এতদঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অঙ্গচ্যুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে মুসলমানের করকবলিত হয়। কাহারও কাহারও মতে মুসলমান শাসনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম একবার ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হয় নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে এই ভূ-ভাগ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে দেওয়ানী লাভ করিয়া থাকিলেও শাহ আলম বাদশাহ ১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট তারিখের করমান্ দ্বারা তাহা স্বীকার করিয়া ছিলেন। চট্টগ্রাম তৎপূর্ব্ব হইতেই মুসলমানের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং শেষোক্ত মত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। মহারাজ যশোধরমাণিক্যের শাসনকালে মঘ বাহিনীর সহিত ত্রিপুরার এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ কোন্ স্থানে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল, জানা যাইতেছে না। স্থূল কথা, মহারাজ অমরমাণিক্যের পরে চট্টগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য স্থাপনের কোনরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে প্রদেশ পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নাম প্রসিদ্ধ, তাহা তৎপরবর্ত্তী অনেককাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল।

---

* From satagam I travelled by the country of the king of Tripura with whom the Mogen have almost continual warres. The Mogen which be of the kingdome of Recon and Rame, be stronger than the king of Tippara. So that chatigan, or Portogrando, is often times under the king of Recon.

Ralph fitch.

ভুলুয়া রাজ্য (নোয়াখালী) লইয়া বারম্বার বিপ্লব উপস্থিত হইলেও রাজমালা তৃতীয় লহরের শেষ সময় পর্য্যন্ত এই রাজ্য ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য রূপেই চলিয়া আসিয়াছে। ভুলুয়ার রাজগণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়াও এই সময়মধ্যে ত্রিপুরার আনুগত্য অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই কিন্তু তৃতীয় লহরের কাল অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মোগল সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়াছে।

কাছাড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা কালে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ প্রতীত ও কাছাড় রাজ্যের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। * বিদেশীয় ঐতিহাসিকও এই সীমা নির্দ্ধারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।† ইহার পর এই রাজ্য ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কথিত আছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান কাছাড় জেলার উত্তর দিগ্বর্ত্তী ভূ-ভাগের একজন রাজা ত্রিপুরেশ্বরের কন্যা বিবাহ করিয়া কাছাড় উপত্যকা যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।‡ তদবধি কাছাড় অঞ্চল ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছে। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ যশোধরমাণিক্য রাজত্ব করিয়াছেন। কোন্ রাজা স্বীয় কন্যা-জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। যে-সূত্রেই হউক; কাছাড় যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ত্রিপুরার হাতছাড়া হইয়াছে, এ কথা সত্য। জয়ন্তীয়া রাজ্যও অনেক পূর্ব্বেই কাছাড়ের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট প্রদেশ ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলেও তাঁহাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই বিজয়ের পরেও সেই অঞ্চলে ত্রিপুরার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতকের তৃতীয় পাদে পুনর্ব্বার উক্ত প্রদেশ মুসলমানের হস্তগত হয়। তদবধি ত্রিপুরা ও অহোমগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়ায় মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। কামরূপের অধিপতি নরনারায়ণের সৈন্যাধ্যক্ষ চিলারায় কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত হইবার অল্পকাল পরে (১৫৮১ খ্রীঃ ১৫০৩ শকে) মহারাজ অমরমাণিক্য পুনর্ব্বার শ্রীহট্ট জয় করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তাকে কারারুদ্ধ ও কর প্রদান জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন।§ অমরমাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়কালে সেই স্থানে একটী অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভ থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা ঃ—

"শ্রীহট্টের মুনারা উচ্চ অর্দ্ধ ভাঙ্গা ছিল।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১০ পৃঃ

---

* রাজমালা — ১ম লহর, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।

† Hunter's Bengal & Assam — Vol VI, P. 264

‡ Aitchinson's Treatise. — P. 213

§ Geography & History of Bengal — (H. Blochmann)

J. A. S. B. 1873. P. 216.

'মুনারা' মিনার শব্দের অপভ্রংশ। শ্রীহট্টের ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে,—

"উচ্চ স্তম্ভকে মিনার বলে। বর্ত্তমান সহরের উত্তরে এক উচ্চ শৈলখণ্ড দৃষ্ট হয়, ইহাকে মিনারের টিলা বলিত। (সাধারণ লোকে মনারায়ের টিলা বলে।)"

শ্রীহট্টের ইতিঃ— ২য় ভাঃ, ২য় খণ্ড, ১ম অঃ, ৫ পৃষ্ঠা।

সম্ভবতঃ এই মিনার বা স্তম্ভকেই রাজমালা লেখক 'মুনারা' বলিয়াছেন ; 'মনারায়' ও 'মুনারা' শব্দে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এতদুভয় শব্দ 'মিনার' শব্দের রূপান্তর বলিয়াই বুঝা যায়।

অমরমাণিক্যের বিজয়ের পর কোন্ সময়ে এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। মুসলমানগণের শাসন বিবরণী আলোচনা করিলে মনে হয়, এই প্রদেশে ত্রিপুরার আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ; রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় মধ্যেই তদঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট প্রদেশ, লাউড়, বানিয়াচঙ্গ, তরপ, জয়ন্তীয়া, গৌড় (শ্রীহট্ট সহর-সহ), ইটা ও প্রতাপগড় এই কয়টী খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত এবং ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল তন্মধ্যে—

লাউড় রাজ্য ঃ— এই রাজ্য শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। লাউড় প্রথমতঃ প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্তের শাসনাধীন থাকিবার প্রমাণ আছে। তাঁহার বংশের অবসানে, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় মাণিক্য নামধারী জনৈক হিন্দু নরপতি এখানে রাজত্ব করিয়াছেন ; ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইঁহার রাজধানী ছিল— জগন্নাথপুরে। শ্রীহট্টের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় ইঁহার ১১১৩ শকে মুদ্রিত একটী রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। ইঁহার বংশীয় কতজন রাজা এইস্থানে কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। অতঃপর দিব্যসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ নৃপতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার পর কেশব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা কর্ত্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইয়াছে। কেশবের অধস্তন কয়েক পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করিবার পর, লাউড় রাজ্য বানিয়াচঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ খাঁ-এর হস্তগত হয়। লাউড়ের রাজবংশীয় জয়সিংহ হৃত রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত দিল্লীতে যাইয়া যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে লাউড় রাজ্যের অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা গ্রন্থভাগে ১০৮—১১২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। সম্রাট দরবারে গোবিন্দ খাঁ-এর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, দৈবানুকূল্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহার পর লাউড়ের কিয়দংশ গোবিন্দ খাঁ-এর এবং অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজবংশের হস্তগত হয়। লাউড় রাজ্যের উপর ত্রিপুরার যে প্রভাব ছিল, উক্ত রাজ্য মুসলমানগণের

হস্তগত হইবার পর হইতে সেই প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাবিব খাঁ কর্ত্তৃক গোবিন্দসিংহ নিহত ও লাউড় রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

বানিয়াচঙ্গ ঃ— এই রাজ্যের বিবরণ গ্রন্থভাগে ১০৬—১১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া গিয়াছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের সময় পর্য্যন্ত এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের পরে ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, এই সময় বানিয়াচঙ্গও মুসলমানগণের কুক্ষিগত হইয়াছিল।

তরপ ঃ— তরপ রাজ্য পূর্ব্ব হইতে ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিলেও মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে তথাকার মুসলমান শাসনকর্ত্তা ত্রিপুরেশ্বরের অবাধ্য হওয়ায়, তৎকর্ত্তৃক তরপ রাজ্য আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছিল। ১৪৮—১৫৩ ও ৩৩৮ পৃষ্ঠায় স্থূলবিবরণ প্রদান করা গিয়াছে। তরপ প্রদেশ মহারাজ অমরের শাসনকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত থাকিলেও শ্রীহট্টের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশও পূর্ণ মাত্রায় মুসলমানের শাসনাধীন হইয়াছিল।

জয়ন্তীয়া রাজ্য ঃ— বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া জয়ন্তিয়া রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্য অতি প্রাচীন, জৈমিনি ভারতে জয়ন্তীয়া 'নারীদেশ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই রাজ্যের ইতিহাস নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে, এস্থলে সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা নাই। জয়ন্তীয়া রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, জয়ন্তীয়া রাজ ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ১৬০—১৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। তদবধি জয়ন্তীয়াপতি ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বহুকাল পূর্ব্বেই এই সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে জয়ন্তীয়া রাজ্যের নামোল্লেখ করা হয় নাই।

গৌড় বা শ্রীহট্ট ঃ— এই রাজ্যের বিবরণ গ্রন্থভাগে ৩৩৯—৩৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজমালা তৃতীয় লহরের সমসাময়িক কালে এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

ইটারাজ্য ঃ— এই রাজ্যের অবস্থা গ্রন্থভাগে ৩৪০—৩৪৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় আগত হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে অথবা উক্ত লহরের ঘটনার সমসাময়িক কালে এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার প্রভাব তিরোহিত হইয়াছে।

প্রতাপগড় ঃ— এই ভূ-ভাগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে ছিল। রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ এইস্থানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থান করিবার প্রমাণও পাওয়া যায়। অদ্যাপি এই অঞ্চলে ত্রিপুরেশ্বরগণের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর অন্য

বংশীয় রাজা কর্ত্তৃকও এই রাজ শাসিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট বিজয়ের সময়ে এইস্থানও ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমান শাসনাধীন হইয়াছে। রাজমালা তৃতীয় লহরের কাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন নিবর্ত্তনের ফলে, রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবেশিত ঘটনার সমসাময়িক কালে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা খর্ব্বীভূত হইয়া যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ব্বে সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহা জানা যাইবে। উক্ত মানচিত্র, বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ম্যাপের সাহায্য গ্রহণে অঙ্কন করা হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের অবস্থান এবং তৎতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নদীর গতি পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কারণে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরীণ স্থানসমূহেরও নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। ফরাসী ভ্রমণকারী জন্ বেপ্টিস্ টেভারনিয়ারের (John Baptista Tavernier) ভ্রমণ বৃত্তান্তে সংযোজিত মোগল সাম্রাজ্যের (উত্তরাপথের) মানচিত্র আলোচনায় জানা যাইবে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার বিস্তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবিরত পরিবর্ত্তনের ফলে রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবিষ্ট ঘটনার সমকালে বঙ্গদেশের অবস্থান ও অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রধানতঃ এই কারণেই আধুনিক মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। টেভারনিয়ারের মানচিত্রে, রাজমালা তৃতীয় লহরের সময়ের অবস্থা সম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

ত্রিপুরার হস্তচ্যুত প্রদেশসমূহের মধ্যে কোন স্থান কোন সময়ে রাজ্যের অঙ্গচ্যুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এক একটী স্থান বারম্বার ত্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইবার পর, কোন সময়ে স্থায়িভাবে মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। মানচিত্র অঙ্কনকালে যতদূর সম্ভব এই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনা পক্ষে যত্নের ক্রটী হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে অনেকস্থলেই ইতিহাস নীরব, সুতরাং আমাদের যত্ন ফলবতী হইয়াছে, এ কথা সাহসের সহিত বলিতে পারি না।

ত্রিপুরার শৌর্য্য ও স্বাধীনতার অবস্থা

মুসলমান শাসনের সমসাময়িককালে ত্রিপুর রাজ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, পাঠান শাসনকালে ত্রিপুরার শৌর্য্য ও রাজনীতিক গৌরব অমোঘ ছিল। মোগল আমলে আত্মদ্রোহিতা, রাজপরিবারস্থ অনধিকারী ব্যক্তিগণের রাজত্ব লাভের লালসা, সেই লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মুসলমানের সাহায্য গ্রহণে নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন ইত্যাদি কারণে রাজ্যের গৌরব কিৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল।

উত্তরা পথের প্রাচীন চিত্র।

(ভন্ নোরিস্ টেভার্নিয়ার প্রণীত গ্রন্থ হইতে গৃহীত)।

এই সময় সাময়িকভাবে রাজা ও রাজ্যের নানাবিধ দুর্গতি ঘটিবার নিদর্শনও পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কালেই কোন শক্তি রাজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হন নাই। ত্রিপুর ইতিহাস ও মুসলমান ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ইংরেজগণের উক্তি আলোচনা করিলেও এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইরেজ রাজত্বেও ত্রিপুরার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই, ইহাও প্রতীয়মান হইবে। ইংরেজ লেখকগণের কতিপয় বাক্য রাজমালার দ্বিতীয় লহরে প্রদান করা হইয়াছে ; পূর্ব্বাপর অবস্থা আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালে রালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) রাজদূত রূপে চীন সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশের উপর দিয়া গমন-কালে ত্রিপুরার যে অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, Sir Harry Johnston তাহার নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"In the delta of Ganges, on the verge of the Tipperah District, he found the people not yet subdued by the Mughal Emperors."

Pioneers in India —P. 163.

এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, খ্রীঃ যোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্য গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিয়ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রালফ্ ফিচের আগমনের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পরে (১৬৫২ খ্রীঃ অব্দে) পিটার হেলিন (Peter Heyleyn) এই রাজ্য সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। তাঁহার বাক্য এই ;—

"Here is also the Kingdom of Tippura, naturally fenced with hills and mountains and by that means hitherto defended against the Mongul Tartars, their bad neighbours, with whom they have continual quarrels."

Bengal Past and Present (Oct. 1907) India
Intra and Extra Gangem — P. P. 50 — 51.

এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুরা রাজ্য সুরক্ষিত পর্ব্বত প্রাচীরে বেষ্টিত থাকায় প্রত্যন্তবাসী দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছিল। কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইত। ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করা সেকালে সহজসাধ্য ছিল না। এই বাক্য দ্বারা ত্রিপুরার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

করমণ্ডল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর বান্‌ডিন্ ব্রোকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও স্পষ্ট ভাষায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালের কথা। উক্ত গবর্ণর লিখিয়াছেন,—

"The countries of oedapur and Tipera are sometimes Independent sometimes under the Great Mogul and sometimes even under the King of Arakan."

(Vanden Broucke.)

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মেজর চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসেও ত্রিপুরার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাক্যের স্থূলমর্ম্ম এই, — "মুসলমানগণের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্রধারণ ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিতেছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর, মুরসিদ কুলী খাঁ-এর বিক্রম কাহিনী শ্রবণে তাঁহাকে হস্তী ও গজদন্তাদি উপঢৌকন প্রদান করেন। তদ্বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরেশ্বরকে 'খেলাত' প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর নবাব ও ত্রিপুরেশ্বরের মধ্যে উক্তরূপ উপঢৌকন ও খেলাত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালিয়াছিল।"*

এই আদান-প্রদান বাধ্যতামূলক নহে— বন্ধুতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হইত। কিন্তু এতদ্দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রত্নমাণিক্যের মানসিক দৌর্ব্বল্য সূচিত হইতেছিল, একথা না বলিয়া পারা যায় না। অতঃপর ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার শাসনকালে বাঙ্গালার নবাব কর্ত্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য আক্রান্ত ও সমতল ক্ষেত্র

---

* The Rajas of Tipperah Cooch Behar and Assam whose countries, although they had been overrun by the Mahammedan arms, had never been perfectly subdued and who therefore continued to spread the umbrella of independence and to stamp the coin in their own names, were so impressed with the idea of the power and abilities of Moorshud Cooly Khan that they forwarded to him valuable presents, consisting of elephants, wrought and unwourught ivory, musk, amber, and various other articles, in token of their submission : in return for which the Nuwab sent them *Khelaats* or honorary : dresses, by the receipt and putting on of which they acknowledged his superiority. This interchange of presents and compliments became an annual coustom during the whole time of his government, without either, party' attempting to recede from, or advance beyond, the implied line of conduct.

Stewart's History of Bengal–Sect. VI. P. P. 421—422.

(Bangabasi-Edition)

বিজিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্ম্ম, জয়লাভ করিয়া হৃত প্রদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া থাকিলেও এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে একমাত্র নূরনগর পরগণার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বরকে বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা কর প্রদান জন্য অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মোগল সম্রাটের আদেশানুসারে এই কর গৃহীত হয় নাই ; উক্ত টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে যে নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল।

"The son of Ram Manik Raja zerninder of Tipperah for a while appears to have been wholly shaken of the Mogul yoke virtually, being only liable to a nominal tribute of 25000 Rupees for the perganah of Noornagar, which at the same time, was entirely remitted to himself, in the form of a military Jaigeer from the Court of Delhi."

Grant's view of Revenues of Bengal.

(Fifth Report. P. P. 395–96.)

এই রাজ্য সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগকে সময় সময় অদ্ভুত কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে) চট্টগ্রামের কমিশনার এই মর্ম্মে গবর্ণমেন্ট বরাবরে এক রিপোর্ট করেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অংশবিশেষ, সুতরাং তাহা খাস দখলে আনা হউক। লর্ড অক্‌লেন্ড্ বাহাদুর সম্যক অবস্থা আলোচনা করিয়া, ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য বিধায় কমিশনারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার আদেশে লিখিত হইয়াছিল—

"The Raja has an Independent Hill territory that 'your Propositions for its resumption are totally inadmissible."

Government ·Ietter to the Cornissioner of

Chittagong – Dt. 27th December, 1838.

এতদ্দ্বারা ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক " Statistical Papers Relating to India" নামক যে গ্রন্থ সংগ্রহ হয়, তাহা ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয় উক্ত গ্রন্থ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সদনে প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীযুত কৃপাপরবশ হইয়া তাহা রাজমালা অফিসে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

NATIVE STATES

Name :– Tipperah.

Locality :– Eastern India, adjacent to Burmah.

Area in Square miles :– 7,632.

Nature of connection with British Government :– Independent.

Remarks :– This District is hilly much covered with jungle, and very thinly inhabited.

১৮৭০ খ্রীঃ ৪ঠা মে তারিখের 'Pioner' পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিয়া যে-সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা রাজমালা দ্বিতীয় লহরের পূর্ব্বভাষে (২।৯০ পৃঃ) প্রদান করা হইয়াছে ; এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। মেকেঞ্জি সাহেবও মুক্তকণ্ঠে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন।*

এবিষয়ে এতদতিরিক্ত আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব। যে-সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারাই ত্রিপুরার স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যাইবে। এ রাজ্যের অর একটী অম্লান গৌরব এই যে, নানাবিধ বিপ্লব-জালে জড়িত হইয়াও ত্রিপুর রাজশক্তি কাহারও নিকত অবনত মস্তকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। এ কথার প্রমাণ জন্যও আমরা ইংরেজের বাক্যের উপরই নির্ভর করিতে পারি। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত "Treaties Engagements and Sunnuds" নামক গ্রন্থে (Vol. I. P. 77) লিখিত আছে। —

"The British Government has no treaty with Tipperah."

একমাত্র বাহুবলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতেছিল, রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ রাজ্যের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজ্যের প্রতি মুসলমান শক্তির হস্ত প্রসারণের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল শক্তি ত্রিপুরায় আড্ডা স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎকালেও রাজ্যের বিশেষ অপচয় ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলগণ রাজ্যের আয়তন খর্ব্ব করতে সমর্থ হইয়াছিল। এ বিষয় ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত "Memoranda on Native States in India" নামক গ্রন্থের ৩৫৪—৫৫ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

---

* North-East Frontier of Bengal P. 561

প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা মুসলমান রাজত্বকালে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও শৌর্য্য কিরূপ ছিল, তাহা জানা যাইবে এবং ইংরেজ আমলেরও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। ইংরেজ রাজত্বে, এই রাজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা যথাসময়ে আলোচনা করা হইবে।

বাণেশ্বর সম্বন্ধীয় কথা

রাজমালা প্রথম লহরের রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর। এই ভ্রাতৃযুগল শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন, একথা প্রথম লহরের মধ্যমণিতে বলা হইয়াছে। আপাততঃ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য প্রণীত 'জিতেন্দ্রিয় মুক্ত রামকৃষ্ণ পাঠকের জীবনচরিত' গ্রন্থ হইতে এক বাণেশ্বরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই বাণেশ্বর ও রাজমালা রচয়িতা বাণেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া নীলকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে তদ্বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এবং তাঁহার সৌজন্যে উক্ত জীবনীগ্রন্থখানাও আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছি।

উক্ত গ্রন্থে বাণেশ্বর সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই, — গৌতম বংশীয় গঙ্গাকুমার বা বৈষ্ণবানন্দ মিশ্র যবন উৎপীড়ন ভয়ে কান্যকুব্জ হইতে কোটালী পানায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহার বংশোদ্ভব হৃদয়ানন্দ আচার্য্যকে, ঢাকার ভিখনলাল পারক কোটালীপাড়া হইতে আনিয়া মন্দার গ্রামে ব্রহ্মোত্র ভূমি দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। হৃদয়ানন্দের পুত্র রামকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন। রামকৃষ্ণের রামজীবন ন্যায়বাগীশ ও যাদব বিদ্যালঙ্কার নামে দুই পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। যাদব বিদ্যালঙ্কারের রাঘবেন্দ্র বেদাচার্য্য, বাণেশ্বর পাঠক ও রামশরণ চক্রবর্ত্তী নামক তিন পুত্র ছিলেন। এই বাণেশ্বরকেই রাজমালার রচয়িতা বলিয়া নীলকৃষ্ণবাবু মনে করিতেছেন। বাণেশ্বর বাসভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক কামাখ্যায় উপস্থিত হন, এবং এখানে ১১ এগার বৎসর কাল যোগ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। কথিত আছে, তিনি হর-পার্ব্বতীর দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অসাধারণ বিদ্যা এ যোগবলে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই সময় তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ রাজনগর নিবাসী মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়ার পত্নীর ষট্‌পঞ্চমী ব্রত উপলক্ষে ব্রতকথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া এবং বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত পুরাণ-পাঠ দ্বারা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজমালা রচয়িতা বাণেশ্বরের সহিত এই বাণেশ্বরের নামের একতা রহিয়াছে, এবং ইনি দীর্ঘকাল কামাখ্যাধামে বাস করিয়াছিলেন, এই কারণেই নীলকৃষ্ণবাবু ইঁহাকে রাজমালার রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যাঁহার পিতামহকে ঢাকার ভিখনলাল পারক আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি মহারাজ রাজবল্লভ সেনের পত্নীকে ব্রতকথা শুনাইয়াছিলেন, সেই বানেশ্বর ও মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের

সময়ের (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) বাণেশ্বর অভিন্ন হইতে পারেন না। নীলকৃষ্ণবাবুর এই ধারণা ভুল হইলেও, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজমালা সম্পাদনের সাহায্যকল্পে উক্ত বিবরণ প্রদান দ্বারা যে সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সহানুভূতি লাভ আমাদের ভাগ্যে বড় বেশী ঘটে নাই। এই কার্য্যের জন্য নীলকৃষ্ণবাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এস্থলে বলিবার যোগ্য আরও কথা ছিল, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া পূর্ব্বভাষ সুদীর্ঘ করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। প্রয়োজন হইলে, পরবর্ত্তী লহরে যতদূর সম্ভব আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

সূচীপত্র

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড

মধ্যমণি (টিকা)

অমরমাণিক্য ও অমর সাগর

বারাহী বিগ্রহ

ভুলয়া বিজয়

তরপ ও শ্রীহট্ট বিজয়

পারিবারিক কথা

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণ

সামরিক বল ও সমর বিবরণ

রাজা ও রাজ্যঘটিত বিবরণ

রাজ দরবার

শাসনতন্ত্র ও শাসন প্রণালী

রাজা ও রাজ্যের অবস্থা

রাজগণের কাল নির্ণয়

ফুলকুমারী

হস্তী-বিজ্ঞান

বার বাঙ্গালা

রাজধর্ম্ম

ত্রিপুরার সামন্তগণ

চিত্র-সূচী

মানচিত্র

শ্রীরাজমালা।

(তৃতীয় লহর)

বিয়ষ — অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ।

বক্তা — পণ্ডিত-প্রবর গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ।

শ্রোতা — মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারাজ রামদেবমাণিক্য।

রচনাকাল — খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ

শ্রীরাজমালা

---ঃ★☉★ঃ---

॥ তৃতীয় লহর ॥

মঙ্গলাচরণ

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

প্রস্তাবনা

শ্রীলশ্রীগোবিন্দমাণিক্য পুণ্যবান অতি।
তাহান তনয় রামমাণিক্য নৃপতি।।
সিদ্ধান্তবাগীশ[১] দ্বার পণ্ডিত পুরাতন।
তাহানে সম্বোধি রাজা বলিল তখন।।
জয়মাণিক্যাবধি পূর্ব্ব রাজা যত।
বংশ শ্রেণী রাজমালা আছয়ে লিখিত।।
তার পরে যত রাজা হৈছে ত্রিপুরাতে।
তা সবার কি বা কীর্ত্তি কহত আমাতে।।
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান।।

---

(১) সিদ্ধান্তবাগীশের পরিচয় পরবর্ত্তী টীকায় পাওয়া যাইবে।

অমরমাণিক্য খণ্ড

জয়মাণিক্য রাজা বধিল যখন।[১]
অমরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসন।।
অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি।
তান গর্ব্ভে চারি পুত্র যোগ্যবান অতি।।
রাজদুর্ল্লভ নারায়ণ, রাজধর ধীর।
অমরদুর্ল্লভ নারায়ণ, যুঝার সিংহ বীর।।
চারি পুত্র নৃপতির পদবি নারায়ণ।
সিংহাসনে বসে রাজা অতি সুশোভন।।
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ রহে আগুসারি।
দুই পার্শ্বে সৈন্য সেনা রহে অস্ত্রধারী।।
চতুর্দ্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাজা।
রাজা হৈয়া ধর্ম্মে চলে তাকে সহে প্রজা।।
অমরমাণিক্য রাজা ছিল পুণ্যবান।
অমর সাগর খনিবার করে অনুষ্ঠান।।
মন্ত্রিদুর্ল্লভাদি পুত্র ছিল বর্ত্তমান।
মন্ত্রিবর্গ বিরাজিত[২] আদেশ সেই স্থান।।
অমর সাগর দীঘী বিস্তার করিয়া।
খনাইব বঙ্গদেশী দাড়ি[৩] সব দিয়া।।

---

(১) জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া অমরমাণিক্যের রাজা হইবার বিবরণ দ্বিতীয় লহরে দ্রষ্টব্য।

(২) মন্ত্রীবর্গ বিরাজিত — প্রাচীনকালে রাজগণ মন্ত্রীদিগকে লইয়া প্রকাশ্য দরবারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। ত্রিপুরার সনন্দ ও তাম্র-শাসন প্রভৃতিতে "কারকবর্গ বিরাজতে" বা "কারকনবর্গ বিরাজতে" বাক্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার অর্থ — "মন্ত্রীবর্গ বিরাজিত।" বর্ত্তমানকালে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে "মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত" (Viceroy in Council) শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা উক্ত শব্দের অনুরূপ।

(৩) দাড়ি — মৃত্তিকা খননের লোকগণ দাড়ি ও তাহাদের সরদারগণ মাঝি নামে অভিহিত হইত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও 'মাঝি' শব্দের ব্যবহার আছে।

রাজার আদেশ পাইয়া মন্ত্রিবর্গ কত।
দীর্ঘিকা খননে দাড়ি লিখিল সম্মত।।[১]
ত্রিপুরা রাজার আমল বঙ্গদেশ যত।
সব জমিদার প্রতি দাড়ি লয় কত।।
সেই মত দাড়ি সব আসিল তখন।
অমর সাগর দীঘী[২] খনিতে আরম্ভন।।
আর দিন অমরমাণিক্য রাজা বলে।
দীর্ঘিকা খনিতে দাড়ি কেবা কত দিলে।।
সুবুদ্ধি নারায়ণ হরিশ্চন্দ্র তনয়।
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিছে নির্ণয়।।
বিক্রমপুর জমিদার চান্দরায় নাম।
সাত শত দাড়ি দিছে কার্য্য অনুপাম।।
বাকলার বসু দিছে সপ্তশত জন।
সলৈ গোয়াল পাড়া গাজি সপ্তশত জন।।
ভাওয়ালিয়া জমিদার দিছে হাজার জন।
অষ্ট গ্রামে দিছে দাড়ি পঞ্চশত জন।। *
বানিয়াচুঙ্গের দাড়ি আর পঞ্চশত।
রণ ভাওয়াল দাড়ি সহস্র সনমত।।
সরাইল ইছাখায় দিল সহস্র জন।
ভুলুয়া দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন।।

---

(১) দীর্ঘিকা খননের দাড়ি (কুলি) পক্ষে সম্মতি জানাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ কুলি প্রেরণ জন্য সকলকে পত্র লিখা হইল।

(২) অমর সাগর — এই বিস্তীর্ণ জলাশয় উদয়পুরে অবস্থিত। ইহা মহারাজ অমরমাণিক্যের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। অমরপুরেও ইঁহার খনিত এক সাগর আছে।

* পাঠান্তর –– অষ্টগ্রাম দিছে দাড়ি সপ্ত শ তখন।। এই পাঠ বিশুদ্ধ নহে। মোট অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, এখানে "পঞ্চশত" বাক্যই অভ্রান্ত। প্রাচীন রাজমালায়ও তাহাই লিখিত আছে, যথা ;––

"অষ্টগ্রামে দিছিলেক পঞ্চশত পত্তি।"

সপ্ত হাজার এক শত দাড়ির নিকাশ।
কবিচন্দ্র পুত্র[১] কহে সুবুদ্ধি বিশ্বাস।।
কহে ভয়ে কহে প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বার বাঙ্গালায়[২] দিছে তরপে[৩] না দিল।।
এ কথা শুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল।
রাজ্যের নিকটে রাজ্য আমা গ্লানি কৈল[৪]।।
রাজধর রাজপুত্র যুদ্ধে নিযুজিল।
বাইশ সহস্র সেনা তান সঙ্গে দিল।।
জিকুয়া গ্রামেতে সৈন্য কোঠ বান্ধি রৈল।
মুছে লস্কর সৈদ্ধিরাম তাতে ধরা গেল।।
রিতা পুত্র দুই জন পিঞ্জরে ভরিয়া।[৫]
উদয়পুরে লৈয়া গেল ত্বরিত করিয়া।।
চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ আর।
ছত্রজিত নাজির, সমর ভীম যার।।
সৌররাষ্ট্র নারায়ণ রণে একা গণি।
সমর প্রতাপ নারায়ণ খড়্গেতে বাখানি।।

---

(১) সুবুদ্ধিনারায়ণকে পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় 'হরিশচন্দ্র তনয়' ও এ স্থলে 'কবিচন্দ্রের পুত্র' বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সুবুদ্ধির পিতার প্রকৃত নাম নির্ণয় পক্ষে সন্দেহ হইতে পারে। হশ্চিন্দ্রের 'কবিচন্দ্র' উপাধি ছিল, প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়। উক্ত পুথিতে লিখিত আছে ;—

"সুবুদ্ধি নারায়ণ সে যে বিশ্বাস প্রধান।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ দশ অবধান।।
অনর্গল কবি হরিশ্চন্দ্রের নন্দন।
কহিবারে লাগিল দাড়ির বিবরণ।।"

(২) বার বাঙ্গালা — বার ভূঞা কর্ত্তৃক শাসিত বঙ্গদেশের বার বিভাগ।

(৩) তরপ — শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত একটী পরগণা। প্রাচীন কালে ইহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

(৪) কৈল — করিল।

(৫) প্রতিপক্ষ ধৃত হইলে তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থায় রাজদরবারে উপস্থিত করিবার নিয়ম ছিল, ইহা রাজমালা দ্বিতীয় লহরেও পাওয়া গিয়াছে।

রণগিরি নারায়ণ অশেষ প্রতাপ।
রণভীম নারায়ণ শত্রুর সন্তাপ।।
রণযুঝার নারায়ণ রণে মহাবীর।
বীরঝম্প নারায়ণ বিক্রম শরীর।।
গজঝম্প নারায়ণ থাকে সাবহিত।
পিতা পুত্র বীরদর্প করেন বিহিত।।
সৈন্য সমে চলিলেক অর্জ্জুন নারায়ণ।
হরিচক্র নারায়ণ বিক্রম পরায়ণ।।
গজসিংহ নারায়ণ সিংহ পরাক্রম।
ত্রিবিক্রম নারায়ণ রণে করে শ্রম।।
প্রতাপ সিংহ নারায়ণ বীর আগুসারি।
শত্রুমর্দ্দন নারায়ণ বিক্রমে কেশরী।।
চন্দ্রহাস নারায়ণ দেখিতে সুন্দর।
সুপ্রতাপ নারায়ণ দর্প বহুতর।।
হিঙ্গল নারায়ণ হৈতন নাম আর।
রণসিংহ নারায়ণ রণে শোভা যার।।
আশাবন্ত নারায়ণ বীরসিংহ সার।
সমর বীর নারায়ণ প্রতাপ অপার।।
এই সব সেনাপতি রণে বিচক্ষণ।
যার ভয়ে কম্পে নিত্য বঙ্গ সেনাগণ[১]।।
ইত্যাদি করিয়া তারা শত সেনাপতি।
ত্রিপুরের সৈন্য চলে রাজধর সঙ্গতি।।
বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন।
তাহাতে প্রধান চলে প্রতাপ নারায়ণ।।
দুই হাজার ঢালি চলে নূপুর পরিয়া।
জাঠি খড়গ চর্ম্ম ধারী ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।।

(১) এই সময়ও ত্রিপুরার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। বঙ্গেশ্বরের সহিত সমর ক্ষেত্রে অনেক বার ত্রিপুরেশ্বরের শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে।

গরুড় নারায়ণে[১] করে গরুড়ের ব্যূহ।[২]
রাজধর নারায়ণ সৈন্যের সমূহ।।
গরুড়াকৃতি এক ব্যূহ নির্ম্মাইল।
যেই স্থানে যেই যুদ্ধা সেই স্থানে দিল।।
চঞ্চু দেশেতে দিল এক সেনাপতি।
দুই সেনাপতি করে মস্তকেতে স্থিতি।।
গ্রীবা নির্ম্মাইল তার শত সেনা দিয়া।
উদর নির্ম্মাণ তাতে সৈন্য অপেক্ষিয়া।।
হস্তী ঘোড়া সেই স্থানে দিলেক বিস্তার।
দুই সেনাপতি তথা রহে নিরন্তর।।
তাহার সহিত সৈন্য রহিল নির্জ্জনে।
স্থানে স্থানে অশ্বগজ করিল সংস্থানে।।

---

(১) এই সেনাপতি গরুড় ব্যূহ রচনায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় "গরুড়নারায়ণ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(২) রাজাদিগের যুদ্ধকালে স্থানভেদে ও প্রয়োজনানুসারে সৈন্যের বিন্যাস করাকে ব্যূহ বলে। শব্দ রত্নাকরে লিখিত আছে ;—

"সমগস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থান ভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্।।"

মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, শুক্রনীতি, নীতি ময়ূখ, কামন্দকীয় নীতি, মনুসংহিতা প্রভৃতি নানা গ্রন্থে ব্যূহ রচনার বিবরণ লিখিত আছে। দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল, অসংহত, শকট, বরাহ, মকর, গরুড়, পদ্ম, বজ্র, শ্যেন, সূচী, অর্দ্ধচন্দ্র, সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি বহুবিধ ব্যূহের কথা উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব। একমাত্র গরুড় ব্যূহের কথাই বলা যাইতেছে। মনু সংহিতার মতে ;—

"দণ্ড ব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎতু শকটেন বা।
বরাহ মকরাভ্যাং বা সূচী বা গরুড়েন বা।।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বরম্।।"

মনু — ৭ । ১৮৭-৮

যুদ্ধ যাত্রাকালে অগ্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড় ব্যূহ রচনা করা ব্যবস্থেয়। অগ্নিপুরাণোক্ত দশবিধ ব্যূহের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে গরুড় ব্যূহের নামোল্লেখ হইয়াছে।

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্বের ৫৬ অধ্যায় আলোচনায় জানা যায়, দ্বিতীয় দিবসের কুরুক্ষেত্র সমরে, বীরাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব গরুড় ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন।

দুই সেনাপতি দুই পদের উপর।
রাজধর সৈন্য সমে মাঝে শশধর।।
এই ক্রমে চলিলেক শ্রীহট্ট যুদ্ধেতে।
নৌকা পথে চলিলেক ইছা খাঁ সহিতে।।
অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন।
ইছা খাঁ সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ।।
সুরমা উজাইয়া নৌকা শ্রীহট্টেতে গেল।
ফতে খাঁ পাঠান সঙ্গে পূর্ব্বে যুদ্ধ দিল।।[১]
পঞ্চশত ঘোটক সৈন্য পাঠান কর্কস।
সমর বিজয়ি সৈন্য বান্ধিয়া তর্কশ[২]।।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সব সুর্মা পার হৈল।
গোধারাণী গ্রামে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভিল।।
অল্প পাঠান সৈন্য ত্রিপুর বহুতর।
হস্তী দিয়া পাঠান সৈন্য মারয়ে বিস্তর।।
বাত্তাও নামে হস্তী মহা বেগবান।
হস্তী বেগে শত্রু সৈন্য গেল নানা স্থান।।
ঐরাজিত নারায়ণ জাতিয়ে ত্রিপুর।
সেই গত কন্ধে (৩) ছিল যেন মত্তশূর।।

---

(১) এই সময় সৈয়দ মুসার পুত্র সৈয়দ আদম নামক জনৈক মুসলমান তরপের অধিপতি ছিলেন। তরপের শাসনকর্ত্তাগণ দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও সাক্ষাৎ ভাবে ইঁহারা ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব উপেক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। আদম অমর সাগর খননের নিমিত্ত মজুর প্রদান না করায়, অমরমাণিক্য তরপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ আদম উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সূত্রে পাঠানের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের যুদ্ধ হয়। ত্রিপুর-বাহিনী অল্পায়াসেই যুদ্ধ জয় এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই সময় মুছে লস্কর সৈদ্ধিরাম নামক দুই ব্যক্তিও ধৃত হইয়াছিল। মুছে লস্কর সৈয়দ আদমের পুত্র বলিয়া বুঝা যায় ; কারণ, আদম মুসলমান শাসনকর্ত্তার শরণাপন্ন হইবার পর, ত্রিপুর-বাহিনী কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্র ধৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে। (কৈলাসবাবুর সংগৃহীত রাজমালা — ২য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাঃ ২য় খঃ, ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য)।

(২) তর্কশ — জিন।

(৩) কন্ধে — স্কন্ধে।

পঞ্চশত শোয়ার ছিল পাঠান দুর্ব্বার।
তাহাকে টোয়ায়[১] হস্তী মারিতে শোয়ার।।
চারি পার্শ্বে বেষ্টিত যে পাঠান সত্বর।
তীরেতে সর্ব্বাঙ্গ ভেদে গজ কলেবর।।
ত্রিপুর সেনায়ে যুদ্ধ দেখায় তাহায়।
এক হস্তী করে রণ ঐরাবত[২] প্রায়।।
তাজিতুরকি ঘোটক[৩] শোয়ারেরগণ।
হস্তীকে বিন্ধিল তীরে সকলে তখন।।
মাহুতের আঙ্গা জিরা[৪] কবচ[৫] ভেদে তীরে।
তিল মাত্র ছিদ্র নাহি সকল শরীরে।।
মধ্যাহ্ন সময়ে যুদ্ধ দুই দণ্ড ছিল।
শ্রমযুক্ত মাহুতের পিপাসা জন্মিল।।
হস্তী খাড়া করি কহে পাঠানের স্থান।
জল তৃষ্ণা বহু হৈছে স্থির নহে প্রাণ।।
পাঠানে বলিল মাহুত মিল আমা স্থান।
মিলিলে জল দিব পাইবা সম্মান।।
হস্তী বৈঠাইয়া মাহুত করে জল পান।
হস্তীকে খাওয়ায় জল করিয়া সন্ধান।।
মাহুতের এই লোভ দেখায় পাঠান।
সুবর্ণ রজত বস্ত্র দেখায় বিদ্যমান।।

---

(১) টোয়ায় — রোখায়, ধাবিত করে।

(২) ঐরাবত — এই হস্তী শ্বেতবর্ণ এবং চতুর্দ্দন্ত বিশিষ্ট। সমুদ্র মন্থনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই হস্তী দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন। বিষ্ণু পুরাণে পাওয়া যায় ;—

"ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোহপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মণ! পযযাবমরাবতীম্।।"

বিষ্ণুপুরাণ — ১।৯।২৫

(৩) তাজিতুরকি ঘোটক — তুরস্ক দেশীয় বলবান ঘোটক।

(৪) আঙ্গা জিরা ;— অঙ্গ রক্ষিণী বা আংরাখা। যুদ্ধকালে শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত জামা।

(৫) কবচ ;— বর্ম্ম। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কিম্বা লৌহ দ্বারা বর্ম্ম নির্ম্মিত হইত, এবং যুদ্ধকালে, অঙ্গরক্ষার্থ ইহা ব্যবহৃত হইত।

হস্তী সমে[১] মিলিলে সেই সব দিব।
সকল প্রধান তোকে এখনে করিব।।
এ বলিয়া পাঠান সব মাহুতকে বলে।
জল পানে ঐরাজিতের শ্রম দূর হৈলে।।
উলটিয়া হস্তী টোয়ায় পাঠানের উপর।
বেগেতে হস্তিনী যায় সৈন্যের ভিতর।।
রাজধর নারায়ণ মাহুতের মাথে।
ইনাম[২] বান্ধিয়া দিল সেই ত যুদ্ধেতে।।
পরেতে পাঠান সভে একত্র হইয়া।
চলনা নামেতে হস্তী সৈন্য আগে গিয়া।।
যুদ্ধ করে পাঠান সব সমর মাঝার।
তাহা দেখি ক্রোধ হয় রাজধর কুমার।।
রাজধরে চন্দ্রবাণ[৩] লইল সত্বর।
দশ চন্দ্রবাণ এড়ে[৪] পাঠান উপর।।
চন্দ্রবাণ প্রজ্বলিত হুহুঙ্কারে যায়।
দৈবগতি চন্দ্রবাণ পড়ে হস্তী গায়।।
হস্তীয়ে চিৎকার দিয়া সৈন্য মধ্যে পড়ে।
ভঙ্গ দিল পাঠান সৈন্য প্রাণ ভয় ডরে।।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গেল পাঠান সকল।
সুরমা দক্ষিণ বন্দে[৫] রাজ সৈন্য বল।।
সেই স্থানে গড় বান্ধি রাজধর নারায়ণ।
ভয়েতে পাঠান সৈন্য করিল মিলন।।
ফতে খাঁ সহিতে পাঠান শরণাগত হয়।
সেই ত সমরে রাজধর যুদ্ধে করে জয়।।

---

(১) সমে — সহিত, সহ।
(২) ইনাম — পুরস্কার।
(৩) চন্দ্রবাণ — চন্দ্রাকৃতি ফলকবিশিষ্ট তীর।
(৪) এড়ে — ক্ষেপণ করে।
(৫) দক্ষিণ বন্দ — দক্ষিণ সীমার অন্তবর্ত্তী।

তার পর রাজধর শ্রীহট্টেতে গেল।
আদি নামে[১] এক দীঘী সেই স্থানে দিল।।
শ্রীহট্টের মুনারা[২] উচ্চ অর্দ্ধ ভাঙ্গা ছিল।
শ্রীহট্ট বিজয়ী বলি মোহর মারিল।।
পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।।
রাজধর চলিল দুলালী গ্রাম পথে।
ইটা গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটী তীর্থে।।[৩]
স্নানদান করে তথা রাজধর নারায়ণ।
উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ।।
সাত দিন হৈল পথে আইসে রাজধানী।
ফতে খাঁ পাঠান সঙ্গে রাজধর আপনি।।
ফতে খাঁ রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিল।
মহারাজ ফতে খাঁকে বহু আশ্বাসিল।।
দয়াবন্ত নারায়ণ রাজার জামাতা।
তার বামে ইছাখাঁকে[৪] বসাইল তথা।।

---

(১) পাঠান্তর — (ক) রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্টেতে গেল।।
আদি নাম সে দীঘী দিয়া হোম করাইল।।
প্রাচীন রাজমালা।
(খ) রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্টে গেল।
আদি রাজধর নামে দীর্ঘিকা দিল।।
রাজাবাবুর রাজমালা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, খনিত দীর্ঘিকার "আদি রাজধর সাগর" নাম রাখা হইয়াছিল। এই জলাশয় অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া সেনাপতি (পরে রাজা) রাজধরের বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

(২) মুনারা — স্তম্ভ।

(৩) ঊনকোটী তীর্থ — এই তীর্থ কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত। রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে ইহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(৪) পাঠান্তর — "শুভদিনে মিলাইল ফতে খাঁ পাঠান।
হস্তী ঘোড়া দিল রাজা বসিবারে স্থান।।
দয়াবন্ত নারাণ প্রধান জামাই।
তার পাছে বসিবারে দিলেক দেখাই।।"

উপরের পাঠে যে "ইছা খাঁ" লিখিত হইয়াছে, তৎস্থলে "ফতে খাঁ" হইবে। লিপিকার প্রমাদ ঐরূপ ঘটিয়াছে।

এই মতে কত দিন রাজধানী ছিল।
অমরমাণিক্য তাকে সম্মানে রাখিল।।
পঞ্চাশ ঘোটক রাখে, যোগানে তাহার।
সেনাপতি সঙ্গে বৈসে মান্য ফতে খাঁর।।
এক হস্তী পঞ্চ ঘোড়া নানা বস্ত্র দিয়া।
ফতে খাঁ বিদায় করে মর্য্যাদা করিয়া।।
উদয়পুর হতে খাঁ শ্রীহট্টে আসিল।
সেই কালে মুছে লস্কর ছাড়িয়া যে দিল।।
সেই কালেতে অমরমাণিক্য নৃপতি।
বঙ্গের সকল প্রজা বশ হৈল অতি।।
চৌদ্দ শ ঊনশত শকে অমর দেব রাজা।
পনর শ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা।।
দুর্লভ নারায়ণ নাম সুর জমিদার।
নৃপ মান্যে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার।।
পূর্ব্ব পুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে মিলে।
সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্যকালে।।
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি।
দুর্লভ নারায়ণ না মিলিল অহঙ্কারবাদী।।
রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়মাণিক্য।
আমিও ভুলুয়া রাজা তুমি সমকক্ষ।।
দূত মুখে শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল।
করিতে না পারে কিছু যুঝিবার বল।।[১]
অমরমাণিক্য রাজা যখনে হইল।
দুর্লভ নারায়ণ প্রতি নৃপতি লিখিল।।
অহঙ্কারে পূর্ণ সে যে ভুলুয়া মাঝার।
নৃপতির পত্র উত্তর লিখে পুনর্ব্বার।।

---

(১) পাঠান্তর — "হেন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জ্বলে।
করিতে না পারে কিছু যুঝে গৌড় বলে।।"

বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।
সে রাজার বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।।[১]
তার পত্র সমে আসি কহিলেক দূত।
তাহা শুনি নরপতি ক্রোধে অদ্ভুত।।
সেইক্ষণে আজ্ঞা দিল সসৈন্যে সাজিতে।
ছত্রিশ হাজার সৈন্য চলিল যুদ্ধেতে।।
আপনে চলিল রাজা চারি পুত্র সঙ্গে।
ভুলুয়া চলিল রাজা যুদ্ধে মনোরঙ্গে।।
সিংহসরব নারায়ণ উজির প্রধান।
ছত্র নাজির নৃপ-শালা জানেন সন্ধান।।
শুভক্ষণে নরপতি চলিল যখন।
যাইতে পথেতে নৃপে দেখিল স্বপন।।
অভয়া দেবীয়ে[২] স্বপ্নে নৃপতিকে কহে।
দেবী পূজা দিয়া যুদ্ধ জয় কর তাহে।।
পূজা দিয়া নরপতি ভুলুয়াতে গেল।
ভুলুয়া লুঠিল সৈন্যে যেবা যেই পাইল।।
দুর্লভ রায় তিন শত ঘোটক সৈন্য লৈয়া।
পাঠান চাকর রাখি যুঝিল আসিয়া।।
নৃপতির সৈন্যে তাকে ঘিরিল সত্বর।
ভঙ্গ দিল পাঠান সৈন্য ঘোড়ার উপর।।
এক দ্বিজ চড়ে তার হস্তীর উপর।
দুর্লভ রায় জ্ঞানে মারে, মরে দ্বিজবর।।

---

(১) পাঠান্তর — "বিজয়মাণিক্যের জমিদার আমি।
বড়ুয়া আছিলা তান আপনেহ তুমি।।"

সেনাপতিগণের নানাবিধ উপাধির মধ্যে 'বড়ুয়া' উপাধিও প্রচলিত ছিল। মহারাজ অমর প্রধানতঃ সেনাপতি (বড়ুয়া) পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে রাজত্ব লাভ করেন।

(২) খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত শিলনীয়া নদীর তীরে অদ্যাপি অভয়া দেবী বিদ্যমান আছেন। শিলনীয়ার উত্তরাংশ, এই দেবীর নামানুসারে 'অভয়া নদী' নাম লাভ করিয়াছে। উদয়পুর হইতে ভুলুয়া যাইবার পথপার্শ্বে এই দেবায়তন অবস্থিত।

নৃপতি শুনিল পরে ব্রহ্ম বধ হৈছে।
অজ্ঞাত প্রায়শ্চিত্ত[১] নৃপতি করিছে।।
ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার বাকলায় বধিল।।
তথায়ে মহারাজা হরিষ হইয়া।
লুঠিল বাকলা রাজ্য সসৈন্যে সাজিয়া।।
গো, মহিষ, মনুষ্য কত বহু লুঠা গেল।
এই সব বিক্রয়েতে রাজা আদেশিল।।
গো মুল্য চারি পণ[২] ছাগ দুই পণ।[৩]
মনুষ্যের মুল্য হৈল এক এক কাহণ।।[৪]
শ্রীহট্টের সৈন্য যত সঙ্গে গিয়াছিল।
লুঠের মনুষ্য নিতে নৃপে আদেশিল।।
রাজার তনয় রাজদুর্লভ নারায়ণ।[৫]
তার সঙ্গে সেনাপতি দুর্লভ নারায়ণ।।

---

(১) মহর্ষি আঙ্গিরার মতে প্রায়শ্চিত্তের নিম্ন লিখিতরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ;—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয় সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতিস্মৃতং।।"

প্রায়স্ শব্দে তপ ও চিত্ত শব্দে নিশ্চয় বুঝায়। তপোনিশ্চয়যুক্ত হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়।

হারিতের মতে — "প্রযতত্বাদ্বোপচিতমশুভং নাশয়তীতি" অর্থাৎ শুদ্ধিদ্বারা, সঞ্চিত পাপ নাশ হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত নাম হইয়াছে।

পাপের প্রকার ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অনিচ্ছায় ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ২৪ বার্ষিক ব্রত অথবা ৩৬০টী ধেনুদান, এবং অসমর্থ পক্ষে ১০৮০ কাহন কড়ি দান ব্যবস্থেয়। এই কার্য্যের দক্ষিণা ২০০ গো কিম্বা ২০০ কাহন কড়ি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক', রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব' ও কাশীনাথের 'প্রায়শ্চিত্তেন্দু শেখর' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২) চারি পণ — চারি আনা। বিশ গণ্ডায় এক পণ। এক পণ ও এক আনা সমান। ইহা কুড়ি মুদ্রা প্রচলিত থাকা কালের হিসাব।

(৩) দুই পণ— দুই আনা। (৪) এক কাহণ — ষোল পণ বা এক টাকা।

(৫) পাঠান্তর — "প্রধান তনয় রাজবল্লভ নারায়ণ" 'রাজদুর্লভ' স্থলে 'রাজবল্লভ' লিখিত হইয়াছে, ইহা ভ্রমসঙ্কুল।

বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তথা।[১]
নৃপতি ফিরিয়া আইসে রাজধানী যথা।।
পনর শ শকে অমরসাগর আরম্ভন।
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।।
যেই দিন নাগ যষ্ঠি জলেতে গাড়িল।
সেই দিন নৃপতি সাগর উৎসর্গিল।।
তার পরে মহারাজা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
ভূম্যাদি ষোড়শ দান দিল উৎসর্গিয়া।।
মহাবাক্য[২] করে রাজা জলাশয়ে গিয়া।
প্রস্তরে নির্ম্মাইল মঠ ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।।
জগন্নাথ স্থাপিত করিল সেই মঠে।
নৃত্য গীত মহোৎসব করে বহু ঠাটে।।
চতুর্দ্দশ গ্রাম ভূমি উৎসর্গিয়া দিল।
তদবধি চৌদ্দগ্রাম[৩] নাম তার হৈল।।
বার মাসে বার যাত্রা করিল উৎসব।
মাসে মাসে ভোজন করায় দ্বিজ সব।।
দুই শত ভট্টাচার্য্য রাজার সভাতে।
নানা শাস্ত্র আলাপন আছিলেক তাতে।।
তুলাপুরুষ করে রাজা ধর্ম্ম অবতার।
মহাদেবী কল্পতরু হৈল সমিভ্যার।।[৪]
অন্যান্য বহুবিধ দান ছিল তাতে।
পাপ পুণ্য সঙ্গে যায় রাজার মনেতে।।

---

(১) এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, অমরমাণিক্য বাকলা রাজ্যে থানা স্থাপন করিয়াছিলেন; ইহা ঠিক নহে। ভুলুয়াতে থানা বসান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বর্ণনাদ্বারা ইহা স্পষ্টতর হইয়াছে ;—

"ভুলুয়ার থানাতে রাজদুর্লভ ছিল।
লোনা জলে ব্যাম হয় নৃপতি আনাইল।।"

(২) মহাবাক্য — প্রতিষ্ঠা ও দানাদি কার্য্যে উৎসর্গ বাক্য। মহাবাক্যের অন্য অর্থও আছে, এ স্থলে তাহা প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) চৌদ্দগ্রাম একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। এই পরগণা কুমিল্লানগরীর দক্ষিণদিকে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) সমিভ্যার — সমভিব্যাবহার, এক সঙ্গে।

এই ভাবি মহারাজা পুণ্যেতেহি মতি।
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম রাখিলেক খ্যাতি।।
আর এক উপস্থিত হৈল সে সময়।
রাজপুত্র রাজবল্লভের ব্যাম হয়।।[১]
ভুলুয়ার থানাতে রাজবল্লভ ছিল।
লোনা জলে ব্যাম হয় নৃপতি আনাইল।।
যশোধর নারায়ণ থানাতে রাখিল।
তার সঙ্গে রণদুর্লভ রাজপুত্র ছিল।।
তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত।
দিল্লীর উমরা[২] সৈন্য আইসে অকস্মাৎ।।
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে।
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে।।
শুভদিনে ইছা খাঁয়ে মিলে নৃপ স্থান।
যোড় হস্তে কহিলেক রাজা বিদ্যমান।।
দিল্লীর উমরা যত সরাইল আইসে।
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে।।
ইছা খাঁর কাকু বাক্য শুনিয়া নৃপতি।
তাহার বাক্যেতে স্নেহ জন্মিলেক অতি।।
ইছা খাঁয় চাহে ফৌজ[৩] নৃপতির স্থান।
মন্ত্রী সবে না কহে যে রাজা বিদ্যমান।।
স্বভাবে বাঙ্গালী জাতি আপ্ত কর্ম্মে দৃঢ়।
রাজা রাণী প্রতি ভক্তি করিলেক বড়।।
তাজ খাঁ বাজ খাঁ নামে দুই সরদার।
তার স্থানে ইছা খাঁয় জিজ্ঞাসে বিচার।।

---

(১) রাজবল্লভ শব্দ ভুল, রাজদুর্লভ হইবে।

(৩) উমরা — ধনী, এ স্থলে সম্রাটের অধীনস্থ ওমরাহগণের সৈন্যকে বুঝান হইয়াছে। ওমরাহগণ সম্রাটের সাহায্যার্থ সৈন্যদল গঠন এবং রক্ষা করিতেন। প্রয়োজন মতে তাহাদিগকে সম্রাটের কার্য্যে নিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিতেন। এই সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ওমরাহগণ নগদ বৃত্তি কিম্বা জায়গীরস্বরূপ ভূ-সম্পত্তি পাইবার ব্যবস্থা ছিল।

(৩) ফৌজ — সৈন্য।

কি মতে পাইব আমি রাজ সৈন্যগণ।
কি মতে দেশেতে আমি যাইব এখন।।
তাজ খাঁ বাজ খাঁ তাহে বলিল তখন।
উজির সঙ্গে প্রীতি কৈলে পাইবা সৈন্যগণ।।
ইছা খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল।
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিত।।
রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খাঁ খাইল।
রাজা রাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল।।
সেই কারণ হৈল ইছা খাঁর তরে।
ইছা খাঁ মচলন্দানি[১] খ্যাতি দিল পরে।।
ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল।
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল।।
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া পঞ্চ বস্ত্র[২] দিল।
ইছা খাঁ মচলন্দানি ইনাম পাইল।।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য ইছা খাঁ সঙ্গে আর।
সিংহ সরব উজির সঙ্গে সৈন্য সমিভ্যার।।
তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি।
সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শ্রীঘ্রগতি।।
সরাইলে গিয়া সৈন্য রহিল তখন।
বঙ্গ সৈন্য তত্ত্ব পাইয়া ভঙ্গ সেইক্ষণ।।
এই বার্ত্তা নৃপতিকে লিখে ইছা খাঁয়।
মহারাজা তুষ্ট হৈল এই যে বার্ত্তায়।।
তার পরে আর ছিল বিধির লিখন।
রাজপুত্র মৃত্যু রাজবল্লভ নারায়ণ।।[৩]

---

(১) মচলন্দানি— ইহা মুসলমান শাসনকালের প্রচলিত উপাধি। সাধারণতঃ শাসনকর্ত্তাদিগকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে ঈশা খাঁ 'মচলন্দানি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিপুর রাজ্যেও এই উপাধির প্রচলন হইয়াছিল ইহা যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

(২) পঞ্চ বস্ত্র — পাঁচ কাপ্‌ড়া ; মুসলমান প্রাধান্য সময়ে (১) পাগড়ি, (২) চাপকান বা আচ্‌কান, (৩) সদরিয়া, (৪) ইজার বা পায়জামা, (৫) রুমাল এই পঞ্চ বস্ত্র খেলাত দেওয়া হইত।

(৩) রাজদুর্লভ হইবে।

অমরমাণিক্য রাজা শোকে অচেতন।
পরে যুবরাজ করে রাজধর নারায়ণ।।
তার পরে মহারাজ শিকারেতে গেল।
রণদুর্লভ নারায়ণ কৈলাতে পাঠাইল।।
পুত্র শোকে মহারাজ ভাবে মনে মন।
কৈলাগড় হৈয়া সরাইল শিকার গমন।।
রাজা সঙ্গে চলে সব সৈন্য সেনাপতি।
দাউদপুরে নৌকা পথে চলে শীঘ্রগতি।।
দাউদপুর জমিদার সে ঘাটে মিলিল।
তদবধি মিলন ঘাট নাম তার খ্যাতি।
দাউদপুর থাকি শিকার করিল নৃপতি।।
তিতাস পার হৈয়া রাজা সরাইলে গেল।
সরাইল বেয়াল্লিশ গ্রাম অরণ্য বহু ছিল।।
বেড়িল অনেক জন্তু তাহার মাঝার।
মহিষ, ভাল্লুক, ব্যাঘ্র, মৃগের শিকার।।
শিকার করিল রাজা তাহার মাঝার।
নানা জন্তু মারিলেক চতুর্দ্দশ হাজার।।
পনর শ এক শাক মৃগয়া করিছে।
সেই বনে বসাইতে[১] রাজধর চাহিছে।
বিজয়মাণিক্যাবধি অরণ্য সেই স্থান।
রাজধরকে দিল রাজা করিয়া ফারমান।।[২]
কৈলাগাড়ি সীমানা[৩] বেয়াল্লিশ তপানাম।
রাজধরে বসাইল ত্রিপুরার ধাম।।
অমরমাণিক্য রাজা শিকার করিয়া।
পুনরপি দেশে আইল সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।।

---

(১) সেই বন আবাদ করিয়া মনুষ্য বসত করিবার নিমিত্ত রাজধর প্রার্থনা করিলেন।

(২) ফরমান — আজ্ঞাপত্র।

(৩) পূর্ব্বকালে সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভূগর্ত্তে কয়লা প্রোথিত করিয়া চিহ্ন রাখা হইত। বর্ত্তমান কালেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

পনর শ এক শক সময় যখন।
রাজধরের পুত্র যশ জন্মিল তখন।।
রাজধরের পুত্র জন্মে মাঘ মাস শেষে।
শুভ লগ্ন দুই প্রহর রাত্রি অবকাশে।।
তাহার কুষ্ঠির ফল লিখিল সকল।
কর্কট লগ্নেতে জন্ম মেষেতে মঙ্গল।।
মকরেতে রবি বুধ ধনুতে শনি বল।
তুলাতে বৃহস্পতি কুম্ভেতে চন্দ্র স্থল।।
কুম্ভেতে শুক্র রহে দৃষ্টি না করিল বহু।
অষ্টমেতে রহে যার চন্দ্র শুক্র রাহু।।[১]
এই সব যোগে জন্ম হয়েত যাহার।
চ্ছেদ যোগ[২] জানিও যে নিশ্চয় তাহার।।
মঙ্গল আছিল মেষে হয় রাজ যোগ।[৩]
বাইশ বৎসর তার হইব রাজ্য ভোগ।।
যশোধর জন্ম পত্রী কথন শুনিল।
নাকে কাণে মুখে কিছু ছেদন করিল।।[৪]
মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর।
তান বংশে কুচু ফা নাম হইল তাহার।।

---

(১) এতদনুসারে রাশিচক্র অঙ্গন করিলে নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়াইবে ঃ—

<table>
<tr><td>০ / ০</td><td>ম</td><td>০ / রা চ শু</td></tr>
<tr><td>লং</td><td></td><td>র বু</td></tr>
<tr><td>কে / ০</td><td>বৃ</td><td>শ / ০</td></tr>
</table>

(২।৩) ছেদ-যোগ ও রাজ-যোগের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের টীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(৪) কুষ্ঠিতে ছেদ-যোগ থাকায়, সেই দোষ প্রশমনার্থ নাসা কর্ণ ইত্যাদি কিঞ্চিৎ ছেদন করা হইল।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর রায় নামেতে।
তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী যুঝার মা পরেতে।।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুর্লভ নাম যার।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণ নাম তার।।
পনর শ দুইশক ভাদ্র মাস তাতে।
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে।।
যশোধর জন্ম হতে অষ্ট মাস পর।
কল্যাণ দেবের জন্ম হইয়াছে তৎপর।।
ভাদ্র মাস দিবা দুই প্রহর অভিজিত।
দুই মুহূর্ত্তেতে জন্ম হইছে নিশ্চিত।।
লগ্নেতে ছিলেক বিছা তাতে বৃহস্পতি।
মকরেতে শনি কুম্ভ রাহু রাজ স্থিতি।।
আর্দ্রা মিথুন চন্দ্র শুক্র কর্কটের।
রবি সঙ্গে মঙ্গল যে আছিল সিংহের।।
স্বক্ষেত্রে একা সৌম কন্যায় ছিল বুধ।
কেতু ছিল সিংহ মাঝে নবগ্রহ বিধ।।
তৃতীয় শনির ঋক্ষ ক্ষেত্র কর্ম্ম স্থান।
লগ্নে তার বৃহস্পতি রাজ যোগ জান।।
কর্ম্ম স্থানে রাহু গ্রহ আশী বর্ষ জীব।
ঊনচল্লিশ বর্ষে তান রাজ্য ভোগ হৈব।।[১]

---

(১) এতদনুসারে রাশিচক্র নিম্নে অঙ্কন করা হইল ঃ

০ / চ ৬	০	০ / রা
শু		শ
কে র ম / বু	০	০ / লং বৃ

রক্তবর্ণ দুই হস্ত মধ্যে উর্দ্ধ রেখা।
মধ্যম অঙ্গুলী সীমা রেখা যায় দেখা।।
হস্তের অঙ্গুল ছোট নখ ছোট হয়।
তর্জ্জনী তাহার ছোট গ্রাসে কষ্ট নয়।।
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অঙ্গুলী।
মধ্যম অঙ্গুলী হইতে অনামিকা বলী।।
ধ্বজ রেখা হস্তেতে ত্রিকোণ দণ্ড সমে।
মধ্যম অঙ্গুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে।।[১]
অপূর্ব্ব বৃষস্কন্ধ বৃষ পৃষ্ঠ যেন।
কমনীয় সম অঙ্গ কাম দেব হেন।।
উচ্চ দীর্ঘ হনু গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিল।
দীর্ঘ ললাট নাসা স্থুল দীর্ঘ হৈল।।
পদতলে চিহ্ন আর অন্য হনে[২] ভিন্ন।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হ্রস্ব অতি সুলক্ষণ চিহ্ন।।
পদের তর্জ্জনী দীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জিনি।
উর্দ্ধ রেখা দুই পদে আছিল অমনি।।
ধ্বজ ব্রজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল পদতলে।
অতি সূক্ষ্মতর হয়ে পর্ব্বকর স্থলে।।
ব্রহ্মরন্ধ্রে নাহি কেশ নিতম্ব শোভন।
স্ব হস্তেত চারি হাত দীর্ঘ যে আপন।।[৩]
অতি বৃদ্ধ রণ দুর্লভ কৈলাগড়ে ছিল।
থানাদারী কর্ম্মে তারে নৃপে নিয়োজিল।।

---

(১) এই রাশিচক্রের ফলাফল সামুদ্রিক শাস্ত্র আলোচনায় জানা যাইবে; এ স্থলে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা অসম্ভব।

(২) হনে — হইতে।

(৩) "রতিরম্ভসি শুক্রসারতা দ্বিগুণাচাষ্টশতৈঃ পলৈর্ম্মিতিঃ।
পরিমাণমথাস্য ষড়যুতা নবতিঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাবুধৈঃ।।"

মর্ম্ম ঃ— হংস পুরুষ জলবিহারাসক্ত, শুক্রসারবিশিষ্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট শতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত। ইহার দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল (চারি হস্ত) হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এতৎসম্বন্ধে এইরূপ পরিকীর্ত্তিত হয়।

কল্যাণ দেবের সেই মাতামহ হয়।
কৈলাগড়ে জন্ম কল্যাণ সেইত সময়।।
সেই কালে রণদুর্লভ দেখে কন্যা সুত।
দৌহিত্র দেখিয়া তুষ্ট হৈল অদ্ভুত।।
জন্মপত্রী লিখাইয়া দেখিল শোভন।
দৈবজ্ঞে নিষেধে তাকে বলিতে কখন।।
কল্যাণ দেবের মাতা হাম্‌থারমা নাম।
কুচু ফা তাহার পিতা জ্ঞান অনুপাম।।
পুরন্দর আর নাম তাহার যে ছিল।
তুলসী ঘাটেতে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল।।
হাম্‌থারমা হাম্‌থার ফা নামে যে হইছে।
কৌতুকেতে রাজধর এ নাম রাখিছে।।
দুর্লভ কল্যাণ রায় দুই শিশুকালে।
মাতামহ দুর্লভ রায় তাকে জিজ্ঞাসিলে।।
তোমা দুই জনা শিশু কি খাইতে মনে।
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আমা স্থানে।।
রণদুর্লভে কহে হংস পাইলে খাই।
কল্যাণে বলে আমি দুগ্ধ যেন চাই।।
দুর্লভ নারায়ণ তাহা শুনিয়া হাসয়।
হংসমান দুগ্ধমান দুই নাম রাখয়।।
আর সব শিশুগণে নানা খেলা খেলে।
কল্যাণে শিব বিষ্ণু পূজে খেলে ধূলে।।
কল্যাণ দেবের বয়স পঞ্চ বৎসর ছিল।
রণবল্লভ নারায়ণ[১] কৈলা মৃত্যু হৈল।।
পরে কল্যাণ দেব আইসে উদয়পুর।
চৈত্রে মদনোৎসব[২] হইল প্রচুর।।

---

(১) 'রণদুর্লভ নারায়ণ' হইবে।

(২) ভবিষ্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে, বিশ্ববিজয়ী মদন, মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাঁহার কোপানলে ভস্ম হইবার পর, তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য গৌরী প্রার্থনা করেন। শঙ্কর উত্তর করলেন—"প্রিয়ে, আমার কোপানলে দগ্ধ হইলে তাহার পুনঃজন্ম অসম্ভব। যাহা হউক, আমি বৎসরের মধ্যে একটি দিন নিরূপণ করিতেছি, সেই

মদন ত্রয়োদশী যাত্রা উৎসবের কালে।
পূর্ব্বদিকে অমরমাণিক্য মঠখলা গেলে।।
চতুর্দ্দোলে চড়ে রাজা প্রচণ্ড শরীর।
চতুর্দ্দোল শোভিয়াছে দেখিতে সুধীর।
কল্যাণ দেবকে শিখায় মাসি পিসিগণ।
রাজার চৌদোলে জল সিচিতে তখন।।
পঞ্চ বৎসর বালক কল্যাণ দেব হয়।
রাজার চৌদোলে জল সিচে সে সময়।।
দেখিয়া অমর দেব হাসিতে লাগিল।
কাহার বালক বলি নৃপে জিজ্ঞাসিল।।
কুচুফার পুত্র বলি কহে সর্ব্বজন।
মাসি পিসি কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ।।
তার পর যেন হৈল শুন মহারাজ।
বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম হইলেক কাজ।।
ফুলকোয়ড়ি ছড়া নাম তাহার নিকট।
তার তীরে দুই বৃক্ষ আছিলেক বট।।
সেই স্থানে দুই বৃক্ষ বহুকাল হয়।
তাতে বাস করি ভূতে উদ্বেগ করয়।।
দিবা রাত্র চারি পাঁচ ভূত হইয়া মেলা।
উলট পলট হইয়া বৃক্ষে করে খেলা।।
দুর্গোৎসব চণ্ডীপাঠে এক দ্বিজবর।
ছাগ মাংস লৈয়া যায় আপনার ঘর।।
তাহা দেখি ভূতে বলে শুনহ ব্রাহ্মণ।
ছাগ মাংস কিছু দাও করিতে ভক্ষণ।।
বিপ্র বলে দিতে নারি রাজার যে বাটা।[১]
তাহাকে খাইতে চাও তুমি দুষ্ট বেটা।।

দিন অনঙ্গ স-শরীরে আবির্ভূত হবে। সেই দিনটি—বসন্তকালের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী।" তদবধি উক্ত তিথিতে মদন পূজা ও মদনোৎসব আরম্ভ হয়, সেই উৎসবকে বসন্তোৎসবও বলে। এই উৎসব এককালে ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইত, কাল প্রভাবে এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

(১) রাজার বাটা— রাজসরকার হইতে নিয়মিত বাট মতে যাহা পাওয়া যায়।

ভূতগণে বলে তাকে শুনহ ব্রাহ্মণ।
চণ্ডীপুথি তোর হাতে রক্ষার কারণ।।
মাংস চাহিল ভূতে বিপ্রে নাহি দিল।
স্বভাব ব্রাহ্মণ গৌড়[১] মাংস লোভি ছিল।।
পথের পথিক যত সেই পথে যায়।
বট বৃক্ষে থাকি ভূতে তাহাকে লড়ায়।।
রাজার কনিষ্ঠ পুত্র যুঝার নারায়ণ।
সেই বৃক্ষ নিকটে বাড়ি করিছে সৃজন।।
অমর মাণিক্য গিয়া সে বাড়ি দেখিল।
ভাল পুরী হৈছে বলি নৃপে প্রশংসিল।।
সেই বৃক্ষে থাকে ভূত সকলে কহিল।
রাজায় ভূতের কথা মনেতে স্মরিল।।
অমর মাণিক্য রাজা কহিল তখন।
বিজয় মাণিক্য রাজা নৃপতি যখন।।
যশপুর হতে আমি গোপগ্রামে আসি।
সন্ধ্যার সময় হৈল বয় নাহি বাসি।।
বিংশতি বৎসর ছিল আমার বয়স।
কিছু ভয় নাহি রাখি বিষম সাহস।।
সেই বৃক্ষ হনে ভূত আইসে আমা আগে।
পথ চাপি[২] রহিলেক আমা অগ্রভাগে।।
দেবতার নাম আমি লইল তখন।
তথাপিহ ভূতে পথ না ছাড়ে তখন।।
খড়গ চর্ম্ম আছিলেক আমার হস্তেতে।
খড়গাঘাত করিলাম ভূত শরীরেতে।।
দুই খণ্ড হৈয়া ভূত পড়ে পৃথিবীত।
ধোরা কাক রূপে পড়ে আমার বিদিত।।[৩]

---

(১) ব্রাহ্মণ গৌড়—গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

(২) পথ চাপি— পথ আগুলিয়া।

(৩) ভূতকে বধ করিলে, তাহার মৃতদেহ কাকের আকার ধারণ করে, এই প্রবাদবাক্য পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীন কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তখন মারিছে ভূত কহিল কারণ।
কিছু বাধা না জন্মিল খঙ্গো সেইক্ষণ।।
এ সব বলিয়া রাজা দিল অনুমতি।
দুই বৃক্ষ কাটিয়া পাড়িল শীঘ্রগতি।।
খনিয়া ফেলিল সব বৃক্ষ মূল মাটি।
যতেক পথিক লোক চলে পরিপাটী।।
কাটিয়াছে সেই বৃক্ষ ভূত ছাড়ি গেল।
কি করিতে পারে ভূত রাজধর্ম্ম বল।।
বৃক্ষমূল খনিতে গর্ত্ত হৈল বিস্তর।
তাহাতে উঠিল জল যেন সরোবর।।
ফুলকুঁয়রী ছড়া সঙ্গে তাতে বহে স্রোত।
নৃপ সবে নরবলি দিত অদ্ভুত।।
হংস ডিম্ব পুষ্প দিয়া পূজা তাতে হয়।
ত্রিপুর দেওড়াই পূজে প্রভাত সময়।।
সেই স্থানের দুই বৃক্ষ কাটায়ে নৃপতি।
পরে নৃপ কর্ণে রোগ জন্মিলেক অতি।।
মহাকষ্ট পায় রাজা জীবন সংশয়।
বৈদ্যের চিকিৎসায় রাজা ভাল নাহি হয়।।
রোগের আঘাতে রাজার কষ্ট বড় হৈল।
সিংহাসনে বসিবার রাজধর আসিল।।
হস্তী ঘোড়া সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যুঝার সিংহ বলে তাতে নৃপ সম্বোধিয়া।।
খড়গ হস্তে করি যুঝার বলিলেক রোষে।
পিতা মৃত্যু নহে ভাই রাজা হইতে আসে।।
রাজার নিকটে এক গৃহের স্তম্ভ বড়।
ক্রোধে খড়গাঘাতে যুঝার তাহাতেই দড়।।
সেই আঘাতে স্তম্ভ কাটা গেল চতুর্থাংশ।
শব গেল নৃপকর্ণে যেন বাজে কাংশ।।
তাহা দেখি নরপতি বিস্ময় হইল।
দুই ভাই হবে বিরোধ তখনে জানিল।।

এ বলিয়া নরপতি বিবেক জন্মিয়া।
উঠিয়া বসিল রাজা সিংহাসনে গিয়া।।
তার পরে রাজধর ফিরি যায় ঘরে।
বিবেক জন্মিল রাজার মৃত্যু ইচ্ছা করে।।
সেই কালে ভূত প্রেত অপ দেবগণ।
জন্মাইল মিথ্যা কথা কহে সর্ব্বজন।।
শোয়াশত শিশুগণ নৌকাতে ভরিয়া।
ডুবাইয়া মারিব ফুলকুঁয়রি ছড়া নিয়া।।
তবে ভাল হবে রাজা জানিও নিশ্চয়।
কানাকানি করে সব পায় মহাভয়।।
নিশ্চয় না পায় তাতে কোন জনে কয়।
নগরে বাজারে হৈল আকুল হৃদয়।।
অমঙ্গল কথা সবে হৈল উদয়পুর।
উদয়পুর উলটিব লোক যাবে দূর।।
রাজার বাড়ীতে ব্যাঘ্রে মনুষ্য মারিব।
শৃগাল কুকুরে সবে নরমাংস খাইব।।
উদয়পুর রাজধানী জলে পূর্ণ হৈব।
আড়াই শত মনুষ্য গরু বাঁচিয়া রহিব।।
তারপর কতদিন আর রাজা হৈব।
সেই রাজা রাজবংশকুল উদ্ধারিব।।
জন্ম হইছে শিশু লুকাইয়া আছে।
চৌত্রিশ বৎসর পরে রাজা হৈব পাছে।।
এ সব প্রসঙ্গ হয় নগরে বাজারে।
ভয়ে ত্রস্ত হৈয়া সবে কহে পরস্পরে।।
রাজধানী জলে পূর্ণ হইব জানিল।
কদলী গাছের ভোর[১] সকলে বান্ধিল।।
মিথ্যা কথা উদয়পুরে জন্মে প্রতিদিন।
সর্ব্বলোক ভয়াতুর জানিয়া প্রবীণ[২]।।

---

(১) ভোর (ভুর) — ভেলা।

(২) প্রবীণ— বৃহৎ। প্রবীণ ঘটনা ঘটিবে জানিয়া সকলে ভয়াতুর হইল।

যার যে বালক রাখে দূর স্থানে নিয়া।
গুপ্ত করি রাখে তাকে কুটম্ব আশ্রাইয়া।।
এসব বৃত্তান্ত শুনে কল্যাণ দেব মাতা।
কল্যাণ নিয়া রাখে যথা আপন ভ্রাতা।।
গামারিয়া কিল্লায় থাকে কল্যাণ মাতুল।
গামারী লস্করী কাজে করে অপ্রতুল।।
অন্ন মাংস সদাকাল তার পাকে হয়।
উষ্ণ থাকিতে সে যে ভোজন করয়।।
কুৎসিত প্রকৃতি তার সিকদারি চালা।[১]
প্রাতঃকালে বৈসে খাইতে হয় বহু বেলা।।
মদ্য বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে।
অন্য জনে জল খাইতে কিলায় ভোজনে।।
সুনামা কন্যা তার জামাই পাঠান রায়।
শ্বশুর নিকটে অন্ন বসি সেই খায়।।
অন্ন মাংস খাইয়া জল তৃষ্ণা হৈল তান।
শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান।।
জামাতার জলপান দেখিয়া শ্বশুর।
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে যেন মত্তশূর।।
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা।
তোমা হতে আমা কর্ম্ম না হবে সর্ব্বথা।।
খাইতে বিলম্ব তাকে বলে যেই জন।
কল্যাণ মাতুলে গালি দেয় ততক্ষণ।।
রাজধানীর বালক লুকাইল সবে।
দূত মুখে নৃপতিয়ে শুনিলেক তবে।।
মিথ্যা কথা জন্মাইল কেবা নৃপে বলে।
ধরিয়া আনহ তাকে যে স্থানে পাইলে।।

---

(১) চালা— ব্যবহার। মুসলমান শাসনকালে 'সিকদার' উপাধিধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তাগণ নিতান্ত অত্যাচারী, দাম্ভিক এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল। বঙ্গদেশে সে কালে বড় লোকের গোলামদিগকে 'সিকদার' সম্বোধনদ্বারা সম্মানিত করিবার প্রথা ছিল ; ইহা উক্ত উপাধিধারী শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের এবং গোলামদিগের প্রভাবের পরিচায়ক। ত্রিপুরায়ও এই উপাধির প্রচলন হইয়াছিল।

আরোগ্য হইয়া রাজা দান ধর্ম্ম করে।
রাজকার্য্য করে নৃপে তাহার যে পরে।।
রামমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল।
পরে অমরমাণিক্য কি কর্ম্ম করিল।।
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
রসাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান।।
শুভ দিন শুভ ক্ষণ করিল তখন।
যুদ্ধের সেনাপতি হৈল রাজধর নারায়ণ।।
তাহার কনিষ্ঠ অমর দুর্লভ নারায়ণ।
তাহাকেই সেনাপতি করিল রাজন।।
চন্দ্র দর্প চন্দ্র সিংহ পদবী নারায়ণ।
ছত্রজিত নাজির রণে চলে সেই ক্ষণ।।
দ্বাদশ বাঙ্গলা সৈন্য চলিল সহিতে।
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে।।
ফেরাঙ্গির সৈন্য চলে নৌকায়ে ভরিয়া।
তুষ্ট হৈল অমর দেব সৈন্য দেখিয়া।।
চাটিগ্রামে গিয়া সৈন্য শীঘ্র উত্তরিল।
কর্ণফুলি বান্ধ দিয়া সৈন্য পার হইল।।
রাম্বু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়।
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়।।
রাজ সৈন্য মন্ত্রণা যে রাম্বু থানা বসি।
হেন কালে মঘ সৈন্য যুদ্ধ দিল আসি।।
ত্রিপুরার সৈন্য দেখি মঘে বাসে ভয়।
ফেরাঙ্গির সৈন্য সঙ্গে মঘেতে মিলয়।।
ফেরাঙ্গিয়ে রাজ থানা ছাড়ে সেই ক্ষণ।
মঘে আসি সর্ব্ব থানা লইল তখন।।
চারিদিগে রসদ বন্ধ করে মঘগণ।
ত্রিপুরার সৈন্যে রসদ না পায় তখন।।
ত্রিপুরার সৈন্য সব রহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য সমর মাঝারে।।

অন্ন কষ্টে বহু সৈন্য পথে পথে মরে।
চাটিগ্রামে আসে সৈন্য বহু কষ্টে তরে।।
রাজপুত্র সৈন্য সমে অন্ন কষ্ট পাইল।
ঘোঙ্গা আলু[১] খাইল ঘোঙ্গি মাড়া[২] নাম হৈল।।
সেই স্থান ছাড়ি আইসে কর্ণফুলি।
মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি।।
ধোপা পাথরের পথে কর্ণফুলি পার।
মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসে মারিবার।।
অন্ন খাইতে নদী পারে যার গৌণ হইল।
সেই লোক সব মঘে পথে সংহারিল।।
চাউল খাই[৩] নদী পার হৈল শীঘ্রগতি।
সেই সব জন প্রাণ হৈল অব্যাহতি।।
এ সব জানিয়া পরে ত্রিপুরার সেনা।
পথে পথে চৌকি বসে রাখে আর থানা।।
প্রাতঃকালে মঘ সৈন্য সেই পথে আসে।
ত্রিপুরার সৈন্যে মঘ কাটয়ে বিশেষে।।
ভঙ্গ দিল মঘ সৈন্য দেশ উদ্দেশিয়া।
অমর দুর্লভ পাছে ধাবমানে গিয়া।।
প্রতাপ নারায়ণ অমর দুর্লভ সঙ্গে।
সুর রাষ্ট্র নারায়ণ তিন যায় রঙ্গে।।
অমর দুর্লভ মিত্র প্রতাপ নারায়ণ।
ঘোটকেতে চড়ি মঘের পশ্চাতে গমন।।
তিন শোয়ার মঘ সৈন্য কাটিতেছে পাছে।
প্রাণভয়ে মঘ সৈন্য ভঙ্গ দিতে আছে।।
সাতগড় তিন বীর লইলেক পুনি।
দুই প্রহর বেলা হইল ফিরিল তখনি।।
রাজধর সঙ্গে ছিল যত সৈন্যগণ।
সহস্রেক মঘ মারিছিল সেই রণ।।

---

(১) ঘোঙ্গা আলু— পার্ব্বত্য জাতির জুমক্ষেত্রে উৎপন্ন এক জাতীয় কন্দবিশেষ।
(২) ঘোঙ্গা আলু ভক্ষণের স্থান 'ঘোঙ্গিমুড়া' নামে অভিহিত হইয়াছে।
(৩) খাই— খাইয়া।

কর্ণফুলী নদীর একাংশ-চট্টগ্রাম।

মঘ সৈন্য পাছে পাছে রাইপুর গিছে।
দিবাকর অস্ত যায় অল্প বেলা আছে।।
দুই শোয়ার গেল অমর দুর্লভ সনে।
দিবাকর অস্ত যায় না আসিল কেনে।।
চিন্তাযুক্ত হইল রাজধর নারায়ণ।
আগু বাড়ি চাহে গিয়া সর্ব্ব সৈন্যগণ।।
মুণ্ড সব বিচারিয়া চাহে রণ মাঝে।
ত্রিপুর মুণ্ড নাদি দেখে যুদ্ধের সমাজে।
ভাবিত হইয়া সৈন্য ধন্দ লাগে মনে।
নৃপতিকে কি বলিব ভাবে সৈন্যগণে।।
অমর দুর্লভ রাজপুত্র কি হইল জানি।
তার সঙ্গে দুই শোয়ার না আসিল পুনি।
সন্ধ্যাকালে দেখে শোয়ার আসে তিন জন।
রক্তেতে ভূষিত অঙ্গ না চিনে তখন।।
দূর থাকে সৈন্য সবে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে।
কুশলে আসিল তারা বলিল বিশেষে।।
রাজধর নারায়ণ আগুবারি নিল।
তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব সৈন্যে শিবিরেতে গেল।।
অশ্ব হতে রাজপুত্র তখনে নামিল।
রক্ত সমে হাতে খড়গ তাতে না খসিল।।
উষ্ণ জল দিয়া তারা হস্ত পাখালিল।
তিন শোয়ারের হস্তের খড়গ খসাইল।।
রাজপুত্র কহিলেক যুদ্ধ বিবরণ।
সৈন্য সবে শুনিয়া যে আনন্দিত মন।।
মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায়।।
দূতে আসি কহিলেক রাজধর স্থানে।
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোমা সনে।।
এই তত্ত্ব রাজস্থানে লিখে রাজধর।
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে পরস্পর।।

অমরমাণিক্য রাজা এই পত্র পাইয়া।
তাহার উত্তর পত্র পাঠায় লিখিয়া।।
যে সব লিখিছ তুমি এই তত্ত্ব সার।
দুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুনর্ব্বার।।
তোমার যুদ্ধেতে পাইলে মঘ ধরি আন।
ভবানী পূজাতে তাকে দিব বলিদান।।
নৃপতির এই পত্র শীঘ্রগতি পায়।
রাজধর নারায়ণ আসিল ত্বরায়।।
সসৈন্যে আসিয়া দেখা দিল রাজধর।
নৃপতিয়ে পুত্র দেখি হরিষ অন্তর।।
যেমতে সমর তুষ্ট হইলেক তাহে।।
শ্রমযুক্ত পুত্র আর সেনাপতিগণ।
বিদায় দিলেক রাজা যার যে ভবন।।
আনন্দেতে গেল তারা যার যেই ঘর।
তারপর অমঙ্গল রাজ্যেতে বিস্তার।।
নগরে বাজারে কাঁদে কুকুর শৃগাল।[১]
গ্রামের দেবতা কাঁদে নিশি দিবা কাল।।[২]

---

(১) প্রবিশন্তি যদাগ্রামমারণ্যা মৃগ পক্ষিণঃ।
অরণ্যং যান্তি বা গ্রাম্যাঃ স্থলং যান্তি জলোদ্ভবাঃ।।
স্থলজাশ্চ জলং যান্তি ঘোরং বাশন্তি নির্ভয়াঃ।
রাজদ্বারে পুরদ্বারে শিবা চাপ্যশিবপ্রদা।।
দিবারাত্রিঞ্চরা বাপি রাত্রাবপি দিবাচরাঃ।
গ্রাম্যাস্ত্যজন্তি গ্রামঞ্চ শূন্যতাং তস্য নির্দ্দিশেৎ
মৎস্যপুরাণ— ২৩৭ অঃ, ১-৩ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— বন্য মৃগ ও পক্ষিগণ যখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, আর গ্রাম্য মৃগ পক্ষীরা অরণ্যে প্রবেশ করে, জীবনিবহ স্থান আশ্রয় করে, স্থলচরগণ জলে প্রবেশ করে, অশুভ শংসী শিবা সকল রাজদ্বারে ও পুরদ্বারে নির্ভয়ে ঘোররব করিতে আরম্ভ করে, নিশাচর প্রাণীগণ দিবালোকে বহির্গত হয় এবং দিবাচরগণ রাত্রিতে বিচরণ করতে থাকে, এবং গ্রাম্য পশুসকল যখন গ্রাম পরিত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে সমস্ত গ্রাম শূন্য হইবে।

অগ্নিপুরাণ ২৩১ অধ্যায়েও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিবাগণের নগরে ঘোররব করিবার কুফলের বিষয় উপরে পাওয়া গেল। বৃহৎ সংহিতার ৯০ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে পাওয়া যায়, — 'শ্বভি শৃগালাঃ সদৃশাঃ ফলেন" অর্থাৎ ফল বিষয়ে শৃগালগণ কুক্কুর সদৃশ।

(২) দেবতার্চ্চাঃ প্রনৃত্যন্তি বেপন্তে প্রজ্বলন্তি চ।
বমন্ত্যগ্নিং তথাধূমং স্নেহং রক্তং তথা বসাম্।।

উল্কাপাত হয়[১] নিত্য ভূমি কম্পবান।[২]
জগন্নাথ মঠে কাঁদে দেখে বিদ্যমান।।
বলভদ্র চক্ষু হৈতে জলধারা বহে।
ব্রাহ্মণে পুছিলে বস্ত্রে মুছা নাহি রহে।।

আরটন্তি রুদন্ত্যেতাঃ প্রস্বিদ্যন্তি হসন্তি চ।
উত্তিষ্ঠন্তি নিষীদন্তি প্রধাবন্তি ধমন্তি চ।।
ভুঞ্জতে বিক্ষিপন্তে বা কোষ প্রহরণ ধ্বজান্।
আবাঙ্মুখা বৈ ভবন্তি স্থানাৎ স্থানং ভ্রমন্তি চ।।
এবমাদ্যা হি দৃশ্যন্তে বিকারাঃ সহসোত্থিতাঃ।
লিঙ্গায়তন বিপ্রেযু তত্র বাসং ন রোচয়েৎ।
রাজ্ঞো বা ব্যসনং তত্র স চ দেশো বিনশ্যতি।।

মৎস্যপুরাণ— ২৩০ অঃ, ১-৫ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— দেবপ্রতিমাসমূহ নৃত্য করিলে, কম্পিত বা প্রজ্বলিত হইলে, অগ্নি, ধূম, স্নেহ, রক্ত বা বসা বমন করিলে, বিচরণ বা রোদন করিলে, ঘর্ম্মাক্ত হইলে, হাসিলে, উঠিলে, বসিলে, প্রধাবিত হইলে, ভীতি প্রদর্শন বা ভোজন করিলে, কোষ, প্রহরণ, ধ্বজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলে, নীচ মুখ হইলে, এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলে, লিঙ্গ আয়তন বা বিপ্রে সহসা এই সকল বিকার পরিদৃষ্ট হইলে সেখানে বাস করিবে না। এই সকল বিকারে হয় রাজার বিপদ, না হয় রাজ্য বিনষ্ট হইবে।

বৃহৎ সংহিতা — ৪৬ অধ্যায় ৮ম শ্লোকেও এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(১) অম্বরমধ্যাদ্বহেব্যা নিপতন্ত্যো রাজ রাষ্ট্র নাশায়।
বংভ্রমতী গগনোপরি বিভ্রমমাখ্যাতি লোকস্য।।
সংস্পৃতী চন্দ্রার্কৌ তদ্বিসৃভাবা স ভুপ্রকম্পা চ।
পরচক্রাগম নৃপ বধ দুর্ভিক্ষা বৃষ্টি ভয় জননী।।

বৃহৎ সংহিতা — ৩৩শ অঃ, ১১-১২ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— নানারূপিনী উল্কাসকল আকাশপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে আকাশ হইতে পতিত হয়। ইহারা রাজা ও রাজ্য নাশের কারণ এবং লোকের বিভ্রম সূচনাকারী। চন্দ্র ও সূর্য্যকে সংস্পর্শ করিয়া তাহা হইতে বিসৃত কিম্বা ভূমিকম্প সমন্বিত উল্কাপাত হইলে পরচক্রাগম, নৃপবধ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও ভয়জনক হয়।

উক্ত সংহিতার ৩৩ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে পাওয়া যায়, উল্কাপাত কোন কোন অবস্থায় শুভ ফল প্রদানও করিয়া থাকে।

(২) বৃহৎ সংহিতা ৩২শ অধ্যায়ে ভূমিকম্পের যে-সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আলোচনায় জানা যায়, পৃথক পৃথক নক্ষত্রের ভূমিকম্পে দেশবিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল হইয়া থাকে। কতিপয় নক্ষত্রের মান লইয়া এক একটি বর্গ গণনা করা হয়, যথা — বায়ব্য মণ্ডল

ব্রহ্মদশ্যে[১] দেবঘরে চুপি দিয়া চায়।
পূজক ব্রাহ্মণ সবে মনে ভয় পায়।।
হেন মতে অমঙ্গল বহুতর হৈল।
বিধাতার নিয়োজিত মাঘ মাস ছিল।।
ফাল্গুনেতে বার্ত্তা আইসে কল্মিগড় হৈতে।
মঘ রাজা সেকান্দর সা আসিলেক তাতে।।
চাটিগ্রামে মঘ সৈন্য সেইক্ষণে আইসে।
এই বার্ত্তা পাইয়া রাজা বলিলেক রোষে।।
সেই দিনে সর্ব্ব সৈন্য যুদ্ধেতে পাঠায়।
রাজধর নারায়ণ সেনাধিপ তায়।।
অমরদুর্লভ রাজপুত্র রণে নিয়োজিত।
সেই সেনাপতি হৈল যুদ্ধেতে বিহিত।।
যুঝার সিংহ নাম আর রাজার তনয়।
সেহ চলিলেক যুদ্ধে করিতে বিজয়।।
নৃপতিয়ে বলে যুঝার ক্রোধ ভাল নয়।
শত্রু আসে যুঝিবারে ধৈর্য্য এ সময়।।
হেন মতে পুনি পুনি[২] নিষেধে[৩] রাজায়।
যুঝার সিংহ মহাক্রোধ না মানে কথায়।।

হৌতভুজবর্গ, আগ্নেয়বর্গ, সুরপতি বা ঐন্দবর্গ ও বারুণবর্গ। ইহার প্রত্যেক বর্গের ভূমিকম্পে— শস্য, জল ও বনৌষধি ক্ষয়, পীড়া, অবনীপাল ও গণপতিদিগের বিধ্বংস ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল হয়। তন্মধ্যে আগ্নেয়বর্গে ভূমিকম্পের ফল নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

"আগ্নেয়েহম্বুদনাশঃ সলিলাশয় সঙ্ক্ষয়োনৃপতি বৈরম্।
দদ্রু বিচর্চ্চিকা জ্বর বিসর্পিকাঃ পাণ্ডু রোগশ্চ।।
দীপ্তৌযসঃ প্রচণ্ডাঃ পীড্যন্তে চাশ্মকাঙ্গ বাহ্লীকাঃ।
তঙ্গণ কলিঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড়াঃ শবরাশ্চনেকবিধাঃ।।"

বৃহৎ সংহিতা— ৩৩ শ অঃ ১৪-১৫ শ্লোক।

মর্ম্মঃ— আগ্নেয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয় শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দদ্রু, বিচর্চ্চিকা (চুলকনা রোগ), জ্বর, বিসর্পিকা (স্ফোটকাদির উৎসেক) ও পাণ্ডু রোগ হইয়া থাকে। এবং দীপ্ততেজা ও প্রচণ্ড অশ্মক, অঙ্গ, বাহ্লীক, তঙ্গণ, কলিঙ্গ, বঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশ এবং নানা শ্রেণীর শবরগণ পীড়িত হয়।

(১) প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মদৈত্য" বলে। "ব্রহ্মদশ্য" শব্দ তাহারই অপভ্রংশ।

(২) পুনি পুনি — বারম্বার। (৩) নিষেধে— নিষেধ করে।

সাজিয়া চলিল যুঝার নিজ সৈন্য সমে[১]।
কাল পূর্ণ হৈল তার কি করে বিক্রমে।।
শুভক্ষণ করি রাজা বিদায় করিল।
তিন পুত্রসমে মন্ত্রী যুদ্ধে পাঠাইল।।
যার যে উচিত ইনাম বস্ত্র অলঙ্কার।
নৃপতিয়ে দিল তাকে যে মত ব্যভার।।
তার পর রাজধর করি যোড় হাত।
করিলেক নিবেদন রাজার সাক্ষাত।।
এক দীঘী খনিয়াছি রাজার আজ্ঞাতে।
কালি উৎসর্গিয়া দীঘী যাইব যুদ্ধেতে।।
তাহা শুনি নৃপতিয়ে বলিল তৎপর।
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি চলহ সত্বর।।
পুন রাজধরে বলে নৃপতির স্থান।
পুষ্কর্ণী উৎসর্গি কল্য যাইব ত্বরমাণ।।
সৈন্য যাউক আজি আমিহ যাব পরে।
চারি দণ্ড মধ্যে দীঘী উৎসর্গি সত্বরে।।
নৃপতিয়ে অনুমতি করিল তখন।
জয়ধ্বজ সঙ্গে চলে রাজধর নারায়ণ।।
যুদ্ধে পাঠায়ে রাজা পুত্র সকলেরে।
দীঘী উৎসর্গিয়া গেল রাজধর পরে।।
যুদ্ধ স্থানে রাজ সৈন্য গড় বান্ধি আছে।
সৈন্য সমে রাজধর সাবহিতে পাছে।।
শুনিয়া সেকান্দর সা বলিল দূতেরে।
অতি শীঘ্র দূত যাও রাজ সৈন্য তরে।।
রাজপুত্র যুদ্ধে আইল দেখিব বিশেষ।
হস্তি দন্ত টোপ নেহ আমার সন্দেশ[২]।।

---

(১) সমে— সহিত।

(২) সন্দেশ— বার্ত্তা, উপঢৌকন। পূর্ব্বকালে বিশেষ ব্যক্তির নিকট বার্ত্তা প্রেরণকালে নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইবার নিয়ম ছিল। এ স্থলে গজদন্ত নির্ম্মিত মুকুট পাঠানো হইয়াছিল।

সৈন্য চর্চ্চিবা[১] তুমি কতেক আসিল।
এ বলিয়া পত্র সমে দূত পাঠাইল।।
দন্তটোপ পত্র সমে আসিলেক দূত।
রাজসৈন্য দূতে আসি দেখে অদ্ভুত।।
তিন ভাই বসিয়াছে রাজপুত্রগণ।
অসংখ্য রাজার সৈন্য না যায় গণন।।
অশ্ব গজ বহুতর সৈন্য স্থানে স্থান।
সেই কালে দূত গেল সভা বিদ্যমান।।
পত্র টোপ দিয়া দূত কহিল সম্বাদ।
টোপ নিতে তিন ভাইয়ের ইচ্ছানুবাদ[২]।।
রাজধরে লইল টোপনা পত্র আর ভাই।
যুঝার সিংহ উষ্ম[৩] হৈল টোপ নাহি পাই[৪]।।
যুঝার সিংহ বলিলেক মনের যে রোষে।
শৃগালের মতে মঘ মারিব বিশেষে।।
সহস্রেক দন্তটোপ পাইব তাহার।
দূতকে বলিয়া দিল এমত প্রকার।।
চট্টগ্রাম গেল দূত ত্বরিত গমন।
সেকান্তর স্থানে কহে এ সব কথন।।
শুনিয়া সেকান্দর সাহা বহু ক্রোধ হৈল।
যুদ্ধ করিবার তরে সৈন্য সাজাইল।।
ত্রিপুর সৈন্যেতে বহু ঘোটক শোয়ার।
সমুখেতে মঘে যুদ্ধ না করে তাহার।।
বন পথে মঘ সৈন্য যুদ্ধে চলিলেক।
বনে যুদ্ধ হৈলে শোয়ার নাহি চলিবেক।।
রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে।
চরে আসি জানাইল তাহার সাক্ষাতে।।
মগধ নৃপতি রণে আইল বন পথে।
তুমি সব[৫] বসিয়াছ কোন হেতু তাতে।।

---

(১) চর্চ্চিবা— অনুসন্ধান করিবা। (২) অনুবাদ— পুনঃ পুন বলা। (৩) উষ্ণ— কুপিত।
(৪) নাহি পাই — না পাইয়া। (৫) তুমি সব— তোমরা সকল।

শুনিয়া যুঝার সিংহ চলিলেক রণে।
সেনাপতি মন্ত্রী সবে নিষেধে তখনে।।
আমা গড়ে যুদ্ধে আসে মগধ রাজন।
গড়ে থাকি করি যুদ্ধ যাব কি কারণ।।
আজি দিবা বড় যুদ্ধ হইবে নিশ্চিত।
আগু হৈয়া যাই কেন তাহা অনুচিত।।
ছত্র নাজির যুঝার সিংহের মাতুল।
মন্ত্রী সবে যুঝারকে বুঝায় অতুল।।
যুঝার কহে মাতুল তুমি যুদ্ধে ভয় পাও।
মাতুলানীর বস্ত্র পরি ঘরে তুমি যাও।।
ক্ষত্রিবংশে জন্মিয়াছ মরিতে বাস ভয়।
শঙ্খ বস্ত্র পরি ঘরে যাও এ সময়।।
রাজধরের ঘোড়া নামেতে বৃন্দাবন।
যুঝার সিংহ চাহে ঘোড়া যুদ্ধের কারণ।।
রাজধরে বলে ভাই চড় তুমি নিয়া।
তোমা জয়মঙ্গল হস্তী আমি চড়ি গিয়া।।
একদন্ত হস্তী ছিল অতি শ্রেষ্ঠতর।
অনুরোধে যুঝার সিংহ দিলেন তৎপর।।
তুলা ভরা আঙ্গাজিরা[১] তাহার উপর।
হাজার মেখি[২] পরিলেক যুঝার তৎপর।।
কনক রচিত শিরস্ত্রাণ দিল মাথে।
বিচিত্র ভূষণ অঙ্গে চড়ে ঘোটকেতে।।
খড়গ চর্ম্ম তর্কস ধরিল অনুক্রমে।
আগু হৈয়া চলে যুঝার নিজ সৈন্য সমে।।
বৎসর পঁচিশ বয়স যুঝার নারায়ণ।
মন্ত্রীবাক্য না মানিয়া চলিলেক রণ।।

---

(১) আঙ্গাজিরা— ইহাকে 'জিরা'ও বলে। এটি পারস্য ভাষার শব্দ। বিশুদ্ধ শব্দ 'জেরা'। যুদ্ধের পোষাককে জেরা বলে। অঙ্গ রক্ষার্থ ব্যবহৃত জামা।

(২) হাজার মেখি—এটি পার্শি শব্দ। জরির কারুকার্য্য খচিত যুদ্ধকালে ব্যবহৃত জামা বিশেষে।

সৈন্যের পশ্চাতে চলে রাজধর নারায়ণ।
অমরদুর্লভ চলিলেক লৈয়া সৈন্যগণ।।
রাজধর একদন্ত গজের পৃষ্ঠেতে।
অমরদুর্লভ রণে চলিল অশ্বেতে।।
যুঝার সিংহ মনে ছিল পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া।
ময়দান সমুখে করি যুদ্ধ করে গিয়া।।
যে কালে মগধ সৈন্য আসিবে ময়দানে।
অশ্ব সৈন্য সমে যুঝার কাটিব তখনে।।
এত ভাবি রাজপুত্র তখনে চলিল।
প্রহরেক রাত্রি চিল তথা উত্তরিল।।
সেই কালে মঘ সৈন্য তথাতে রহিয়া।
চারি হাজার সৈন্য পূর্ব্বে দেখা দিল গিয়া।।
তাহা দেখি রোষিলেক যুঝার সিংহ বীর।
অশ্ব সৈন্য লৈয়া কাটে মঘ সৈন্য শির।।
ছিন্ন ভিন্ন হৈল সব মগধের সেনা।
ভঙ্গ দিয়া মঘে গেল আপনার থানা।।
কাটিতে কাটিতে যায় নৃপতি নন্দন।
মগধ খেদাইয়া[১] কাটে গড়ের সদন।।
সেই কালে বলিলেক যুঝার সিংহ বীরে।
শীঘ্র হস্তী আন মঘ গড় ভাঙ্গিবারে।।
আসিতে আসিতে হস্তী মঘ গড়ে গেল।
সৈন্য সমে রাজধর তৎপর আসিল।।
মঘ গড় ভাঙ্গিবারে সব সৈন্য যায়।
তাহা দেখি মঘ সৈন্য বড় ভয় পায়।।
অগ্নি অস্ত্র[২] মঘ সৈন্য বহুতর ছাড়ে।
বন্দুকের গুলিয়ে বহু ত্রিপুর সৈন্য মরে।।

---

(১) খেদাইয়া — তাড়াইয়া।
(২) অগ্নি অস্ত্র — বন্দুক।

ত্রিশ হাজার বন্দুক মঘ গড়ে ছিল।
গুল্লিঘাতে বৃক্ষ পত্র কিছু না রহিল।।
দৈবযোগে জয়মঙ্গল হস্তীর কপালে।
এক গোল্লাঘাতে হস্তী তাতে ক্রোধে জ্বলে।।
সেই কালে যুঝার বলে রাজধর ভাই।
তোমা হস্তী বৈঠাও আমি হস্তী'পরে যাই।।
রাজধরে বৈঠায় হস্তী চড়য়ে যুঝার।
ঘোড়া ছাড়ি হস্তী চড়ে দৈবের সঞ্চার।।
হাজার মেখি পৈরে[১] যুজার কনক রচিত।
ব্যাঘ্র হেন দেখি হস্তী উঠিল ত্বরিত।।
গোল্লাঘাতে হস্তীর যে ক্রোধ বাড়িয়াছে।
যুঝার চড়িতে হস্তী উঠিলেক রোষে।।
হস্তীর দড়িতে ধরি রহিল যুঝার।
লটকিয়া[২] রৈল হস্তীর পদের মাঝার।।
মারিল হস্তীয়ে লাথি বুকের উপর।
সেই ঘাতে পড়ে বীর পথের অন্তর।।
সেই পথে সেই গজ ভয়ে ভঙ্গ দিল।
হস্তী পদ বুকে ঠেকি যুঝার মরিল।।
ভাই বলে রাজধরে ডাকে বারে বারে।
অঙ্কুশ[৩] না মানে হস্তী কি করিতে পারে।।
পথের উপর উচ্চে মঘ সৈন্য ছিল।
হস্তী' পরে রাজধরকে সেলেতে হানিল।।
উরুতে লাগিয়া হানা পিছলিয়া যায়।
পেটেতে লাগিয়া হানা রক্ত বহে তায়।।
রাজা হইবার তরে আছিল কপাল।
এই মর্ম্মাঘাতে সেই বাঁচিল সে কাল।।

---

(১) পৈরে— পরিধান করে।
(২) লটকিয়া — ঝুলিয়া।
(৩) অঙ্কুশ — ডাঙ্গস, হস্তী তাড়নের লৌহনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।

ভঙ্গ দিল রাজ সৈন্য সাগর প্রমাণ।
পাছে পাছে মঘ সৈন্য আসে ত্বরমাণ।।
যুঝার সিংহ পড়িয়াছে পথের মাঝার।
মঘ সৈন্যে কাটি নিল মস্তক তাহার।।
চন্দ্র সিংহের পুত্র ছিল ছোটরায় নাম।
যুঝার সিংহ সহিত মরিল সংগ্রাম।।
যুঝার সিংহ মিত্র সে যে অতি বলবান।
মিত্র স্নেহে যুদ্ধ সে যে করিল সে স্থান।।
শতাবধি মঘ সে যে স্বহস্তে মারিল।
সেই দিন তার সম কেহ না যুঝিল।।
যুঝার সিংহ মস্তক দেখে সেকান্দর সাহা।
তিরস্কার করি বলে ভাল নহে এহা।।
রাজপুত্র মারিবারে না হয় উচিত।
সজীব আনিতা যদি আমার বিদিত।।
তার পিতা অমরমাণিক্য রাজস্থান।
যুঝারকে পাঠাইতাম করিয়া সম্মান।।
এমত দারুণ কর্ম্ম না হয় উচিত।
সেনাগণে গালি দিল সভার বিদিত।।
তার পরে পত্র লিখে নৃপতির স্থানে।
মঘ রাজা সেকান্দর বিনয় তখনে।।
রাজপুত্র পড়ে রণে নামেতে যুঝার।
আমি আজ্ঞা নাহি করি বধিতে তাহার।।
রাম্বু ছকরুয়া ছিল আদম বাদসায়।
তোমা স্থানে রহে গিয়া করিয়া সহায়।।
তাহাকে বান্ধিয়া পাঠাও আমার বিদিত।
তবে আমা সঙ্গেতে তোমা হবে বহু প্রীত।।
মঘ দূতে পত্র লৈয়া আসে ত্বরমাণ।
রাজধর স্থানে পত্র দিল যুদ্ধ স্থান।।
যুদ্ধে ভয় পাইল তারা রাজ সৈন্যগণ।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যায় ত্রিপুর সেইক্ষণ।।

এই তত্ত্ব উদয়পুরে দিন দিনে গেল।
যুদ্ধ ভঙ্গ শুনি নৃপ বহু ক্রোধ হইল।।
যুঝার সিংহের সেবক যুদ্ধ হনে আসে।
যুঝার সিংহের মৃত্যু নৃপে কহে[১] শেষে।।
যেই মতে যুঝার সিংহ পড়িলেক রণ।
যেই মতে যুদ্ধে ভঙ্গ ত্রিপুরার গণ।।
এই বার্ত্তা শুনি রাজা শোকে অচেতন।
রাজ অন্তঃপুরে ক্রন্দন করে সর্ব্ব জন।।
আপনে চলিল রাজা যুদ্ধের কারণ।
শোকেতে বিহবল তাতে চলিলেক রণ।।
রাজা বলে পূর্ব্ব রাজা আমল যখন।
বহু যুদ্ধ করি রাজ্য রাখিছি আপন।।
আপন রাজত্ব কালে পরাভব হৈল।
রাজ্যধন পুত্র আমি রাখিতে নারিল।।
যুদ্ধ স্থানে গিয়া রাজা শিবিরেতে গেল।
ভঙ্গ সৈন্য ত্রিপুরের সকল আসিল।।
পুত্র শোকে মহারাজা ভাবে মনে মন।
রাজধরকে জিজ্ঞাসিল যুদ্ধ বিবরণ।।
আদি অন্ত সব কথা কহে রাজধরে।
রাজা বলে যুঝার সিংহ কার্য্য নষ্ট করে।।
পরে রাজা পাঠানের মাহিনা বুঝায়।
ভঙ্গ দিল যত সৈন্য আশ্বাসে রাজায়।।
নৃপতি বলিয়া দিল যেন মত বিধি।
চন্দ্রদর্প বান্ধে গড় সৈন্যকে সম্বোধি।।
যতেক শোয়ার আছে করিয়া পয়ান।
কোঠেতে রহিল রাজা জানিয়া সন্ধান।।
তিন দিন পরে মঘ ইছাপুরা আইসে।
দুই প্রহর বেলা যুদ্ধ হয়েত বিশেষে।।

---

(১) নৃপে কহে — নৃপ স্থানে কহে।

দুই সহস্র পাঠান শোয়ার রাজার।
রণে আগু হৈল মঙ সৈন্য মারিবার।।
প্রতাপ নারায়ণ আদি সেনাপতিগণ।
অশ্বে চড়ি গেল তারা করিবারে রণ।।
রাজ সৈন্য যুদ্ধ স্থানে রহে সাবহিত।
দুই সহস্র মঘ সৈন্য হৈল উপস্থিত।।
পাঠান সকলে যায় মারিবার ক্রোধে।
অধিক আসুক মঙ মন্ত্রীয়ে নিষেধে।।
পরে দুই লক্ষ মঘ আসিলেক রণ।
পাঠানের সৈন্যগণ স্থগিত তখন।।
সেই কালে মন্ত্রী কহে ঘোড়া ছাড় আগে।
যাবত মঘের সৈন্য গড়ে নাহি লাগে।।
পাঠানে গালিতে[১] বলে মন্ত্রীয়ে[২] বর্ব্বর।
কিমতে ছাড়িব ঘোড়া মঘ বহুতর।।
যে কালে মারিব মঘ তাতে নিষেধিলা।
এখন মঘ বহু সৈন্য তাতে বিধি দিলা।।
আমা সব বধিবারে তোমা ইচ্ছা হৈল।
এ বলিয়া পাঠান সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।।
বৃদ্ধ ত্রিপুর যত রণের মাঝারে।
পাঠান সকলে তাকে হাতে হাতে ধরে।।
অলঙ্কার তারা সবের নিলেক পাঠানে।
রাজ সৈন্য হাহাকার হইল তখনে।।
কোঠ মধ্যে নরপতি ভাবয়ে আপন।
বিনা যুদ্ধে সৈন্য ভঙ্গ দৈবের ঘটন।।
গর্জ্জিয়া তর্জ্জিয়া আইসে মঘ সৈন্যগণ।
নৃপতির ভয় নাহি রাজসৈন্যগণ।।
তাহা দেখি নরপতি ভাবিত অন্তর।
চৌদলেতে উদয়পুরে আসিল তৎপর।।

---

(১) গালিতে — গালি দিয়া।
(২) মন্ত্রীয়ে— মন্ত্রীকে

রাজধানী গিয়া রাজা কহে মন্ত্রী স্থান।
কৌড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আমা বিদ্যমান।।
উদয়পুরে আসি মঘ কিছু না পাইব।
ধনহীন বলি আমা মঘেতে কহিব।।
রাজার আজ্ঞায় কৌড়ি আনে সেইক্ষণ।
কৌড়ি পুঞ্জ রাখিলেক রাজার ভবন।।
মহারাজা রাণী সঙ্গে ভঙ্গ সেইক্ষণ।
রাজধানী প্রজা ভঙ্গ যার সেই মন।।
ডোমঘাট পতে রাজা অরণ্যেতে গেল।
সেই স্থানে গিয়া রাজা গোপনে রহিল।।
এথা সেকান্দর সাহা সসৈন্যে সহিত।
উদয়পুর আসিলেক জানিয়া বিহিত।।
রাজপুরী আসিলেক লুটিবার আশ।
রাজপুরী শূন্য দেখে হইল নৈরাশ।।
রাজা প্রজা শূন্য উদয়পুর দেশ।
ধনের কারণে মঘে করয়ে উদ্দেশ।।
পরে সেকান্দর সাহা ধন না পাইয়া।
দুই জন দেওড়াই[১] পাইল বন বিচারিয়া।।
সেকান্দর সাহা বলে দেওড়াই স্থানে।
ধন দেখাইলে রাজা করিব এখানে।।
মঘ বাক্য শুনি দেওড়াই ধন দেখাইল।
সেইক্ষণ দেওড়াইকে রাজা খ্যাতি দিল।।
তাহা দেখি কহিলেক আর যে দেওড়াই।
আর ধন দেখাইব যদি রাজ্য পাই।।
ধন লোভে মঘ রাজে দিল তাকে ফাঁকি।
সেইক্ষণে রাজা করে দেওড়াই ডাকি।।
দুই দেওড়াই রাজা হৈল ধন দেখাইয়া।
সেকান্দরে নিল ধন দেওড়াই ফাঁকি দিয়া।।

(১) দেওড়াই — চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক। ইঁহাদের বিবরণ প্রথম লহরে প্রদান করা হইয়াছে।

দুই দেওড়াই বাদাবাদি মঘে পায় ধন।
রাজ ধনে সেকান্দর হরষিত মন।।
পনর দিবস মঘ ছিল রাজধানী।
কুড়া মঘী নাম এক সরদার জানি।।
তাহার সহিত সৈন্য রাখিয়া বিস্তর।
উদয়পুর হনে যায় সাহা সেকান্দর।।
পনর শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে।
প্রথমে আসিলা মঘ উদয়পুরেতে।।
মঘ রাজা সেকান্দর রসাঙ্গেতে গেল।
অমরমাণিক্য স্থানে পত্রি যে লিখিল।।
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত।
তবে তোমা সঙ্গে আমা হব বহু প্রীত।।
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি।।
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার।
তুমি মঘ কি জানিবা আমা ব্যবহার।।
দৈবযোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে।
আর দুই পুত্র আমা প্রধান যে আছে।।
তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত।
তথাপি আদম আমি না দিব নিশ্চিত[১]।।
রাজার নিষ্ঠুরবাণী শুনি মঘ দূতে।

অরণ্য হইতে রাজা তেতৈয়াতে গেল।
রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া রাজা সে স্থানে রহিল।।
সেই কালে কুচক্র এক হইল কথন।
ছত্রজিত নাজির নামে দৈবের ঘটন।।
পূর্ব্ব কূলে গিয়া নাজির কুকি রাজা হৈব।
যতেক ত্রিপুর প্রজা তার সঙ্গে নিব।।

(১) আদম সাহা, রসাঙ্গের সামন্ত রাজা ছিলেন। রসাঙ্গের অধিপতি সেকেন্দর সাহার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হেতু ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কুকির ছাম্বুলদেশ পাট নির্ম্মাইয়া।
অমরমাণিক্য স্থানে লোকে কহে গিয়া।।
তাহা শুন মহারাজ বহু ক্রোধ হৈল।
দুই শত সেনায় নাজির ধরিয়া আনিল।।
নাজির দেখিয়া রাজা বলিলেক তাতে।
এই মুখে রাজা হৈবা ছাম্বুল রাজ্যেতে।।
নাজির পায়েতে নিগড় দিল সেইক্ষণ।
বহুল প্রহরী দিয়া নাজির রক্ষণ।।
দুই দিন ছত্র নাজির নিগড়ে রাখিল।
অমরাবতী রাণী স্থানে নৃপে জিজ্ঞাসিল।।
তোমা ভাই ছত্র নাজির বড়হি দুরন্ত।
কুকি রাজা হৈতে চায় লইয়া সামন্ত।।
মহাদেবী বলে কহি শুন মহারাজ।
ভ্রাতা নাজির আমার কুমন্ত্রণা কাজ।।
রাজ্য ভ্রষ্ট আমাদিগের হইল যখন।
ভাই সম্বোধিয়া আমি কহিল তখন।।
চলিতে না পারি আমি গহন কানন।
আমাকে ধরিয়া চল যে স্থানে রাজন।।
মুখভঙ্গী করি নাজির আমা গালি দিল।
আমা পুত্র যুঝার তার বাক্য না শুনিল।।
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈল তোমা সেই সে কারণ।
তোমাকে ধরিয়া ভগ্নী নিব কোন জন।।
সহোদর হইয়া নাজির আমা ফেলি গেল।
তার সম দুষ্ট নাহি দেখি কোন কাল।।
আমা সব মারিলে যে সে হইব রাজা।
পুত্র সব খেদাইয়া শাসিবেক প্রজা।।
নাজির বধিতে আজ্ঞা দিল মহারাণী।
রাণী অনুরোধ রাজা ছাড়ায় তখনি[১]।।

(১) পাঠান্তর — মহাদেবীর বাক্যে রাজার হৈল ক্রোধ।
মারিবারে ইচ্ছা হৈল তেজি উপরোধ।।

নাজিরের কথা শুনি নৃপ ক্রোধ অতি।
ছত্র নাজির বধে আজ্ঞা চন্দ্রসিংহ প্রতি।।
চন্দ্রসিংহে নিবেদিল উচিত না হয়।
নাজির নৃপের শ্যালক মনে বাসি ভয়।।
পরে আজ্ঞা করে আগু নারায়ণ তরে।
ছত্র নাজির কাট নিয়া মনুনদী তীরে।।
আগুয়ানে কহে নাজির রাণী ভাই হয়।
তাহাকে কাটিলে রাণী বধিবে নিশ্চয়।।
ক্রোধ হৈল মহারাজা তার বাক্য শুনি।
চন্দ্রদর্পেতে আদেশ হইল তখনি।।
আজ্ঞামাত্র চন্দ্রদর্পে না করিল ব্যাজ।
ছত্র নাজির লৈয়া গেল মনু তীর মাঝ।।
স্নান তর্পণ করে নাজির মনুনদী তীরে।
রাম রাম বলি স্কন্ধ পাতয়ে সত্বরে।।
মারিল খড়্গের ঘাত স্কন্ধচ্ছেদ হৈল।
নৃপতির আজ্ঞা লৈয়া দাহ কর্ম্ম কৈল।।
ভ্রাতৃ শোকে পুত্র শোকে রাণীর ক্রন্দন।
তাহা শুনি নৃপতির স্থির নহে মন।।
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া রাজা অনুশোচ[১] করে।
মরিবার ইচ্ছা রাজা ভাবে নিরন্তরে।।
মহারাণী সম্বোধিয়া কহিল রাজন।
জীবনের কার্য্য নাহি চলহ এখন।।
রাণী বলে এমত বাক্য না হয় উচিত।
মৃত্যু ইচ্ছা করে যদি হয়ে প্রায়শ্চিত্ত।।
নৃপে বলে জন্মিলে মৃত্যু আছে তার সঙ্গে।
অপমান পাইলে শত্রু হাসিবেক রঙ্গে।।
যুঝার সিংহ পুত্র কামোদ কাও নাম।
তাহাকে দেখিলে শোক বাড়ে অনুপাম[২]।।

---

(১) অনুশোচ— অনুশোচনা, অতীত বিষয় লইয়া চিন্তা।
(২) অনুপাম— অনুপম, যাহার উপমা নেই।

এই মতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাস।
শোকেতে বিহ্বল রাজা ছাড়য়ে নিশ্বাস।।
দিবা শিবা করে রব[১] উল্কাপাত হয়।[২]
অমঙ্গল হবে রাজ্যে লোক সবে কয়।।
হস্তী ঘোড়া চক্ষু হৈতে ধারা বহে জল।
আচম্বিত মহাবায়ু হইল প্রবল।।
চন্দ্র সূর্য্য পতন রাজা দেখিল স্বপ্নেতে।[৩]
নবদণ্ড ছত্র ভাঙ্গি পড়ে পৃথিবীতে।।[৪]
মনেতে ব্যাকুল রাজা কুস্বপ্ন দেখিয়া।
কোথা যাব কি করিব রহে বিমর্শিয়া।।
অন্যান্য যত রাজা আমাকে সেবিছে।
আমার বিপদে তারা হরিষেতে আছে।।

---

(১) সর্ব্বদিক্ষ্বশুভা দীপ্তা বিশেষেণাহ্ন্য শোভনা।
পুরে সৈন্যেহপসব্যা চ কষ্টা সূর্য্যোমুখী শিবা।।
বৃহৎ সংহিতা — ৮ম অঃ, ৪ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— সর্ব্বদিকে দিপ্তস্বর অশুভকর, বিশেষতঃ দিবাভাগে অশুভকর হয়, এবং সৈন্যোপরে ও পুরে দক্ষিণস্থা সূর্য্যমুখী শিবা কষ্টপ্রদা হয়।

শৃগালের অস্বাভাবিক শব্দকে দীপ্তস্বর বলে।

(২) উল্কাপাতের ফল পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে। (দ্বিতীয় লহর, ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৩) চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন স্বপ্নে দর্শন করলে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"শক্রধ্বজাভি পতনং পতনং শশি সূর্য্যোয়ো।
দিব্যান্তরীক্ষ ভৌমানামুৎপাতানাঞ্চ দর্শনম্।।
*　*　*　*
ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদ-বানরর্ক্ষনরৈরপি।
পরাদভি ভবশ্চৈব তস্মাচ্চ ব্যসনোদ্ভবঃ।।"
মৎস্যপুরাণ— ২৪২ অঃ, ৯ ও ১৩ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— শঙ্খ, ধ্বজ, চন্দ্র ও সূর্য্যের পতন এবং দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত দর্শন * * * পিশাচ, রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক এবং মনুষ্যগণের সহিত ক্রীড়া ও অন্য হইতে অভিভব (পরাভব)— স্বপ্নে এই সকল দৃষ্ট হইলে বিপদ উপস্থিত হইবে।

(৪) ছত্র ও দণ্ড ভঙ্গ স্বপ্নে দর্শন করা রাজা ও রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলসূচক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গণেশ খণ্ড, ৩৩ ও ৩৪ অধ্যায়ে ও দেবী পুরাণের ২২ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে স্বপ্নফল সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে অধিক আলোচনার সুবিধা ঘটিল না।

না যাইব রাজধানী নিশ্চয় কহিল।
যে করিল সুখ ভোগ তাহা ভাল হইল।।
আষাঢ় মাসেতে রাজার কাল উপস্থিত।
সভা হৈতে গেল রাজা গৃহেতে ত্বরিত।।
মহাদেবী সম্বোধিয়া কহেন রাজন।
রাজধর অভিষিক্ত করি এইক্ষণ।।
মনু নাম মহানদী হৈল পৃথিবীতে।
বাচস্পতি তীর্থচিন্তামণি গ্রহন্তেতে।।
বড়বক্র নদী হয় মনুর সঙ্গম।
তাতে স্নান দান কৈলে হয় পুণ্যোত্তম।।
বড়বক্র মনু সঙ্গম মৃত্যু যার হয়।
চন্দ্রলোকে যায় সেই প্রমাণ নিশ্চয়[১]।।
মনু স্নান করিলে যে মহা পূণ্য হয়।
রাণী স্থানে মহারাজা তীর্থফল কয়।।
রাণী প্রবোধিয়া রাজা সভাতে আসিল।
পাত্র মিত্র সবাইকে নৃপে আশ্বাসিল।।
আষাঢ় মাসের বৃষ্টি নদী পূর্ণ অতি।
নৌকা খেলিতে ফাকী বলিল নৃপতি।।
সাজাইয়া অনেক নৌকা রাজার সাক্ষাত।
নানা বাদ্য সুললিত বাজিলেক তাত।।
চতুর্দ্দোলে চড়ি রাজা নৌকাতে গমন।
বাদ্য তালে নৌকা চলে হরষিত মন।।
ছয় দণ্ড পথ মনুনদী উজাইয়া।
প্রস্রাবের ইচ্ছা রাজা তটে উঠে গিয়া।।
মনুনদী তীরে এক বৃহৎ শিলা ছিল।
সেই স্থানে নরপতি প্রস্রাবেতে গেল।।

---

(১) "সমুদ্রস্যোত্তরে দেশে ততো মনুনদী স্মৃতঃ।
যং গত্বাপি মহারাজন্ পিত্বা পানীয়মুত্তমং।।
মনুনদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং।
তত্র স্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোক মনুত্তমঃ।।"
বায়ুপুরাণ।

গোপনে নিয়াছে রাজা আফিঙ্গ তখন।
সেই স্থানে নৃপে করে আফিঙ্গ ভক্ষণ।।
নৌকা খেলি নরপতি ঘরে আইসে পুনি।
দুই প্রহর রাত্রি পরে কাল নৃপমণি।।
রাজধরে তত্ত্ব শুনি আসিল তখন।
অমরদুর্লভ রাজপুত্র না ছিল ভুবন।।
কুমার কুমারী পৌত্র দৌহিত্র যত জন।
মৃত রাজা বেষ্টিত যে করয়ে ক্রন্দন।।
স্নান করাইয়া রাজা চৌদোলে রাখিল।
অমরা দেবীয়ে স্নান পরেতে করিল।।
সেই রাত্র বীণা যন্ত্র ত্রিপুরার গীত।
দোগরি সারঙ্গ বাজে বংশী সুললিত।।
সেই রাত্র এই মতে গত হইল নিশি।
প্রাতঃকালে দেখিলেক সর্ব্ব সৈন্য আসি।।
পাত্র মিত্রগণ যত মিলিয়া প্রভাতে।
রাজধর রাজা করে যথা বিধিমতে।।
চত্র দণ্ড আরঙ্গি ধরে শিরোপরে।
সুললিত বাদ্যোদ্যম হৈল রাজপুরে।।
হস্তী অশ্ব সৈন্য যত আছিল যোগান।
নৃপতিকে প্রণমিল সিংহাসন স্থান।।
রাজধরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসনে।
মৃত রাজা দহিবারে আজ্ঞা সেইক্ষণে।।
সুবর্ণ জড়িত বস্ত্র পৈরায় রাজন।
আগর চন্দন দিয়া অঙ্গেতে লেপন।।
রাম নাম লিখিলেক শরীরের মাঝ।
চতুর্দ্দোলে বৈসে রাণী করি বহু সাজ।।
নৃপ সঙ্গে মহারাণী সহগামী চলে।
চরণ ধরিয়া রোদন করয়ে সকলে।।
পুত্র পৌত্রাদি রোদন দেখি মহারাণী।
রোদন দেখিয়ে দয়া জন্মিল তখনি।।

তাহা সবে দিতে ধন রাণীর আশয়।
ধন দিলে রাজধরের কিবা মনে হয়।।
এ সব চিন্তিয়া রাণীর আদেশ তখন।
অমর দুর্লভেতে দিল তিন সিন্দুক ধন।।
পৌত্র দৌহিত্র যত আছিলেক তাতে।
জনে জনে দিল ধন তা সভার হাতে।।
রাজধর রাজা বলে রাণীর বিদিত।
রাজধন আমা স্বত্ব বাটা[১] অনুচিত।।
তা শুনি অমরাবতী কহিল তখন।
তোমাকে দিয়াছি রাজ্য তাকে দিল ধন।।
তাহা শুনি নরপতি কিছু না বলিল।
চতুর্দ্দোল চালাইতে নৃপে আদেশিল।।
হস্তী ঘোড়া বাণ[২] ডঙ্কা[৩] করিয়া সাজন।
ছত্র আরঙ্গি নিশান রাজার ভূষণ।।
মৃত রাজা লৈয়া চলে মনুনদী তীরে।
চিতা খনিয়া রাখে শ্মশানের পরে।।
শ্মশানেতে মহারাণী দান দিতে মনে।
বহু যত্নে এক দ্বিজ পাইল তখনে।।
যথোচিত দান ধর্ম্ম রাণীয়ে করিয়া।
চিতা প্রবেশিত যায় হরি নাম লৈয়া।।
প্রদক্ষিণ করি রাণী চিতা প্রবেশিল।
সেই কালে হরিধ্বনি লোকেতে করিল।।
মুখাগ্নির কর্ম্ম করে অমর দুর্লভ।
শুভক্ষণে জন্ম তার বংশের বল্লভ।।
সেই কালে মহারাজার অগ্নি কার্য্য হয়।
পতিব্রতা মহারাণী পতিলোকে যায়।।
যথাবিধি শ্রাদ্ধ দ্রব্য করে আয়োজন।
রাজারাণীর শ্রাদ্ধ করে রাজপুত্রগণ।।

---

(১) বাটা—বাট করা, ভাগ করা। (২) বাণ— বাণা, পতাকা। (৩) ডঙ্কা— নাগড়া, ভেরী।

লোকবাদে নাজির বধে করি অবিচার।
অমরমাণিক্য মৃত্যু লোকেতে প্রচার[১]।।
রাজধর্ম্মে লিখিয়াছে বিচার রাজার।
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্ব্বার।।

রাজধরমাণিক্য খণ্ড

রামমাণিক্য রাজা সিদ্ধান্তবাগীশ স্থানে।
রাজধর রাজ্য প্রজা শাসিল কেমনে।।
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে শুন মহারাজ।
রাজধর রাজা হৈয়া যে করিছে কাজ।।
যেই স্থানে রাজধর হৈল নরপতি।
সেই ছড়া নাম ধরে রাজধর খ্যাতি[২]।।
রাজধানী ছাড়া রাজা বিষাদিত মন।
পিতৃ মাতৃ শোক ভাবে রাজ্যের কারণ।।
সেই কালে এক প্রজা উদয়পুর হনে।
নৃপতি সাক্ষাতে আসি কহে সেইক্ষণে।।
মগলে[৩] ছাড়িয়া গেল উদয়পুর দেশ।
শুভ বার্ত্তা পাইয়া রাজা হরিষ বিশেষ।।
ভ্রাতৃ মন্ত্রী পুত্র সেনা মন্ত্রণা করিয়া।
শুভ দিনে চলে রাজা হরষিত হৈয়া।।

---

(১) মিথ্যা লোকবাদের উপর নির্ভর করে ছত্র নাজিরকে অবিচারে বধ করার পাপে অমরমাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জন-প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

(২) রাজধর ছড়া—পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক অপভ্রংশ হইয়া এই স্থানের নাম 'রাজাছড়া' পরে 'রাতাছড়া' হইয়াছে। মধ্যমণিতে বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) পাঠান্তর—"বার্ত্তা কৈল গিয়া সে যে কত ভক্তি করি।
মগধে ছাড়িয়া গেল উদয়পুর নগরী।।"

মূলে "মগধে" শব্দের পরিবর্ত্তে "মগলে" লিখিত হইয়াছে; ইহা লিপিকার প্রমাদ। মঘকে মগধ বলিবার দৃষ্টান্ত রাজমালায় অনেক পাওয়া যায় ; মঘকে কোন স্থলেই মগল বলা হয় নাই।

ভাদ্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণ পক্ষ তাতে।
উদয়পুর চলে রাজা মহারণ্য পথে।।
পর্ব্বতের জুম[১] ধান্য পাকে সেই কাল।
নানা ফুল ফল হয় জুমের মাঝার।।
খুটি মুড়া বামে করি ধ্বজ নগর পথে।
বিশালগড় হৈয়া চলে ডোমঘাটি তাতে।।
উদয়পুর আসি রাজা প্রবেশিল পুরী।
সেলামবাড়ি বাদ্য বাজে[২] জয়ধ্বনি করি।।
রাজধরমাণিক্য রাজ্য শাসে সেই ক্ষণ।
সর্ব্বপ্রজা আনন্দিত থাকে অনুক্ষণ।।
বিষ্ণু মন্ত্রেতে দীক্ষা ছিল মহারাজা।
পরম বৈষ্ণব সাধু না হিংসয়ে প্রজা।।
সাধুর চরিত্র রাজার বৈষ্ণব আচার।
পাত্র মিত্র সৈন্য বশ করে আপনার।।
প্রাতঃস্নান করে সদা পূজয়ে গোপাল।
পঞ্চ পাত্র অন্নদান করে সদাকাল।।
সার্ব্বভৌম বিরিঞ্চি নারায়ণ দুই জন।
রাজপুরোহিত তারা শাস্ত্রে বিচক্ষণ।।
এক পাত্র চন্তাই যে পাএ অন্নদান।
দুই পুরোহিতে পাএ দুই অন্ন স্থান।।
আর দুই পাত্র অন্ন অন্য দ্বিজে পাইছে।
কপিলার[৩] গ্রাস রাজা প্রতিদিন দিছে।।

---

(১) জুম—ত্রিপুর প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির কৃষিক্ষেত্র। জুম-কৃষি উৎপন্নের প্রণালী পরবর্ত্তী মধ্যমণিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(২) রাজাকে সেলাম করিবার কালে, ত্রিপুর জাতীয় বাদক কর্ত্তৃক 'সেলামবাড়ি বাদ্য' বাজাইবার নিয়ম ছিল।

(৩) কপিলা— কামধেনু। ইহার উৎপত্তি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

"দক্ষস্যতনয়া যাভূৎ সুরভির্নাম নামতঃ।
গবাং মাতা মহাভাগা সর্ব্বলোকোপকারিণী।।

পরে রাজা মন্ত্রী লৈয়া সভাতে বৈসয়।
ভোজন করে রাজা দুই প্রহর সময়।।
এই মত রাজধর্ম্ম ছিল নৃপতির।
শান্ত দান্ত মহারাজা প্রজা রাখে স্থির।।
ভাগবত নিত্য রাজা করেন শ্রবণ।
আনন্দ হৃদয় রাজা পুলকিত মন।।
দুই শত ভট্টাচার্য্য সভাতে রাজার।
সমাই স্থানে জিজ্ঞাসিয়া করে ব্যবহার।।
রাজা বলে মানব জন্ম হয় কি না হয়।
অহর্নিশি হরি-কীর্ত্তন শুনিব নিশ্চয়।।
নৃপতির বাক্য শুনি ভট্টাচার্য্য সবে।
সার্ব্বভৌম আদি যত কহিলেন তবে।।
যে বলিলা মহারাজা অযুক্ত না হয়।
হরি-কীর্ত্তনেতে সর্ব্ব পাপ হয় ক্ষয়।।
এখনে উচিত নহে হরি-সংকীর্ত্তন।
বৃদ্ধ হৈলে হরি-কীর্ত্তন শুনিবা রাজন।।
সার্ব্বভৌম বাক্য যবে নৃপতি শনিল।
বিনয় করিয়া রাজা কহিতে লাগিল।।
মৃত্যু হৈলে হরিপদ পায় যেই জন।
বহু কাল পৃথিবীতে কিবা প্রয়োজন।।
এই মনে করি রাজা আরম্ভে কীর্ত্তন।
শুভ দিনে সঙ্কল্প হইল আবাহন।।
রাত্রি দিবা অহর্নিশি হরির কীর্ত্তন।
কীর্ত্তনীয়া আষ্ট জন পাইছে বেতন।।

তস্যাস্ত তনয়া জজ্ঞে কশ্যপাত্তু প্রজাপতেঃ।
নাম্না সা রোহিণী শুভ্রা সর্ব্বকামদুঘা নৃণাম্।।
তস্যাং জজ্ঞে শূর সেনাদ্বসো রতিতপোজ্জলাৎ।
কামধেনুরিতি খ্যাত সর্ব্বলক্ষণ সংযুতা।।"

কামধেনুর সেবা, কামধেনু দান প্রভৃতি পূণ্যকার্য্যের ফল বিষ্ণুপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত এবং দানসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

কীর্ত্তনীয়া বরাত কাউয়া বাসা ঘাটে।[১]
বেতন পাইয়া কীর্ত্তন করে পরিপাটে।।
সম্বৎসর পিতৃ শ্রাদ্ধ করে মহারাজ।
অহোরাত্র কীর্ত্তন হয় রাজগৃহ মাঝ।।
দশ দ্বিজ শ্রাদ্ধ কালে গোপাল মন্ত্র[২] জপে।
যাবত সমাপন হয় শ্রাদ্ধের সমীপে।।
শ্রাদ্ধ সমাপিয়া রাজা উঠয়ে যখন।
ব্রাহ্মণেতে দিছে দান প্রতি জনে জন।।
ব্রাহ্মণ ভোজন হৈলে রাজার ভোজন।
দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করে দ্বিজগণ।।
এই মতে রাজধর্ম্ম করে রাজধর।
পুত্রবৎ প্রজা পালন করে নিরন্তর।।
ক্রমে ক্রমে মহারাজা জ্ঞানের বিশেষ।
দান ধর্ম্ম করিবারে মন্ত্রীতে আদেশ।।

---

(১) কাউয়া বাসা নামক বনকর ঘাটে কীর্ত্তনীয়াগণের বেতনের বরাত ছিল, তথা হইতে ইহারা বেতন পাইত। বর্ত্তমান কালে এই নামের স্থান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

(২) গোপাল মন্ত্র—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার নাম গোপাল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালের স্বরূপ বিষয়ে ব্যাসদেবকে যাহা বলেছিলেন, তদ্দ্বারাই 'গোপাল' নামের গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইতে পারে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—

"গোপাল মুনয়ঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠানন্দ মূর্ত্তয়ঃ।
পদ্মপুরাণ—পাতাল খণ্ড।

শ্রাদ্ধকালে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণেতিহাসের আলোচনা করা শাস্ত্রসম্মত কার্য। যথা ;—
"স্বাধ্যায়াং শ্রাবয়েদেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
ইতিহাস পুরাণানি শ্রাদ্ধ কল্পাংশ্চ শোভনান্।।"
কূর্ম্মপুরাণ—২১শ অধ্যায়।

মৎস্যপুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এতদনুসারে শ্রাদ্ধ-মণ্ডপে শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং বিরাট পর্ব্ব পাঠ করা ব্যবস্থেয়। বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধকালে শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন এবং গোপাল মন্ত্র জপ করা শ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত কার্য্য। পদ্মপুরাণ, তন্ত্রসার, অনন্তসংহিতা, হরিভক্তিবিলাস, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে গোপাল ও দ্বাদশ গোপালের স্বরূপ এবং গোপাল মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

মহাদান[১] করিবার করে আয়োজন।
তুলাপুরুষ[২] আদি দান করে সেইক্ষণ।।
আর যত করে দান বলিবেক কত।
দ্বিজগণে দিল দান যথাবিধি মত।।
নৃত্য গীত সংকীৰ্ত্তন মহোৎসব হয়।
বিষ্ণুমন্দির দিতে রাজার মনের আশয়।।
নির্ম্মল মন্দির এক বিচিত্র আকার।
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল স্বহস্তে রাজার।।
দীঘী পুষ্করিণী রাজা দিল স্থানে স্থান।
বাগ বাগিচা পুষ্পের করিল উদ্যান।।

---

(১) তুলা পুরুষাদি ষোড়শ দানকে মহাদান বলে। হেমাদ্রির দানখণ্ডের মতে নিম্নোক্ত ষোল প্রকারের দানকে মহাদান আখ্যা প্রদান করা হয়েছে ঃ—

"আদ্যন্তু সর্ব্ব দানানাং তুলাপুরুষ সংজ্ঞিতম্।
হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডঃ তদনন্তরম্।।
কল্প পাদপ দানঞ্চ গো সহস্রন্তু পঞ্চমম্।
হিরণ্য কামধেনুশ্চ হিরণ্যাশ্বস্তথৈব চ।।
পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বদ্ধরাদানস্তথৈব চ।
হিরণ্যাশ্ব রথস্তদ্বদ্ধেমহস্তিরথস্তথা।।
দ্বাদশং বিষ্ণুচক্রঞ্চ ততঃ কল্পলতাত্মকম্।
সপ্তসাগর দানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ।
মহাভূত ঘটস্তদ্বৎ ষোড়ষঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।।"

মলমাস তত্ত্বধৃত মৎস্যপুরাণ।

(১) তুলাপুরুষ দান, (২) হিরণ্য গর্ভ, (৩) ব্রহ্মাণ্ড দান, (৪) কল্প পাদপ দান, (৫) গো সহস্র দান, (৬) হিরণ্য কামধেনু, (৭) হিরণ্যাশ্ব, (৮) পঞ্চ লাঙ্গলক, (৯) ধরাদান, (১০) হিরণ্যাশ্ব রথ, (১১) হেম হস্তিরথ, (১২) বিষ্ণু চক্র, (১৩) কল্প লতা, (১৪) সপ্ত সাগর দান, (১৫) রত্ন ধেনু, (১৬) মহাভূত ঘট দান, এই ষোড়শ প্রকার দানই মহাদান। ইহার এক একটী দানকেও মহাদান বলা হয়।

কূর্ম্ম পুরাণমতে নিম্নলিখিত দশবিধ দানকে মহাদান বলা হয় ;—

"কনকাশ্বতিলা গাবো দাসীরথ মহীগৃহাঃ।
কন্যা চ কপিলা ধেনুর্মহাদানানি বৈ দশ।।"

মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।

(১) কনক, (২) অশ্ব, (৩) তিল, (৪) গো, (৫) দাসী, (৬) মহী, (৮) গৃহ, (৯) কন্যা, (১০) কপিলা ধেনু, এই দশবিধ দানকে মহাদান বলা হয়।

(২) তুলাপুরুষ— স্বীয় দেহের তুল্য ওজনের স্বর্ণ, রৌপ্যাদি দান করা। দ্বিতীয় লহরের ৫৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় এতদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

এই মতে সুখে ভোগে কত দিন যায়।
গৌড়েশ্বরে নৃপবার্ত্তা সেই কালে পায়।।
অমরমাণিক্য স্বর্গ প্রাপ্তি পরে।
তান পুত্র রাজধর নৃপ অভ্যন্তরে।।
বহুতর মত্তহস্তী আছয়ে রাজার।
ঘোটক বহুল নৃপের সংখ্যা নাহি তার।।
বহু সৈন্য ধন রত্ন আছয়ে বিস্তর।
ব্রাহ্মণেতে দান রাজা করে নিরন্তর।।
এহা শুনি গৌড়েশ্বর চমকিত মন।
কি মতে কাড়িয়া নিব রাজহস্তী ধন।।
বহু সৈন্য পাঠাইল উদয় নগরী।
দ্বাদশ বাঙ্গালা দিল সৈন্য সমভ্যারি।।
এই মতে গৌড় সৈন্য করিয়া সাজন।
কৈলাগড়ে যুদ্ধ জন্য আসিল তখন।।
যুদ্ধ বার্ত্তা পাইয়া রাজা সৈন্য নিজুজিল।
সেনাপতি চন্দ্রদর্প যুদ্ধেতে রহিল।।
বহু সৈন্য লৈয়া চন্দ্রদর্প নারায়ণ।
কৈলাগড়ে গিয়া করে যুদ্ধ আরম্ভন।।
নৃপতির সৈন্য দেখি গৌড় সৈন্যগণ।
ভয়যুক্ত গৌড় সৈন্য কি করিবে রণ।।
পৃষ্ঠভঙ্গ গৌড় সৈন্য দিল আকস্মাৎ।
রাজ সৈন্য ধাবমান তাহার পশ্চাৎ।।
রাজধরমাণিক্য রাজা অতি পুণ্যবান।
বিনা যুদ্ধে গৌড় সৈন্য ভঙ্গ দিল স্থান।।
গৌড় সৈন্য দূর করি চন্দ্রদর্প আইসে।
গৌড় সৈন্যে কহে প্রাণ বাঁচিল বিশেষে।।
চন্দ্রদর্প আসি বলে নৃপের সাক্ষাৎ।
গৌড় সৈন্য দূর করি আসিল পশ্চাৎ।।
যেমতে করিল যুদ্ধ সব বিবরণ।
কৈলাগড়ে থানা রাখি আসিছে এখন।।

চন্দ্রদর্প নারায়ণ করে নিবেদন।
তাহা শুনি নরপতি হরষিত মন।।
রাজধরমাণিক্য রাজা পুণ্য আখ্যায়ন।
তান কালে দুর্ভিক্ষ যে না ছিল কখন।।
বিষ্ণুপরায়ণ রাজা রাজধর্ম্মে[১] মতি
অধর্ম্ম নাহিক কভু তাহান সুখ্যাতি।।
তান কালে প্রজা সব ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রজা সবে করে ধর্ম্ম যার যেই মন।।
নানা সুখে প্রজা সব বঞ্চে সেই কাল।
প্রজার না করে দণ্ড সুখে গেল ভাল।।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর যদি হয়।
কাল পূর্ণ হৈল রাজা বুঝিল নিশ্চয়।।
প্রতিদিন প্রদক্ষিণ বিষ্ণুর মন্দির[২]।
বিষ্ণু পাদোদক গ্রহণ[৩] হয় নৃপতির।।

---

(১) রাজধর্ম্ম—রাজার কর্ত্তব্য পালন। রাজনীতি অনুসারে প্রজার পালন করিলে রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়। মন্বাদি বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থে এবং মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে, কালীপুরাণ ৮৫—৮৬ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ, স্বর্গ খণ্ডের ১৩৮ অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম বিষয়ক অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব।

(২) দেবতা প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ঃ—

"প্রদক্ষিণাং যে কুর্ব্বন্তি ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্।।
ষস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ সাষ্টাঙ্গক প্রণামকম্।
দশাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।।"

হরিভক্তি বিলাস।

মর্ম্ম ঃ— ভক্তিযুক্তচিত্তে দেব প্রদক্ষিণ করিলে তাহাদের কদাচ যমপুর দর্শন হয় না। তিনবার প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধের ফল হয়।

হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে দেবতা প্রদক্ষিণ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে। এতদ্ব্যতীত কালিকাপুরাণের ৭১ অধ্যায়ে, তন্ত্রসার গ্রন্থে, এবং কর্ম্মলোচন প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ে দেবতা প্রদক্ষিণের প্রণালী ও ফল সম্বন্ধীয় বিবরণ পাওয়া যাইবে।

(৩) চরণামৃতের নামান্তর পাদোদক। দেবতার পাদোদক গ্রহণের অমোঘ ফলের কথা নানা শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। পদ্ম পুরাণের মতে ঃ—

"হৃদিরূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ।।"

পদ্মপুরাণ—উঃ খণ্ড, ১০০ অঃ

মহারাজা পূণ্যবান ছিল অতিশয়।
বিষ্ণু গৃহে গেল রাজা সেই ত সময়।।
বিষ্ণু পাদোদক বহু করিয়া ভক্ষণ।
প্রদক্ষিণ করে রাজা আনন্দিত মন।।
প্রদক্ষিণ করে রাজা নাচিতে নাচিতে।
ভাবেতে বিহবল রাজা হইলেক তাতে।।
গোমতী নদীর তীরে বিষ্ণুর আলয়।
ভাবেতে বিহবল হৈয়া রাজা নদীতে পড়য়।।
রাম নাম লৈয়া রাজা নতীতে পতন।
দেহ ত্যাগ হয় রাজা বৈকুণ্ঠে গমন।।
রাজ পুত্র যশোধর আর মন্ত্রীগণ।
মৃত রাজা বেষ্টিত সব করয়ে ক্রন্দন।।
স্নান করাইয়া রাজা চতুর্দ্দোলে রাখে।
রাজআভরণ শোভে রাম নাম লিখে।।
সর্ব্ব সৈন্য বেষ্টিত চলে নৃপতি লইয়া।
বৈকুণ্ঠ পুরেতে নৃপ সংস্কার করিয়া।।
দাহ সংস্কার পরে আইসে সর্ব্ব জন।
যথাবিধি করিলেক শ্রাদ্ধ আয়োজন।।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দ্বারের পণ্ডিত।
শাস্ত্রে বিচক্ষণ সেই রাজা পুরোহিত।।
তাহার আদেশক্রমে শ্রাদ্ধ আয়োজন।
যথাবিধি করিলেক দ্রব্য সংঘটন।।
রাজপুত্র যশোধর শ্রাদ্ধ আরম্ভিল।
যথাবিধি ক্রমে দান প্রত্যেকে করিল।।

মর্ম্ম ঃ— যাহার হৃদয়ে হরিরূপ জাগরূপ, মুখে নাম, উদরে নৈবেদ্য এ পাদোদক এবং মস্তকে নির্ম্মাল্য, তিনি স্বয়ং অচ্যুত স্বরূপ।

স্কন্দপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ এবং হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে পাদোদকের ভূয়সী মাহাত্ম্য বর্ণীত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না।

(১) উদয়পুরস্থ রাজপরিবারের সমাধি ক্ষেত্র “বৈকুণ্ঠপুর” নামে অভিহিত হইত।
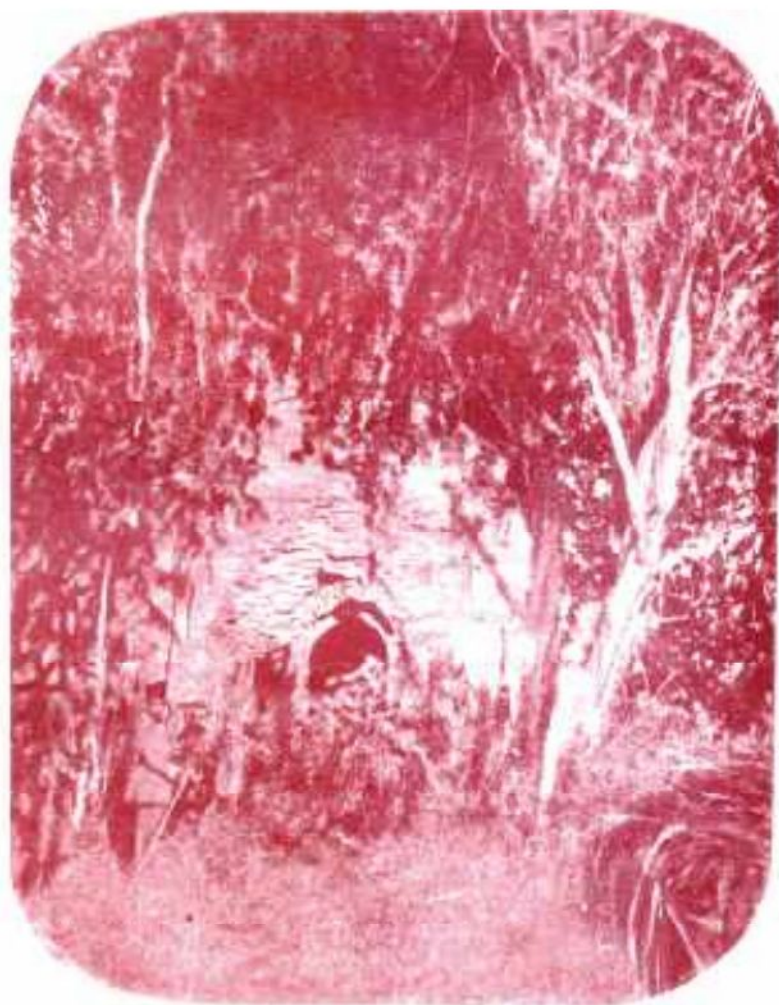
মহারাজ রাজধর মাণিক্যের বিষ্ণুমন্দির।

ভূম্যাদি ষোড়শ দান[১] করে বিধি মতে।
বৃষোৎসর্গ[২] হস্তী ঘোড়া দান বহু তাতে।।
এই মতে রাজ-শ্রাদ্ধ হৈল সমাপন।
ব্রাহ্মণ বিদায় করে দিয়া বহু ধন।।
রাজাহীন রাজ্য প্রজা রহিবে কেমনে।
রাজা বিনে রাজ্য স্থির না হয় কখনে।।
মন্ত্রী লৈয়া রাজসৈন্য করয়ে মন্ত্রণা।
কতদিনে রাজা হবে করয়ে গণনা।।

যশোধরমাণিক্য খণ্ড

নৃপতির পুত্র যশোধর নারায়ণ।
মন্ত্রী কহে তাকে রাজা করিব এখন।।
পনরশ তের শক হইল যখন।
রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন।।
তার পুত্র যশোধর হইলেক রাজা।
পাত্র মিত্র মন্ত্রী বশ করে সৈন্য প্রজা।।

---

(১) শুদ্ধিতত্ত্বের মতে— ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, ধেনু, হিরণ্য ও রজত, এই সকল বস্তু ষোড়শ দানের অন্তর্ভুক্ত।

(২) মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনায় শ্রাদ্ধ বাসরে যে-সকল দানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তন্মধ্যে বৃষোৎসর্গ একটি প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। শুদ্ধিতত্ত্বের মতে ;—

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি যস্যানোৎসৃজদ্যতে বৃষঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা দত্তৈশ্রাদ্ধ শতৈরপি।।"

মর্ম্ম ঃ— অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে যাহার উদ্দেশে বৃষ উৎসৃষ্ট না হয়, তদুদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। অর্থাৎ যে প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করা হয়, তাহার প্রেতলোকে গতি হয়, একমাত্র বৃষোৎসর্গই স্বর্গ-গতির উপায়।

চারিটি বৎসতরী সহিত বৃষ উৎসর্গ করা প্রশস্ত। শাস্ত্রে বৃষ ও বৎসতরীর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শুদ্ধিতত্ত্ব, বৃষোৎসর্গতত্ত্ব, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৃষোৎসর্গের ফল, কার্য্যপ্রণালী ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

শিষ্টের পালন করে দুষ্টের সংহার।
পিতৃ পিতামহ ক্রমে বৈষ্ণব আচার।।
রাজ রাজ্যে প্রজা সবে সুখেতে বঞ্চিল।
রাজ উপদ্রব নৃপের কিছু নাহি ছিল।।
পুত্রবৎ পালন প্রজা করে আপন।
সুখ্যাতি হইল রাজার মধুর বচন।।
এই মতে কত দিন বঞ্চি রাজন।
তার পরে যেবা হৈল কহিব এখন।।
হোসন সাহা নামে ছিল মঘ নরপতি।
যশমাণিক্য সঙ্গে বহু ছিল প্রীতি।।
মঘ সনে প্রীতি রাজার হইল যখনি।
রাজ্য উপদ্রব প্রজার ঘুচিল তখনি।।
পূর্ব্বে ভুলুয়ার রাজ্য রাজার আমল।
যশমাণিক্যাবধি না মিলে সকল।।
ভুলুয়ার জমিদার গন্ধর্ব্বনারায়ণ।
সুর বংশে জন্ম তার অতি বিচক্ষণ।।
যশমাণিক্য রাজা চিন্তিল তখন।
ভুলুয়া নাহি মিলে কিসের কারণ।।
বহু সৈন্য নিজুজিল ভুলুয়ার রণে।
ভুলুয়ার যুদ্ধ জয় হৈল সেইক্ষণে।।
পরাজয় হইয়া গন্ধবর্বনারায়ণ।
নৃপতি সাক্ষাতে আসি মিলিল তখন।।
ভুলুয়ার রাজ্য লুটে যত সৈন্যগম।
ভুলুয়া রাজ্যেতে জন না রাখে তখন।।
এই মতে রাজ্য আমল করে দিনে দিনে।
যশমাণিক্য রাজা সর্ব্ব সৈন্য সনে।।
পাত্র মিত্র সেনা রাজা করয়ে পালন।
দান ধর্ম্ম করিবারে হইলেক মন।।
প্রাসাদ পুষ্কর্ণী দীঘী দিল স্থানে স্থান।
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল হৈয়া দিব্য জ্ঞান।।

পনরশ চব্বিশ শকে[১] যশ রাজা হৈল।
যেন মত নাম রাজা সেই খ্যাতি হৈল।।
তার পর মঘ রাজা হোসনসাহা সনে।
তার সঙ্গে বৈরি-ভাব জন্মিল তখনে।।
এসব বৃত্তান্ত সকল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাহা ব্যবহার।।
হেন মতে একবিংশ বৎসর বঞ্চিল।
যশমাণিক্য রাজার রাজ্য ভোগ হৈল।।
বিধাতার নিয়োজিত দৈবের ঘটন।
দিল্লীশ্বর সাহাসিলিম শুনিল তখন।।
ত্রিপুর রাজার হস্তী ঘোটক বহুতর।
দূত মুখে শুনে সাহাসিলিম সত্বর।
ফতেজঙ্গ নবাব যুদ্ধেতে চলে রঙ্গে।
প্রধান উমরা দুই দিল তার সঙ্গে।।
ইস্পিন্দার নুরুল্যা নামে যুদ্ধ সেনাপতি।
সৈন্য সঙ্গে চলে ফতেজঙ্গের সংহতি।।
দিল্লী হতে সৈন্য সব ঢাকাতে আসিল।
দ্বাদশ বাঙ্গালা সৈন্য সঙ্গেতে লইল।।
ফতেজঙ্গ নবাব ঢাকাতে রহিলেক।
ইস্পিন্দার নুরুল্যা সৈন্য পাঠাইলেক।।
তার সঙ্গে বঙ্গ সৈন্য পাঠায় সেইক্ষণ।
উদয়পুরে আসি তারা করিবারে রণ।।
দুই ভাগ হৈয়া সৈন্য চলিল তখন।
ইস্পিন্দার সৈন্য সমে কৈলাতে গমন।।
মৃজা নুরুল্যা খাঁ চলে সৈন্যের সহিত।
মেহারকুলের পথে হৈয়া হরষিত।।
দুই পতে দুই সৈন্য থানা করি রহে।।
যশমাণিক্য তত্ত্ব পাইলেক তাহে।।

---

(১) এ স্থলে সময় নির্দ্ধরণ লইয়া রাজমালা রচয়িতা কিম্বা নকলকারী ভ্রমে পতিত হইয়াছে। মধ্যমণিতে এ বিষয় আলোচিত হইবে।

আপনার সৈন্য রাজা আনিয়া সাক্ষাত।
দুই ভাগ করি সৈন্য পাঠায় পশ্চাত।।
চণ্ডীগড়ে কত সৈন্য ছকড়িয়া কত।
দুই ভাগে পাঠায় সৈন্য নৃপতির যত।।
সেনাপতি দুই ভাগ করে সেইক্ষণ।
দুই গড়ে রহিলেক সেনাপতিগণ।।
হেন মতে রাজসৈন্য গড়ে রহে গিয়া।
সেই কালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া।।
পত্র লিখিল রাজা মগলের স্থান।
কি কার্য্যে আসিছ লিখ আমা বিদ্যমান।।
রাজপত্র পাইয়া সে যে মগলে লিখিল।
দিল্লীশ্বরে তোমা স্থানে আমা পাঠাইল।।
যত হস্তী আছয়ে যে তোমা নিজ স্থান।
সকল পাঠাও মোকে হৈয়া ভজমান।।
নহে রাজা আসিয়া মিলহ এই স্থান।
দিল্লীশ্বরে বলিয়াছে এ সব বিধান।।
দূতে আসি এ সকল রাজাতে কহিল।
যশমাণিক্য শুনি তাহা বহু ক্রোধ হৈল।।
হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখনে।
তোমরা চলিয়া যাও যথা ইচ্ছা মনে।।
এ সব বলিয়া দূতে রাজায় পাঠায়।
দূত যাইয়া মগলেতে সকল জানায়।।
দূত কথা শুনি মগল ক্রোধ হয় অতি।
সৈন্য সমে যুদ্ধ তরে চলে শীঘ্রগতি।।
দুই সৈন্য করে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
ত্রিপুর মগল সৈন্য পরে বহুতর।।
ত্রিপুর মগল সৈন্য করে হানাহানি।
আপ্তপর ভেদ নাহি দুই যে বাহিনী।।
অপার মগল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার।
ভঙ্গদিল ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধের মাঝার।।

যশমাণিক্য রাজা ছিল উদয়পুরে।
ভঙ্গ দিয়া যায় সৈন্য রাজার গোচরে।।
সৈন্য ভঙ্গ দেখি হয় নৃপ চমকিত।
যুদ্ধবার্ত্তা শুনি রাজা হইল ভাবিত।।
ভঙ্গ দিয়া গেল রাজা গহন পর্ব্বতে।
সে কালে মগল আসে উদয়পুরেতে।।
ছকড়িয়ার পতে ইস্পিন্দার সেনাপতি।
উদয়পুর আসিলেক অতি শীঘ্রগতি।।
উদয়পুর সর্ব্ব প্রজা ভঙ্গ সেইকাল।
যার যেই স্থানে গেল ভাবিয়া বিশাল।।
উদয়পুর আসি মগল কিছু না পাইয়া।
গ্রামে গ্রামে ফিরে মগল ধন বিচারিয়া।।
ধন না পাইয়া মৃজা নুরুল্যায় তাতে।
রাজার উদ্দেশে চর পাঠায় পর্ব্বতে।।
গহন কাননে চর রাজ উদ্দেশ তরে।
পর্ব্বত মাঝারে রাজা পাইল তৎপরে।।
রাজতত্ত্ব পাইয়া নুরুল্যা সেনাপতি।
রাজারে ধরিতে সৈন্য পাঠায় শীঘ্রগতি।।
গহন কাননে রাজা সৈন্য বিবর্জ্জিত।
মগলের সৈন্য গিয়া হৈল উপস্থিত।।
যুদ্ধ দিতে সৈন্য নাহি নৃপতি সহিত।
ভঙ্গ দিতে নাহি পারে রাণী সমুদিত।।
মগলের সৈন্যে রাজা ধরে সেই স্থান।
উদয়পুর আনিলেক করিয়া সন্ধান।।
নুরুল্যায় মন্ত্রণা যে করে বহুতরে।
কত দিন রাজা রাখে সেই উদয়পুরে।।
যশমাণিক্য লৈয়া চলিল ঢাকাতে।
ইস্পিন্দার নুরুল্যায় স্ব-সৈন্য সহিতে।।
মগলের কত সৈন্য রহে সেই স্থান।
উদয়পুর রহিলেক করিতে সন্ধান।।

ঢাকাতে নৃপতি লৈয়া যখনেতে গেল।
ফতেজঙ্গ নবাবের দরশন হৈল।।
ফতেজঙ্গ নবাব সে যে অতি দুরাচার।
নরপতি পাঠাইল নিকটে বাদসার।।
বাদসাহা সিলিম নাম দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে সমাদর করে বহুতর।।
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন সাহা।
তোমার সমীপে হস্তী আছিলেক যাহা।।
তোমার যে ধন রত্ন সৈন্য বহুতর।
রাজ্যে যাইয়া আমা স্থানে পাঠাও সত্বর।।
বাদসার অনুমতি শুনি যশোধর।
প্রণমিয়া বাদসাকে দিলেন উত্তর।।
আমা ধন জন রত্ন সকল তোমার।
তোমার সৈন্যেতে রাজ্য লুটিছে আমার।।
কিবা অপরাধ আমা হয় তোমা স্থান।
রাজ্যে না যাইব আমি পাইয়া অপমান।।
আমার যে শেষ কাল হইল এখন।
রাজ্যে যাইয়া কি করিব নাহি রত্ন ধন।।
তীর্থাশ্রমে যাই আমি দেহ অনুমতি।
তীর্থবাস করি আমি পাই অব্যাহতি।।
রাজার বচন শুনি দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে বিদায় যে দিলেন সত্বর।।
বাদসার অনুমতি পাইয়া রাজন।
কাশীবাসে গেল রাজা লৈয়া পরিজন।।
কাশীবাস করে রাজা হরষিত মন।
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা করে দরশন।।
গঙ্গাস্নান করে রাজা মণিকর্ণিকাতে।
সর্ব্বদেব দরশন রাণীর সহিতে।।
কতকাল কাশীবাস করিয়া নৃপতি।
প্রয়াগ হইয়া চলে মথুরাতে গতি।।

মধুরাধামেতে নৃপ গেল সেইক্ষণ।
বৃন্দাবন উপবন গিরিগোবর্দ্ধন।।
নানা তীর্থ ভ্রমে রাজা রাণীর সহিত।
বৃন্দাবন বাস করে হৈয়া আমোদিত।।
যশমাণিক্য রাজা অতি পুণ্যবান।
বহুকাল বাস করে বৃন্দাবন স্থান।।
বৃদ্ধ হৈল নরপতি জরায়ে পীড়িত।
বাহাত্তর বর্ষ বয়স হৈল সমুদিত।।
রাত্র দিন ভাবে রাজা শ্রীকৃষ্ণচরণ।
শরীর ত্যজিয়া চরণ পাইব কেমন।।
কালপূর্ণ নৃপতির হইল ঘটন।
শিরেতে বেদনা জ্বর হইল রাজন।।
তিন দিন ছিল জ্বর রাজার তখন।
বৃন্দাবন পাইল রাজা বৈকুণ্ঠে গমন।।
যশমাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে।
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে।।
শ্রাদ্ধাদি মহোৎসব করে যশ রাণী।
পৃথিবীতে তান খ্যাতি রহিল এখনি।।
যশমাণিক্য রাজা হৈল সমাপন।
তারপরে যেবা হৈল ত্রিপুর ভুবন।।
যশমাণিক্য রাজা যে কালে নিয়াছিল।
প্রধান ত্রিপুরগণ নানা স্থানে গেল[১]।।
যার যে লক্ষালক্ষ যায় সেই স্থান।
পর্ব্বতে রহিল কেহ করিয়া সন্ধান।।
যত কিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে।
মগলের সৈন্যে লুটে না পারে থাকিতে।।
পাপিষ্ঠ মগল জাতি দুষ্ট দুরাচার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষেধির নগরে রাজার।।

(১) যশোধরমাণিক্যকে মুসলমানগণ ধৃত করিয়া নেওয়ার পর উদয়পুরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানাস্থানে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ দেবপূজা নিষেধে যবন।
কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ।।
অমর সাগর আদি যত সরোবর।
জান কাটিয়া সুখায় মগল বর্ব্বর।।
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ।
সরোবরে লুকাইছে জানিয়া বিশেষ[১]।
এই মত অথান্তর[২] করেন মগল।
উদয়পুর প্রজা যত হইল বিকল।।
রাজা-শূন্য রাজ্যে হৈল অমঙ্গল যত।
ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা ভাবে অবিরত।।
রাজ পাত্র মন্ত্রী সব নানা স্থানে রহে।
কি মতে হইব রাজা চিন্তিত যে তাহে।।
এই মত অরাজক আড়াই বৎসর।
মগলে সাধয়ে রাজ্য রাজা দেশান্তর।।
দৈবের বিচিত্র গতি বুঝন না যায়।
সেই কালে দেবচক্র হইল উপায়।।
উদয়পুর রাজ্যে যত মগলের সেনা।
দিনে দিনে মরে সৈন্য নাহিক গণনা।।
সেই কালে মগল সেনা চিন্তয়ে বিস্তর।
কি মতে বাঁচিব প্রাণে যাইয়া স্থানান্তর।।
উদয়পুর ছাড়িয়া মগল গেল সেইক্ষণ।
মেহারকুলেতে যাইয়া রহে সর্ব্বজন।।
মগলে ছাড়িয়া গেল শুনে সর্ব্বজন।
তখনে আসিল প্রজা আনন্দিত মন।।
রাজ পাত্র মন্ত্রী যত আর সেনাপতি।
যার যেই পুরী আইসে আনন্দিত অতি।।
রাজা শূন্য রাজ্য যেন থাকা নাহি যায়।
অরক্ষক গাব[৩] তেন নানা দিগে ধায়।।

---

(১) সরোবরে লুক্কায়িত ধনরত্নের সন্ধান জন্য মোগলগণ জান কাটিয়া সমস্ত জলাশয় সিঞ্চন করিয়াছিল।

(২) অথান্তর— অত্যাচার, উপদ্রব। (৩) গাব — গরু।

যশমাণিক্য রাজা মধুরা গমন।
রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন।।
রাজ পুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজ ভ্রাতা।
কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্ব্বথা।।
সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিত তখন।
কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ।।
মহামাণিক্য বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি।
যশধর কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি।।
করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান।
সেই রাজযোগ্য হয় দেখ বিদ্যমান।।

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড

এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ।
কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন।।
রাজ ভট্টাচার্য্য আদি যতেক পণ্ডিত।
অভিষেক করে রাজা সঙ্গে পুরোহিত।।
ছত্র আরঙ্গি ধরে শিরের উপর।
দরিয়া ত্রিপুরা বাদ্য বাজিল সত্বর।।
পাত্র মিত্র সেনাপতি সেলাম করিল।
রাজপুর মাঝে মঙ্গলধ্বনি বর হৈল।।
কালিকাপ্রসাদ নাম রাজপাটহাতী।
সেইকালে গজপরে চড়িল নৃপতি।।
বুলনি[১] করয়ে রাজা নগর ভ্রমণ।
বিতরণ করে রাজা যত রত্ন ধন।।
যতেক আসিল দ্বিজ ধন রত্ন দিল।
পাত্র মিত্র বস্ত্রাদিতে সকল তুষিল।।

---

(১) বুলনি— চলন, নগর, ভ্রমণ, শোভাযাত্রা।

পনরশ সাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল।
শুভদিনে মহারাজা মোহর মারিল।।
শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে।
আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে।।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুপরায়ণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়জিত সদ্‌গুণ আচরণ।।

অথ শ্লোক।

রাজাভবদ্বিষ্ণুপরায়ণো বৈ শরদ্বিমাংশোঃ কুলসম্ভবশ্চ।
অভেদধর্ম্মঃ কিল কল্পবৃক্ষঃ কল্যাণমাণিক্যমহীমহেন্দ্রঃ

তথার পয়ার।

মহারাজা হইলেন বিষ্ণুপরায়ণ।
চন্দ্রবংশে জন্ম শরচ্চন্দ্রের কিরণ।।
ধর্ম্মতুল্য রাজা সেই দানে কল্পবৃক্ষ।
কল্যাণমাণিক্য ছিল পৃথিবীতে মোক্ষ।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা অতি পুণ্যবান।
পাত্র মিত্র বশ করে করিয়া সম্মান।।
অন্য দেশে গিয়াছিল সৈন্য সেনাপতি।
সে সকল আসিলেক শুনিয়া সুখ্যাতি।।
কেহকে করিল বশ নিজ বাহুবলে।
কেহরে করিল বশ প্রীতি কুতূহলে।।
প্রধান যতেক পাত্র মন্ত্রী সেনাপতি।
যার যেই নিজ কার্য্যে নিযোজে নৃপতি।।
পর্ব্বতিয়া কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ।
ঘোটক গবয় বস্ত্র লইয়া তখন।।
থাল ঘোঙ্গ গজদন্ত আনিল তখন।
নানা ভেট লৈয়া আইসে নৃপতি সদন।।
নৃপতিকে ভেট তারা দিল সেইক্ষণ।
ইনাম পাইল তারা বস্ত্র আভরণ।।
পূর্ব্বাবধি চতুর্দ্দশ দেবতা সংস্থান।
অষ্টধাতুর দেবতা ছিলেন নির্ম্মাণ।।

চতুর্দ্দশ দেবতা মূর্ত্তি গঠায় নৃপতি।
সুবর্ণ রজত তাতে মনোহর অতি[১]।।
দেবের প্রতিষ্ঠা রাজা করে সেইক্ষণ।
পূজে চতুর্দ্দশ দেব হরষিত মন।।
গব আদি মেষ ছাগ নানা বলিদান।
নৈবেদ্যাদি অন্ন ব্যঞ্জন যেমত বিধান।।
সেই কালে মহারাজার স্বপ্নেতে আদেশ।
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ।।
আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে।
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে।।
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন।
প্রভাতে কহিল রাজা স্বপ্নের কথন।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল।
সিদ্ধান্তবাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল।।
হরিষ হইয়া নৃপ করে সেই ক্ষণ।
পুষ্কর্ণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন।।
বাস্তু পূজা করে পুষ্কর্ণীর আরম্ভন।
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন।।
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর।
পুষ্কর্ণীর নাম রাখে কল্যাণসাগর[২]।।
গবর মহিষ ছাগ বলি উপহার।
যথাবিধি পূজা করে দেবী কালিকার।।
নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্ন আর।
কালিকার ভোগ দিল বিধি অনুসার।।

---

(১) অষ্টধাতুর প্রাচীন মূর্ত্তিসমূহকে রজত ও সুবর্ণমণ্ডিত করা হইয়াছিল। মূর্ত্তিগঠনের উক্তি ঠিক নহে।

(২) এই দীর্ঘিকা ঁত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের সন্নিহিত পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ২২৪ গজ ও প্রস্থ ১৬০ গজ। রাজমালা প্রথম লহরের ১২৭ পৃষ্ঠায় এই সরোবরের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

কালিকার মঠচুড়া মঘে ভাঙ্গিছিল।
পুনর্ব্বার মহারাজা নির্ম্মাণ করিল।।
অমরসাগর আদি যত সরোবর।
জান কাটিয়া মঘে শুখায় তদন্তর।।
সেই জান বদ্ধ রাজা করিল তৎপর।
নিজালয় নির্ম্মাইল পরম সুন্দর।।
প্রতিদিন দান ধর্ম্ম করে নৃপবর।
বিপ্রেতে দান দিয়া ভোজন তৎপর।।
প্রজাকে পালন করে দয়া বহুতর।
প্রতিষ্ঠা কারণে লয় রাজা অল্প কর।।
এই সব সুখ্যাতি হৈল নানা দেশ।
তাহাতে আসিল প্রজা জানিয়া বিশেষ।।
যতকে ব্রাহ্মণ ছিল নিজ অধিকারে।
যার যেই যোগ্য বৃত্তি দিল নৃপবরে।।
নৃপের প্রধান পুত্র গোবিন্দ নারায়ণ।
তাহার কনিষ্ঠ জগন্নাথ পরায়ণ।।
মধ্যমা রাণীর গর্ব্ভে জন্মে আর সুত।
নৌগতর[১] নাম তার শুনিতে অদ্ভুত।।
কনিষ্ঠা রাণীতে জন্মে দুই সহোদর।
যাদব রাজবল্লভ নাম তাহার অন্তর।।
পুত্র পৌত্র দৌহিত্র কুটুম্ব বহুতর।
সবের পালন করে ধর্ম্ম নৃপবর।।
ত্রিপুরভূম আচরঙ্গ দক্ষিণ সীমানা।
তারপরে রাঙ্গামাটী করিল আপনা।।
উদয়পুর পূর্ব্ব-উত্তর কোণে আচরঙ্গ।
ত্রিপুর রাজার থানা জানে সর্ব্ব বঙ্গ।।
উদয়পুর যখনে মগলে লইল।
রণজিত সেনাপতি আচরঙ্গ গেল।।

---

(১) নৌগতর — এটি 'নক্ষত্র' নামের অপভ্রংশ।

আচরঙ্গে গিয়া সে যে নরপতি হৈল।
নিজ বাহুবলে সেই প্রজারে শাসিল।।
সেই স্থানে থাকিয়া যে রাজ্য ভোগ করে।
আচরঙ্গ রঞ্জিতের মৃত্যু হৈল পরে।।
তারপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ হৈল নরপতি।
রাজা হৈয়া রাজ্য শাসে সেই মহামতি।।
এই মত কত দিন ছিল সেই স্থানে।
কল্যাণমাণিক্য রাজা দূত মুখে শুনে।।
রাজা বলে আমা রাজ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ।
রাজ্যাস্পদ করে সে যে আমা বিড়ম্বন।।
এমত বলিয়া রাজা মন্ত্রীতে আদেশ।
ধরিয়া আনিতে তাকে আচরঙ্গ দেশ[১]।।
রাজার প্রধান পুত্র গোবিন্দ নারায়ণ।
তাকে সম্বোধিয়া নৃপ বলিল তখন।।
রণজিতের পুত্র হয় লক্ষ্মীনারায়ণ।
সসৈন্যে ধরিয়া তাকে আনহ আপন।।
বহু সৈন্য লৈয়া যাও তোমার সঙ্গতি।
প্রধান যতেক আছে সৈন্য সেনাপতি।।
পিতৃ আজ্ঞা শুনিয়া গোবিন্দ নারায়ণ।
রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল তখন।।
রাজার সাক্ষাতে সে যে বিদায় হইয়া।
শুভক্ষণে রাজপুত্র চলিল সাজিয়া।।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

রাজার আদেশ পাইয়া　　সর্ব্ব সৈন্য সাজাইয়া,
চলিলেক গোবিন্দ নারায়ণ।
রাজপুত্র যুদ্ধে চলে　　নানাবিধ বাদ্য ভালে,
শব্দ উঠে গগন মণ্ডল।
বিচিত্র কবচ পৈরে　　শিরেতে আরঙ্গি ধরে,
অস্ত্র সব লৈল বহুবিধ।

(১) আচরঙ্গ দেশ — আচরঙ্গ দেশ হইতে।

গজ বাজী সৈন্য সঙ্গে দেখিতে যে মনোরঙ্গে,
সৈন্য সেনা চলিল বিস্তর।
সৈন্য যত আগুহৈয়া আচরঙ্গ উদ্দেশিয়া,
যুদ্ধে চলে আনন্দিত মন।
পঞ্চদশ সেনাপতি বিক্রমে অদ্ভুত অতি
নানা অস্ত্র ধারণ তাহার।
শেল শূল খড়গ জাঠি হাতে ধরে পরিপাটি,
বহু সৈন্য চলিলেক রণে।
রাজপুত্র অস্ত্রধারী গজ আরোহণ করি,
চলিলেক সৈন্যের মাঝার।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ বহু অশ্ব কত গজ,
রণে চলে ভয়ঙ্কর অতি।
গিরি নদী গুহা পথ লঙ্ঘিয়া সে মহাসত্ত,
পথ করে পর্ব্বত কাটিয়া।
উচ্চ নীচ পথ করি লঙ্ঘিয়া বহুল গিরি,
থরে থরে সৈন্যের গমন।
সর্ব্ব সৈন্য আনন্দিত কিছু মাত্র নাহি ভীত,
রাজ সৈন্য চলিয়াছে রণে।
এক মাস এই মতে যাইতে হইলে পথে,
আচরঙ্গ গিয়া উত্তরিল।
শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সঙ্গে যত সৈন্যগণ,
গড় করে আচরঙ্গ পথে।
আচরঙ্গ পথে গড় বার্ত্তা শুনে পরস্পর,
তত্ত্ব পায় লক্ষ্মীনারায়ণ।
পাত্র মিত্র মন্ত্রী তার পরস্পর যুক্তি সার,
কি করিব এই ত সময়।
কল্যাণমাণিক্য রাজা শাসিতেছে সর্ব্ব প্রজা,
তাতে আমি অপরাধী নর।
রাজ পুত্র আসে রণে বহু ভয় পাই মনে,
তার সনে যুদ্ধ অনুচিত।

যুদ্ধে জয় না পাইব তাতে অপরাধী হৈব,
রাজ পুত্রে প্রাণেতে বধিবে।
ভঙ্গ দিতে মনে লয় যুদ্ধ দিতে করি ভয়,
পাত্র মন্ত্রী কহে বিবেচিয়া।
লক্ষ্মীনারায়ণ বাণী মন্ত্রী শুনি কহে পুনি,
যাহা বল তাহা মিথ্যা নয়।
রাজ্য ছাড়ি ভঙ্গ দেয় সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে নেয়,
রহ গিয়া অরণ্য মাঝার।
বিলম্বের নাহি কাজ শুন কহি মহারাজ,
এ সময়ে ভঙ্গ সে উচিত।

পয়ার।

এতেক কহিল যদি পাত্র মিত্রগণ।
আপনেহ বিবেচিল লক্ষ্মীনারায়ণ।।
যুদ্ধ না করিয়া ভঙ্গ লক্ষ্মীনারায়ণ।
তার সঙ্গে ভঙ্গ দিল যত প্রজাগণ।।
ভঙ্গ দিয়া যায় তারা গহন কানন।
তিন দিনের পথে গিয়া রহিল তখন।।
এথায় গোবিন্দদেব যুদ্ধ সজ্জা অতি।
আচরঙ্গ পথে গড় সৈন্যের সঙ্গতি।।
লক্ষ্মীনারায়ণে ভঙ্গ দূতে যে কহিল।
শুনিয়া গোবিন্দদেব অতি ক্রোধ হৈল।।
সেই কালে গড় ছাড়ে নৃপতি নন্দন।
অরণ্যে উদ্দেশ করে লক্ষ্মীনারায়ণ।।
পঞ্চ সেনাপতি সঙ্গে সৈন্য কত জন।
গড়েতে রাখিয়া গেল গোবিন্দ নারায়ণ।।
সেই পথে লক্ষ্মীনারায়ণ ভঙ্গ দিয়া গেল।
সেই পথে গোবিন্দদেব সসৈন্যে চলিল।।
যথাতে রহিছে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ।
তথা গিয়া উত্তরিলা রাজসৈন্যগণ।।

সর্ব্ব সৈন্য গিয়া তথা চৌদিগে বেষ্টন।
সৈন্য সমে ধরা গেল লক্ষ্মীনারায়ণ।।
লক্ষ্মীনারায়ণ লৈয়া আইসে আচরঙ্গ।
সর্ব্ব সৈন্য আনন্দিত গোবিন্দদেব সঙ্গ।।
লক্ষ্মীনারায়ণ ধন রত্ন যত ছিল।
হস্তী ঘোড়া আদি করি সব কাড়ি লৈল।।
এক সেনাপতি আচরঙ্গেতে রাখিয়া।
সৈন্য সমে লস্করি কাজেতে নিয়োজিয়া।।
এই মতে আচরঙ্গ জিনিল তখন।
সৈন্যসমে আসিল গোবিন্দনারায়ণ।।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে লৈয়া রাজার নন্দন।
প্রণাম করিল গিয়া নৃপতি চরণ।।
যুদ্ধ বিবরণ কহে গোবিন্দনারায়ণ।
তাহা শুনি নরপতি হরষিত মন।।
লক্ষ্মীনারায়ণ হয় নৃপতি নন্দন।
মর্য্যাদা করিয়া তাকে রাখিল তখন।।
তার পরে যেবা হৈল কহি নরপতি।
মগলের সনে যুদ্ধ হইলেক অতি।।
যশমাণিক্য রাজা মথুরা গমন।
কল্যাণমাণিক্য রাজা ত্রিপুর ভুবন।।
লোক মুখে বাদসাহায় এই তত্ত্ব পায়।
মুর্শিদাবাদ নবাবেত পত্রিকা পাঠায়।।
মুর্শিদাবাদের নবাব দুরন্ত প্রকট।
পরওয়ানা লিখিলেক রাজার নিকট।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা ত্রিপুর নৃপতি।
বাদসাহা নজরানা পাঠাইতে হাতী।
সহস্রাদি ঘোটক যে সৈন্য সমভ্যার[১]।
কামান বন্দুক বহু সৈন্যেতে অপার।

(১) সমভ্যার— সমভিব্যাহার।

সৈন্য সমে পরোয়ানা নৃপতির প্রতি।
বার বাঙ্গলা সৈন্য পাঠায় তারা সঙ্গতি।।
চর্ম্মের কামান বহু সৈন্যের সহিত[১]।
একাওয়াজে[২] ফাটে কামান শত্রু হয় ভীত।।
কৈলাগড়ে নৃপতির পূর্ব্ব পর থানা।
কমলাসাগর পাড়ে বাদসাই সেনা।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা যুদ্ধ বার্ত্তা পায়।
গোবিন্দদেব সঙ্গে লৈয়া যুদ্ধে রাজা যায়।।
দুই সৈন্যে ঘোর রণ হৈল সেই ক্ষণ।
কামানের গোলা পরে গড়েতে রাজন।।
সেই গোলা হাতে লৈয়া গোবিন্দ যুবরাজ।
নৃপতিকে দেখাইল সর্ব্ব সভা মাঝ।।
দারুণ কামান গোলা গড়ে আসি পড়ে।
কি মতে করিব যুদ্ধ রণের মাঝারে।।
যুবরাজ বাক্য শুনি নৃপতি কহিল।
বহু যুদ্ধ করিয়াছি ভীত নাহি ছিল।।
কখনে শত্রুর সঙ্গে না করিছি প্রীতি।
শত্রু সঙ্গে কর প্রীতি যেই তোমা মতি।।
তোমা মনে যাহা লয় তারা কর তুমি।
আজি হতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি।।
রাজগুরু স্থানে রাজা কহে বিবরণ।
ধনুর্ব্বাণ সমর্পিল শ্রীগুরু চরণ।।
মগল রাজার সৈন্যে ঘোরতর রণ।
মগলের সৈন্য রণে ভঙ্গ সেই ক্ষণ।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা আনন্দিত মন।
পাত্র মিত্র দুই পার্শ্বে বৈসে সিংহাসন।।

---

(১) চর্ম্মের কামান— ইহাতে বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে ভীষণ শব্দ হইত। শত্রুপক্ষের ভীতি উৎপাদন করাই ইহা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল। গাজিনামা পুথিতেও চর্ম্মের কামান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(২) একাওয়াজে— এক আওয়াজে। একবার মাত্র গর্জ্জন করিয়াই ফাটিয়া যায়।

পাত্র মিত্র সম্বোধিয়া আদেশে রাজন।
যুবরাজ করিতে গোবিন্দ নারায়ণ।।
লগ্নাচার্য্য সহিতে যে সিদ্ধান্তবাগীশ[১]।
শুভ দিন করিলেন চাহিয়া[২] জ্যোতিষ।।
শুভক্ষণ উৎসব করিল অতি সাজ।
সেই কালে গোবিন্দদেব হৈল যুবরাজ।।
যুবরাজ হৈল পুত্র হরিষ রাজার।
যুবরাজ স্থানে রাজ্যকাজে দিল ভার।।
তদন্তরে মহারাজা কল্যাণ নৃপতি।
মহাদান করিবার আনন্দিত মতি।।
ধর্ম্মের যে অংশ রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রথমে করিল তুলাপুরুষ আপন।।
যজ্ঞ হোম করিলেক ব্রাহ্মণের গণে।
তুলাতে বসিল রাজা ধর্ম্মের আসনে।।
অলঙ্কার বস্ত্র সমে তুলাতে বসিল।
আর দিগে ধন রত্ন পরিমিত দিল।
তুলা হতে নামিয়া উৎসর্গে সেই ক্ষণ।।
তিন হস্তী পঞ্চ ঘোড়া দান বিতরণ[৩]।।
সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি।
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি।।
হস্তী এক দিল তাকে সসজ্জ করিয়া।
মেহারকুলে গ্রাম এক দিল উৎসর্গিয়া[৪]।।

---

(১) সিদ্ধান্তবাগীশ--- ইনি সভাপণ্ডিত এবং রাজপুরোহিত ছিলেন। রাজমালার আলোচ্য লহর তাঁর রচিত। ইনি হস্তীদান গ্রহণ করিয়া সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ মধ্যমণির প্রারম্ভে পাওয়া যাইবে।

(২) চাহিয়া---দেখিয়া।

(৩) হস্তী ও অশ্ব দানের ফল নন্দিপুরাণ, বহ্নিপুরাণ ও শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় ; তাহার একটী বাক্য নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"যোহশ্বং রথং গজং বাপি ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।
স শক্রস্য বসেল্লোকে শক্রতুল্যো যুগান্ দশ।
প্রাপ্যান্তে চৈব মনুষ্যং রাজা ভবতি বুদ্ধিমান্।।"
শুদ্ধিতত্ত্বম্।

(৪) এই ভূমিদানের বিবরণ মধ্যমণিতে বিবৃতি হইয়াছে।
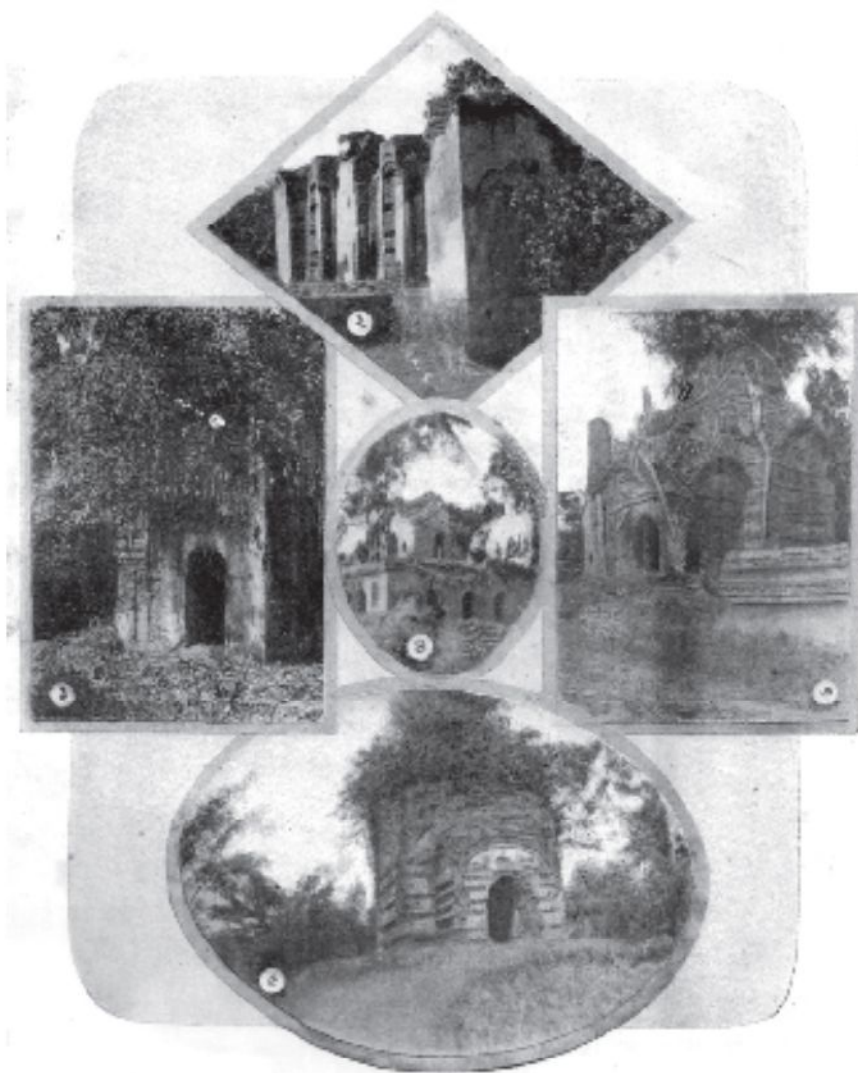
মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের নির্ম্মিত মন্দির সমূহ।
(১) ধর্ম্মমঠ, (২) বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, (৩) দ্বিতীয় বিষ্ণুমন্দির, (৪) দোলমঞ্চ, (৫) দুর্গামন্দির।

তুলাপুরুষ কীর্ত্তি হইল বিস্তর।
সেই কীর্ত্তি গেল রাজার দেশদেশান্তর।।
সেই কালে আসে দ্বিজ নানা দেশ হতে।
নৃপতি করয়ে দান উদয়পুরেতে।।
পঞ্চদশ সহস্র আসিছে দ্বিজগণ।।
যাচক কাঙ্গালী যত না ছিল গণন।।
তুলার যতেক ধন ব্রাহ্মণেতে দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিজ নিজ স্থানে গেল।।
মহাদান পরে করে যথাবিধি মতে।
সবৎসা পপিলাধেনু[১] উৎসর্গিলা তাতে।।
বানারস মথুরা আর সেতুবন্ধ দেশ।
উড়িষ্যা আদি যত দ্বিজ আসিলেক শেষ।।
কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া সুবর্ণাদি দান।
দ্বিজ সব সন্তর্পিল[২] যেমত বিধান।।
সিংহদ্বার সমীপেতে মনোরম স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ।।
চন্দ্রগোপীনাথ মূর্ত্তি[৩] চাটিগ্রামে ছিল।
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়া ছিল।।
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া তখন।
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অর্চ্চন।।
সেই মঠ বাম পাশে আর মঠ দিয়া।
উৎসর্গ করিল রাজা ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।।
ধর্ম্ম মঠ নাম নৃপ রাখিল তাহার।
পনরশ বাহাত্তর শকে মঠের প্রচার।।
শ্লোক এক মঠ দ্বারে লিখিল তখন।
তাহার নিকটে গৃহ জগতমোহন।।

---

(১) কপিলা—কপিলা শব্দের পর্য্যায়ে প্রধানতঃ কামধেনুকে বুঝায়। দুগ্ধবতী গাভীও কপিলা শব্দবাচ্য। যথা— "কপিলা গো বিশেষঃ" (ইতি হেমচন্দ্র) "সা তু স্বর্ণ বর্ণা" (ইতি পুরাণম্)

(২) সন্তর্পিল—তৃপ্ত করিল।

(৩) চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ মহারাজ উদয়মাণিক্য কর্ত্তৃক চন্দ্রপুর গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিলেন। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৬৮ পৃষ্ঠায় এই বিগ্রহের বিষয় উল্লেখ আছে।

কতেক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ নিজ রাজ্যে ছিল।
তাহা সবে দিয়া ধন তীর্থ করাইল।।
নিজ পুর সমুখেতে ছিল এক স্থান।
বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে নির্ম্মাণ।।
দোল মঞ্চ নির্ম্মাইল তার পূর্ব্ব দিগে।
দুর্গা গৃহ নির্ম্মাইল সন্নিকট ভাগে।।
কল্যাণমাণিক্য রাজা পূণ্য ব্যয় হেতু।
ধর্ম্মেতে বান্ধিল রাজা ভবসিন্ধু সেতু।।
প্রাণী মাত্র বিষ্ণু জ্ঞান করেন নৃপতি।
বিষ্ণুপরায়ণ রাজা ধর্ম্মে ছিল মতি।।
বৃদ্ধ হৈল নরপতি জ্বর ছিল তাতে।
বায়ুতে কম্পিত দেহ হৈল অকস্মাতে।।
এইমতে তিন দিন মোহিত রাজন।
ঔষধ প্রয়োগে রোগ না হয় বারণ।।
পনরশ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস শেষে।
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাশে।।
মঙ্গল বাসর তিথি কৃষ্ণানবমীতে।
তিন দণ্ড রাত্রি গতে রাজ স্বর্গ তাতে।।
পাত্র মিত্র সেনাপতি রাজ সৈন্যগণ।
রাজপুরী আসিলেক ত্বরিত গমন।।
নির্জ্জন হইছে সব রাজপুরী লোক।
ক্রন্দন করয়ে তারা পাইয়া মহাশোক।।
কুমার কুমারী রাণী শোকেতে বিহবল।
রাজঅন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দনের রোল।।
স্নান করাইয়া রাজা চতুর্দ্দোল মাঝে।
দিব্য অলঙ্কার বস্ত্র ভূষিত যে সাজে।।
সুগন্ধি চন্দন কৈল শরীরে লেপন।
পুষ্পমালা পৈরাইয়া রাম নাম লিখন।।
সেই রাত্র জাগরণ সকল রহিল।
রজনী প্রভাত দিবা বুধবার হৈল।।

প্রভাত সময়ে পাত্র মন্ত্রী সেনাগণ।
গোবিন্দদেব যুবরাজ বসে সিংহাসন।।
বাজিল সেলাম বাড়ি নৃপতির রীতি।
সেই কালে গোবিন্দমাণিক্য নৃপখ্যাতি।।
পাত্র মিত্র সেনাগণ প্রণমিল তাতে।
নগরে নাগরী মঙ্গল করিল বিহিতে।।
গোবিন্দদেব নৃপতির আদেশ পাইয়া।
বৈকুণ্ঠপুরেতে[১] চলে মৃত রাজা লৈয়া।।
চিতাপরে মৃত রাজা রাখে সেইক্ষণ।
কাষ্ঠসমে ঘৃত দেয় আগর চন্দন।।
নৃপতির পুত্র জগন্নাথ নারায়ণ।
মুখাগ্নি করিল রাজার সেই মহাজন।।
বিধিমতে করে শ্রাদ্ধ গোবিন্দ নৃপতি।
নানা রাজ্য হতে দ্বিজ আসিলেক অতি।।
বেষ্টিত হইয়া বসে যত দ্বিজগণ।
শ্রাদ্ধেতে বসিল রাজা ব্রাহ্মণ অর্চ্চন।।
তিল সুবর্ণ দান ষোড়শ হয় পরে।
কাঞ্চন পুরুষ[২] দান বিচিত্র শয্যা[৩] করে।।
তার পরে মহাদান ছিল আরম্ভন।
সবৎসা কপিলা আদি গো দান করেন।।

---

(১) বৈকুণ্ঠপুর — শ্মশানক্ষেত্র।

(২।৩) কাঞ্চন পুরুষ — সুবর্ণ নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি। বিলক্ষণা— শয্যা বিশেষ, ইহাকে বিচিত্র শয্যাও বলে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এই সকল দান বিশিষ্ট দান মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এই ঃ—

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীহহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্।
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফল পুষ্প সমন্বিতম্।।
সং পূজ্য দ্বিজ দাম্পত্যং নানাভরণ ভূষণৈঃ।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো দেয়া চ কপিলা শুভা।।"

মৎস্য পুরাণ।

"দ্বিজ দম্পতিং পূজয়িত্বা কাঞ্চনং প্রেতপ্রতিকৃতি রূপং পুরুষং ফলবস্ত্রযুক্তং শয্যায়ামারোপ্য ভূষিত দ্বিজ দম্পতিভ্যাং শয্যাং দদ্যাৎ।"

শুদ্ধিতত্ত্বম্।

তার পরে দশ অশ্ব সুসজ্জ সহিত।
সপ্ত হস্তী সাজাইল বিচিত্র ভূষিত।।
নৃপতি করেন দান পিতৃ স্বর্গ তরে।
প্রতি হস্তী শত মুদ্রা দক্ষিণা সমভ্যারে।।
জগন্নাথ আদি করি রাজার তনয়।
বৃষোৎসর্গ আদি দান করে সে সময়।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করে সেইক্ষণ।
দক্ষিণা সহিতে দান দিলেক রাজন।।
শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করে গোবিন্দ নৃপতি।
জ্ঞাতি গোত্র ভোজন করায় তাতে অতি।।
আশী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছিল।
সাত্রিশ বৎসর নৃপ রাজত্ব করিল।।
সেই শকে অভিষেক গোবিন্দ নৃপতি।
শ্রাদ্ধ পরে করিলেন মহরে রাজখ্যাতি।।
ত্রিপুরের বংশে যত পূর্ব্ব রাজাগণ।
কল্যাণমাণিক্যাবধি হৈল সমাপন।।
রামমাণিক্য রাজা শুনিল তখন।
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে করি সমাপন।।

ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণিক্য
জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তবাগীশ প্রত্যুত্তরং সমাপ্তং।

শ্রীরাজমালা

—❖—

তৃতীয় লহরের মধ্যমণি

(টীকা)

তৃতীয় লহরের মধ্যমণি

(টীকা)

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

— * —

গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত সমস্ত বিষয়ের বিবৃতি পাদটীকায় প্রদানের সুবিধা না হওয়ায়, অনুল্লেখিত বিষয়গুলির স্থূলমর্ম্ম এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। গ্রন্থের সংসৃষ্ট অংশের সহিত ইহা মিলাইলে, বিষয়গুলি সহজবোধ্য হইবে বলি আশা করা যায়।

রাজমালা তৃতীয় লহর ও তাহার রচয়িতার বিবরণ

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় সভাসদ্ বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কর্ত্তৃক রাজমালার প্রথম লহর রচিত হইয়াছিল ; গ্রন্থের এই অংশ পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। দ্বিতীয় লহর মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালের (সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে) রচিত। বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের বাক্য অনুসরণে এই অংশের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে, তাঁহার অনুজ্ঞায় রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইবার প্রবাদ ত্রিপুরায় সর্ব্বজনবিদিত ; কিন্তু উক্ত লহরে বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায়, গোবিন্দমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা— তদাত্মজ মহারাজ রামমাণিক্য এই লহর রচনা করাইয়াছিলেন। রাজমালার উক্তি এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

"শ্রীলশ্রীগোবিন্দমাণিক্য পূণ্যবান অতি।
তাহার তনয় রামমাণিক্য নৃপতি।।
সিদ্ধান্তবাগীশ দ্বারপণ্ডিত পুরাতন।
তাহানে সম্বোধি রাজা বলিল তখন।।
জয়মাণিক্যাবধি পূর্ব্ব রাজা যত।
বংশশ্রেণী রাজমালা আছয়ে লিখিত।।
তারপরে যত রাজা হৈছে ত্রিপুরাতে।
তা সবার কিবা কীর্ত্তি কহত আমাতে।।

সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান।।”

ইহা তৃতীয় লহরের প্রারম্ভিক বাক্য। এই লহরের উপসংহারে পাওয়া যায়,—

“ত্রিপুরের বংশে যত পূর্ণ রাজাগণ।
কল্যাণমাণিক্যাবধি হৈল সমাপন।।
রামমাণিক্য রাজা শুনিল তখন।
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে করি সমাপন।।

সর্ব্বশেষে লিখিত হইয়াছে,—“ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তবাগীশ প্রত্যুত্তরং সমাপ্তং।”

এই সকল বাক্যদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, মহারাজ রামমাণিক্যের আদেশানুসারে সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিধারী প্রাচীন দ্বারপণ্ডিত কর্ত্তৃক রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে উক্ত মহারাজ রামমাণিক্যের পিতা গোবিন্দমাণিক্যের নির্দ্দেশে এই লহর রচিত হইবার প্রবাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন আর একটী বিষয়ও এই প্রবদের অনুকূলে গৃহীত হইবার যোগ্য। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী লহরদ্বয় আলোচনা করিলে জানা যাইবে, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় রচিত প্রথম লহরে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা পর্য্যন্তের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; এবং মহারাজ অমরমাণিক্যের আদেশানুসারে রচিত দ্বিতীয় লহরে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা পর্য্যন্তের বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে-রাজার আদেশমতে যে-খণ্ড রচিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে তাঁহার বিবরণ প্রদান করা হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী লহরদ্বয়ের পদ্ধতি অবলম্বনেই তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই লহরে অমরমাণিক্য হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত চারিজন রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লহরের রচনা কার্য্যে যে মহারাজ গোবিন্দের কর্ত্তৃত্ব ছিল, উক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। তদীয় পুত্র রামমাণিক্যের সময়ে রচিত হইয়া থাকিলে এই লহরে গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ পরিত্যক্ত হইত না। রাজমালার চতুর্থ লহর, এই রাজার বিবরণ লইয়া আরম্ভ হইয়াছে।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা আরও স্পষ্ট; তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“দুর্জ্জয় খণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হৈতে রাজা তাতে লিখে।। *

* ইহা রাজমালার দ্বিতীয় লহর।

সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেব পাইল।
তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁথিল।।
গোবিন্দমাণিক্য রাজা বড় পূণ্যবান।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা সবের শুনিল বাখান।।”

উক্ত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে এই লহরের রচনা আরম্ভ হইয়া তদাত্মজ রামমাণিক্যের সময় শেষ হইয়াছে। এই কারণেই ইহাতে গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ পরিত্যক্ত এবং শ্রোতা স্থলে রামমাণিক্যের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত দুই মতের সামঞ্জস্য রক্ষার অন্য যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণে পাওয়া গিয়াছে সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিবিশিষ্ট দ্বারপণ্ডিত কর্ত্তৃক এই লহর রচিত হইয়াছে। রচয়িতার নাম কিম্বা পরিচয়সূচক কোন বিবরণ রাজমালায় নাই। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের দ্বারস্থ হইয়া এবং প্রাচীন পণ্ডিত সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইঁহার পরিচয়যোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। নানাবিধ উপায় অবলম্বন দ্বারা কবির পরিচয় লাভে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইতেছিলাম, এই সময় এক দিবস সন্ধ্যার পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগরতলায় মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন, তাঁহার নাম শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। আমি তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই কুমার বাহাদুরের সদনে উপস্থিত ছিলাম। আগন্তুক ব্যক্তিকে কুমার বাহাদুর পূর্ব্বেও চিনিতেন, কিন্তু বিশেষ পরিচয় জানিতেন না। আমার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও ইঁহার দেখা হয় নাই।

কিয়ৎকাল বাক্যালাপের পর, কথা প্রসঙ্গে আমি ‘রাজমালা’ সম্পাদনের কার্য্য করিতেছি জানিয়া, আগন্তুক আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,--- “রাজমালার তৃতীয় খণ্ড রচয়িতার বিবরণ আপনি পাইয়াছেন কি? এই খণ্ড আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ গঙ্গধর সিদ্ধান্তবাগীশের রচিত।” ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাক্য যেন দৈববাণী বলিয়া মনে হইতেছিল। কিয়ৎকাল স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। যাঁহার বিবরণ সংগ্রহের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার বংশধর আজ অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহে উপস্থিত! এই ঘটনায় হর্ষ এবং বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কুমারবাহাদুর বিস্মিতভাবে বলিলেন--- “এবম্বিধ অভাবনীয় লাভ, শ্রীভগবানের কৃপাসাপেক্ষ।” সঙ্গে সঙ্গে একখানা খাতা এবং পেন্সিল ছিল, কবির মোটামুটি পরিচয় তখনই লিখিয়া লইলাম। বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, অল্পকাল পরেই তিনি তাহা প্রদান দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন। তদবলম্বনে কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশসম্ভূত বিভূতি উপাধ্যায় রাঢ় দেশ নিবাসী ছিলেন। তাঁহার ক্রম অধস্তন পুরুষত্রয় --- সদানন্দ পাঠক, পরমানন্দ আচার্য্য ও শ্রমন্ত আচার্য্য রাঢ় দেশেই ছিলেন। শ্রীমন্তের রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, রাঢ় দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পদ্মার তীরবর্ত্তী চন্দ্রপ্রতাপে যাইয়া বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন ; কিন্তু এই স্থানে তাঁহাদের বসতি এক পুরুষের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রামচন্দ্রের পুত্র রঘুনাথ বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য চন্দ্রপ্রতাপের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয়ে, মেহেরকুল পরগণায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রঘুনাথ বুড়িচঙ্গ গ্রামে এবং বিশ্বনাথ শ্রীচাইল গ্রামে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে এই ভ্রাতৃ যুগল ত্রিপুরেশ্বরের যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজমালা তৃতীয় লহরের রচয়িতা গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ, পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথ বাচস্পতির পুত্র। কল্যাণমাণিক্যের পূর্ব্বে ত্রিপুর দরবারে গঙ্গাধরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইনি কল্যাণমাণিক্যের দ্বারপণ্ডিত এবং রাজপুরোহিত ছিলেন, রাজমালা আলোচনায় ইহাই জানা যাইতেছে। কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক যুবরাজ নিয়োগকালে * এবং তুলাপুরুষ দান ইত্যাদি পারত্রিক মঙ্গলজনক কার্য্যানুষ্ঠানকালে † সিদ্ধান্তবাগীশের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কল্যাণমাণিক্যের পরবর্ত্তী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকালে ১০৮১ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৩ শক) এক তাম্রশাসন দ্বারা, সিদ্ধান্তবাগীশের পিতা রঘুনাথ বাচস্পতিকে সাত দ্রোণ ভূমি ব্রহ্মোত্তর প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের অধস্তন বংশ্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে এই তাম্রফলকের দক্ষিণার্দ্ধ পাওয়া গিয়াছে। বামার্দ্ধ বিনষ্ট হওয়ায় তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। লব্ধাংশ দ্বারা মোটামুটি বিবরণ বুঝা যাইবে। সনন্দদাতার নামের অংশ বিনষ্ট হইয়া থাকিলেও

---

* পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া আদেশে রাজন।
যুবরাজ করিতে গোবিন্দনারায়ণ।।
লগ্নাচার্য্য সহিতে যে সিদ্ধানন্তবাগীশ।
শুভদিন করিলেন চাহিয়া জ্যোতিষ।।"

রাজমালা--- কল্যাণমাণিক্য খণ্ড

† সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টচার্য শিরোমণি।
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি।।"

রাজমালা--- কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।।

সিদ্ধান্তবাগীশের পিতা

রঘুনাথ পাচশর্তির তাম্রশাসন

সনন্দের শকাঙ্ক এবং “শ্রীরাম সত্য” মোহর দ্বারা, ইহা যে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সম্পাদিত, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সনন্দের পাঠ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

বিষ্ণু—

শ্রীরাম সত্য জয় | শ্রীরাম সত্য

....বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামা দেশোহ
....ত। রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে
.... জ বিজয়পুর ও মৌজে জগতপুর হাসিলাত পূর্ব্ব পাঁচ দ্রো
.... সাত দ্রোণ ভূমি ঁপ্রিতে ব্রহ্মোত্তর শ্রীরঘুনাথ বাচস্পতি
.... ম তুলিয়া পরম সুখে ভোগ করৌকেন এহার পাঁচাপ
.... য়াব্দা ঃ ১৫৯৪* সন ১০৮১ তেং ৭ ফাল্গুন।
.... ১ কার্ত্তিক। †

এই সকল বিবরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, রঘুনাথ পাচস্পতি কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরায় আগমনের সম্ভাবনাই অধিক। তৎপূর্বে সমাগত হইয়া থাকিলেও কল্যাণমাণিক্যের সময়ই রাজদরবারে তাঁহার পুত্র গঙ্গাধর প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য তুলাপুরুষ দানোপলক্ষে তিনটি হস্তী ও পাঁচটী অশ্ব দান করেন। এই সময় সিদ্ধান্তবাগীশও একটী হস্তী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতৎ-সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“তুলা হতে নামিয়া উৎসর্গে সেইক্ষণ।
তিন হস্তী পঞ্চ ঘোড়া দান বিতরণ।।
সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি।
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেন তখনি।।
হস্তী এক দিল তাকে সসজ্জ করিয়া।
মেহেরকুলে গ্রাম এক দিল উৎসর্গিয়া।।” ‡

হস্তী প্রতিগ্রহ দ্বারা সিদ্ধান্তবাগীশ, সমাজে বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তিন-কাঞ্চন দানগ্রহীতার ন্যায় হস্তী প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে নিন্দিত এবং

---

* ১০৮১ ত্রিপুরাব্দে ১৫৯৩ শক হইবে, এস্থলে ১৫৯৪ অঙ্কিত হইয়াছে।

† দুইটী তারিখ অঙ্কনের কারণ, অন্যান্য সনন্দের বিবরণের সহিত আলোচনা করা হইবে।

‡ এই ভূমি দানের কোনও নিদর্শন সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই।

পতিত হইয়া থাকেন। এজন্য অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে তাহা গ্রহণ করে না। হস্তী প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে ;—

> "ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বৃত্ত্যর্থং সাধুতস্তথা।
> অব্যশ্বমাপি মাতঙ্গ তিল লৌহাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।।"
>
> ব্রহ্মপুরাণ।

অন্যত্র পাওয়া যায় ;—

> "হস্তি কৃষ্ণাজিনাদ্যাস্তু গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।
> সদ্বিপ্রস্তান্ন গৃহ্ণীয়ুর্গৃহ্ণন্তস্তু পতন্তিতে।।"
>
> বৃহৎ পরাশর।

এজন্যই সিদ্ধান্তবাগীশ হস্তী গ্রহণদ্বারা সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন ; তাঁহার বংশধরগণও এই নিন্দার হস্ত হইতে সম্যকরূপে নিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

সিদ্ধান্তবাগীশ, তাঁহার পিতার সময়ে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিলেও অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় প্রভাব তাহার উপর কতটা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, একমাত্র ভাষা আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন রাজমালা হইতে কবির ব্যবহৃত ভাষার কতিপয় নিদর্শন এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) হেনকালে ভূত বেটা আইল মোর আগে।
পদ চাপিয়া রৈল দেখিয়া না ভাগে।।
(২) অন্ন খাইতে জল খাইলে নির্ব্বলী জামাই।
তুমি ছাড় হৈতে আর কি হবে কামাই।।
(৩) রাজপুত্রের মুণ্ড দেখি সেকেন্দর সাহা।
আবিস্কার করিয়া বোলয়ে আহা আহা।।
(৪) মঘের ভঙ্গেতে তোরে ধরিবেক কোনে।।
(৫) আজ্ঞামাত্রে চন্দ্রদর্প না কৈল দিরঙ্গ।।
(৬) যত ধর্ম্ম করিলেক কহিবাম কত।। ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যের নিম্নলিখিত শব্দগুলি ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত ছিল, বত্তমান কালেও ইহার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে তাহার অর্থ লিপি করা হইল।

পত চাপিয়া = পথ আগুলিয়া। কামাই = উপার্জ্জন বা কার্য্য সাধন। আবিস্কার = আক্ষেপ। কোনে = কে, কোন্ ব্যক্তি। দিরঙ্গ = বিলম্ব। কহিবাম = বলিব।

তৃতীয় লহরের সমগ্র ভাগ এবম্বিধ শব্দে পরিপূর্ণ। প্রাদেশিক ভাষা সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, এই লহরের ভাষা আলোচনা করিলে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এক বিস্তৃত বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে একমাত্র রঘুনাথ বাচস্পতি বংশধারা এস্থলে সংযোজিত হইল। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য ধারার বিবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজমালার তৃতীয় লহর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তদাত্মজ রামদেবমাণিক্যের শাসনকালে রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই লহরের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে রামদেবমাণিক্যের রাজত্বকাল জানা আবশ্যক। চাকলা রোশনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ জে. জি. কমিং (J. G. Comming. I. C. S.) ত্রিপুরার ইতিহাসপ্রণেতা মিঃ ই. এফ. সেণ্ডিস্ (E. F. Sandys) ও রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রভৃতির নির্দ্ধারণানুসারে এবং 'ত্রিপুর বংশাবলী' পুঁথির মতে মহারাজ রামদেবমাণিক্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজমালা আলোচনায়ও তাহাই জানা যাইতেছে। উল্লিখিত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সামান্য মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সেই সকল বাক্য আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, রাজমালার আলোচ্য খণ্ড আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

রাজমালার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই লহরের ন্যায় এই লহরেও রাজগণের ইতিবৃত্ত ব্যতীত অন্য বিষয়ক বিবরণ বড় বেশী পাওয়া যায় না। ইহাতে শাসন-নীতি, সমাজ-নীতি, কৃষি ও বাণিজ্য-নীতি ইত্যাদি রাজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাপক বিবরণ অতি অল্পই আছে। রাজগণের যে-সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। আনুষঙ্গিকভাবে ইহাতে যে-সকল ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বাছিয়া লইলে তৎসাহায্যে প্রাচীন তথ্য অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই খণ্ড পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের আদরণীয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

অমরমাণিক্য ও অমরসাগর

মহারাজ অমরমাণিক্য ১৪৯৯ শকে রাজ্যলাভ করেন।* সিংহাসন প্রাপ্তির পর তাঁহার প্রথম কার্য্য অমরসাগর নামক সুবিশাল বাপী খনন করা। এবম্বিধ কার্য্য ত্রিপুরেশ্বরগমের পক্ষে নূতন বা বৈচিত্রময় নহে। মহারাজ অমরের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেক রাজাই বিস্তীর্ণ তড়াগাদির প্রতিষ্ঠাদ্বারা পুণ্য ও যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অমরসাগর খনন কার্য্যের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাকে জলাশয় প্রতিষ্ঠা না বলিয়া রাজসূয় যজ্ঞ বলা অসঙ্গত হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তদানীন্তন প্রধান প্রধান রাজা ও জমিদারবর্গকে এই কার্য্য সম্পাদনার্থ মৃত্তিকা খননকারী লোক প্রদান জন্য বাধ্য করা হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যত সংখ্যক মজুর প্রধান করিয়াছিলেন, রাজমালায় তাহার একটা মোটামুটী হিসাব পাওয়া যায়। সেকালে ত্রিপুরা অঞ্চলে মৃত্তিকা খননকারীদিগকে "দাড়ি" এবং

---

* চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব রাজা। — অমরমাণিক্য খণ্ড।

তাহাদের সরদারগণকে "মাঝি" বলা হইত। রাজমালায় লিখিত দাড়ির তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

" বিক্রমপুর জমিদার চাঁদ রায় নাম।
সাত শত দাড়ি দিচ্ছে কার্য্য অনুপাম।।
বাকলার বসু দিছে সপ্ত শত জন।
সলৈ গোয়াল পাড়া গাজি সপ্ত শত জন।।
ভাওয়ালিয়া জমিদার দিছে হাজার জন।
অষ্টগ্রামে দিছে দাড়ি পঞ্চ শত জন।।
বানিয়া চুঙ্গের দাড়ি আর পঞ্চ শত।
রণ ভাওয়াল দাড়ি সহস্র সম্মত।।
সরাইল ইসা খায় দিল সহস্র জন।
ভুলুয়া দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন।।
সপ্ত হাজার এক শত দাড়ির নিকাশ।
কবিচন্দ্র পুত্রে কহে সুবুদ্ধি বিশ্বাস।।"

রাজাবাবু'র বাড়ীতে রক্ষিত পুথির পাঠ অন্যরূপ। তাহাতে পাওয়া গিয়াছে ;—

"সহস্র পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া।
ইছা খাঁ মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইয়া।।
চান্দ রায় জমিদার বিক্রমে কেশরী।
সপ্তশত প্রমাণে দিয়াছে সে দাড়ি।।
বাকলার বসু দিছে সপ্তশত জন।
ভূষণারা দিয়াছে দাড়ি তত জন।।
ভাওয়ালি দিয়াছে ইছা খাঁর অনুমতি (১)।
অষ্টগ্রামে পঞ্চশত শুনহ নৃপতি।।
বাণিয়া চোঙ্গেতে দিছে দাড়ি পঞ্চশত।
রণ ভাওয়ালিয়া দিছে দুই পঞ্চশত।।
সরাইল ভুলুয়া দিছে হাজার হাজার।
সকলে দিয়াছে দাড়ি যত জমিদার।।

উক্ত উভয় পাঠে পরস্পর কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। আবার, প্রাচীন রাজমালার পাঠ উক্ত উভয় পাঠ হইতে কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত দেখা যায়। নিম্নে তাহা প্রদান করা হইল।

সহস্র পরিমাণ দাড়ি সুসয্য করিয়া।

১। অনুমতি ঃ অনুরূপ (?)

ইছা খাঁ মছলন্দালী দিছে পাঠাইয়া
চান্দ রায় শ্রীপুর বিক্রমপুর হনে।
সপ্তশত দাড়ি সে যে দিলেন্ত আপনে।।
বাকলার বসু দিছে সপ্তশত জন।
সলৈ গোয়াল পাড়িয়া গাজি দিল তত জন।।
ভাওয়ালিয়া দিছে ইছা খাঁয়ের অনুমতি।
অষ্টগ্রামে দিছিলেক পঞ্চশত পৰ্ত্তি (?)।।
বাণিয়া চোঙ্গে দিয়াছিলেক আর পঞ্চশত।
রণ ভাওয়ালে আর পঞ্চ-পঞ্চ শত।।
সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহস্র।
আর যত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র।।"

উদ্ধৃত তিনটী পাঠে কুলির সংখ্যা এবং কুলি প্রদানকারীর নাম সম্বন্ধে কোন কোন অংশে অনৈক্য লক্ষিত হইতেছে। তদ্বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

কুলিদাতা।		সম্পাদ্য পুথি অনুসারে কুলির সংখ্যা।	রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথি মতে কুলি-সংখ্যা।	প্রাচীন রাজমালা মতে কুলি-সংখ্যা
চাঁদ রায়	....	৭০০	৭০০	৭০০
বাকলার বসু	....	৭০০	৭০০	৭০০
গোয়াল পাড়ার গাজি		৭০০	০	৭০০
ভওয়াল	....	১,০০০	১,০০০	১,০০০
অষ্টগ্রাম	....	৫০০	৫০০	৫০০
বাণিয়াচঙ্গ	....	৫০০	৫০০	৫০০
রণ ভাওয়াল	....	১,০০০	১,০০০	১,০০০
সরাইল (ইছা খাঁ)	....	১,০০০	১,০০০	১,০০০
ভুলুয়া	....	১,০০০	১,০০০	১,০০০
ইছা খাঁ মসনদ আলী	....	০	১,০০০	১,০০০
ভূষণা	....	০	৭০০	০
	মোট	৭,১০০	৮,১০০	৮,১০০

আমাদের সম্পাদ্য পুথি অপেক্ষা অন্য দুই পুথিতে কুলির সংখ্যা ১০০০ এক হাজার অধিক দৃষ্ট হইতেছে। সম্পাদ্য পুথিতে এবং প্রাচীন রাজমালা পুথিতে গোয়ালপাড়ার গাদি ৭০০ কুলি দেওয়ার বিষয় লিখিত আছে। রাজাবাবুর বাড়ীর পুথিতে গোয়ালপাড়ার উল্লেখ নাই, ভূষণার জমিদার ৭০০ শত কুলি প্রদান করিবার কথা আছে ; ইহা অন্য পুথিতে পাওয়া যায় না। ভূষণা এক

কালে ত্রিপুরার অধীনে থাকিবার প্রমাণ আছে। মহারাজ বিজয়মাণিক্য, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের হত্যাকারী মাধবকে ভুষণার 'লস্কর' পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* তাহা হইলেও, প্রাচীন রাজমালার ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। তাহাতে যখন ভূষণা নামের উল্লেখ নাই, তখন রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির পাঠ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে। এই পুথিতে "গোয়াল পাড়া" স্থলে ভূষণা লিখিত হওয়া বিচিত্র নহে।

রাজাবাবুর বাড়ীর পুথিতে এবং প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়, ঈশা খাঁ মসনদ আলী ১০০০ এবং সরাইলের ঈশা খাঁ ১০০০ কুলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের সম্পাদ্য পুথিতে কেবল সরাইলের ঈশা খাঁ-এর নাম আছে। ইনিও ত্রিপুরেশ্বর হইতে মসনদ আলী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে উভয় ঈশা খাঁকে অভিন্ন মনে করিয়া রাজমালার নকলকারী একমাত্র ঈশা খাঁ-এর নামোল্লেখ করিয়াছেন, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে অর্থাৎ দুই ঈশা খাঁ কুলি প্রদান করিয়া থাকিলে কুলির সংখ্যা ৭,১০০ শত না হইয়া, ৮,১০০ শত হইবে বলা যাইতে পারে ; কিন্তু এই সংখ্যাও বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন রাজমালায় কুলিদাতাগণের নামোল্লেখে হিসাব প্রদানের পর লিখিত হইয়াছে — "আর যত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, রাজমালায় যাঁহাদের নামোল্লেখ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য জমিদার হইতেও কুলি পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সংখ্যা জানিবার উপায় নাই।

অমরসাগর ১৫০০ শকে খনন আরম্ভ হইয়া তিন বৎসরে শেষ হইয়াছিল। † ইহা খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ঘটনা। এই সময় যে-সকল ব্যক্তি কুলি প্রদান দ্বারা উক্ত কার্য্যের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা সঙ্গত বোধে নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ রায়

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামক ভ্রাতৃযোগল বিক্রমপুরের মুকুটমণিস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে চাঁদ রায় জ্যেষ্ঠ। ইঁহার জাতিতে কায়স্থ, ঘৃত কৌশিকী গোত্রীয় দে বংশে ইঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষ নিম রায় বিক্রমপুরে আসিয়া বসতি

---

* "ই কথা শুনিয়া রাজা সত্য নির্ব্বন্ধিল।
ভূষণা রাজ্যে যে তোমা লস্কর কৈল।।"
প্রাচীন রাজমালা।

† "পনরশ শকে অমরসাগর আরম্ভন।
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড।

স্থাপন করেন। কেহ বলেন কর্ণাট দেশ হইতে, কাহারও মতে মুরশিদাবাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী কর্ণসুবর্ণ হইতে নিম রায় বিক্রমপুরে আগমন করিয়াছিলেন। মতান্তরে, সেন রাজগণের শাসনকালে তাঁহাদের স্বদেশী নিম রায়কে বিক্রমপুরে আনিয়া আশ্রয় প্রদান করা হইয়াছিল। এই সকল প্রবাদের মধ্যে কোনটী সত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ভ্রাতৃযুগল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালীগঙ্গার তীরবর্ত্তী শ্রীপুরে ইঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধিগৌরবে তৎকালে শ্রীপুর সর্ব্ববিষয়ে শ্রীসম্পন্ন এক প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণও এই স্থানকে দ্রষ্টব্য মনে করিতেন। ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ এই স্থান দৃষ্টি করিয়া লিখিয়াছেন !—

"From Bacla I went to Sreepur which standeth upon the river Ganges. The King is called cadry. They are all here about rebels against their King Zelalddin Echebar."

এই সময় বঙ্গের কতিপয় ভূম্যধিকারী সমবেত ভাবে, দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোহরের স্বনামধন্য রাজা প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, ভাওয়ালের ফজলগাজি, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, মসনদ আলী, এবং চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা তৎকালীয় বারভুঞার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ইঁহারা স্বদেশের উদ্ধারসাধন জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না। কতিপয় স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের প্ররোচনায় তাঁহাদের সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। ইঁহার পরস্পর একে অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এই সূত্রে সর্ব্বনাশের মূল আত্মকলহের সৃষ্টি হইল ; ইহার বিষময় ফলে সকলকেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত কোটীশ্বর শিব বিগ্রহের পূজারীকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে ভুক্ত করিবার চেষ্টা হওয়ায়, তাঁহাদের অমাত্য বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় বংশজ শ্রীমন্ত খাঁ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। রাজাজ্ঞায় উক্ত দেবল ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে শ্রীমন্ত বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই সূত্রে রাজা এবং রাজশ্রীর প্রতি তাঁহার বিষম আক্রোশ জন্মিল। তদবধি তিনি প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদা খিজিরপুরাধিপতি ঈশা খাঁ মসনদ আলী, বন্ধুভাবে কেদার রায়ের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এই আতিথ্যই ইঁহাদের মধ্যে বিষম শত্রুতার উদ্ভব করিয়া

দিল। চাঁদ রায়ের বালবিধবা কন্যা সোণামণি তৎকালে পূর্ণ যুবতী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ রূপলাবণ্যের খ্যাতি দেশময় বিঘোষিত হইয়াছিল। ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের ভবনে অবস্থানকালে একদিন অকস্মাৎ সোণামণিকে দেখিতে পাইলেন। এই দর্শনই বঙ্গের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

ঈশা খাঁ স্বীয় রাজধানীতে যাইয়াই চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সোণামণিকে পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। হিন্দু বিধবার মাহাত্ম্য মুসলমাণের বোধগম্য নহে, কি ভাবে হিন্দু বিধবার পবিত্রতা রক্ষিত হয়, তাহাও মুসলমান বুদ্ধির অগোচর। বিশেষতঃ তৎকালে কোন কোন হিন্দু নরপতি আপন কন্যা বা ভগ্নীদিগকে মুসলমান সম্রাটের গৃহে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছিলেন! এই সকল কারণে ঈশা খাঁ হয়ত মনে করিয়াছিলেন, চাঁদ রায় প্রভৃতি তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিবেন ; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। চাঁদ রায় ঈশা খাঁ-এর প্রস্তাব অবগত হওয়ামাত্র দূতকে বিতাড়িত করিয়া, খিজিরপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রথমেই কলাগাছিয়া দুর্গ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া ত্রিবেণী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রায় ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সেই দুর্গ আক্রান্ত এবং খিজিরপুর লুণ্ঠিত হইল। ঈশা খাঁ প্রমাদ গণিয়া, পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীমন্ত খাঁ চাঁদ রায়ের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। তাহার চিরপোষিত দুরভিসন্ধি সাধনের ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া, গোপনে ঈশা খাঁ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহাদের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল, শ্রীমন্ত যে উপায়েই হউক সোণামণিকে ঈশা খাঁ-এর হস্তগত করিবে ; এই কার্য্যের নিমিত্ত ঈশা খাঁ শ্রীমন্তকে বিস্তর পারিতোষিক প্রদান জন্য প্রতিশ্রুতি হইলেন। অতঃপর শ্রীমন্ত খাঁ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অগোচরে শ্রীপুরে যাইয়া প্রকাশ করিল, রায়-ভ্রাতৃদ্বয় শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন, ঈশা খাঁ সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই শ্রীপুর আক্রমণ করিবেন। এই সংবাদে সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিল। রাজরাণী রাজ্য অপেক্ষা বিধবা দুহিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিকতর ব্যাকুল হইলেন। শ্রীমন্ত পরামর্শ দিল, সোণামণিকে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। চাঁদ রায়ের প্রধান অমাত্য বৈদ্য জাতীয় রঘুনন্দন চৌধুরী সেই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া, রাজধানী ও রাজপরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমন্ত এই প্রস্তাবে অকৃতকার্য্য হইয়া, রাণীর নিকট পুনর্ব্বারপ্রস্তাব করিল, সোণামণিকে আপাততঃ তাঁহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসা যাইতে পারে। রাণী এই প্রস্তাব অতীব সঙ্গত মনে করিলেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। অমাত্য রঘুনন্দন অনেক চেষ্টা করিয়াও রাণীর মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা

রাজকন্যাকে জলপথে প্রেরণ করা স্থিরীকৃত হইল, পাপাত্ম শ্রীমন্ত তাঁহার রক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্গে চলিল। এই দুর্বৃত্ত সুযোগ পাইয়া, সোণামণিকে চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে সুবর্ণগ্রামে নিয়া ঈশা খাঁ-এর হস্তে অর্পণ করিল।* এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া চাঁদ রায় ক্ষোভে, ঘৃণায় অধীর হইলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের ভার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া শ্রীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং স্বীয় ইষ্টদেবীর প্রত্যাদেশানুসারে, কেদার রায়কে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কেদার, জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে ক্ষুণ্ণমনে, স্বীয় বাহিনীসহ রাজধানী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। দুহিতার অবস্থা এবং রাজ্যের পরিণাম চিন্তায় চাঁদ রায় অল্পকালের মধ্যেই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, উত্তরোত্তর সেই রোগই তাঁহার লীলা অবসানের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

কেদার রায়

চাঁদ রায়ের পরলোক প্রাপ্তির পর কণিষ্ঠ কেদার রায় বিপুল বিক্রমে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া তাঁহাকে মোগল বাহিনী এবং আরাকানের মঘ শক্তির সঙ্গে বারম্বার আহবে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। সন্দ্বীপের আধিপত্য রক্ষার নিমিত্ত তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদার্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পত্রে পত্রে তাহা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

চাঁদ রায় মানবলীলা সম্বরণ করিবার অল্পকাল পরে ভারত-সম্রাট মহামতি আকবর পরলোক গমন করেন। অতঃপর কেদার রায়ের আধিপত্যকালে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম, 'জাহাঙ্গীর' (বিশ্ববিজয়ী) নাম গ্রহণপূর্ব্বক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন (১৬০৫ খ্রীঃ) বঙ্গের ভৌমিকগণ রাজকর্ম্মচারীবর্গের অসঙ্গত ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া মুসলমানের শাসন-শৃঙ্খল উন্মোচনের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর, সাম্রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই সের আফগানকে ঘৃণিত উপায়ে হত্যা করিয়া তৎপত্নী মেহেরুন্নেসাকে বেগমরূপে গহণ করায় বাদশাহের প্রতি জমিদারবর্গের অধিকতর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইঁহার সমবেত শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না। কতিপয় স্বদেশদ্রোহী কূটচক্রীর প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইয়া জমিদারগণ সমবেত শক্তি সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, পরস্পর আত্মকলহ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পরিতে লাগিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* সোণামণি ঈশা খাঁ-এর হস্তগত হইবার বিষয় Journal Asiatic Society of Bengal, Vol XLIII, Part 1. P. 202 এ পাওয়া যাইবে

এই সময় দিল্লীশ্বর, ভৌমিক সমাজকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিলেন (১৬০৫ খ্রীঃ)। মানসিংহ প্রথমতঃ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয় ; এই সময় ঢাকার নাম "জাহাঙ্গীরনগর" রাখা হইয়াছিল।

ভৌমিকগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নিমিত্ত মানসিংহ বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। চাঁদ রায়ের সর্ব্বনাশের মূল শ্রীমন্ত খাঁ এবং স্বদেশদ্রোহী ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইল। ইহাদের সাহায্যে অনেক গুহ্য বিবরণ এবং সৈন্য চালনার সন্ধান ইত্যাদি বিষয় অবগতান্তে মানসিংহ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভূঞা বা রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কেহ কেহ মানসিংহের প্রলোভনে বাধ্য হইয়া কিম্বা ভয়ে অভিভূত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ঈশা খাঁ অনেক পূর্ব্বেই ভূঞাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মোগলের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদরা রায়, রাজা মুকুন্দ রায় এবং চাঁদগাজী ব্যতীত অন্য সকলেই একে একে মানসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

মানসিংহ, ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন সত্য, কিন্তু পরিশেষে মানসিংহেরই জয় হইল। প্রতাপাদিত্য ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় মুসলমানের হস্তগত হইলেন। অতঃপর ভূষণা আক্রমণ ও মুকুন্দ রায়কে বিধ্বস্ত করিয়া, মোগলবাহিনী বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসহ হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ মোগল সেনাপতি কিলমিক্‌কে শ্রীপুর আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়। তিনি কেদার রায়ের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইবার পর, মানসিংহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বিক্রমপুরের সীমান্তে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া একগাছি শৃঙ্খল ও একখানা তরবারিসহ কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন — কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিলে তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইবে না। যদি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তরবারি গ্রহণ করেন, তবে মোগল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে তাঁহাকে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে একখানা পত্রও দেওয়া হয়, তাহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা মিশ্রিত নিম্মোক্ত বাক্যগুলি লিখিত ছিল ;—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলি চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পলায়ী।
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিত বঙ্গ ভূমিঃ
বিষম সময় সিংহো মানসিহঃ প্রয়াতি।।"

এই পত্র এবং শৃঙ্খল ও তরবারি পাইয়া কেদার রায়ের বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি মানসিংহের পত্রের উত্তরে লিখিলেন ;—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং বিভর্ত্তিবেগং পবনাতিরেকং।
করোতিবাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেবনান্যঃ।।" *

এই পত্র দূতের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, — "তোমার প্রভুকে বলিও আমি তাঁহার প্রেরিত তরবারিই গ্রহণ করিলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে একের অস্ত্রাঘাতে অপরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই তরবারির বিশ্রাম ঘটিবে না।"

ইহার পর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সাত দিবস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মানসিংহের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কেদার রায় গুরুতররূপে আহত অবস্থায় ধৃত ও বন্দী হইয়া মানসিংহের সম্মুখে নীত হইবার অল্পকাল পরেই তাঁহার পঞ্চত্বলাভ হইল। ভগবান তাঁহার পুণ্যময় আত্মাকে ভাবী দুর্গতির হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। এই যুদ্ধে কেদার রায় পঞ্চশত রণতরী এবং বহু সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবরনামা গ্রন্থে এই যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

"Raja Man Singh * * * turned his attention towards kaid Rai of Bengal who has collected nearly 500 Vessels of war and had laid seige to Kilmak, the Imperial Commander in Srinagar, Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after."

Akbornama—P. 116.

এই যুদ্ধে বিক্রমপুরের গৌরবরবি চির অস্তমিত হইল। চাঁদ ও কেদার রায়ের অতুল কীর্ত্তিমণ্ডিত শ্রীপুর সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। কাচকির দরজা, কেশার মার দীঘি এবং রাজবাড়ীর মঠ প্রভৃতি যে কয়েকটী সামান্য কীর্ত্তিচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠের নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা পদ্মা কিম্বা মেঘনা বাহিয়া জলপথে গমনাগমন করিয়াছেন, এই অভ্রভেদী মঠ অবশ্যই তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রায়ান্ বাহাদুরের কীর্ত্তিস্তম্ভ মঠ ও মন্দিরসমূহ পদ্মা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পর, এই মঠটী বিক্রমপুরের শেষ কীর্ত্তিচিহ্ন স্বরূপ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান ছিল। কীর্ত্তিগ্রাসিনী পদ্মার বক্রদৃষ্টি

---

* বৈদ্য জাতীয় বিশ্বনাথ সেন, চাঁদ ও কেদার রায়ের মুন্সী পদে নিযুক্ত ছিলেন, এই পত্র তাঁহার রচিত। এ বিষয়ের প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

"চাঁদ রায় কেদার রায় বিক্রমপুর শাসক।
বুরীবংশী বিশ্বনাথ তৎপত্র লেখক।।"

অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা—(গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত)

অনেকবার ইহার প্রতি পতিত হইয়াছে, পরিশেষে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২২শে ভাদ্র তারিখে তাহা গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরকে কীর্ত্তিবিহীন করিয়াছে! বিক্রমপুরের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন এতদিনে নিঃশেষ হইয়াছে।

এই মঠ কেদার রায়ের মাতৃ-শ্মশান ক্ষেত্রে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য, নির্ম্মাতা রাজমিস্ত্রী এবং মঠের চূড়া ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ; এ স্থলে তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই মঠ প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ ছিল ; গোড়ার বেড় প্রায় ১২০ ফুট এবং দেওয়ালের বেধ ১১ ফুট থাকা জানা যায়। মঠটী এক দ্বারী, একটী মাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক দ্বারা গঠিত ছিল। পূর্ব্বে ইহার অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেজর জেমস্ রেনল, ডাক্তার টেইলার, এবং ডাক্তার ওয়াইজ প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মঠের বিষয় আপন আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পূর্ত্ত বিভাগের রিপোর্টেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এখানে একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। বিশ্বকোষ গ্রন্থে চাঁদ রায়ের বিবরণে লিখিত হইয়াছে ;—

"ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহার কন্যা সোণাই বা স্বর্ণময়ীকে লইয়া গিয়া বিবাহ করেন?"

"উক্ত প্রবাদ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে কেদার রায় শব্দে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠ চাঁদ রায় এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় চাঁদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তৎপক্ষেই সন্দেহ। এরূপ স্থলে ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক চাঁদ রায়ের কন্যা গ্রহণ একান্ত অসম্ভব।

বিশ্বকোষ — ৬ষ্ঠ ভাগ, ২০৯ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র কেদার রায় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;—

"কেদার রায়—সন্দ্বীপের নিকট শ্রীপুরের রাজা। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন। এই সময় মোগলগণ যখন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন, তখন সন্দ্বীপ কেদার রায়ের অধিকৃত ছিল। * * * আরাকাণের রাজা পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইবার জন্য একজন নৌ-সেনা পাঠাইয়া দেন। কেদার রায়ও শ্রীপুর হইতে এক শত কোষা নৌকা পাঠাইয়াছিলেন।"

বিশ্বকোষ—৪র্থ ভাগ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা।

কেদার রায় ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব করিবার কথা কি সূত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে, বিশ্বকোষে তাহার উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকোষের বর্ণিত সন্দ্বীপের যুদ্ধ এবং কেদার রায়ের এক শত কোষা নৌকা সাহায্য প্রদান, ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা নহে ;--- ইহা ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। * আরও দেখা

* সন্দ্বীপের ইতিহাস — ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩৬-৩৭ পৃঃ
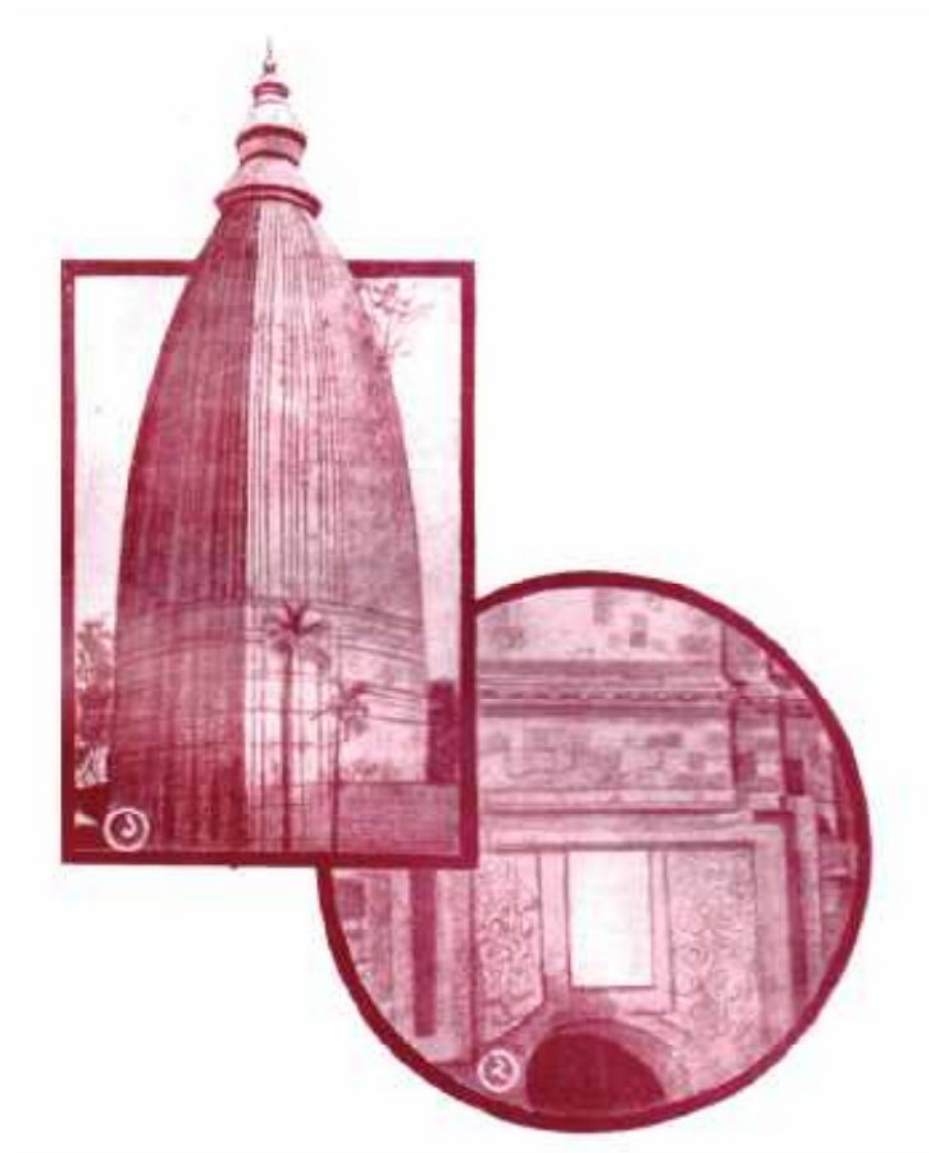
(১) রাজবাড়ীর মঠ - বিক্রমপুর।
(২) উক্ত মঠের সম্মুখভাগস্থ কারুকার্য্য।

যায়, ঈশা খাঁ-এর সহিত রায় পরিবারের মনোমালিন্য ঘটিবার পূর্ব্বে তাঁহারা স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন। কেদার রায় ও ঈশা খাঁ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে দলবদ্ধ হইয়া মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।* ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগল সেনাপতি বাজবাহাদুর, প্রতিপক্ষের পরাক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া আরও সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর মানসিংহ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অতঃপর কেদার রায় ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ধৃত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে রাজত্ব করা সম্ভব হইতে পারে না।

এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশা খাঁ মস্নদ আলী ও রায় রাজাগণ সমসাময়িক ছিলেন। এবং ইঁহাদের মধ্যে চাঁদ রায়ের কন্যাঘটিত বিবাদ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে।

এই চাঁদ রায় ও কেদার রায় অমরসাগর খনন কালে ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে সাত শত কুলী দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের সহিত এই পরিবারের সৌহৃদ্য ছিল। ত্রিপুরেশ্বরের কুকি ও ত্রিপুর সৈন্য দ্বারা ইঁহারা সর্ব্বদা সাহায্য লাভ করিবার বিস্তর প্রমাণ আছে। এরূপ স্থলে রায় পরিবার সৌহার্দ্দ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কুলি প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়।

বাকলা

অমরসাগর খনন কালে বাকলার 'বসু' বংশীয় রাজা হইতে সাহায্য লাভের কথা রাজমালায় পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে বাকলা রাজ্যের এবং রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

'বাকলা' বাখরগঞ্জের প্রাচীন নাম। এই নাম কত কালের তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। বাকলা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ; ইহার বিস্তৃতিও নিতান্ত সামান্য ছিল না। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ বিবৃতি' গ্রন্থে বাকলার বর্ণনা স্থলে পাওয়া যায় —

"মেঘ্নানদী পূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিল পুরী যক্ষসীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং।।
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকান্তোদ্রি বর্জ্জিতঃ।
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখর।।
জম্বুদ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারো হি তথোত্তরে।
বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ।।"

* আকবরনামা—(ইলিয়ট সাহেবের অনূদিত) ১১৬ পৃঃ

মর্ম্ম ঃ— পূর্ব্বদিকে মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী, উত্তর সীমায় ইদিলপুর এবং দক্ষিণে সুন্দর বন। এতন্মধ্যে গিরিবর্জ্জিত সোমকান্ত, ইহার পরিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে দুইটী জনপদ অবস্থিত—পশ্চিমাংশে জম্বুদ্বীপ এবং উত্তর ভাগে স্ত্রীকার ; মধ্য ভাগে 'বাকলা' রাজধানী।

বাকলার নামান্তর চন্দ্রদ্বীপ। চন্দ্রদ্বীপ নামকরণ সম্বন্ধে কতিপয় কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার কোনটী গ্রহণীয় নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। বাহুল্য ভয়ে সেই সকল কিম্বদন্তীর আলোচনায় বিরত থাকিতে হইল। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ১৩শ অধ্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে এবং তাহাতে এই দ্বীপের বিস্তৃতির যে আবাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনায় বুঝা যায়, এক কালে বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি' গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের সীমা নিম্নোক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—

"পূর্ব্বে মধুমতী সীমা পশ্চিমে চ ইছামতী।
বাদা ভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহিচোত্তরে।
সমন্তাৎ মাসমার্গস্য শাসকোহহম্ মহীপতিঃ।।"

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। সেন বংশের রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন কথাই জানা যাইতেছে না। N. Beveridge প্রভৃতি বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রণেতাগণও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীনকালে সেন রাজগণের অধীনস্থ সামন্ত রাজা দ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইতেছিল। এ কথারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের মতে সেন বংশীয় বল্লাল সেনের পৌত্র দনৌজামাধব* চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা। 'চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ' প্রণেতা স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র এবং বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই দনৌজামাধব মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের দ্বারা দনুজ, দনৌজা, ধিনুজরায়, নোজা, নৌজা প্রভৃতি অনেক নাম পাইয়াছেন। এই ত গেল নাম বিভ্রাট। কাহারও মতে ইনি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র, কেহ বলেন, লক্ষ্মণ সেনাত্মজ সদাসেন হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছেন।† আবার কাহারও মতে ইনি লক্ষ্মণ সেনের পুত্র।‡ অদ্যাপি এ বিষয়েরও শেষ মীমাংসা হয় নাই।

---

* "This is probably the same person as Dhinaj Madhub who is believed to have a grandson of Ballal Sen."

J. A. S. B. — 1874. p. 83

† Journal of the Asiatic Society of Bengal

Vol. LXV part 1. page 32.

‡ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—৩২১ পৃষ্ঠ।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মতে, দনুজমাধর সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়েরও ইহাই মত। কিন্তু এই বিষয়ে ঘোর মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুরের ইতিহাস প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় এতৎসম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে।

"যেমন আদিশূরের নামান্তর বীরসেন ধরিয়া লইয়া একটা প্রমাণের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমন আরও "দনুজ মাওধাকে" দনুজমর্দ্দন ঠিক করিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজ সিংহাসনে উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় নাই। কারণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কায়স্থ দে বংশ। বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া, এইজন্য এতকাল লেখাপড়া চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাঁহারা বিক্রমপুরের জীর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বাকলার নূতন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখক মহাশয়েরা যদি ঘৃত কৌশিক গোত্রীয় দে উপাধিধারী চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে সেন বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তবে বরং অধিক সঙ্গত বোদ হইত।"

ফরিদপুরের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, সেন বংশীয় দনুজমাধব সুবর্ণগ্রামের রাজপাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক জই বরণি স্বরচিত "তারিখ - ই - ফিরোজশাহী" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, দনুজমাধব সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিবার কালে (১২৮০ খ্রীঃ) সম্রাট বুলবন, তুগ্রল খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎকালে সম্রাটের জলপথে অভিযান বিষয়ে ইনি বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। 'রিয়াজ্-উস্-সলাতিন্' গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। যাঁহারা এই দনুজমাধবকে চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা বলিতেছেন, তাঁহাদের মতে, সম্রাট বুলবনের আক্রমণের পরবর্ত্তী বিশ বৎসরের মধ্যে দনুজমাধর সুবর্ণগ্রামের রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে বুলবনের আগমনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত মতের বিরুদ্ধবাদী ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে আলোচনার যোগ্য।

"যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই দনুজ রায়ই ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে (তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথের মতেও ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে সেন বংশের রাজ্য শেষ হয়) বুলবনের আক্রমণের বিংশতি বৎসর পরে চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তবুও সন বা পুরুষ হিসাবে গণনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বুলবনের আক্রমণের সময় দনুজ রায় অন্ততঃপক্ষে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; তাহা হইলে ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। চন্দ্রদ্বীপের দনুজমাধবের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ পরমানন্দের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে ; উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজত্বের ২৯শ

বৎসরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাকলায় (চন্দ্রদ্বীপে) যে জলপ্লাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় অল্পবয়স্ক যুবরাজ। তাহা হইলে ১৫৮৫ - ১২৫৫ = ৩৩০ বৎসরে ৬ষ্ঠ পুরুষের অথবা প্রতি পুরুষে ৫৫ বৎসরের কল্পনা করিতে হয়। ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ১১শ অঃ, ৪৩০-৪৩১ পৃঃ।

দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে অন্যবিধ মতেরও অসদ্ভাব নাই। তাহা একটী নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে;—

"বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আপতিত হইয়াছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটুম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়েকটী জমিদারী সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর সৃষ্টিকর্ত্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দনুজমর্দ্দন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারীর প্রবর্ত্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত।"

ভারতী—ফাল্গুন, ১২৯৯।

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রণেতা মহাশয়ও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন,—

"আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিক্রমপুর আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের রায় রাজগণ, চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতোয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই 'দে' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় এই তিন রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন।"

ফরিদপুরের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

এই সকল বাক্য আনুমাণিক হইলেও অযৌক্তিক নহে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বঙ্গজ কায়স্থ ইহা অবিতর্কিত সত্য। বল্লাল সেনকে বর্ত্তমান কালে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলা হইলেও পূর্ব্ব কালে তিনি বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।* এরূপ স্থলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দ্দনকে বল্লালের বংশধর না বলিয়া, চাঁদ রায় প্রভৃতির সহিত এক বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

---

* "ততো বহুতিযেকালে গৌড়ে বৈদ্য কুলোদ্বহঃ।
বল্লাল সেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ।।"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী।

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদি বংশজে।।"

সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা।

"অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুল নন্দনঃ।
কুরুতেহতি প্রজস্তেন কুলশাস্ত্র নিরূপণং।।"

কায়স্থ কুলদীপিকা।

রাজমালা আলোচনায় বাকলা রাজ্যে 'বসু' বংশীয় রাজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।* রাজগণের নামে তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, 'দে' বংশের প্রতিষ্ঠিত বাকলা রাজ্য দৌহিত্র সূত্রে বসু বংশের হস্তগত হয়। আবার, কালক্রমে বসু বংশের দৌহিত্র, মিত্র বংশীয় উদয়নারায়ণ উক্ত রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। বংশ তালিকা আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক বিবরণ পাওয়া যাইবে। বাকলার পূর্ব্বোক্ত সকল বংশীয় রাজাই ''রায়'' উপাধি গ্রহণ করিতেন। ধারাবাহিক ভাবে কতিপয় রাজার নাম নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।
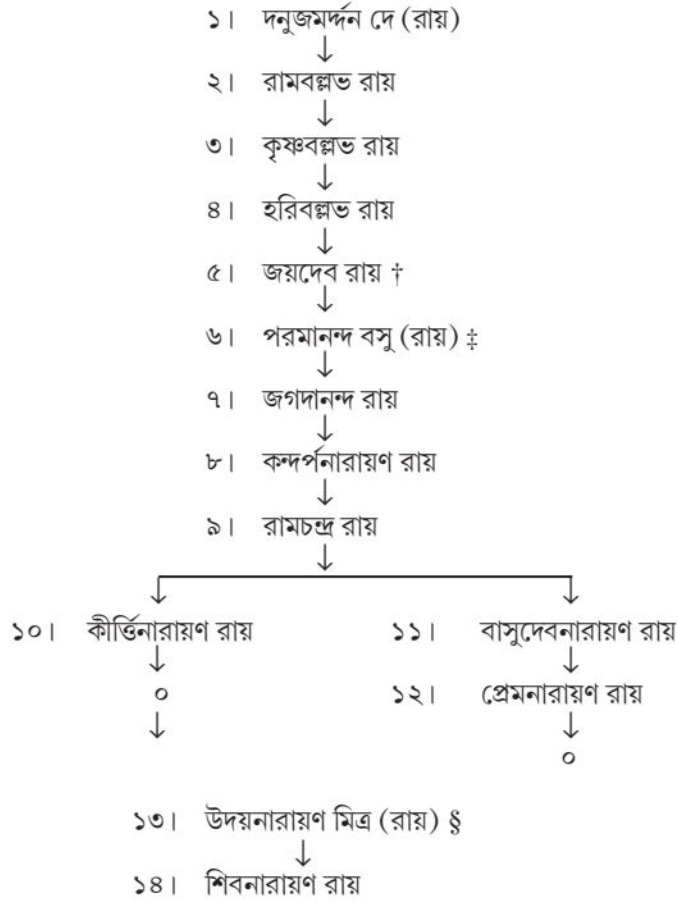
* বাকলার বসু দিছে সপ্ত শত জন।

রাজমালা—অমরমাণিক্য খণ্ড।

† ইঁহার পর দে বংশের লোপ হওয়ায় রাজত্ব বসু বংশের হস্তগত হয়।

‡ ইনি রাজা হরিবল্লভের দৌহিত্র। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতে ইঁহার পিতা বলভদ্র বসু বাকলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু "চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বংশাবলী" ও ঘটককারিকা প্রভৃতির মতে পরমানন্দই বসু বংশের প্রথম রাজা।

§ ইনি রাজা বাসুদেবের দৌহিত্র এবং প্রেমনারায়ণের ভাগিনেয়।

১৪।
↓
১৫। জয়নারায়ণ রায়
↓
১৬। নৃসিংহনারায়ণ রায়
↓
১৭। বীরসিংহনারায়ণ রায় (দত্তক)
↓
১৮। দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (দত্তক)

পরবর্ত্তীকালে বাকলা রাজ্য মুসলমানের কবলগত হইয়া থাকিলেও জমিদারীসূত্রে তাহার অধিকাংশ রাজবংসের হস্তেই ছিল। সদর রাজস্ব আদায়ের ত্রুটী, কর্ম্মচারীবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা কারণে তাহা উত্তরোত্তর বিনষ্ট হইয়াছে।

বাকলার বসু বংশীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় এবং ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য সমসাময়িক ছিলেন, রাজমালা আলাচনায় ইহা জানা যাইতেছে।* এ বিষয়ের অন্য প্রমাণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই সুদক্ষ ঐতিহাসিক এবং সুযোগ্য রাজমন্ত্রী আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, –– পাতশাহ আকবরের রাজত্বের ঊনত্রিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় প্রবল ঝাঞ্ঝাবাতের সহিত সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভয়ঙ্কর প্লাবনে বাকলা রাজ্য জলমগ্ন হইয়াছিল। বাকলারাজ তৎকালে প্রমাদ গণিয়া একখানা নৌকায় আরোহণ করিলেন, কিন্তু আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না, অত্যল্পকালের মধ্যেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমার কতিপয় অনুচরসহ একটী উচ্চ দেবমন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সদাগরগণ সন্নিহিত উচ্চস্থানগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমান্বয়ে পাঁচঘন্টাকাল অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্টি এবং অশনিপাতের ফলে লোকালয়সমূহ বিধ্বস্ত হইয়া স্রোতোবেগে ভাসিয়া গেল। কেবল পূর্ব্বোক্ত দেবমন্দির ব্যতীত আর কোন চিহ্নই রহিল না। এই দুর্ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।†

সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বের ২৯শ বৎসরে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। ব্লকম্যান সাহেব এই ঘটনার সময় ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।‡ এই সময় বাকলারাজ ভীষণ প্লাবনে জলমগ্ন

---

* অমরমাণিক্যের ভুলুয়া রাজ্য বিজয় বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;—
"ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল।
কন্দর্পরায় জমিদার বাকলার বধিল।।"

‡ Col. H. S. Jarrett's Ain-i-Akbari –Vol. II. p. 123.

† J. A. S. B –1868. Dec.

হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার কথা জানা যাইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশাবলী এবং প্রাচীন ঘটককারিকার মতে রাজা জগদানন্দের শাসনকালে এই নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তিনিই প্রবল প্লাবনে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এস্থলে আইন-ই-আকবরী প্রণেতা ভ্রমে পতিত হইয়া মন্দির চূড়ারোহী রাজপুত্রের নাম "পরমানন্দ" লিখিয়াছেন।* পরমানন্দ রাজা জগদানন্দের পিতা— পুত্র নহেন। জগদানন্দের পুত্রের নাম কন্দর্পনারায়ণ।

জগগানন্দের পরলোক প্রাপ্তির পর প্রবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ বাকলা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন (১৫৮৪ খ্রিঃ)। ইনি মঘ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদলের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত পৈতৃক রাজধানী কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া, বাসুরীকাঠী, হোসেনপুর এবং ক্ষুদ্রকাঠী প্রভৃতি স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর মাধবপাশায় নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে অদ্যাপি রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এবং অন্যান্য অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী পিত্তলনির্ম্মিত তোপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। † পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে বাকলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। ‡

কন্দর্পনারায়ণের পরলোকগমনের সময় নির্ণয়োপযোগী কোনও নিদর্শন সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। তবে, এই মাত্র পাওয়া যায়, ইঁহার মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র রামচন্দ্র সাত কি আট বৎসর বয়স্ক ছিলেন ; পিতার অভাবে তিনিই রাজ্যাধিকারী হইলেন। ইনি যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের দুহিতা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সম্বন্ধ সুখকর হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজকগণের অনেকে বাকলায় গিয়াছেন, তন্মধ্যে মেলকয়র ফন্‌সিক (Melchoir Fonseca) নামক ব্যক্তি ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তথায় উপনীত হইয়া, অনধিক নয় বৎসর বয়স্ক রাজা রামচন্দ্র রায়কে শাসনকর্ত্তা দেখিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অল্প পূর্ব্বে (১৫৯৭ কিম্বা ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দে) কন্দর্পনারায়ণ স্বর্গীয় হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার রাজত্বকালে ১৫৮৪ খ্রী) হইতে ১৫৯৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে রাজা জগদানন্দ বাকলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পক্ষান্তরে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ অমরমাণিক্য ১৫৭৭ খ্রীঃ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। § তিনি ১৫০০ শকে (১৫৭৮ খ্রীঃ) অমরসাগর খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় বাকলায় রাজা জগদানন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব মহারাজ অমর, বাকলারাজ জগদানন্দের

---

* বাকলা— ১৬৬ পৃষ্ঠা।

† Jour. As. Soc. Bengal —Vol. XLIII. p. 207.

‡ Hacklyt's Voyages —Vol. II. p. 257.

§ এই লহরের যথাস্থানে এ বিষয় আলোচিত হইবে।

সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কন্দর্পনারায়ণের সময়েও কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বাকলাধিপতি জগদানন্দ, অমরসাগর খনন কালে কুলি প্রদান দ্বারা সহায্য করিয়াছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

গোয়াল পাড়া

ইহা আসাম প্রদেশের একটি জেলা। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় কূল ব্যাপিয়া এই জেলা অবস্থিত। এই নদের বাম তীরে প্রধান নগর ''গোয়াল পাড়া'' সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশ। পুরাকালে এই জেলার কিয়দংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল ; তৎপর এখানে কোচগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিয়ৎকাল পরে এতদঞ্চল অহোমগণের হস্তগত হইয়াছিল। অহোম জাতির নামানুসারেই এতৎ প্রদেশের নাম ''আসাম'' হইয়াছে। অহোমদিগকে পুরাভূত করিয়া মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সময় কিয়ৎকালের নিমিত্ত গাজী বংশীয়গণ এতদ্দেশে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বংশ হইতেই মহারাজ অমরমাণিক্য জলাশয় খনন জন্য লোকবল লাভ করিয়াছিলেন। সাহায্যকারীর নাম জানিবার কোনরূপ সূত্র পাওয়া যাইতেছে না।

ভাওয়াল

বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত, অরণ্যসঙ্কুল একটী পরগণা। এই স্থানে পালবংশীয়গণ রাজত্ব করিয়াছেন। এতদ্বংশীয় রাজা শিশুপালের কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি দুরদুরিয়া, শাইটহালিয়া, শৈলাট ও দীঘলিরছিট প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান আছে। দীর্ঘলিরছিটে ইঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রবাদবাক্য দ্বারা জানা যায়, দুরদুরিয়া দুর্গ ইঁহারই নির্ম্মিত। এই দুর্গে রাণীভবানী নাম্নী পাল বংশের এক রাণী বাস করিতেন, এরূপ জনপ্রবাদ আছে। এই কারণে উক্ত স্থান ''রাণীবাড়ী'' নামে অভিহিত হইয়াছে।

বানার নদীর পশ্চিম তীরে, শিশুপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। এই নগরী একডালা দুর্গের সন্নিহিত। ইহার অনতিদূরে অবস্থিত দুর্গাবাড়ী শিশুপালের অন্যতর কীর্ত্তি। ভাওয়ালের গভীর অরণ্য-মধ্যে ইঁহার আরও অনেক কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশুপালকে পরাজিত করিয়া মুসলমানগণ ভাওয়াল প্রদেশ অধিকার করেন। ডাক্তার টেইলারের মতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল ; এই নির্দ্ধারণ সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাল বংশীয়দিগকে অপসারিত করিয়া পলোয়ান শাহ নামক জনৈক

ধর্ম্মপ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার অধস্তন অষ্টম স্থানীয় ফজলগাজী বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছিলেন। মানসিংহ ভৌমিক সমাজের উৎসারণ সাধনার্থ পূর্ব্ববঙ্গে আগমনকালে গাজী বংশ সহজেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।* কাহারও কাহারও মতে সেন বংশের অভ্যুদয়ে পাল বংশীয়গণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। †

ভাওয়াল প্রদেশে মুসলমানগণের প্রথম প্রাধান্য লাভের সময় নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন ব্যাপার। ফজলগাজী যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভাওয়াল এবং তৎসন্নিহিত অপর কতিপয় পরগণায় স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, ইহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার আধিপত্য বুড়িগঙ্গার উত্তর তীর হইতে গাড়ো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ঈশা খাঁ মসনদ আলী সরকার বাজুহা ‡ ও সরকার সোণারগায়ে আধিপত্য লাভের পর হইতে ফজল গাজীকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফজল গাজী মহারাজ অমরমাণিক্যের সমসাময়িক শাসনকর্ত্তা। ইনি অমরসাগর খনন কার্য্যে এক হাজার মৃত্তিকা খননকারী লোক দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

অষ্টগ্রাম

ইহা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলাস্থ জয়নসাহী পরগণার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থান সাধারণতঃ "জয়নসাহী অষ্টগ্রাম" নামে প্রখ্যাত। পশ্চিম ময়মনসিংহে মহারাজ বল্লাল সেনের প্রভাব বিস্তার কালে, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইতিহাস আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে। কালক্রমে কামরূপ রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন বংশের হস্তগত হয়। এই সুযোগে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের বনভূমিতে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কোচ, হাজো ও গাড়ো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি এই সকল রাজ্যের নায়ক ছিল। জঙ্গলবাড়ী, খালিয়াজুরি, মদনপুর, সুসঙ্গ, বোকাইনগর ও গড় দলিপা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের লীলাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ক্রমে ক্রমে কামরূপের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর, তাহার কোন কোন অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আর্য্যগণ অসভ্য জাতির হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কালক্রমে ময়মনসিংহের সমগ্র ভাগ মুসলমানগণের হস্তগত

---

* Elliot's History, Vol.–VI, P. 105, and J. A. S. B. –Vol. XLIII. 1874 PP. 199 -201

† ময়মনসিংহের ইতিহাস—৩য় অধ্যায়, ১৮ পৃষ্ঠা।

‡ টোডর মল্ল কর্ত্তৃক ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে "ওয়াশীল তুমার জমা" (Rent roll) প্রস্তুত কালে সরকার বাজুহার সৃষ্টি হয়। হোসেন শাহের শাসনকালে যে প্রদেশ "নছরতসাহী" নামে অভিহিত ছিল এবং বর্ত্তমান কালে যে ভূ-ভাগ জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত, টোডার মল্ল তাহাকেই সরকার বাদুহা আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

হইয়া পড়ে। হোসেন শাহের শাসনকালে, এতদঞ্চলে সম্যকরূপে মুসলমান আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

মুসলমান শাসনকালে পূর্ব্ব ময়মনসিং "সরকার বাজুহা" নামে অভিহিত হইলে, জয়নসাহী অষ্টগ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। ঈশা খাঁ মসনদ আলীর প্রাধান্য কালে এই স্থান তাঁহার অধীনস্থ ফতে খাঁ নামক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। ঈশা খাঁ-রে পরলোক গমনের পর, এই ফতে খাঁ তাহার পূর্ব্ব অধিকৃত স্থানে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। অষ্টগ্রাম হইতে পাঁচ শত কুলি প্রেরণ দ্বারা যে অমরসাগর খননে সাহায্য করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এই ফতে খাঁ-ই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন।

বাণিয়াচঙ্গ

ইহা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার একটি প্রসিদ্ধ পরগণা। পুরাকালে ব্রাহ্মণ রাজা কর্ত্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইতেছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কেশব মিশ্র। মিশ্ররাজের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদবাক্য দ্বারা জানা যায়, কেশব মিশ্র বাণিজ্যার্থ জলপথে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি আনা হইয়াছিল। তাঁহার নৌকা সুবিস্তীর্ণ হাওরে (বিলে) পতিত হওয়ায়, চতুর্দ্দিকে অন্তত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, কোথাও স্থল না পাওয়ায়, দেবীর দৈনিক পূজার ব্যাঘাৎ হেতু মিশ্র মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দৈবানুগ্রহে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত একটি ভু-খণ্ড পাইয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে দেবীর অর্চ্চনা সমাপন করিলেন। পূজান্তে বিগ্রহ নৌকায় নেওয়ার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই উত্তোলন করা যাইতে পারিল না। সুতরাং মিশ্র মহাশয় সেই স্থানেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। কেশবের সঙ্গে জনৈক বণিক (বাণিয়া) এবং চঙ্গ জাতীয় নাবিকগণ ছিল। এই 'বাণিয়া' ও 'চঙ্গ' উপাধিদ্বয়ের সমন্বয়ে স্থানের নাম 'বাণিয়াচঙ্গ' হইয়াছে। আসাম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"A Merchant, who was travelling with a crew of Chung or Namasudra boatmen, anchored in the haor over the site on which the village was subsequently built. An image of Goddess Kali was in the boat ..... The water gradually disappeared, as they do at the present day on the cessation of the rains and a village was founded by the pious merchant."

Allen's Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) chap. II, p. 26.

১৩১৪ সনের নব্যভারত পত্রিকায় এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়ে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৎসমস্তের মর্ম্ম পুর্ব্বোক্ত বিবরণের অনুরূপ। "বাণিয়াচঙ্গ" নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে, কিন্তু উপরে কথিত প্রবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সরকারী কাগজপত্রেও তাহাই পাওয়া যায়।*

* Paper No. 798. Dated 1st June. 1883

সে কালে শক্তিশালী এবং সাহসী ব্যক্তির পক্ষে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা বড় কঠিন ছিল না। অশাসিত অরণ্যাকীর্ণ ভূ-ভাগ বা অপ্রসিদ্ধ জনপদসমূহ একবার হস্তগত করিয়া বসিলে তাহাতে বাধা প্রদান করিবার কেহ ছিল না। এবম্বিধ সুযোগ পাইয়াই বাণিজ্য ব্যবসায়ী কেশব মিশ্র বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কান্যকুব্জ হইতে সমাগত বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি নানা জাতীয় স্বদেশী লোক আনিয়া নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।*

কেশব মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তী কতিপয় বংশধরের নাম যথাক্রমে নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। বাহুল্য ভয়ে সম্যক বংশপত্রিকা প্রদান করিবার সুবিধা ঘটিল না।

* Allen's Assam District Gazetteers Vol. II (Sylhet) Chap 11 P. 26
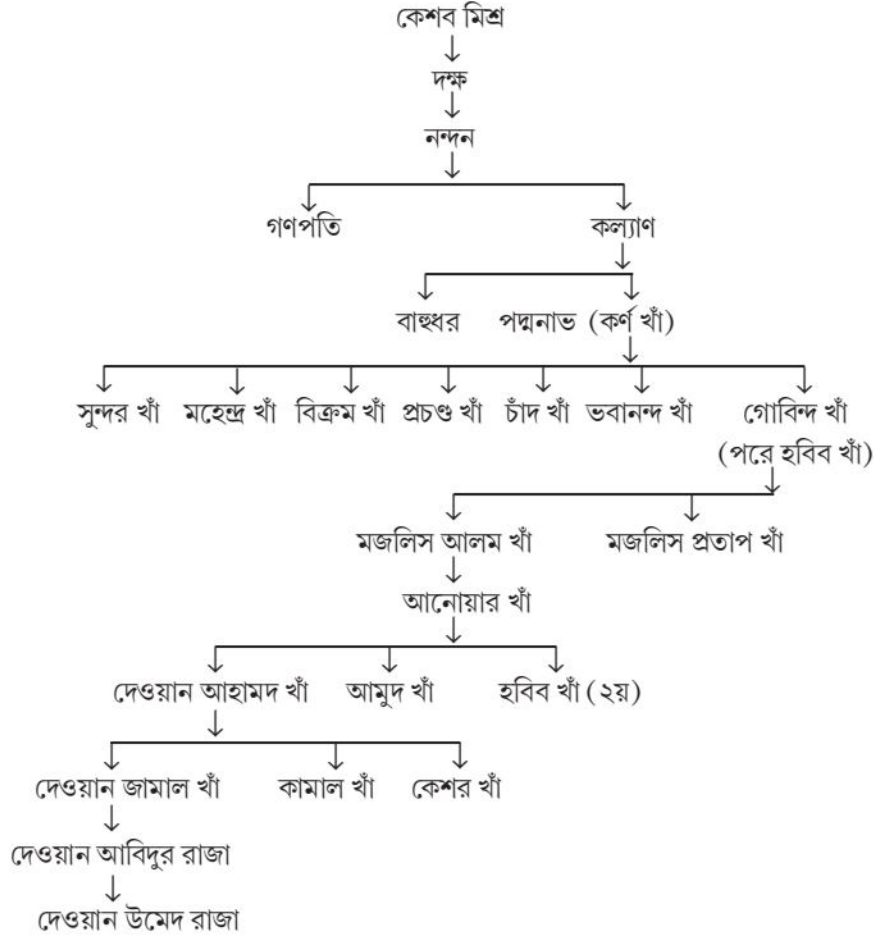
কেশব মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় পদ্মনাভ পরাক্রমশালী, বিদ্যানুরাগী এবং দানশীল ছিলেন। বদান্যগুণে তিনি 'কর্ণ খাঁ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পিতৃরাজ্যের অধিপতি হইলেন। তৎকালে বাণিয়াচঙ্গের সীমা পার্শ্ববর্তী জগন্নাথপুর রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। জগন্নাথপুরের রাজা জয়সিংহ (নামান্তর গোবিন্দসিংহ) বাণিয়াচঙ্গের রাজা গোবিন্দ খাঁ-এর সমসাময়িক ছিলেন।

এই সময় সুপ্রসিদ্ধ লাউড় রাজ্য পূর্ব্বোক্ত বাণিয়াচঙ্গ ও জগন্নাথপুরের সীমান্তবর্ত্তী ছিল। লাউড়ের রাজবংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, এই অরক্ষিত রাজ্যের উপর খাসিয়াগণের অদম্য অত্যাচার চলিতে থাকে। প্রজাগণ গুরুতর বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাণিয়াচঙ্গরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ খাঁ এই সুযোগে খাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া সুবিস্তীর্ণ লাউড় রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

'জগন্নাথপুরের ইতিহাস' পুস্তকায় উল্লেখ আছে, এই সময় লাউড় ও জগন্নাথপুরের রাজবংশীয়গণ অবিভক্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। দিল্লীর দরবারে লাউড়ের রাজাই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার নামেই অবিভক্ত রাজ্যদ্বয়ের রাজস্ব প্রদান করা হইত। জগন্নাথপুরের রাজা দিল্লীর দরবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন।

বাণিয়াচঙ্গপতি গোবিন্দ খাঁ লাউড় রাজ্য অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথপুরের অধিকৃত ভূমিও তাঁহার হস্তে আসিল। লাউড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, লাউড়ের রাজার উপর মোগল সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পিত থাকায় এই রাজ্যের উপর কর অবধারিত ছিল না।* যে সামান্য পরিমাণ রাজস্ব লাউড়ের রাজার নামে নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার সম্যক জগন্নাথপুরের রাজাকেই বহন করিতে হইত। সম্পত্তি বাণিয়াচঙ্গের রাজার হস্তগত হইবার পর হইতে জগন্নাথপুরের রাজা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ সম্রাটের রাজস্ব প্রদান করিতে তিনিই বাধ্য ছিলেন। এই কারণে জগন্নাথপুরের রাজা, গোবিন্দ খাঁ-এর বিরুদ্ধচারী হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিপুল বিক্রমের সম্মুখীন হইতে সাহসে কুলাইল না। অনেক চিন্তার পর জয়সিংহ (গোবিন্দসিংহ) দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া

---

* "Laur ceased to be Independent, the Rajas submitted to undertake the defence of the frontier but did not pay revenue."

Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II, (Sylhet) P. 92

গোবিন্দ খাঁ-এর অধিকৃত বাণিয়াচঙ্গসহ সম্যক লাউড় রাজ্যে অধিকার পাইবার প্রার্থী হইলেন। এতৎ সম্বন্ধে জগন্নাথপুরের ইতিহাসে পাওয়া যায় ;—

"বিরক্ত হইয়া তিনি করিলা নিশ্চিত।
সম্পত্তি হইতে তারে করিব বঞ্চিত।।
গোবিন্দের অনিষ্টেতে করি দৃঢ় পণ।
চলিলা সে হৃষ্ট মনে নবাব ভবন।।
বলে এক নিবেদন করি তব কাছে।
আমি আর গোবিন্দের যত ভূমি আছে।।
সর্ব্বস্ব আমারে দেও সনন্দ করিয়া।
আমি একা সব কর দিব পাঠাইয়া।।"

জয়সিংহের (নামান্তর গোবিন্দ সিংহ) আবেদন উপলক্ষে, সম্রাট লাউড়ের অবস্থাদি অবগত হইয়া, প্রতিবাদী গোবিন্দ খাঁকে দিল্লীতে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিলেন এবং তিনি আগমন না করা পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিবার নিমিত্ত আবেদনকারী জয়সিংহের প্রতি আদেশ হইল। তিনি বিচারপ্রার্থী হইয়া, নজরবন্দী কয়েদে আবদ্ধ রহিলেন।

গোবিন্দ খাঁ, দূতমুখে সম্রাটের আদেশ অবগত হইয়া কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং কঠোর পদাঘাতে আগন্তুকের দূত-লীলা সাঙ্গ করিয়া দিলেন ; অতঃপর আসন্ন বিপদাশঙ্কায় তিনি সুদৃঢ় মৃৎপ্রাচীর দ্বারা বাণিয়াচঙ্গ নগরের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিলেন।

গোবিন্দের এবম্বিধ ধৃষ্টতা সম্রাট দরবারে উপেক্ষিত হইবার নহে ; অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত দিল্লীর সৈন্যদল উপস্থিত হইল। কিন্তু গোবিন্দের পরাক্রমের নিকট তাহারা মস্তকোত্তোলন করিতে পারিতেছিল না। সেনাপতি বুজিলেন, ইঁহাকে সম্মুখ সমরে জীবিতাবস্থায় ধৃত করা অসম্ভব হইবে, অথচ বধ করিবার নিমিত্ত তিনি আদিষ্ট নহেন। এ হেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া সেনাপতি কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, জহরৎ বিক্রেতা বেশে নৌকা লইয়া আজমীরগঞ্জে উপনীত হইলেন। গোবিন্দ খাঁ, মণি ক্রয়ের নিমিত্ত বণিকের নৌকায় উপস্থিত হইলে, তদবস্থায় তাঁহাকে ধৃত ও বন্ধন করা হইল। যথাকালে তিনি দিল্লীতে নীত এবং সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন ও রাজদূত বধের অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ হইলেন।

এই ঘটনায় জয়সিংহ (নামান্তর গোবিন্দ) দেখিলেন, অনায়াসে তাঁহার অভিষ্ট লাভের পথ পরিষ্কার হইতেছে। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে গোবিন্দ খাঁ-এর প্রাণ দণ্ডের দিন আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল দিল্লীতে অবস্থান

করিয়া তিনি লাউড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং সাধারণে তাঁহার জয়সিংহ নামের পরিবর্ত্তে গোবিন্দসিংহ নামই অবগত ছিল।*

গোবিন্দ খাঁ-এর প্রামদণ্ডের অবধারিত দিন সমাগত হইল। ঘাতক, বিচারপ্রার্থী গোবিন্দ সিংহকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিত, সে মনে করিল, এই ব্যক্তিই বধ্য ; সুতরাং তাঁহাকেই হত্যা করিল। জয়সিংহের 'গোবিন্দ' নামই তাঁহার প্রাণ বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল ; ইহাকেই বলে 'নামে নামে যমে টানা"। গোবিন্দ খাঁ-এর সভাপণ্ডিত মুরারি বিশারদ দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়া রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের সন্তোষ সাধন দ্বারা স্বীয় প্রভুর জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

এই ভ্রান্তিমূলক বধের বার্ত্তা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। মন্ত্রীগণ বুঝাইলেন, এরূপ বিভ্রাট ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরের ঘটিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে গোবিন্দ খাঁকে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে মুক্তি প্রদান করাই সঙ্গত। সম্রাট বুঝিলেন, — ইহা খোদার ইচ্ছা। মুসলমান রাজত্বকালে এবম্বিধ অনেক গুরুতর ত্রুটীমূলক কার্য্য খোদার ইচ্ছায় নিষ্পন্ন হইত। জয়সিংহ সম্পত্তি লাভের আশায় প্রার্থীভাবে সম্রাট দরবারে যাইয়া, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনিময়ে প্রাণ হারাইলেন, ইহা ঘাতকের ত্রুটী নহে — খোদার ইচ্ছা! ইহার উপর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না।

সম্রাটের আদেশে গোবিন্দ খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে জীবনের বিনিময়ে জাতি ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে হইল।† ব্রাহ্মণ সন্তান গোবিন্দ খাঁ, সম্রাটের কৃপায় ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হবিব খাঁ নাম ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। জয়সিংহ (গোবিন্দসিংহ) নিহত হওয়ার ইঁহার নির্ব্বিবাদে সমগ্র লাউল ও বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের সনন্দ লাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। হবিব খাঁ-ও অধিকাংশ সময় লাউড়ে বাস করিতেছিলেন, বাণিয়াচঙ্গে অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিতেন।

জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিজয়সিংহ। তিনি অগ্রজের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বিজয় মনে করিলেন, গোবিন্দ খাঁ-এর চক্রান্তেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার উপর আবার হবিব খাঁ, ভ্রাতৃশোকসন্তপ্ত বিজয়কে সমস্ত

---

* "জয়সিংহের দুই নাম ছিল প্রকাশিত।

গোবিন্দ বলিয়া তাকে অনেকে জানিত।।" — জগন্নাথপুরের ইতিহাস।

† "The last Hindu king of Laur, called Gobinda, was for some cause, summoned to Delhi and there become a Mahammadan."

Hunter's statistical Account of Assam Vol. II, (Sylhet)

সম্পত্তির অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া অইধকতর বিপদাপন্ন করিলেন। বিজয়সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের আশায় দিল্লীযাত্রা করিলেন। বহু চেষ্টার পর তিনি লাউড় রাজ্যের অর্দ্ধাংশের অধিকার লাভের সনন্দ পাইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত হবিব খাঁ তাঁহাকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদান করিলেন না।

অনন্যোপায় হইয়া বিজয় পুনর্ব্বার দিল্লীর আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হবিব খাঁ ভাবিলেন, একবার জাতি ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ধন-প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। বারম্বার সম্রাটের আদেশ অমান্য করিলে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এই সময় কবিবল্লভ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তীতায় উভয়ের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসার ফলে বিজয়সিংহ হবিব খাঁ-এর আনুগত্য স্বীকারে সম্পত্তির ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের ঘটনা।

হবিব খাঁ ও বিজয়সিংহের মধ্যে এই মীমাংসা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কিয়দ্দিবস পরে উভয়ের রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণোপলক্ষে পুনর্ব্বার বিবাদের সূত্রপাত হইল। অতঃপর বিজয় সিংহকে জাতিভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত হবিব খাঁ চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার পুত্রের সহিত বিজয় সিংহের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বিজয় এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া, কৌশলে হবিব খাঁ-এর অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর হবিব খাঁ-এর উত্থাপিত বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব কপট সম্মতি জানাইয়া বিজয়, তাঁহার পুত্র মজলিস আলমকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। আলমকে গুপ্তহত্যা করাই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল। বিজয়ের কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইলেন, এবং গোপনে তাঁহাকে আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইয়া পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ; এই কারণেই সে-যাত্রায় আলমের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। হবিব খাঁ পুত্রমুখে সমস্ত অবগত হইয়া, বিজয়কে বধ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা বিজয়সিংহ মৃগয়া ব্যপদেশে বনে গমন করিয়াছিলেন, হবিব খাঁ-এর নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে তথায় তিনি নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হবিব সসৈন্যে আপতিত হইয়া বিজয়সিংহের বাড়ী লুণ্ঠন করিলেন। বিজয়ের বালকপুত্রদ্বয় প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ইহার উপর আবার অল্পকাল মধ্যেই পিতৃব্য পুত্রের সহিত বালকদ্বয়ের সম্পত্তিঘটিত বিবাদ উপস্থিত হইল। এই গৃহবিবাদেই জগন্নাথপুর রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছিল।

এদিকে হবিব খাঁ-এর সংস্থাপিত লাউড়ের রাজধানী অকস্মাৎ খাসিয়া সরদারগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। এই আকস্মিক আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিল না। খাসিয়াগণের পাশবিক অত্যাচারে অনেক লোক বিনষ্ট হইল,

অনেকে সম্পত্তির মমতা পরিত্যাগ করিয়া কোনমতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করিল। তদবধি লাউড় জনশূন্য হইয়া ক্রমে গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। লাউড়ের জঙ্গলে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা "বাণিয়াচঙ্গের হাবিলী" নামে পরিচিত। কথিত আছে, এই দুর্গ মজলিস আলমের পুত্র (হবিব খাঁ-এর পৌত্র) আনোয়ার খাঁ কর্ত্তৃক খাসিয়াদিগের উপদ্রব নিবারণকল্পে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আনোয়ার খাঁ-এর সময়েই বাণিয়াচঙ্গ রাজ্য মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু এই সময়ও তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। আনোয়ার খাঁ নবাব দরবার হইতে 'দেওয়ান' উপাধি লাভ করেন। আনোয়ার খাঁ-এর অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় দেওয়ান উমেদ রাজাও সম্ভ্রান্ত জমিদার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তৎপর হইতেই ক্রমে অবনতি আরম্ভ হয়। ইহাই বাণিয়াচঙ্গের স্থূল বিবরণ।

অমরসাগর খননকালে বাণিয়াচঙ্গের রাজা ৫০০ শত মজুর দ্বারা মহারাজ অমরমাণিক্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বাণিয়াচঙ্গের রাজগণের কাল নির্ণয় করিবার কোনও সূত্র না পাওয়ায়, কোন রাজা কর্ত্তৃক মজুর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অবধারণ করা কঠিন হইয়াছে। গোবিন্দ খাঁ (পরে হবিব খাঁ) খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা জানা গিয়াছে ; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের কালজ্ঞাপক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহারাজ অমরমাণিক্য খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। ইহা বাণিয়াচঙ্গের রাজা গোবিন্দ খাঁ-এর এক শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঘটনা। সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করা হয় ; সেই হিসাবে, গোবিন্দ খাঁ-এর পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় পুরুষে রাজা নন্দনের নাম পাওয়া যায়। ইনি বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পৌত্র। রাজা নন্দন, মহারাজ অমরমাণিক্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং ইনিই অমরসাগর খননের নিমিত্ত মজুর প্রদান করিয়াছিলেন এরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

রণ-ভাওয়াল

ইহা প্রাচীন ভাওয়াল রাজ্যের অংশবিশেষ। ভাওয়ালের সঙ্গে এই অংশও পাল বংশীয় নৃপালগণের শাসনাধীন ছিল। পাল বংশ ধ্বংস এবং মুসলমানগণের অভ্যুত্থানের পর, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, পলোয়ান শাহের অধস্তন বংশ্য ফজল গাজী ভাওয়াল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই সময় দৌলত গাজী চৌয়ার নামক জনৈক মুসলমান রণভাওয়ালের আধিপত্য লাভ করেন। ইনি ঢাকা নগরীর কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি। কি উপায়ে রণভাওয়ালে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এতদঞ্চলে ঈশা খাঁ মসনদ আলীর প্রভাব বিস্তার কালে ফজল গাজীকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময় সম্ভবতঃ দৌলত গাজীও ঈশা খাঁ-এর অধীনতাপাশ হইতে উন্মুক্ত থাকিতে সমর্থন হন নাই।

ভাওয়াল প্রদেশ পাঠান শাসনের কুক্ষিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রণভাওয়াল তালুকে পরিণত হয়। অতঃপর অনেকবার এই প্রদেশের বন্দোবস্ত কার্য্য সম্পাদিত ও রাজস্বের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে রেজা খাঁ কর্ত্তৃক একবার রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। তৎকালে রণভাওয়াল আলেপ সিং পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই বন্দোবস্তে রণভাওয়ালের রাজস্ব ১৪,১৭৩ টাকা অবধারিত হয়। ১১৯৫ সনে রটন সাহেব যে বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে তিন ভাগে বিভক্ত রণভাওয়ালের রাজস্ব ১২,৮৫৪ টাকা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। এই খাজনার পরিমাণ অতঃপর অনেকবার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক বিভাগ হইতে বিতাড়িত মঙ্গলসিংহ বিদ্রোহী হইয়া ভাওয়াল অঞ্চলে নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। এই সময় রণভাওয়ালের তালুকদার আবদুল হাপিজের ঋণদায়ে সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হয়। তালুকদার পক্ষ নীলাম খরিদদারকে সম্পত্তি দখল করিবার পক্ষে বাধা প্রদান করায় উভয় পক্ষে গুরুতর দাঙ্গা হইয়াছিল। এই গোলমালের সময় তালুকদার কলিমন্নেছা ; বর্ম্মীর তালুকদার লুৎফুল্লার শরণাপন্না হইলেন। মঙ্গলসিংহকে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে লুৎফুল্লা তাহাকে অর্থসাহায্য করেন। এই অর্থবল লাভ করিয়া মঙ্গলসিংহ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে এক বৃহৎ দস্যুদল গঠন করিয়া, নরহত্যা, লুণ্ঠনাদি দ্বারা ভাওয়াল প্রদেশ জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তাহাকে দমন করিতে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অনেক সময় লাগিয়াছিল। সে সেশন জজের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদশে পায়।

মঙ্গলসিংহ ধৃত হইবার পর, তাহার ভ্রাতা গুলজার সিংহও দল বাঁধিয়া বিস্তর অত্যাচার শুরু করিয়াছিল, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করেন।

ইহার পর রণভাওয়ালের অধিবাসীবৃন্দকে ঠগীর উপদ্রব, নীলকরের অত্যাচার প্রভৃতি অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

অমরসাগর খননকার্য্যে রণভাওয়াল হইতে মহারাজ অমরমাণিক্য এক সহস্র লোকবল লাভ করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে (ভাওয়ালে ফজল গাজীর প্রাধান্য সময়ে) দৌলত গাজী চৌয়ার রণভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ফজল গাজী ও দৌলত গাজী উভয়ে সমসাময়িক ব্যক্তি। এই দৌলত গাজী চৌয়ারই মজুর প্রদান দ্বারা অমরমাণিক্যকে সাহায্য করা প্রতিপন্ন হইতেছে।

সরাইল

সরাইল বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরা জেলার একটী সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধ পরগণায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এতদঞ্চলে

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তনের পর, সরাইলের কিয়দংশ তাহাদের দ্বারা "সতর খণ্ডল" নামে অভিহিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই নাম বিলুপ্ত হয় নাই। তৎকালে মুসলমানগণের অধিকৃত ভূ-ভাগ বাদে, সরাইলের অবশিষ্টাংশ ত্রিপুর রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। ১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে উত্তরোত্তর সমগ্র সরাইল পরগণা মোগল সম্রাটের কুক্ষিগত হইয়াছে।

ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের শাসনকালে সরাইল প্রদেশ ঈশা খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ; কি সূত্রে সরাইলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। এই মাত্র জানা যায়, ইনি ত্রিপুরার সামন্তমধ্যে পরিগণিত ছিলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষাবলম্বী হইতেন। ইঁহার বিপদকালে ত্রিপুরেশ্বরও যথোচিত সাহায্য করিতেন। অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক তরপ রাজ্য আক্রমণকালে ঈশা খাঁ বাঙ্গালী সৈন্যবলসহ সেই অভিযানে যোগদান করিয়াছলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

> "অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন।
> ইছা খাঁ সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ।।"
>
> অমরমাণিক্য খণ্ড

তরপের যুদ্ধ ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে অকস্মাৎ দিল্লীর সৈন্যদল আসিয়া সরাইল আক্রমণে উদ্যত হইল। ঈশা খাঁ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় পলায়নপর হইলেন। মুসলমানগণ সরাইলের সন্নিহিত স্থানে ছাউনি করিয়া বসিল। দ্বাদশ ভৌমিকদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মানসিংহ এই সময় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সৈন্যদলের দ্বারাই ত্রিপুরার কোন কোন অংশ কিয়ৎপরিমাণে উপদ্রুত হইয়া থাকিবে।

ঈশা খাঁ মেহেরকুলের পথে উদয়পুরে যাইয়া মহারাজ অমরমাণিক্যের শরণাপন্ন হইলেন। ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ-এর একমাত্র প্রার্থনা ;—

> "দিল্লীর উমরা যত সরাইল আইসে।
> রাজসৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে।।"

মহারাজ সৈন্য প্রদান দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু সেই সম্মতি কার্য্যে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিল। ঈশা খাঁ সর্ব্বদা দরবারে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইতেছিলেন না, তিনি মন্ত্রীবর্গের পরিতোষ বিধানার্থ সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই তাঁহার বিপদের কথা রাজদরবারে জানাইত না। রাজপরিষদগণের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করিয়া ঈশা খাঁ সেই পথ ছাড়িয়া

দিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি যখন বুঝিলেন, আত্মপরায়ণ পারিষদবর্গ দ্বারা কার্য্যোদ্ধার হইবার আশা নাই, তখন অনন্যোপায় হইয়া ;—

"ইছা খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল।
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল।।
রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খাঁ খাইল।
রাজারাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল।।"

এই ঘটনা হইতে ঈশা খাঁ রাজা এবং রাজমহিষীর অসীম কৃপার পাত্র হইলেন। তাঁহাকে দরবার হইতে "মসনদ আলী" উপাধি এবং পাঁচটী হস্তী ও দশটী অশ্বসহ খেলাত প্রদান করা হইল। তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত সিংহ সরব (সর্ব্ব) উজীরের কর্ত্তৃত্বাধীনে বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরিত হইল। রাজসৈন্য সরাইলে উপনীত হওয়া মাত্রই মুসলমানগণ তাহাদের তাম্বু-ডেড়া গুটাইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ঈশা খাঁ-এর শাসিত প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই উপদ্রবশূন্য হইল।

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় অমরমাণিক্য প্রসঙ্গে ঈশা খাঁ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে— ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬০৯ খ্রীঃ) বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইস্লাম খাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক ত্রিপুরা আক্রমণ করায়, মহারাজ অমরমাণিক্য বিপক্ষের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত ঈশা খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাণী উক্ত সেনাপতিকে পাদোদক প্রদান দ্বারা উৎসাহিত করিবার কথাও কৈলাসবাবু বলিয়াছেন।* এই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে নাই। বিশেষতঃ অমরমাণিক্য ১৫৭৭ হইতে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইস্লাম খাঁ ১৬০৮ মতান্তরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবেদারী পদ লাভ করিয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং মহারাজ অমরমাণিক্যের পরলোক প্রাপ্তির পরে ইস্লাম খাঁ বঙ্গের শাসনভার লাভ করা স্থিরীকৃত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অমরমাণিক্য ও ইস্লাম খাঁ-এর মধ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব দেখা যাইতেছে।

অমরমাণিক্যের শাসনকালে সরাইলের অধিকাংশ ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। মহারাজ অমর ১৫০১ শকে এই অরণ্যসঙ্কুল স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ ও হরিণ প্রভৃতি নানা জাতীয় অনেক পশু শিকার করিয়াছিলেন। এই অভিযানে রাজকুমার রাজধর দেব (পরে রাজধরমাণিক্য) ছিলেন। তিনি উক্ত বনভূমি পিতার অনুমতিক্রমে আবাদ করিয়া 'বেয়াল্লিশ' নামক এক সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন। বর্ত্তমান কালেও সরাইলের কিয়দংশ এই নামে অভিহিত হইতেছে।

১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যে সরাইলের সমগ্র ভাগ উত্তরোত্তর মোগল শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী কিয়ৎকালের অবস্থা জানা

* কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য়, ৬ষ্ঠ অঃ ৭১ পৃষ্ঠা।

যায় না। ঈশা খাঁ মসনদ আলীর বংশধর দেওয়ান মজলিস গাজীর এই পরগণা জমিদারীসূত্রে শাসন করিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত দেওয়ান সাহেবের বংশধরগণ বর্ত্তমান কালেও সরাইলের কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, দেওয়ান মজলিস গাজীর পূর্ব্বেও ঈশা খাঁ-এর বংশধরগণই সরাইলের জমিদার ছিলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ ও মজলিস গাজীর মধ্যবর্ত্তী কালে কত পুরুষ গিয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। দেওয়ান মজলিস গাজী হইতে ধারাবাহিক বংশ তালিকা পাওয়া যায়। এই বংশীয় দেওয়ান নুরমাহাম্মদের পুত্র দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ, ত্রিপুরেশ্বর **রামদেবমাণিক্য** হইতে সরাইলের কিয়দংশ দানপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। **রামমাণিক্য** খণ্ডে তাহা বিবৃত হইবে। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সংগ্রহ অবলম্বনে দেওয়ান বংশের সংক্ষিপ্ত তালিকা এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।
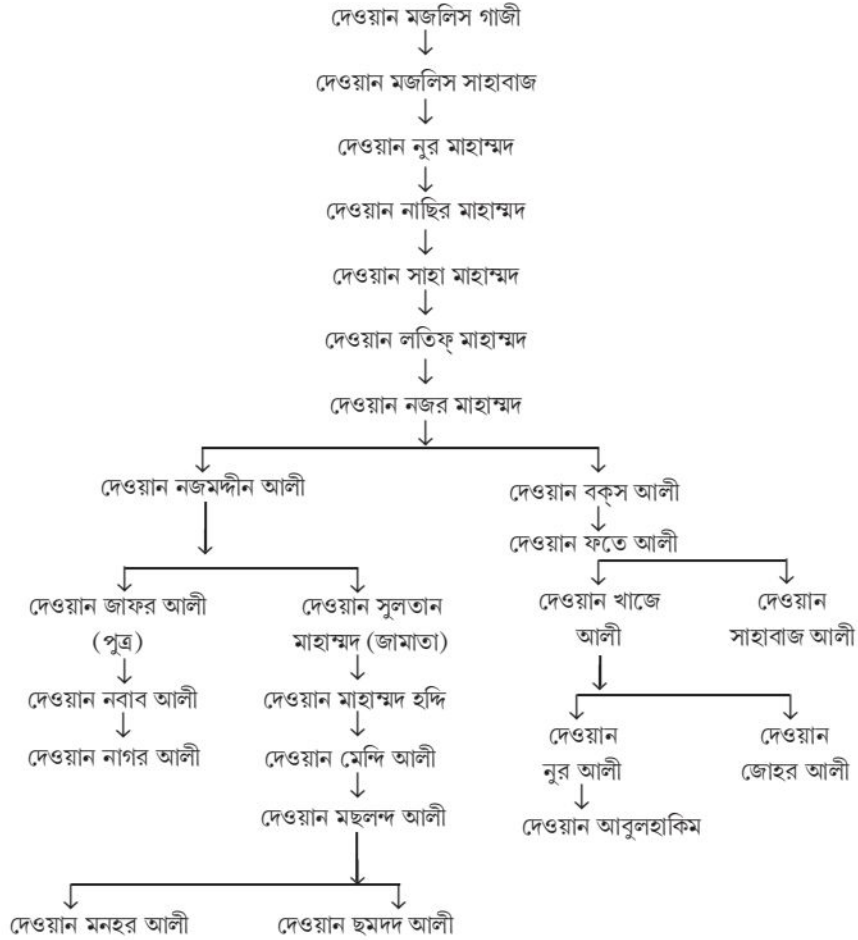
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, মঘ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যু দলের অত্যাচার নিবারণকল্পে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সয়েস্তা খাঁ নাওরা বিভাগ * স্থাপন করেন। এই বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় খিজিরপুরে † প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১১২ টি মহাল "উমলে নাওরা" নামে নৌ-বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় সরাইল-সতরখণ্ডলও নাওরা মহালের সামিল হইয়াছিল। অনেক কালের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর সরাইল বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সরাইলের অধিপতি পূর্ব্বোক্ত ঈশা খাঁ মসনদ আলী মহারাজ অমরমাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন, সম্যক বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে। ইনি অমরসাগর খননকার্য্যে এক হাজার মজুর প্রদান দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন।

ভুলুয়া

মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে থানেশ্বরের সন্নিহিত তিরৌরী বা তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাভুত ও নিহত করিয়া, তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। মহম্মদ ঘোরী স্বীয় ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দীনকে নবাধিকৃত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গজনীতে ফিরিয়া যাইবার পর হইতে, কুতুব স্বয়ং ও তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার এবং তৎপুত্র মহম্মদ ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে আফগান রাজ্য প্রসারণের উদ্দেশ্যে দেশের পর দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। ইঁহার ক্রমান্বয়ে বিহার এবং পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ জয় করিয়া আসামের সীমা পর্য্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠে। তৎকালে মিথিলার শূর উপাধিধারী আদিশূর নামক রাজার ৯ম পুত্র বিশ্বম্ভর শূর মুসলমান ভয়ে ভীত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। ইহা ১১২৫ শকের (১২০৩ খ্রীঃ) ঘটনা। এই সময় লক্ষণ সেন ‡ নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। বিশ্বম্ভর

---

* সমরতরী বিভাগের সর্ব্ববিধ কার্য্য পরিচালন জন্য যে স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করা হয়, তাহা 'নাওরা বিভাগ' নামে অভিহিত হইত।

† বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশের নাম খিজিরপুর ছিল।

‡ মীনহাজ স্বীয় রচিত 'তবকাত-ই-নাসারি' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে 'নছমিয়া' নামের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে আবার 'লছমিয়াকে' 'লাক্ষ্মণেয়' করিয়া লক্ষ্মণ সেনের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে লেছমিয়াকে বল্লালের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রণেতা মহাশয় বলেন— "মুসলমানেরা লছমন অর্থাৎ লক্ষ্মণের নামের শেষে অবজ্ঞাসূচক আলেফ্ যোগ করিয়া লছমিয়া করিয়াছেন; লছমিয়া ও লছমন একই কথা।" সাহিত্য — ১৩০১, বৈশাখ এবং যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১০ম পরিচ্ছেদ, ১৩৫০ পৃষ্ঠা।

তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে নব-বলদৃপ্ত মুসলমানের ভয়ে বঙ্গের রাজন্যবর্গ সন্ত্রস্ত ছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে কুমার বিশ্বম্ভরকে আশ্রয় প্রদান করিতে লক্ষ্মণ সেন সাহসী হইলেন না। অন্যান্য স্থানে চেষ্টা করিয়াও তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর শূর কর্ণাট ক্ষত্রিয় ছিলেন। কায়স্থ কারিকায় এবং ভুলুয়ার ইতিহাসে বিশ্বম্ভর শূরের অধস্তন সপ্তমস্থানীয় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয়সূচক যে কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

" শুন শুন মহাশয়, আমার যে পরিচয়,
মৈথিল ভূমেতে ছিল বাস।
তাহে পদ ভঙ্গ কৈল, বঙ্গে উপস্থিত হৈল,
রাঢ় প্রদেশে নিবাস।।
তাহে পদ ভঙ্গ করি, ভুলুয়া নিবাস করি,
মহারাজ আদিশূরের জর্দ্দান।
বাৎস্য গোত্র পঞ্চ প্রবল, করি অবধান,
লক্ষ্মণ মাণিক্য শূর এইত আমার নাম।।"

বিশ্বম্ভরের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তাঁহাকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ কায়স্থ বলিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও মতে তিনি ক্ষত্রিয় হইলেও ভুলুয়ায় আসিয়া বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে মিলিয়া ছিলেন। শেষোক্ত বাক্যই সত্য, তাহার অনেক প্রমাণও আছে এই বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক গুটিদুই কথা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) পূর্ব্বে ভুলুয়ার রাজ পরিবারের উপবীত, উপনয়ন সংস্কার এবং ক্ষাত্রোচিত অশৌচ পালনের প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য।

(২) ইঁহার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ন্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন না করিয়া, অদ্যাপি বাচস্পতি মিশ্রের মত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

ভুলুয়ায় আসিবার পর স্বদেশী ও স্বজাতীয়গণের সহি যৌনসম্বন্ধ স্থিরতর রাখা অসম্ভব হওয়ায়, রাজা বিশ্বম্ভরের অধস্তন পঞ্চমস্থানীয় কবিচন্দ্র খাঁ, বিক্রমপুর ও বাকলা চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। * কবিচন্দ্র, কায়স্থ সমাজের তদানীন্তন সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও কুলাচার্য্যদিগকে বশভূত করিয়া, বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তদবধি শূর রাজবংশ কায়স্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই সময় বিক্রমপুর বহরের

---

* ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস—২৪ পৃষ্ঠা।

চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ হংস বসু ও গোপাল বসু, এবং চতুর্ম্মণ্ডলের পাই মিত্র প্রভৃতি কতিপয় কুলীন কায়স্থ, শূর-বংশের অন্ন গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার অপরাধে কৌলিন্য- ভ্রষ্ট ও কুলজ শ্রেণীতে অবনত হইয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের পৌত্র লক্ষ্মণমাণিক্য, গাভার সুবিখ্যাত ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষদস্তিদারের হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন।* এই পরিণয় ব্যাপারে পরমানন্দ চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অপদস্থ হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজার সহিত লক্ষ্মণমাণিক্যের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়।

এক সম্প্রদায়ের মতে ভুলুয়ার রাজবংশ মিথিলা পরিত্যাগের পর, কিয়ৎকাল রাঢ়দেশে অবস্থান করেন। তথা হইতে ভুলুয়ায় আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে লক্ষ্মণ মণিক্যের পরিচয়সূচক কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেও এ-কথার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস–– রাজন্য কাণ্ডে এই মতই গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই বংশের এক শাখা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চৌধুরী ভবানীপুরে বাস করিতেছেন ; উক্ত শাখার এক বিস্তীর্ণ বংশ-তারিসা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শূর চৌধুরী মহাশয় মুদ্রিত করিয়েছেন। † তাহা আলোচনায় জানা যায়, এই বংশের আদিপুরুষ কবিশূর (সামন্তরাজ)। তিনি এবং তৎপুত্র মাধব শূর (মহাসামন্তরাজ) কোথায় রাজত্ব করিয়াছেন, প্রকাশ নাই। মাধব শূরের পুত্র আদিশূর (জয়ন্ত) পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের (গৌড়ের) রাজা ছিলেন। এই আদিশূরের অধস্তন ১৫শ স্থানীয় রাজা বিশ্বম্ভর শূর ভুলুয়ায় আসিয়া রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বম্ভরের ভুলুয়া গমনের পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে শূরপুর (বর্দ্ধমান), সিংহেশ্বর, গড়মন্দারণ, প্রদ্যুম্ননগর প্রভৃতি স্থানে রাজধানী স্থাপনের কথা পাওয়া যায় ; কিন্তু মিথিলাবাসের কথা এই বংশ-পত্রিকায় নাই। অথচ ভুলুয়ার ইতিহাসে, বিশ্বম্ভর মিথিলা হইতে সমাগত বলিয়া জানা যাইতেছে। এমম্বিধ মতবৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য নহে।

এস্থলে আর একটী বিষয় আলোচনাযোগ্য। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শূরচৌধুরী মহাশয়ের সঙ্কলিত বংশ-পত্রিকায় আদিশূরের (জয়ন্ত) পরবর্ত্তী ১৫শ স্থানে বিশ্বম্ভরের নাম লিখিত হইয়াছে। কাশীনাথবাবুর মতে, আদিশূরের 'রাজাধিরাজ' উপাধি ছিল এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (গৌড়ে) ৭৩২ হইতে ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছেন।

---

* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত 'বারভূঞা'—১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা। এবং নব্যভারত চৈত্র, ১৩০৭।

† শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে এই বংশ-পত্রিকা আমরা পাইয়াছি।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্ত্তা গৌড়েশ্বর আদিশূরই যে কাশীনাথবাবুর লক্ষ্যস্থল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহার মতে আদিশূরের রাজত্বকাল ৭৩২-৭৮২ খ্রীঃ (৬৫৪-৭০৪ শক) কুলার্ণব এবং বরেন্দ্র কুলপঞ্জীর মতের সহিত এই নির্দ্ধারণের কষ্টকল্পনা দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে ; কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সেই সকল মত পোষণ করেন না। ক্ষিতীশ বংশাবলীর নির্দ্ধারণ মতে ৯৯৯ শকে, বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৯৫৪ শকে, এবং ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শকে আদিশূর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল নির্দ্ধারণের সহিত কাশীনাথবাবুর নির্দ্ধারিত শকাঙ্ক ন্যূনাধিক তিন শদাব্দী অন্তর দাঁড়াইতেছে। এরূপ স্থলে গৌড়েশ্বর আদিশূর এবং কাশীনাথবাবুর আদিশূরকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। রাজা বিশ্বম্ভর মিথিলা হইতে সমাগত, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত ; তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণগণ ভুলুয়া সমাজে আবহমানকাল মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, অদ্যাপি মৈথিল পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের কৌলিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইতেছে। ভুলুয়ার প্রচলিত ভাষায় বহুল পরিমাণে মৈথিল ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।* এই-সকল বিবরণ রাজা বিশ্বম্ভরের মিথিলা হইতে আগমনের পোষক প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কাশীনাথবাবুর সঙ্কলিত বংশ-পত্রিকায় এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায়, উক্ত তালিকার মৌলিকতা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হয়। পক্ষান্তরে, ভুলুয়ায় রক্ষিত বংশ-পত্রিকায় বিশ্বম্ভরকে আদিশূরের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গে সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নকারী আদিশূরের পুত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ প্রাচীনগণের মতে আদিশূরের বংশ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল।† তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধেও প্রবল মতবৈষম্য রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভুলুয়ার রাজবংশকে গৌড়েশ্বর আদিশূরের বংশধর বলিয়া নির্ব্বাচন করা অসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

বিমল যশের অধিকারী প্রবলপরাক্রান্ত গৌড়েশ্বর আদিশূরের পরবর্ত্তী দেশীয় রাজন্যবর্গ কিয়ৎকাল তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন। এই সময় অনেক শৌর্য্যশালী ও কৃতী রাজা 'শূর' উপাধি গ্রহণ শ্লাঘ্য মনে করিতেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক বিরচিত 'চন্দ্রপ্রভা' কুলপঞ্জিকায় 'লিপিশূর' নাম পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ প্রদেশে তিরুমলয় গিরিলিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধীশ্বর

---

* বিজয়া পত্রিকা—"নোয়াখালীর ভাষা বৈচিত্র্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
ভিস্মক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।।"
বৈদ্যকুল পঞ্জিকা।

'রণশূরের' নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে। * পাণ্ডুকেশ্বরে 'ললিতশূরের' এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। † সন্ধ্যাকর নন্দী বিবচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে 'লক্ষ্মীশূর' নামক রাজার উল্লেখ আছে। নেপাল রাজ্যে প্রাপ্ত একখণ্ড শিলালিপিতে আর এক 'রণশূরের' নাম পাওয়া গিয়াছে। ‡ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত 'মাদা' গ্রামে 'দামশূর' নামধেয় এক শূররাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।§ এই সকল শূর উপাধিধারীর বিবরণ দ্বারা জানা যায়, সে-কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন বংশীয় কৃতী পুরুষগণ 'শূর' উপাধি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এতদ্বারা বুঝা যায়, উক্ত নীতি অনুসরণে মিথিলায় এক শূর বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বংশোদ্ভূত বিশ্বম্ভর শূর ভুলুয়ায় আসিয়া নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের পিতার নাম, গৌড়েশ্বর আদিশূরের নামের সহিত ঐক্য থাকায়, ভুলুয়ার রাজ-বংশগণকে আদিশূর জয়ন্তের বংশধর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য রক্ষার অন্য পন্থা পাওয়া যায় না।

বিশ্বম্ভর স্বদেশ পরিত্যাগের পর, রাঢ় ও বঙ্গে আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়া তীর্থ-দর্শন মানসে চন্দ্রনাথ পবর্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, এই অভিযানকালে ১৪৯ খানা নৌকা, ২০০ শত সৈন্য এবং বহুসংখ্যক পরিজন তাঁহার সঙ্গে ছিল। তীর্থক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নাবিকগণের দিগ্‌ভ্রম ঘটিল। অষ্টাহকাল ইতস্ততঃ পোত সঞ্চালনের পর পথভ্রান্ত নৌ-বিতান বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলাস্থিত আমিশা পাড়ার পশ্চিম দিকস্থ নাওড়ি গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান সোণাইমুড়ি রেল-স্টেশনের পশ্চিমস্থ বগাদীয়া (বকদ্বীপ) ও ভানুরাই গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া, নব-সঞ্চিত বালুকাস্তরে আবদ্ধ হয়। স্থান অপরিচিত, নাবিকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত, মাঘের সমুদ্রজ গভীর কুজ্ঝটিকাজালে চতুর্দ্দিক সমাবৃত। ইহা ভীষণ বিপদের পূর্ব্ব-সূচনা মনে করিয়া বিশ্বম্ভর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন। তিনি বারাহী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, এই আসন্ন বিপদকালে একাগ্র হৃদয়ে স্বীয় ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

কথিত আছে, দেবীর প্রত্যাদেশ মতে বিশ্বম্ভর, জলগর্ত্ত হইতে বারাহী দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া, রাত্রিকালেই সেই বিগ্রহ নবোত্থিত চড়াভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক ছাগাদি বলিপ্রদান দ্বারা অর্চ্চনা করে। ¶ ইহা ৬১০ সনের

* গৌড় লেখমালা—৩৯ পৃষ্ঠা।

† Proc. Asiatic Society of Bengal— P. 72. 1877.

‡ Bendall's catalogue of the Budhist Mss. Page XIII

§ বঙ্গে জাতীয় ইতিসাহ—রাজন্য কাণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

¶ সোণাইমুড়ি রেল স্টেশনের সন্নিহিত বগাদিয়া (বকদ্বীপ) তৎকালে জলমগ্ন ছিল, কাহারও কাহারও মতে এই স্থানে দেবী-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিশ্বম্ভরের দেশ পরিত্যাগকালে সঙ্গে আনা হইয়াছিল।

(১২০৩ খ্রীঃ) ১০ই মাঘ তারিখের ঘটনা। ডাক্তার ওয়াইজ এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"The exact date of this fiction is given as the 10th of Magh, 610 Bengali year or A. D. 1203. the same year in which the first Mahammadan invasion of Bengal under Bakhtyar Khiliji took place."

J.A.S.B.— Vol. XLIII, Part 1, P. 203.

দিগ্‌ভ্রমবশতঃ বিশ্বম্ভরের দেবীবিগ্রহ পূর্ব্বাস্যে স্থাপিতা হইয়াছেন, এবং পশ্চিমাভিমুখীন করিয়া ছাগবলি দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাতে দীর্ঘকালের পর ভানুর দর্শনলাভ করামাত্রই আনন্দের সহিত সেই স্থানের নাম 'ভানুরাই' রাখা হইল। এবং সূর্য্যালোকে দিগ্‌ভ্রম অপনোদিত হওয়ায় বুঝা গেল, দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বাস্যে স্থাপিতা হইয়াছেন। তখন সকলেই বলিয়া উঠিত,— "ভুল হুয়া, ভুল হুয়া।" এই "ভুল হুয়া" শব্দ হইতেই রাজ্যের নাম ভুলুয়া হইয়াছে। স্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩০৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয় পূবের্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রচলিত প্রবাদসমূহের মধ্যে উপরোল্লিখিত বাক্যই অধিক প্রচলিত এবং প্রবল বলিয়া জানা যায়। পশ্চিমাভিমুখীন স্থাপিত করিয়া ছাগাদি বলিপ্রদান শাস্ত্রসিদ্ধ না হইলেও প্রথমানুষ্ঠিত কার্য্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ ভুলুয়ার কোন কোন তান্ত্রিক সমাজে অদ্যাপি সেই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

বিশ্বম্ভর, ভানুরাই গ্রামে স্বীয় আরাধ্যা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপনার পর, এই স্থানের অল্প উত্তর দিকে, শিমুলিয়া গ্রামে গড়- পরিখা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ রাজবাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন ; এবং নানাস্থান হইতে বিবিধ জাতীয় লোক আনিয়া নগরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উক্ত গড়খাই এখনও প্রশস্ত এবং গভীর আছে। জলে নামিয়া মৎস্য ধরিবার কালে কোন কোন সময় এই পরিখা হইতে নর-কঙ্কাল উত্থিত হইতে দেখা যায়। জনপ্রবাদ এই যে, এখানে ভূগর্ব্তে একটী সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। বিশ্বম্ভরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ লক্ষ্মণমাণিক্যও কিয়ৎকাল এই রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সঙ্কলিত রাজমালা হইতে ভুলুয়া রাজপরিবারের বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিয়া রাজমালা দ্বিতীয় লহরে দেওয়া হইয়াছে। সেই তালিকা অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম। এই কারণে বিশুদ্ধ বংশ-পত্রিকা সংগ্রহ জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। অল্পদিন হইল, ভুলুয়া আমিশপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে ভুলুয়ার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং রাজবংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি।

কৈলাসবাবু ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্রের নাম বলরাম রায় লিখিয়াছেন। রাজমালায় 'দুর্ল্লভ নারায়ণ' নাম পাওয়া যায়, বলরামের নামোল্লেখ নাই। উক্ত বংশাবলীর প্রতি সন্দেহ করিবার ইহাই প্রধান কারণ। বিশেষতঃ ঢাকা মিউজিয়মের সুযোগ্য কিউরেটর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, মহাশয় 'বলরাম' নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়* সেই সন্দেহ অধিকতর গাঢ় হইয়া উঠে। মহিমবাবু এই সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত বংশ-পত্রিকায় লক্ষ্ম -ণমাণিক্যের পুত্র স্থলে ধর্ম্মমাণিক্য, ব্রহ্ম বা বলরামমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্য এই চারিটি নাম লিখিত আছে। মহিমবাবু পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন,— "দুর্লভনারায়ণ বা দুর্লভ রায় নামক কোন ভুলুয়াপতির সহিত ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হয় নাই। অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা দুর্লভমাণিক্য নহেন,— মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র বলরামমাণিক্য।" ইহা স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি। এরূপ স্থলে লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র যে বলরাম ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না রাজমালা রচয়িতা সম্ভবতঃ বলরামের নাম অবগত ছিলেন না। তিনি যে দুর্লভনারায়ণ নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা লক্ষ্মণমাণিক্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। অতঃপর তদ্বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। এরূপ নাম-বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। মহিমবাবুর প্রদত্ত ভুলুয়া রাজবংশাবলীর কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। সমগ্র বংশ-পত্রিকা অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া তাহা পরিহার করিতে হইলে।

ভুলুয়ার রাজবংশাবলী

* নলিনীবাবু লিখিয়াছেন ;— "ভুলুয়া শব্দ ইংরেজীতে অনেক সময় ভুলুয়া বা বালুয়া লিখিত হইত, ছাপার ভুলে 'বলরাম' লিখিত হইয়াছে। লং সাহেব ও কৈলাসবাবু তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।"

বিচিত্রা—বৈশাখ, ১৩৩৫।

রাজা কবিচন্দ্র খাঁ-র পৌত্র উদয়, ত্রিপুরেশ্বরগণের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সগৌরবে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করেন। ইহাই ভুলুয়া রাজবংশের প্রথম মাণিক্য উপাধি। তদবধি কতিপয় পুরুষ পর্য্যন্ত ভুলুয়ার রাজগণের ঐ উপাধি চলিয়াছিল। এমনকি, ত্রিপুরেশ্বরগণের নামের অনুকরণ করিবার নিমিত্তও তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। উদয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, লক্ষ্মণমাণিক্য, গোবিন্দমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অমরমাণিক্য ও রামমাণিক্য প্রভৃতি নামের সহিত ত্রিপুরেশ্বরগণের নামের একতা লক্ষিত হয়। 'মাণিক্য' উপাধি লইয়া ত্রিপুরার সহিত ভুলুয়ার মনোমালিন্য অনেককাল চলিয়াছিল এবং এই কারণে অনেকবার ভুলুয়াপতিদিগকে পর্য্যুদস্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজাগণ সহজে সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন নাই।

---

* রাজমালায় ইঁহার নাম দুর্লভনারায়ণ লিখিত হইয়াছে।

† ইঁহার পত্নী রাণী শশীমুখী কর্ত্তৃক বারাহীবিগ্রহ আমিশাপাড়া গ্রামে স্থাপিতা হইয়াছেন ; তদবধি উক্ত স্থানেই দেবীর অর্চ্চনা চলিতেছে।

দ্রষ্টব্য— রাজা বিশ্বম্ভরের বংশধরগণ নোয়াখালী জেলাস্থিত শ্রীরামপুর, দত্তপাড়া, গন্ধর্ব্বপুর, কল্যাণপুর বড়হালিয়া, বাবুপুর, কৃষ্ণরামপুর, মহেশপুর, খালিলপুর ও মাইঝদী গ্রামে, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত জীবনপুর, করইতলী প্রভৃতি গ্রামে এবং রাজসাহী জেলার চৌধুরী ভবানীপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের সকল শাখার বংশাবলীই সংগ্রহ করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে প্রদান করিবার সুবিধা ঘটিল না।

ভুলুয়াপতি, রাজা রাজবল্লভের পুত্র লক্ষ্মণমাণিক্য তদানীন্তন দ্বাদশ ভৌমিকগণের একতম। তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। তিনি এবং বঙ্গের আরও কতিপয় ভৌমিক মোগল সম্রাটকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য বীরপুরুষ ছিলেন। মঘ, ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীজ) এবং মুসলমানগণের সহিত তিনি বারম্বার আহবে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের সহিত ইঁহার মনোমালিন্য থাকিলেও বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

এই সময় মঘ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণের উপদ্রবে মেঘনানদের মোহনার সন্নিহিত প্রদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী স্থানগুলি জনশূন্য হইতে চলিয়াছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও রামচন্দ্র, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য এই দস্যুদিগকে দমন করিয়া দেশের অশান্তি নিবারণকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে, উক্ত উভয় জাতীয় দস্যুর অত্যাচারে দেশের গুরুতর দুর্গতি ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। ইঁহার দলবদ্ধ হইয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন, মনুষ্য চরি এবং দাস ভাবে তাহাদিগকে ব্যবহার ও বিক্রয় করিতেছিল। ইহাদের দৌরাত্ম্যে দেশের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

লক্ষ্মণমাণিক্য রাঢ়, মিথিলা, বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগকে আনিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা হইতেও অনেক ভদ্র পরিবার আসিয়া এই স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রায় সকলকেই রাজসরকার হইতে যথাযোগ্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করা হইত। এই সময়ে বিক্রমপুরের আদর্শে ভুলুয়া সমাজকে উন্নীত করিবার নিমিত্ত রাজা বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য কেবল বীর ছিলেন, এমন নহে ; তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত "বিখ্যাত বিজয়" নাটক, "কৌতুক রত্নাকর", এবং "কুবলয়াশ্ব চরিত" নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ। "বিখ্যাত বিজয়" নাটক অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধের উপাখ্যান লইয়া রচিত এবং ভুলুয়ার "ভারতী রঙ্গমালয়ে" অভিনীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে, আর একখানা নোয়াখালি জেলাস্থ খিলপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের গৃহে আছে। কৌতুক রত্নাকরের একখানা পাণ্ডুলিপি ঢাকা ইউনিভারসিটির পুস্তকালয়ে (Dacca University. S. No. 1871.) এবং আর একখানা আগরতলার রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কুবলয়াশ্ব চরিত গ্রন্থের বিষয় শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আলোচনা

করিয়াছেন।* বিখ্যাত বিজয় নাটকের প্রারম্ভ ভাগের কিয়দংশ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের অনন্যসাধারণ বীরত্বকাহিনী বর্ত্তমান কালেও লোকমুখে ঘোষিত হইয়া থাকে। ইনি সমুদ্রের উপকূলভাগের আধিপত্য লইয়া মঘ, পর্ত্তুগীজ ও মুসলমানগণের সহিত বারম্বার জলযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ চরিজীবন স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ পর্ত্তুগীজ দস্যুদলের সহযোগিতায়ও ইঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। জলদস্যুগণের উপদ্রব নিবারণ এবং জলপথে রাজ্য আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে লক্ষ্মণমাণিক্য মেঘনা নদ ও বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত কল্যাণপুরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া শিমুলীয়ার বাসভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ, বিশ্বম্ভরের স্থাপিতা বারাহী দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি কল্যাণপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার কালে দেবীমূর্ত্তি আদি-পীঠস্থান হইতে উঠাইয়া নব-রাজধানী কল্যাণপুরের সন্নিহিত বারাহীনগর নামক গ্রামে স্থাপনা করেন। প্রবাদ এই যে, দেবীর প্রথম স্থাপিত সুবর্ণ-ঘট এখনও ভানুরাই গ্রামেই রহিয়াছে। বারাহী বিগ্রহের বিবরণ অতঃপর আলোচিত হইবে।

সামাজিক বিষয় লইয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণের সহিত ভুলুয়ার রাজা কবিচন্দ্র খাঁ-এর মনোমালিন্য ঘটিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাগরের উপকূলভাগের সীমারেখা লইয়া উভয় রাজ্যের বিবাদ পুরুষানুক্রমে চলিতেছিল। বিশেষতঃ দীক্ষাগুরু লইয়া এই বিবাদ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায়। হুগলী জেলাস্থ বাঁশবেড়িয়ার সিদ্ধজীবন দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য (নোয়াখালী জেলাস্থিত বাবুপুরের ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ) চন্দ্রদ্বীপের রাজগুরু ছিলেন, তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সিদ্ধজীবনের প্রপৌত্র রামরমন ভট্টাচার্য ভুলুয়ারাজা লক্ষ্মণমাণিক্যকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বকালে, লক্ষ্মণমাণিক্য স্বীয় গুরুকে বলপূর্ব্বক ভুলুয়ায় আনিয়া পাঁচপাড়া গ্রামে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি দিয়া স্থাপিত করেন। কথিত আছে, লক্ষ্মণমাণিক্যের অনুচরগণ, গুরু রামরমণের ঘর, আসবাবপত্র এমনকি বৃক্ষাদি পর্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল। "ভুলুয়াই-লুঠ" নামে একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, অনেকের মতে এই ঘটনা হইতেই সেই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সুত্রে উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়। কন্দর্পনারায়ণ ভুলুয়ার যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমণের পর তদীয় পুত্র রাজা রামচন্দ্রও পিতৃবৈরীর সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

* Report for the scarch of Sanskrit Manuscripts 1895—1900

রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত সন্ধির নিমিত্ত কপট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় কোষ-নৌকায় আহ্বান করিলেন। লক্ষ্মণ সরলচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রের নৌকায় গিয়াছিলেন। তথায় আমোদ-প্রমোদের সমারোহ যথেষ্ট ছিল। লক্ষ্মণমাণিক্য বিমুগ্ধচিত্তে নর্ত্তকীবৃন্দের নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছেন, এই সময় তাঁহার অজ্ঞাতসারে নোকা ভাসাইয়া ধীরে ধীরে মেঘনা-বক্ষে নীত হয়। তখন রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রধান সেনাপতি রামাইমাল ও অন্যান্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিরস্ত্র ও নিঃসহায় লক্ষ্মণমাণিক্যকে অকস্মাৎ আক্রমণ এবং বন্দী করিল। এই অবস্থায় বীরকেশরী লক্ষ্মণকে চন্দ্রদ্বীপ-রাজধানীতে নেওয়ার পর নির্ম্মমভাবে নিহত করা হইয়াছিল।* প্রচলিত প্রবাদ এই যে, লক্ষ্মণমাণিক্য বন্দী অবস্থায় বিক্ষুব্ধচিত্তে একটী তালবৃক্ষকে পৃষ্ঠের চাপে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। তিনি যে বিপুল বলশালী ছিলেন, তাঁহার ব্যবহৃত এক মণ ওজনের লৌহময় বর্ম্মই এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই কবচের খণ্ডিত অংশ কিয়ৎকাল কল্যাণপুরের চৌধুরীবাড়ীতে ছিল। শুনা যায়, বর্ত্তমান কালে তাহা তারিণীচরণ নট্ট নামক জনৈক কবির সরকারের বাড়ীতে অযত্নে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। ইহা সযত্নে রক্ষণোপযোগী বস্তু।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পর তদীয় পুত্র বলরামমাণিক্য ভুলুয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কল্যাণপুর পরিত্যাগ করিয়া চরসাই গ্রামে রাজধানী স্থাপন এবং বিহিরগাঁয়ে এক বিলাস-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত গ্রামে তাঁহার আরাধ্যা তারামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার সময় হইতেই ভুলুয়ার অবনতি আরম্ভ হয়। তৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এবং বলরামের পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলী এ-স্থলে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বলরাম পঞ্চ ম-কারের সেবায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, পিতার বীরত্ব এবং যশোরাশি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে লক্ষ্মণমাণিক্য কর্ত্তৃক ভুলুয়া রাজ্য শাসিত হইতেছিল, সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই পাওয়া

---

* "চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ" প্রণেতা স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন,— "রামচন্দ্র সসৈন্যে যুদ্ধার্থ ভুলুয়ায় গমন করেন। লক্ষ্মণমাণিক্য এই বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, রামচন্দ্রকে বধ করিবার নিমিত্ত একাকী খড়গহস্তে তাঁহার নৌকার দিকে ধাবিত হইলেন। লক্ষ্মণ ক্রোধভরে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নৌকায় পাদক্ষেপ করা মাত্র পাটাতন স্খলিত হওয়ায় তিনি নৌকার ডহরের মধ্যে পতিত হইলেন। অমনি তাঁহার হস্ত পদ সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হয়, এবং তদবস্থায় লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে নীত ও রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছলেন।"

যায়। এই লক্ষ্মণমাণিক্যই এক সহস্র কুলি প্রদান দ্বারা অমরসাগর খননকার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁ মসনদ আলী

অযোধ্যা নিবাসী কালিদাস নামক ব্যক্তি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। তাঁহার "গজদানী" উপাধি ছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদাস গজদানী বাদশাহের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন একটী করিয়া সুবর্ণ নির্ম্মিত গজ (হস্তী) দান করিবার দরুণ ইঁহাদের "গজদানী" উপাধি হইয়াছিল। সে-কালে এই ভ্রাতৃযুগলের প্রতিপত্তি এবং প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

সম্মান ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের আশায় কালিদাস ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মতান্তরে, ইনি বিপাকে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ মালেক-উল্-উলমা ইঁহার উক্ত ধর্ম্মের দীক্ষাদাতা। মুসলমান হইয়া ইনি সোলেমান খাঁ নাম লাভ করিলেন।* ইঁহার পুত্র, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের অগ্রগণ্য ঈশা খাঁ মসনদ আলী। এই বংশের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।
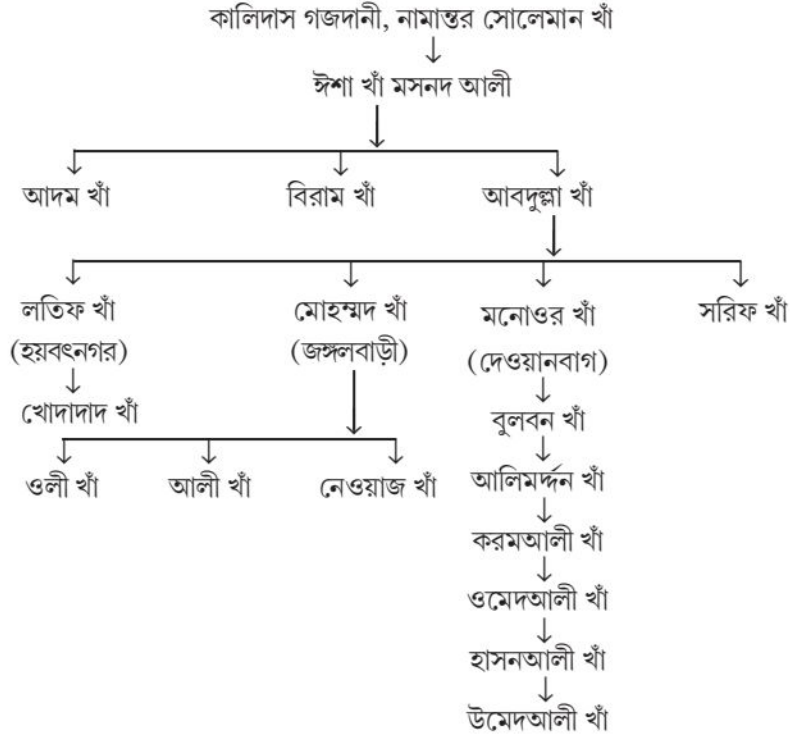
* সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস —৫ম অঃ, ৯৬ পৃষ্ঠা

ঈশা খাঁ, ঢাকার অন্তর্গত খিজিরপুরে আবাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া, ভাওয়ালের ফজল গাজীর ন্যায় এক নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময় ঈশা খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত ছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ্ বার ভূঞাদিগের মধ্যে ঈশা খাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ ফিচ্ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া ঈশা খাঁকে সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা রূপে দেখিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও ঈশা খাঁ-এর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। J. Wise-এর গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা যাচ্ছে ঃ—

"The most celebrated of all the bhueyas however, was Isa Khan Masnad Ali of Khijerpur. He is described by Abul Fazal as the Marzbon-- Bhati or Governor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great zeminders".

বেহারে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হওয়ার সময়কালে সম্রাট আকবরের আদেশানুসারে রাজস্ব-সচীব টোডর মল্ল বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহ দমন এবং রাজস্ব অবধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ঈশা খাঁ সহজেই দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকার বাজুহা * ও সরকার সোণার গাঁয়ের † আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এতদুভয় সরকারের বিস্তৃতি সামান্য ছিল না, উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত ইহার সীমা নির্দ্ধারিত ছিল।

ঈশা খাঁ খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াশাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ় ও নিরাপদ করিবার অভিপ্রায় ত্রিবেগ (১), হাজিগঞ্জ (২) ও কলাগাছিয়া (৩) নামক স্থানে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ, এবং একডালা (৪) ও এগারসিন্ধুর (৫) প্রাচীন দুর্গদ্বয়ের সংস্কার কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

ঈশা খাঁ স্বীয় বল দৃঢ় করিয়া, দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। এই বার সম্রাট ইঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বঙ্গদেশে প্রেরণ, করিয়াছিলেন। সাবাবাজ খাঁ দলবলসহ ঈশা খাঁকে আক্রমণ এবং যুদ্ধে পরাভূত করায়, ঈশা খাঁ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। সাহাবাজ খাঁ

---

* সরকার বাজুহার অন্তর্গত ভূ-ভাগ হোসেন শাহের শাসনকালে 'নছরতসাহি' নামে এবং ইংরেজ শাসন কালে জেলা ময়মনসিংহ নামে অভিহিত হইয়াছে।

ঢাকার বর্ত্তমান সদর ষ্টেসন সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন ঢাকার অবশিষ্ট ভূ-ভাগ লইয়া সরকার সোণারগাও নামকরণ হয়।

(১)—(৫)। পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত স্থানের বিবরণে এই-সকল দুর্গের অবস্থান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'সাহাবাজপুর' নামে অভিহিত হইয়াছে। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

ঈশা খাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে দিল্লীতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরিত হইল। "আকবরনামা" গ্রন্থে সাহাবাজ খাঁ-এর রণজয় বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই ;—

"রণজয় সংবাদ মুন্সী আবুলফজল সম্রাট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন ঃ— অতিশয় সন্তোষদায়ক রণজয় সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহে সাহাবাজ খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া সাগরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন।" *

বিজয়গর্ব্বোন্মত্ত সাহাবাজ খাঁ ঈশা খাঁকে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে ঈশা খাঁ অকস্মাৎ সসৈন্যে মোগল সেনাপতির শিবির আক্রমণ করিলেন। সাহাবাজ খাঁ অপ্রস্তুত বিধায় এই আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে ঈশা খাঁ তাঁহার পূর্ব্ব অধিকৃত প্রদেশ পুনরধিকার করিয়া বসিলেন।

ঈশা খাঁ-এর রাজধানী মোগল সেনাপতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায়, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সুবর্ণগ্রামে নব-রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে এই রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁ পুনর্ব্বার শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এবং সরকার বাজুহা-তে একটী দুর্গ ও বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সময় কোচরাজা লক্ষ্মণহাজো, হাজরাদী প্রভৃতি ভূ-ভাগ শাসন করিতেছিল। ঈশা খাঁ ইহাকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া, সেই স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থান জঙ্গলাবৃত থাকায়, ইহার নাম "জঙ্গলবাড়ী" রাখা হইল। এই রাজধানীকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশা খাঁ রাঙ্গামাটী ও দশকাহনিয়াতে দুইটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

ঈশা খাঁ, মোগল সেনাপতি সাহাবাজ খংাকে পরাজিত করিবার পর দিন দিন আত্মশক্তি বর্দ্ধি এবং সুদৃঢ় করিতেছিলেন। এই সময় (১৫৯৫ খ্রীঃ) রাজা মানসিংহ ভৌমিক দলকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। তিনি প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের রাজধানী আক্রমণ এবং অধিকার করেন। ঈশা খাঁ তখন একডালা দুর্গে ছিলেন। মানসিংহ ডেমরা নামক স্থানে ছাউনী করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাস —৫ম অঃ, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা

একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। ঈশা খাঁ এইস্থানে পরাভূত হইয়া এগারসিন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মানসিংহ এগারসিন্ধু আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে ঈশা খাঁ-এর সৈন্যদল সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে মানসিংহের জামাতাকে নিহত করিয়া ঈশা খাঁ জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ চালিয়াছিল, বিজয়লক্ষ্মী কোন পক্ষকেই কৃপা করিলেন না। তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে রণক্ষেত্রে মানসিংহের হস্তস্থিত তরবারি ভগ্ন হওয়ায়, ঈশা খাঁ যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া মানসিংহকে অস্ত্র গ্রহণের অবসর প্রদান করিলেন। বীর হৃদয়ের ঔদার্য্য বীরকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে। ঈশা খাঁ-এর এবম্বিধ সৌজন্য এবং বীরোচিত উদারতা দর্শনে মানসিংহ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ঈশা খাঁ-এর সহিত সন্ধি স্থাপন এবং তাঁহাকে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন। সম্রাটের দরবারে ঈশা খাঁ সাদরে গৃহীত এবং "মসনদ আলা" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি বাদসাহের সনন্দ দ্বারা বাইশটী পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

ঈশা খাঁ-এর শাসনকালের পূর্ব্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোচ, হাজং প্রভৃতি নানা জাতির প্রাধান্য ছিল। ঈশা খাঁ তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া ভদ্র শ্রেণীর নানা জাতীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের বসতি স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্বে যাহারা এই অঞ্চল শাসন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরের মদনকোচ, সদর মহকুমাস্থিত বোকাইনগরের বোকা কোচ, এবং টাঙ্গাইল মহকুমাস্থ কাগমারির হোররাজার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

ঈশা খাঁ-এর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ভাওয়ালের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে গাজী বংশের আধিপত্য প্রবল ছিল। ঈশা খাঁ-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গাজীবংশ

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ঈশা খাঁ কোন সময়ই সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত বা সম্রাট কর্ত্তৃক উপাধি লাভ করেন নাই। আকবর নামার তৃতীয় খণ্ডে, ঈশা খাঁ-এর বশ্যতা স্বীকার ও উপঢৌকন প্রদানের কথা বারম্বার উল্লেখ থাকিলেও বেভারিজ সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন,— "(In Akbar Nama Vol. III.) we are told more than once of his making submission and sending presents, but he was never really subdued, and his swamps and creeks enabled him to preserve his Independence as effectually as the Aravalli Hills protected Rana Pratap of Udaipur." (J. A. S. 13.— 1904. p. 61) এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ঈশা খাঁ কখনও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, আমাদের পূর্ব্বকথিত সরাইলে ঈশা খাঁ এবং এই ঈশা খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি। এবম্বিধ ঐতিহাসিক বিতর্ক সর্ব্বদাই চলিতেছে এবং অতঃপরও চলিবে।

নিষ্প্রভ এবং ঈশা খাঁ-এর অনুগত হইয়া পড়েন। ঈশা খাঁ-এর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই (খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষ পাদে) গাজীবংশীয়গণ পুনরুত্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত অরণ্যের দুই দিক হস্তগত করিয়াছিলেন। উত্তরে কড়ইবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশকাহনীয়া (সেরপুর), এবং দক্ষিণে ভাওয়াল বাজু ঈশা খাঁ-এর বংশীয়গণের হস্তচ্যুত এবং গাজীবংশের করায়ত্ত হইয়াছিল।

ঈশা খাঁ-এর পরলোকগমনের পর * অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার অধিকৃত ভূ-ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত এবং তাহার অধিকাংশই মুসলমানগণের হস্তগত হয়। হয়বৎনগর ও জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে মসনদ আলীর বংশধরগণের প্রভূত্ব স্থিরতর ছিল এবং অদ্যাপি তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

এই ঈশা খাঁ মসনদ আলী অমরসাগর খননকালে এক সহস্র মজুর প্রদান দ্বারা ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ক্ষেত্রে একটী বিষয় আলোচনাযোগ্য। কোন কোন ব্যক্তি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলী ও সরাইলের ঈশা খাঁ মসনদ আলীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নামের ও উপাধির একতাই এরূপ ধারণার মূলীভূত কারণ। নিবিষ্টচিত্তে সমগ্র বিষয় আলোচনা করিলে এই ধারণা পোষণ করা যাইতে পারে না। এতদ্বিষয়ক রাজমালার বাক্য পূর্ব্বেই প্রদান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির ভাষায় পাওয়া যায়,—

"সহস্র পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া।
ইছা খাঁ মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইয়া।।
* * * *
সরাইল ভুলুয়া দিছে হাজার হাজার।
সকলে দিয়াছে দাড়ি যত জমিদার।।"

প্রাচীন রাজমালার উক্তিও তদনুরূপ। তাহাতে পাইতেছি, —

"সহস্র পরিমাণ দাড়ি সুসয্য করিয়া।
ইছা খাঁ মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইয়া।।
* * * *
সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহস্র।
আর যত ভৌমিক দিয়াছে করি মিশ্র।।"

এস্থলে "ঈশা খাঁ মছলন্দ আলী" খিজিরপুরের ঈশা খাঁ। সরাইলের ঈশা খাঁ-এর নামোল্লেখ না থাকিলেও "সরাইল" শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশা খাঁ ও সরাইলের জমিদার এক ব্যক্তি ছিলেন না। তাহা হইলে ঈশা খাঁ-এর

---

* ১৫৯৯ শকে ঈশা খাঁ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নামোল্লোখের পরে পুনর্ব্বার সরাইলের নাম করা হইত না। আমাদের সম্পাদ্য পুথিতে উভয় মসনদ আলীকে অভিন্ন জ্ঞানে একমাত্র সরাইলের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যে পরবর্ত্তী কালের সংশোধনের ফল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আরও দেখা যায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ বাইশটী পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার * এবং ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর † সেই বাইশ পরগণার তালিকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত উভয় তালিকায় স্থানের নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও তাহা একই স্থানের নামান্তর মাত্র। তাহার কোন তালিকায়ই "সরাইল" নাম পাওয়া যায় না। যদি খিজিরপুরের ঈশা খাঁ সরাইলের ঈশা খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি হইতেন, তবে এই সকল তালিকায় অবশ্যই সরাইলের নাম থাকিত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ যে বাইশ পরগণার প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সরাইল তাহার বহির্ভূত এবং ভিন্ন ব্যক্তির অধিকৃত ছিল।

সরাইলের জমিদারগণের বংশ-তালিকা যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দেওয়ান মজলিস গাজীর নাম সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলীর বংশ পত্রিকায় এই নাম নাই। ইহাও দেখা যায় যে, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ-এর বংশধরগণ বর্ত্তমান কালেও হয়বৎনগর, জঙ্গলবাড়ী ও দেওয়ানবাগ নামক স্থানে সগৌরবে বিদ্যমান আছেন। এবং সরাইলের ঈশা খাঁ-এর বংশধরগণও সরাইলে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু সরাইলের জমিদারগণ পূর্ব্বোক্ত ঈশা খাঁ-এর বংশধরগণের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ রাখেন না। যদি উভয় স্থানের ভূম্যধিকারীগণের পূর্ব্বপুরুষ এক ব্যক্তি হইতেন, তবে পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ স্থিরতর থাকিত।

খিজিরপুরের ঈশা খাঁ সম্রাট আকবর হইতে এবং সরাইলের ঈশা খাঁ ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্য হইতে "মসনদ আলী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহাই পাওয়া যায়। খিজিরপুরের মসনদ আলীর বংশধরগণ নিকট সম্রাট প্রদত্ত উপাধির সনন্দ না পাওয়া কেহ কেহ মনে করেন, তিনি মহারাজ অমরমাণিক্য হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন ; এবং এই সূত্রেও উভয় ঈশা খাঁ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অমরমাণিক্যের প্রদত্ত উপাধির সনন্দও অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় সম্রাট আকবরের প্রদত্ত সনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাস — ৫ম অধ্যায়, ৫৭ পৃষ্ঠা।

† ময়মনসিংহ গীতিকা — ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

করা কিম্বা উভয় ঈশা খাঁকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ঈশা খাঁ সম্রাট হইতে নসরতসাহির আধিপত্য লাভের যে সনন্দ পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাহারও অস্তিত্ব নাই।* এরূপ স্থলে উপাধির সনন্দ পাইবার আশা করা যাইতে পারে না। সম্যক অবস্থা আলোচনা করিলে উভয় ঈশা খাঁ-এর মধ্যে প্রভাবেরও বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং ইঁহারা যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিদ্ধারণ করা কষ্টসাধ্য নহে।

বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে যে অমরসাগর খনিত হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা জানা যাইবে। বর্ত্তমান ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও কাছাড় প্রভৃতি জেলার তদানীন্তন প্রধান ব্যক্তিগণের সকলেই এই কার্য্যে মহারাজ অমরমাণিক্যকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, — অমরসাগর খনন ব্যাপারকে রাজসূয় যজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এতগুলি রাজা এবং জমিদারকে যিনি মজুর প্রদান জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন, তিনি যে অসাধারণ প্রভাবশালী ছিলেন, ইহা অতি সহজবোধ্য। তবে, ইঁহাদের সকলেই অমরমাণিক্যের অনুগত বা করপ্রদ ছিলেন, এমন নহে। কেহ আনুগত্য হেতু, কেহ প্রীতি রক্ষার্থ এবং কেহ বা ভয়প্রযুক্ত এই সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড।

তরপ, বর্ত্তমান কালে শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে ; পূর্ব্বে ইহা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ একটী খণ্ড রাজ্যে পরিগণিত ছিল। অমরমাণিক্যের পূর্ব্ব হইতেই তরপ প্রদেশ মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়া থাকিলেও তরপের জমিদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব ও আধিপত্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু অমরসাগর খননকালে এই জমিদার মজুর প্রদান করেন নাই। অমরমাণিক্য তরপের জমিদারকে এই অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পরে প্রদান করা হইবে।

---

* ময়মনসিংহের ইতিহাসে পাওয়া যায়,— "সম্রাট কুলতিলক আকবর শাহ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁকে যে সনন্দাদ্বারা নছরতসাহির আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও সুসঙ্গের রাজাদিগের প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার অংশ, তৎকালে নছরতসাহির অন্তর্গত ছিল।"

ময়মনসিংহের ইতিহাস—৪র্থ অধ্যায়, ৪৪ পৃষ্ঠা।

এই বাক্য আলোচনায় জানা যায়, কেদারনাথবাবু ঈশা খাঁ-এর প্রাপ্ত নসরতসাহির সনন্দ আলোচনা করিয়াছিলেন।

উক্ত বিশাল-বাপী (অমরসাগর) উদয়পুর নগরীর বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া অদ্যাপি মহারাজ অমরমাণিক্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২২৮ গজ এবং প্রস্ত ৩০২ গজ। ইহার গর্ব্তে ১২ দ্রোণ ১ কাণি ৩ গণ্ডা ভূমি পতিত হইয়াছে। এই সরোবরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থের পরিসর কম, এই কারণে ইহা দৃশ্যতঃ অস্বাভাবিক লম্বা বলিয়া মনে হয়। এই জলায় এখনও অত্যন্ত গভীর আছে। তিন বৎসরে ইহার খননকার্য্য শেষ হইয়াছিল।*

অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্যের খনিত আর একটি 'অমরসাগর' আছে। ইহা উদয়পুরস্থিত সরোবরের পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠি হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা ও জমিদারগণের সহিত এই সরোবর খননকার্য্যের কোনরূপ সংশ্রব থাকা জানা যায় না।

বারাহী বিগ্রহ

রাজা বিশ্বম্ভর শূর কর্ত্তৃক ভুলুয়াতে বারাহী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিগ্রহ সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

অনেকের মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মারিচী (মারজয়ী) এবং হিন্দু তান্ত্রিকগণের বারাহী বিগ্রহ অভিন্ন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকগণ এক মূর্ত্তিকেই স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবদেবীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক সময় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কোন মূর্ত্তিকে একই নামে এবং কোন মূর্ত্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সময়, তান্ত্রিকগণ যে মূর্ত্তিকে 'বারাহী' নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধগণ তাহাকেই 'মারিচী' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অনেক স্থলে উভয় মূর্ত্তির অবয়বের ঐক্যতা দর্শনে, এই কথা অসত্য বলিয়া মনে হয় না ; কিন্তু কোন কোন স্থলে অবয়ব বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা মারিচী মূর্ত্তিকে চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা ও অষ্টভুজারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বারাহী সর্ব্বত্রই অষ্টভুজা দেখা যায়। †

দেবী পুরাণে বারাহীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মতে বারাহী দেবী মাতৃকা বা যোগিনীবিশেষ। উক্ত পুরাণের দেবী নিরুক্তাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ;—

"বরাহ রূপধারী চ বরাহোপম উচ্যতে।
বারাহ জননী চাথ বারাহী বরবাহনা।।"

---

* পনর শ শকে অমরসাগর আরম্ভন।
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।।
অমরমাণিক্য খণ্ড।

† একই মন্দিরে হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের উপাস্য বিগ্রহ স্থাপিত থাকিবার নিদর্শনও বিরল নহে। যশোহর-খুলনার ইতিহাস ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্যত্র পাওয়া যায় ;—

"দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।
হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথা।।
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী কামরূপিনী।
এতাঃ সর্ব্বাশ্চ যোগিন্যো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে।।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মতে বারাহী, বরাহ দেবের শক্তিরূপিণী। যথা —

"যজ্ঞাবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্।।"

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে লিখিত আছে ;—

"বারাহরূপিনীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাম্।
শুভদাং সুপ্রভাং শুভ্রাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্।।"

পুরাণ ব্যতীত তন্ত্রেও বারাহী দেবীর উল্লেখ আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের মতে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহরক্ষা করিবার পর, তাঁহার নিম্ন পাটির দন্ত পঞ্চ সাগরে পতিত হওয়ায় সেই স্থানে মহারুদ্র ভৈরব এবং দেবী বারাহী বিরাজ করিতেছেন। তন্ত্রচূড়ামণি, শিবপার্ব্বতী সংবাদে, ৫১ বিদ্যোৎপত্তিতে পাওয়া যায়,—

"অধোদন্তে মহারুদ্রো বাহারী পঞ্চ সাগরে।"

এখন দেখা যাইতেছে, হিন্দুগণের বারাহীদেবী পুরাণ এবং তন্ত্র উভয় শাস্ত্রের মত-সিদ্ধ। পৌরাণিক যুগ হইতেই হিন্দু সমাজে বারাহীর অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ; তান্ত্রিকযুগে এই পূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল।

ভুলুয়ার বারাহী মূর্ত্তি অষ্টভুজা, এক খণ্ড উৎকৃষ্ট নিকষ-পাথর কাটিয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাতে কলাচাতুর্য্য যথেষ্ট আছে। মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য, প্রসন্ন ভাব এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শন করিলে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মাগধী শিল্পীর পুরুষ ভাবের দ্যোতনা আছে। কিন্তু ইহা গৌড়ীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটী আলীঢ় ভাবে যুদ্ধবেশে দণ্ডায়মানা। শিল্পী যে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই তা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ পদ্ম, ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নস্থ পদ্মের অনুরূপ। চালচিত্রে পাঁচটী ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। এই বিগ্রহ রাজা বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক ভুলুয়াতে যে অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বাল হইয়াছে।

এককালে বারাহী বা মারিচী মূর্ত্তি অর্চ্চনার বহুল প্রচারহেতু নানা প্রদেশ হইতে উক্ত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। কলিকাতাস্থ গবর্ণমেন্টের চিত্রশালায় ৩৬১৮, ৩৮২০ ও ৬২৬০ নম্বরে তিনটী মারিচী মূর্ত্তি রক্ষিত হইতেছে।

ইহা ৮০০---১২০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত এবং মাগধী শিল্প বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কৃপায় এই শ্রেণীর একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাহা রামপুর বোয়ালিয়ার চিত্রশালায় রাখা হইয়াছে। ভুলুয়ার মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির অবিকল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।* পাল বংশীয় প্রথম ভূপতি গোপাল, মারিচীর উপাসক ছিলেন।† বিক্রমপুরস্থ কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার গ্রামে কতিপয় মারিচী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কুকুটিয়ায় প্রাপ্তমূর্ত্তি ভুলুয়ার মূর্ত্তির সম্যক অনুরূপ।‡ এই সকল মূর্ত্তির অবয়ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ভুলুয়ার মূর্ত্তির উর্দ্ধভাগের কিয়দংশ খণ্ডিত। প্রবাদ বাক্যের সাহায্যে জানা যায়, কালা পাহাড়ের করস্পর্শে মূর্ত্তির এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

ভুলুয়ার বারাহী মূর্ত্তি পূজরি পরম্পরা নিম্নোক্ত ধ্যানমন্ত্রে পূজিতা হইতেছেন ;—

"ওঁ বারাহী অষ্টভুজাং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাং।
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ব্বাণাং মধ্যে শ্রীবদনাম্বুজাং।।
দক্ষকর্ণে মুখং দোর্গং বাম কর্ণে বরাহকং।
বরাহ বাহিনীমাদ্যাং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।।"

এই ধ্যানমন্ত্র বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। দেবীর বীজমন্ত্র "হ্রীং"। আবরণ দেবতা মহারুদ্র ভৈরব, দুর্গা, বরাহগণ, উমা, মহেশ্বর এবং স-বাহন প্রতিমাস্থ দেবতাবৃন্দ। এতদধিক বিবরণ এস্থলে প্রদান করিবার সুবিধা ঘটিল না।

বৌদ্ধগণ নিম্নোদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে মারিচীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ;—

"হেমাভা শূকরারূঢ়াং তপ্ত কাঞ্চন ভাসুরাং।
নীল যোর্দ্ধস্থিতাং [চৈব] চন্দ্রাম্ভোরুহসংস্থিতাং।।
অশোক বৃক্ষ শাখাগ্র বিলজ্ঞাং বাম পাণিনা।
বিভ্রতী বরদাকারং দক্ষিণ করপল্লবাং।।
দীপ্ত রত্নোপশোভেন মৌলিনা বুদ্ধ শেখরা।
শ্বেত বস্ত্রাং নমস্যামি মারীচীং অভয় প্রদাং।।"

সাধনমালা।

এই মূর্ত্তি বৌদ্ধগণ হইতে হিন্দুর গ্রহণ করা অপেক্ষা, বৌদ্ধগণ হিন্দু হইতে লইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়। পরে বৌদ্ধ শিল্পী কর্ত্তৃক মূর্ত্তি

---

* সাহিত্য—কার্ত্তিক, ১৩১৯ সন। ইহাতে মূর্ত্তির বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রদান করা হইয়াছে।

† Indian Antiquary Vol. IV. Page 364.

‡ ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ১৩শ অঃ ৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং হিন্দুগণও নিরাপত্তিতে সেই মূর্ত্তি গ্রহণ ও অর্চ্চনা করিয়াছে, সম্যক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই হৃদয়ে এরূপ ধারণা হইয়া থাকে।

ভুলুয়া বিজয়

মহারাজ অমরমাণিক্যের অমরসাগর খননে হস্তক্ষেপ করা, তাঁহার রাজত্বের প্রথম কার্য্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই কার্য্য আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টি ভুলুয়া রাজ্যের প্রতি পতিত হইল।

ভুলুয়ার রাজবংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই আনুগত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ত্রিপুরার সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে চেষ্টিত দেখা গিয়াছে। ভুলুয়াপতি উদয়মাণিক্য (রাজা বিশ্বম্ভর শূর হইতে অধস্তন ৭ম স্থানীয়) ত্রিপুরেশ্বরগণের অনুকরণে 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তদবধি ইঁহাদের হৃদয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পর কেবল উপাধির অনুকরণ করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, ত্রিপুরেশ্বরগণের নামের অনুকরণে সন্তানগণের নামকরণ করিবার প্রথাও এই পরিবারে অনেক কাল চলিয়াছিল।

বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভুলুয়ার রাজা ত্রিপুরেশ্বরকে কর প্রদান করিবার একটা আভাস পাওয়া যায়।* তৎপরবর্ত্তী কালে কর দিতেন কি না জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু প্রতি বৎসর ত্রিপুরার পুণ্যাহ উৎসব কালে রাজাকে নজর প্রদান করিতে ভুলুয়াপিত বাধ্য ছিলেন, তাঁহার নজরই সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইত। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরেশ্বরগমের রাজ্যাভিষেক কালে ভুলুয়াপতিগণ তাঁহাদের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া দিতেন। এই সকল কার্য্যের দ্বারা বুঝা যায়, ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীমধ্যে ভুলুয়ারাজ সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভুলুয়ারাজাগণ ত্রিপুরার অবাধ্যতাসূচক কোনও কার্য্য করা প্রকাশ পায় না। ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য স্থূলবুদ্ধা এবং অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন। অবিচলিত বিশ্বাসই রাজ্যের অবনতি এবং রাজার মৃত্যুর মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। ইঁহার শাসনকালে ভুলুয়ারাজ প্রথম শিরোত্তোলন করেন। তৎকালে দেবমাণিক্য ভুলুয়াপতিকে দমন করিয়া, সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় ভুলয়ার রাজা কে ছিলেন,

---

* ভুলুয়ার রাজা, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে লিখিয়াছিলেন,—

"বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।"

অমরমাণিক্য খণ্ড—১২শ পৃষ্ঠা।

বহু চেষ্টায়ও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে নাই। ভুলুয়ারাজগণের সময় নির্দ্ধারণোপযোগী কোনরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

অতঃপর উদয়মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক কালে ভুলুয়ার রাজা টিকা প্রদান করিতে অসম্মত হন। উদয়মাণিক্য পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলেন, স্বীয় জামাতা মহারাজ অনন্তমাণিক্যকে বধ করিয়া তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য দ্বারা রাজ্যলাভ করিলেন সত্য, কিন্তু অযোগ্যতা এবং দুশ্চরিত্রতা হেতু রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট ঘটাইয়াছিলেন। ইঁহার সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য মুসলমানের কুক্ষিগত হয়। উদয়মাণিক্য রাজবংশীয় নহেন বলিয়া চিরবশ্য ভুলুয়ারাজ ইঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে,—

"দুর্লভনারায়ণ নাম সুর জমিদার।
নৃপমান্যে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার।।
পূর্ব্বপুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে মিলে।
সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্যকালে।।
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি।
দুর্লভনারায়ণ না মিলিল অহঙ্কার বাদী।।
রাজবংশ মারিয়া তুমি উদয়মাণিক্য।
আমিও ভুলুয়া রাজা তুমি সমকক্ষ।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড— ১১ পৃষ্ঠা।

ছত্রমাণিক্যের বংশধরগণের হস্তে রক্ষিত রাজমালার পাঠ অন্যরূপ, তাহাতে পাওয়া যায়,—

"দুর্লভনারায়ণ সুর ভুলুয়া জমিদার।
রাজার সমান সে যে তেমত সংসার।।
প্রতি পুরুষ তারা ত্রিপুরেতে মিলে।
এহার পূর্ব্বে অমরমাণিক্যেতে না মিলে।।
উদয়মাণিক্য রাজা ছিল সেনাপতি।
সেই হেতু না মিলিল ভুলুয়ার পতি।।
উদয়মাণিক্য রাজা পাঠাইল লিখন।
তাহাকে উত্তর লিখে দুর্লভনারায়ণ।।
সেনাপতি রাজা হৈছ উদয়মাণিক্য।
দুর্লভমাণিক্য আমি তোমা সমকক্ষ।।
ইহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জ্বলে।
করিতে না পারে কিছু যুঝে গৌড় বলে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড।

ভুলুয়া রাজের ব্যবহার উদয়মাণিক্য ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার রাজা গৌড়ের সাহায্য লাভ করিয়াছেন জানিয়া, ভীতিপ্রযুক্ত নীরবে এই গুরুতর অবজ্ঞা সহ্য করিলেন।

অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে পূনর্ব্বার সেই কলহ উপস্থিত হইল। এই সময় ভুলুয়ার অধিপতি মজুর প্রদানদ্বারা অমরসাগর খননকার্যে সাহায্য করিয়া থাকিলেও ত্রিপুরার সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসী হইলেন। অমরমাণিক্য সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকা কালেই ভুলুয়ার ঔদ্ধত্য দর্শনে ক্ষুব্ধ ছিলেন, রাজ্যলাভ করিয়াও তদ্রূপ ব্যবহার পাওয়ায় তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভুলুয়ারাজ ত্রিপুরেশ্বরের অনুকরণে "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন, মহারাজ অমরের ইহা সহ্য হইল না। এই উপাধি পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি ভুলুয়া-রাজ্যের প্রতি আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভুলুয়ার অধীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন,— ''আপনি রাজা হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি। আমি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের জমিদার, আপনি তাঁহারই সেনাপতি, সুতরাং আপনার এরূপ আস্ফালন কার শোভা পায় না, এতদ্বিষয়ক রাজমালার বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অমরমাণিক্য রাজা যখনে হইল।
দুর্লভনারায়ণ প্রতি নৃপতি লিখিল।।
অহঙ্কারে পূর্ণ সে যে ভুলুয়া মাঝার।
নৃপতির পুত্র উত্তর লিখে পুনর্ব্বার।।
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি।
সে রাজার বড়ুয়া (১) হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড —১১-১২ পৃষ্ঠা।

ছত্রমাণিক্যের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত পুথির ভাষা অধিকতর পরিষ্কার, তাহা এই ;—

"পরে যদি অমরমাণিক্য রাজা হইল।
মাণিক্য না লিখ নাম তাহাকে লিখিল।।
না মানিল আজ্ঞা সে যে মত্তমান হয়।
তুমি না হইতে রাজা মোর নাম হয়।।
বিজয়মাণিক্য রাজার জামিদার আমি।
তাহান বড়ুয়া লোক আছিলা আপনি।।
আপনে হৈছ রাজা বড়ুয়া তনয়।
এহাতে আতঙ্গ (২) কর কিবা অতিশয়।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড।

---

(১) বড়ুয়া—সেনাপতির উপাধি। (২) আতঙ্গ— আস্ফালন।

এস্থলে একটী কঠিন সমস্যা দাঁড়াইতেছে। রাজমালার রচয়িতা, উদয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ভুলুয়ারাজ্যের নাম ''দুর্লভনারায়ণ রায়'' বা "দুর্লভমাণিক্য'' লিখিয়াছেন। ভুলুয়ার রাজবংশে "দুর্লভনারায়ণ'' নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য নামধেয় রাজাকে "দুর্লভনারায়ণ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যায়। রাজমালার উক্তিদ্বারাও এই অনুমানের সত্যতা উপলব্ধ হইবে। তাহাতে পাওয়া যায় ;—

"ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার বাকলায় বধিল।।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৩ পৃষ্ঠা।

এই লিপি নিতান্তই অস্পষ্ট ; কাহাকে বধ করা হইল, তাহাই বুঝা যাইতেছে না। প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"দুর্লভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদারে তাহারে বধিল।।"

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির ভাষার সহিত প্রাচীন রাজমালার ভাষার বিশেষ ঐক্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; তাহাতে পাওয়া যায় ;—

"দুর্লভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার তাহাকে মারিল।।"

এই সকল বাক্যদ্বারা পাওয়া যাইতেছে, বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি কর্ত্তৃক ভুলুয়ার যে রাজা নিহত হইয়াছিলেন, রাজমালাকার তাঁহাকেই 'দুর্লভমাণিক্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভুলুয়ার বিবরণে জানা গিয়াছে, ভুলুয়ার অধীশ্বর লক্ষ্মণমাণিক্যকে রাজমালাকার 'দুর্লভমাণিক্য' নাম প্রদান করিয়াছেন, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এবম্বিধ নাম বিভ্রাটের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে মনে হয়—লক্ষ্মণমাণিক্যের নামান্তর 'দুর্লভমাণিক্য' ছিল, বর্ত্তমানকালে সেই নাম বিস্মৃতি-গর্ত্তে বিলীন হইয়াছে ; অথবা রাজমালা রচয়িতার অনভিজ্ঞতা হেতু 'লক্ষ্মণমাণিক্য' স্থলে 'দুর্লভনারায়ণ' নাম লিখিত হইয়া থাকিবে। এই নাম বৈষম্যের কারণ যাহাই থাকুক, লক্ষ্মণমাণিক্যই যে রাজমালায় দুর্লভমাণিক্য নাম লাভ করিয়াছেন, ইহা স্থির নিশ্চয়। লক্ষ্মণমাণিক্য বীরপুরুষ এবং বিপুল শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; সেকালে ত্রিপুরেশ্বরকে উপেক্ষা করা তাঁহার ন্যায় বীর্য্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে।

আর একটী কথাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। রাজমালার মতে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প রায়, ভুলুয়ার রাজাকে বধ করিয়াছিলেন ; এই উক্তিও প্রমাদপূর্ণ।

কন্দর্প রায়ের পরলোক গমনের পর, তদীয় পুত্র রাজা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভুলুয়ার রাজা নিহত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজমালা লেখকের এই বিবরণ জানা ছিল না বলিয়াই ভুলুয়ারাজ্যের হত্যাকারীর নাম 'কন্দর্প রায়' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভুলুয়ার কোন্ রাজার সহিত অমরমাণিক্যের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা আর এক কঠিন সমস্যা। রাজমালার মতে মহারাজ অমরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভুলুয়ারাজের নাম দুর্লভমাণিক্য। রাজমালার নির্দ্ধারিত নাম যে প্রমাদমূলক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ভুলুয়ায়াধীশ্বর লক্ষ্মণমাণিক্যের নামান্তর বলিয়া বুঝা যায়। লক্ষ্মণমাণিক্যকেই রাজমালাকার দুর্লভমাণিক্য নামে অভিহিত করিয়াছেন, এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং রাজমালার মতে লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে মহারাজ অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, লক্ষ্মণের পুত্র রাজা বলরাম রায়কে মহারাজ অমরের প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ণয় করিয়াছেন।* শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও অমরমাণিক্যের প্রতিপক্ষ যোদ্ধার নাম রাজা বলরাম রায় লিখিত হইয়াছে। ইঁহার স্ব স্ব মতের পরিপোষক প্রমাণ প্রদান করেন নাই, অথচ এই মত ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না ; সুতরাং ইহা বিতর্কিত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ আলোচনা উপলক্ষে দেখা গিয়াছে, চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।† কন্দর্পনারায়ণের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র রাজা রামচন্দ্র রাজ্যারোহণ করেন। এই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপাধীশ্বর কন্দর্পনারায়ণের পরেও (১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দের পরে) লক্ষ্মণমাণিক্য কিয়ৎকাল জীবিত ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৮ শক পর্য্যন্ত (১৫৭৭—১৫৮৬ খ্রীঃ) মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। ‡ সুতরাং তিনি ভুলুয়ারাজ বলরামের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন না, এবং তাঁহার সহিত রাজা বলরামের সংগ্রাম হওয়াও সম্ভবপর নহে, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। ভুলুয়ার যুদ্ধে লক্ষ্মণমাণিক্যই মহারাজ অমরের প্রতিপক্ষ ছিলেন, সম্যক অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়।

---

* কৈলাসবাবুর রাজমালা— ৪র্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

† এই লহরের ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতার মতে কন্দর্পনারায়ণ ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

‡ "রাজগণের কাল নির্ণয়" শীর্ষক আলোচনায়, অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ক সম্যক বিবরণ জানা যাইবে।

এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে (১৫৭৮ খ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।* ভুলুয়ারাজের অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ অমর ছত্রিশ হাজার সৈন্যসহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। উজীর সিংহসরব নারায়ণ (সর্ব্বনারায়ণ সিংহ), সেনাপতি ছত্রজিৎ নাজির, রাজপুত্র রাজবল্লভ নারায়ণ এবং দুর্লভনারায়ণ সেনাপতি রাজার সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য (রাজমালার মতে দুর্লভ রায়) তিন শত পাঠান জাতীয় অশ্বারোহী এবং বহু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু ত্রিপুর সৈন্যের আক্রমণ-বেগ অধিককাল সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। লক্ষ্মণমাণিক্য দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই ; তাঁহার বিক্রমে মুসলমান, মঘ ও ফিরিঙ্গী প্রভৃতি সকল শক্তিই ব্যস্ত ছিল। সে-কালে ত্রিপুরার প্রবল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধনও সামান্য পরাক্রম বা অল্প সাহসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ভুলুয়ার অনুগত ও আশ্রিত জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজার হস্তী আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ ভুলুয়ারাজ জ্ঞানে তাঁহাকে বধ করিল। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ অমর মর্ম্মাহত হইয়া, ব্রহ্মবধজনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে নিহত ব্রাহ্মণের নাম এবং পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

ভুলুয়া বিজয়ের পর লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। নগরবাসিগণ ধন-সম্পত্তি হারাইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। গো, মহিষ এবং মনুষ্য পর্যন্ত লুণ্ঠিত ও নামাত্র মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া যায়,—

"ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার বাকলায় বধিল।।
তথায়ে মহারাজ হরিষ হইয়া।
লুটিল বাকলা রাজ্য সসৈন্য সাজিয়া।।
গো মহিষ মনুষ্য কত বহু লুঠা গেল।
এই সব বিক্রয়েতে রাজা আদেশিল।।
গো মূল্য চারিপণ ছাগ দুইপণ।
মুষ্যের মূল্য হৈল এক এক কাহণ।।
শ্রীহট্টের সৈন্য যত সঙ্গে গিয়াছিল।
লুঠের মনুষ্য নিতে নৃপে আদেশিল।।

---

* "চৌদ্দ শ ঊনশত শকে অমর দেব রাজা।
পনর শ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড—১১ পৃষ্ঠা।

রাজার তনয় রাজদুর্লভ (রাজবল্লভ) নারায়ণ।
তার সঙ্গে সেনাপতি দুর্লভনারায়ণ।।
বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তথা।
নৃপতি ফিরিয়া আইসে রাজধানী যথা।।

অমরমাণিক্য খণ্ড—১৩-১৪ পৃষ্ঠা।

এই সকল বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, মহারাজ অমর ভুলুয়া বিজয়ের পর, বাকলা রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়া সেখানে এক থানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,—

"তৎকালে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্য ইহা শ্রবণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য এই স্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য ধন ও বহুসংখ্যক লোককে দাসদাসীরূপে বন্দী করিয়া আনয়ন করেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭০ পৃষ্ঠা।

এই উক্তি প্রাচীন রাজমালার বাক্যদ্বারা সমর্থিত হয় না ; ইহা প্রমাদপূর্ণ বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন রাজমালায় ভুলুয়া বিজয়ের বিবরণে পাওয়া যাইতেছে ;—

"দুর্লভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার তাহারে মারিল।।
তবে ত অমর দেব হরষিত হৈয়া।
লুটিল সকল দেশ সসৈন্যে সাজিয়া।।
যত গরু বৎস সব মনুষ্য লুটিল।
ই সকল বেচিতে রাজায়ে আজ্ঞা দিল।।
চারিপণ গরু যে ছাগল দুইপণ।
মনুষ্যের দর হৈল এক এক কাহণ।।
শ্রীহট্টের লোক সবে লইতে আজ্ঞা দিল।
এহি মতে নরনারী লুটি বিক্রয় করিল।।
প্রধান তনয় রাজবল্লভ নারায়ণ।
সেনাপতি সঙ্গে রণদুর্লভ নারায়ণ।।
বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া রাখিলেক তথা।
আপনি চলিয়া আইলা নিজদেশ যথা।।"

প্রাচীন রাজমালা।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার পাঠও এতদনুরূপ। এই পুথিতে লিখিত আছে ;—

"দুর্লভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল।
কন্দর্প রায় জমিদার তাহাকে মারিল।।
শুনিয়া অমর দেবে তাহাকে শুনিয়া (?)।

লুটিল সকল দেশ হরষিত হৈয়া।।
গো মহিষ আদি মনুষ্য লুটিল।
বিক্রয় করিতে তাকে রাজা আজ্ঞা কৈল।।
গো মহিষ বেচিলেক মূল্য চারিপণ।
মনুষ্যের মূল্য হৈল জনেকে কাহণ।।
শ্রীহট্টের লোক কিনে রাজার আজ্ঞায়।
এহি মতে নরনারী সব বিক্রী যায়।।
রাজার প্রধান পুত্র দুর্লভনারায়ণ*।
সেনাপতি সনে দুর্লভনারায়ণের বল (?)।।
বড় পুত্র বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া তথাতে।
মহারাজা আসিলেক উদয়পুরেতে।।”

শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে, ভুলুয়ারাজের হত্যা বিবরণ এবং মহারাজ অমর কর্ত্তৃক ভুলুয়া লুণ্ঠনের কথা এক সঙ্গে জড়াইয়া অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা ইহা বুঝা যাইতে পারে যে, অমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন— বাকলা রাজ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত জটিল ভাষাকে সংশোধন করিতে যাইয়া, স্বর্গীয় উজীর দুর্গামণি ঠাকুর মহোদয় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি ভুলুয়ার লুণ্ঠন ব্যাপার বাকলার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন! এ যাত্রায় বিজয়মাণিক্য বাকলা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, এমন বুঝা যায় না ; কিন্তু রাজমালার উক্তিমতে ইহা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিমধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে।

এই লুণ্ঠনে যে ভুলুয়া রাজ্য ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। লুণ্ঠিত দ্রব্যের নির্দ্ধারিত দর হইতে জানা যাইতেছে, কড়ি মুদ্রার প্রচলন সেকালেও ছিল। তৎ-সময় মনুষ্য লুণ্ঠন এবং দাস-দাসীরূপে তাহাদিগকে বিক্রয় করিবার প্রথা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সুতরাং লুণ্ঠিত নরনারীদিগকে বিক্রয় করা বিচিত্র কথা নহে। তবে, প্রতি মনুষ্যের এক কাহণ (এক টাকা বা এক কর্যাপণের সমান) মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া নিতান্তই বিস্ময়জনক! নামমাত্র মূল্য গ্রহণ করিয়া মানুষগুলিকে বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অবস্থানুসারে ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই কার্য্য যে আক্রোশমূলক, তাহা অতি সহজে বোধগম্য।

শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে ভুলুয়া যুদ্ধে নিহত ব্রাহ্মণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, মহিমবাবু তাঁহারই বংশীয়। উক্ত বিবরণী হইতে নিহত বিপ্রবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা হইল।

---

* এস্থল ‘রাজবল্লভ’ বা ‘বল্লভ’ হইবে।

ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য, বিক্রমপুরস্থ বটেশ্বর গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ গোত্রজ ডিংসাই শ্রোত্রীয় বংশসম্ভুত রামনাথ চক্রবর্ত্তী (ভট্টাচার্য)-কে ভুলুয়ায় আনয়ন করিয়া নিষ্কর ভূমি প্রদান - পূর্ব্বক বলরা গ্রামে উপনিবিষ্ট করেন। ইনি রাজকবি এবং অমাত্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। রামনাথ কালক্রমে বলরা হইতে কল্যাণপুরে এবং কল্যাণপুর হইতে বিহিরগাঁয়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

রামনাথ কাব্যরসিক এবং কবি ছিলেন। তিনি মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের রচিত বীররসাত্মক "বিখ্যাত বিজয়" নাটক অভিনয়ের উৎসাহদাতা ছিলেন। এই সময় ভুলুয়ার রাজধানী কল্যাণপুরে "ভারতী রঙ্গশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবিজ্ঞ এবং কবিত্ব-গুণালঙ্কৃত রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া রামনাথের কবিত্বশক্তি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "সৎকার্য্য রত্নাকর" নামক একখানা সংস্কৃত কাব্য আছে।

রামনাথের রামশরণ ও রামরাম নামক দুইটী পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনুজ রামরাম চক্রবর্ত্তী জনসমাজে "রামঠাকুর" নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি তরবারি ও লাঠি চালনায় সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন; বিশেষ বলশালীও ছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত দ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ, সরল ও সূচ্যগ্র একখানা তরবারি, একটি সুদীর্ঘ বল্লম এবং অগ্নিসংযোগে ব্যবহার্য গুরুভার বিশিষ্ট একটি বন্দুক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে অনেককাল ছিল। ১২৯৩ সালে গৃহদাহ হওয়ায়, তৎকালে বন্দুকটী ও তরবারিখানা বিনষ্ট হইয়াছে, জীর্ণাবস্থাপন্ন বল্লমটী এখনও মহিমবাবুর গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

রামরামের অগ্রজ রামশরণ, বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার রাজচন্দ্রের সদস্য ছিলেন। এই জমিদারদ্বয় ভুলুযার রাজবংশসম্ভুত; ইঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। একদা পিতৃব্যের কার্য্যকলাপের সন্ধান লইবার নিমিত্ত কুমার রাজচন্দ্র স্বীয় অমাত্য ও সখা রামশরণকে গোপনে রাজার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণ রাজার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি ধরা পড়িলেন, রাজা তাঁহাকে অভয়বাক্যে মুক্তি প্রদান করিলেও অভিসন্ধি ব্যক্ত হওয়ার দরুণ ভীতিবিহ্বল রামশরণ বাবুপুরের বাস পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়ায়, রামশরণ নিজকে অধিকতর বিপন্ন মনে করিতেছিলেন।

কুমার রাজচন্দ্র রঙ্গমালা নাম্নী এক অপূর্ব্বা সুন্দরী নট্ট-ললনার প্রণয়াসক্ত ছিলেন। তিনি রঙ্গমালার নামে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাবুপুরের সর্ব্বশ্রেণীর সামাজিকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এতদুপলক্ষিত ভোজে রঙ্গমালা স্বয়ং পরিবেশন করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জাতিচ্যুতি ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে, বাবুপুরের ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া, বাড়ীঘর এবং ধনসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থানে পলায়ন করিলেন।* এই সময় রামশরণ বাবুপুর পরিত্যাগ করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্মে নব-দীঘিত

গোপালপুরের জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিয়া, ছয়টী পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া লীলা সম্বরণ করেন।

রাজচন্দ্রের এবম্বিধ সমাজবিগর্হিত কার্য্য দর্শনে পিতৃব্য রাজেন্দ্রনারায়ণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অনিষ্টপাতের মূলীভূত কারণ রঙ্গমালাকে স্বীয় অনুচরদ্বারা বধ করাইয়াছিলেন। এই ঘটনায় রাজচন্দ্র পিতৃব্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন; উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হওয়ায়, রাজচন্দ্র ভ্রাতৃবৃন্দসহ নিহত হইলেন। এই যুদ্ধ "চৌধুরীর লড়াই" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবং এই ঘটনা অবলম্বনে গ্রাম্য কবিদ্বারা এক গীতিকাব্য রচিত হইয়াছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়, বর্ত্তমান কালেও "চৌধুরীর লড়াই" গীত হইয়া থাকে।

অমরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত রামরাম চক্রবর্ত্তী (রাম ঠাকুর) ভুলুয়ারাজের পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং নিহত হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া মহারাজ অমরমাণিক্য ব্রহ্মবধজনিত পাপ বিমোচনকল্পে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এবং নিহত ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সন্ধান লইতে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদিগকে যথোচিত সাহায্যদান করাই মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সরলচিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই উদ্দেশ্যের মূলে এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা রোষদৃপ্ত অমরমাণিক্যকে শমন জ্ঞান করিয়া, অভাবনীয় নূতন বিপদের আশঙ্কায় অনুসন্ধানরত রাজপুরুষগণের নিকট আত্মগোপন করিলেন। এমনকি, পৈতৃক বাস্তুভূমিও তাঁহাদের নিকট বিভীষিকাময় হইয়া দাঁড়াইল; তাঁহারা স্বীয় কুলগুরু বাবুপুরের ঠাকুরগণের আশ্রয়ে সপরিবারে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনায় জ্ঞাতিবর্গ রাম ঠাকুরের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষাত্রোচিত ব্যবহারের নিমিত্ত অদ্যাপি তর্পণ কালে কেহই তাঁহার নাম করেন না।

রাম ঠাকুরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার অগ্রজ রামশরণের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশপত্রিকা এস্থলে প্রদান করা গেল।

রামনাথ

(বিক্রমপুর হইতে আগত)

রামরমণ

---

*এই ঘটনা, মহারাজ বল্লাল সেনের ডোম-কন্যা গ্রহণের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দেয়।

তরপ ও শ্রীহট্ট বিজয়
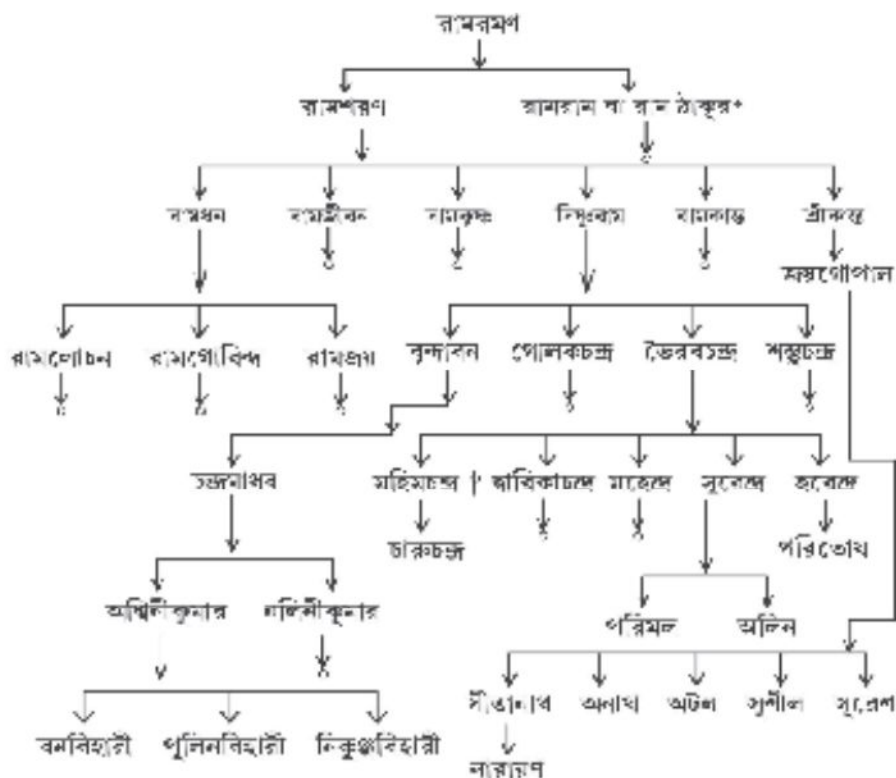
অমরমাণিক্য ভুলুয়াপতিকে দমন করিয়া পুনর্ব্বার অমরসাগর খননের আরব্ধ কার্য অগ্রসরের পক্ষে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়, —

"একদিন মহারাজা বৈসে সিংহাসনে।
এহিকালে কহে রণচতুর নারায়ণে।।
তোমার রাজ্যেতে বহু সুখে আছে প্রজা।
বহুদেশ অধিকারী হৈছ মহারাজা।।
নানাদেশী রাজা তোমা করে বহু মানে।
তরপের জমিদার তোমারে না মানে।।
ইহা শুনি মহারাজা বড় ক্রোধ হইল।
নিকটে থাকিয়া বেটা আমা না মানিল।।
অমরমাণিক্য রাজা বিশ্বাসেতে পুছে।
দীর্ঘিকা কাটিতে কেবা কত দাড়ি দিছে।।

রাজাবাবুর রাজমালা — অমরমাণিক্য খণ্ড।

---

*ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।

† ইনি এই গ্রন্থের নিমিত্ত ভুলুয়ার ও নিজ বংশের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সাহিত্য চর্চ্চা ইঁহার জীবনের ব্রত। ইঁহার মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কতিপয় গ্রন্থ আছে।

রাজাজ্ঞানুসারে বিশ্বাস, মজুরদাতাগণের নামসহ, মজুরের হিসাব প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—

"অমরসাগর কাটিতে সর্ব্ব দাড়ি দিছে।
দ্বাদশ বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিছে।।"

ইহা শুনিয়া মহারাজ অমর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং তরপের জমিদারকে তাঁহার অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। এই সময় তরপের জমিদার কে ছিলেন, নির্ণয় করা আবশ্যক।

তরপের প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায়, শ্রীহট্টে গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়ার ন্যায় তরপও একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। আধুনিক শ্রীহট্টনগরসহ তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকস্থ বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত, গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ লাউড় রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এবং শ্রীহট্টের উত্তর-পূর্ব্বাংশ ব্যাপীয়া ত্রিপুর রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ড জয়ন্তীয়া রাজ্যের শাসনাধীন ছিল।* গৌড় রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই স্বতন্ত্রভাবে তরপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্য সাধারণতঃ গৌড়ের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তরপের উপর ত্রিপুরেশ্বরগণের পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য ছিল, এবং পূর্ব্বোক্ত রাজ্যত্রয়ও ত্রিপুরার সামন্ত-রাজ্য মধ্যে গণ্য হইত।

প্রবাদ বাক্যের সাহায্যে জানা যায়, তরপের রাজা অকস্মাৎ রাজত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি 'আচাক' খ্যাতিলাভ করেন। অকস্মাৎ কোনও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিলে শ্রীহট্টের প্রচলিত ভাষায় তাহাকে 'আপেক' বা 'আচানক' ঘটনা বলে। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি হঠাৎ রাজপদ লাভ করায়, তিনি আচাকনারায়ণ নাম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নারায়ণ' উপাধি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতার চিহ্ন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ত্রিপুরা সেনাপতি এবং সামন্তগণের 'নারায়ণ' উপাধি ছিল। তরপের ইতিহাস প্রণেতাও আচাকনারায়ণকে ত্রিপুরার অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—

"আচাকনারায়ণ যে ত্রিপুরাধিপতির করদ কি সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকালে যিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন।"

তরপের ইতিহাস — ৩২ পৃষ্ঠা।

---

* "There were at this time three divisions of the present District — Gor (Sylhet) Laur, and Jaintia."

Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. (Sylhet).

উত্তরে বরবক্র নদী, পূর্ব্বে ভানুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা এবং পশ্চিমে লাখাই, ইহাই তরপ রাজ্যের সীমা ছিল। রাজপুর নামক স্থানে আচাকনারায়ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। আচাকনারায়ণের বংশপরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ ইঁহাকে ত্রিপুরার রাজবংশীয় বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ নেই। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

শ্রীহট্টে (গৌড় রাজ্যে) যে-সময় রাজা গৌড়গোবিন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন, রাজা আচাকনারায়ণ তৎকালে তরপের শাসন কার্যে লিপ্ত থাকা প্রকাশ পায়। এই সময় তরপ রাজ্যস্থিত কাজি নরুদ্দীন নামক একব্যক্তি স্বীয় পুত্রের বিবাহোৎসবে গোহত্যা করার অপরাধে রাজা আচাকনারায়ণ তাহার প্রাণদণ্ড করেন। নুরুদ্দীনের ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন, ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ মানসে দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাটের দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করে। এই সময় তোগলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।* তিনি এই অভিযোগ উপলক্ষে পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তনকল্পে স্বীয় ভাগিনেয় সিকান্দরশাহকে প্রচুর সৈন্যবলসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপা-ই-সালারকে তাঁহার সাহার্য্যার্থে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

সিকান্দর রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য নহে মনে করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষায় ব্রহ্মপুত্র তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় হজরত শাহজালাল নামক জৈনিক শক্তিশালী দরবেশ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করায়, সিকান্দরশাহ তাঁহার উপদেশানুসারে সৈন্য পরিচালনা দ্বারা অল্পায়াসেই শ্রীহট্ট জয় করিলেন। রাজা গৌড়গোবিন্দ পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ইংরেজ ইতিহাসিক হন্টারের মতে ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে, বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের শাসনকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।† তদবধি শ্রীহট্টে হিন্দু রাজ্যের বিলোপ এবং মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীহট্ট বিজয়ের পর, শাহজালালের উপদেশ মতে, সেনাপতি নারিসউদ্দিন তরপ্ আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তরপাধিপতি আচাকনারায়ণ গৌড়গোবিন্দের

---

* তরপের ইতিহাস — ছৈয়দ আবদুল আকবর কৃত, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম অঃ, ১৬ পৃষ্ঠা।

† "Sylhet appears to have been conquared by a small band of Muhammadans in the reign of Bengal King Shamsuddin in 1384 A.D. the supernatural powers of the last Hindu King. Gour Gobind, proved ineffectual against the still more extraordinary powers of the Fakir Shah Jalal, who was the real leader of the invaders."

Hunter's Statistical Accounts of Assam — Vol. II (Sylhet).

পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অশিক্ষিত অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবল পাঠান শক্তির সম্মুখীন হইয়া সুফল লাভের আশা নাই, সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাবও ফলপ্রদ হইল না। উত্তর পাইলেন কাজি নুরুদ্দীনের শোণিতের বিনিময়ে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে।

আচাকনারায়ণ দেখিলেন, উক্ত উভয় প্রস্তাবের একটীও তাঁহার দ্বারা পালিত হইবার নহে। তিনি উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় পরিবারবর্গসহ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।* ত্রিপুরাধিপতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃতরাজ্য উদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। কিয়ৎকাল পরে আচাকনারায়ণ ত্রিপুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মথুরায় যাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এই বিজয় বার্ত্তা দিল্লীতে পৌঁছিবার পর, সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ হৃষ্ট চিত্তে, বিজেতা সেনাপতি নাসিরউদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তদবধি নাসিরউদ্দীনের বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে এই রাজ্য কিয়ৎকাল শাসন করিয়াছেন। নাসিরউদ্দীনের পরলোক গমনের পর তৎপুত্র সিরাজউদ্দীন তরপের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইঁহার মুসাফীর ও ফকির নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মুসাফীর পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মুসাফীরের সৈয়দ শাহ খোদাবন্দ, ইস্‌মাইল, সুলেমান ও ইব্রাহিম নামক চারি পুত্র ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ খোদাবন্দ পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন। খোদাবন্দের পাঁচ পুত্র --- তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র শাহ ইস্রাইল পিতা কর্ত্তৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কিন্তু তিনি বিষয়-বিতৃষ্ণ ছিলেন; রাজ্যভোগ অপেক্ষা বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চাই তিনি অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। এই তিন ভ্রাতা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া "আউলিয়া" হওয়ায়, চতুর্থ পুত্র ছৈয়দ মিকায়েল রাজ্যলাভ করেন। মিকায়েলের চারি পুত্র --- নাজির খাঁ, আব্বাস বা দরওয়া খাঁ, মুসা এবং মিনা বা সুলতান। আব্বাস খাঁ অগ্রজ কর্ত্তৃক নিহত হন। মিকায়েল পুত্রগণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে মুসা খাঁকে কথঞ্চিৎ ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। তদনুসারে সৈয়দ মুসা পিতৃরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মুসা দৃঢ়তার সহিত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* হণ্টার সাহেবের মতে ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্ট ও তরপ মুসলমানগণের হস্তগত হয়। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রত্নমাণিক্য ১৩৬৬ খ্রীঃ অব্দে যে রাজত্ব করেন তা মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা জানা গিয়াছে, কিন্তু তিনি কোন্ সময় পর্য্যন্ত কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন, জানা যাইতেছে না। তৎপরবর্ত্তী রাজগণের সময় নির্ণয় করিবারও সুবিধা ঘটে নাই। আচাকনারায়ণ, ত্রিপুরেশ্বর রত্নমাণিক্যের কিম্বা তৎপরবর্ত্তী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তরপের অধিপতিগণের ক্রমিক তালিকা অঙ্কন করিলে নিম্নলিখিত মত দাঁড়াইবে।
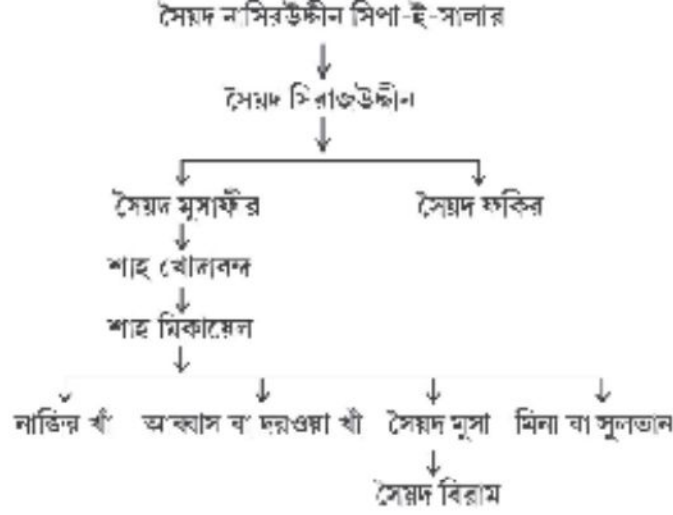
উক্ত বংশপত্রিকা আলোচনায় জানা যায়, শাহ মিকায়েলের পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র সৈয়দ মুসা পিতার স্থলবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন। রাজমালার মতে তরপের শাসনকর্ত্তা মুছে লস্কর, অমরমাণিক্যের বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজমালার বাক্য এই, —

"জিকুয়া গ্রামেতে সৈন্য কোঠ বান্ধি রৈল।
মুছে লস্কর সৈদ্ধিরাম তাতে ধরা গেল।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪ পৃষ্ঠা।

এস্থলে সৈয়দ মুসাকেই রাজমালার লেখক মুসে লস্কর (মুছে লস্কর) নামে আখ্যাত করিয়াছেন। 'মুসা' শব্দকে 'মুসে' করা অস্বাভাবিক নহে। সেকালে ত্রিপুরার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদিগকে 'লস্কর' উপাধি দেওয়া হইত; এই কারণেই সৈয়দ মুসাকে 'মুসে লস্কর' বলা হইয়াছে।

সৈয়দ মুসা, অমরসাগর খননকার্য্যে মজুর প্রদান না করায়, মহারাজ অমরমাণিক্য তরপ আক্রমণের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ও প্রধান সেনাপতি রাজধরনারায়ণকে নিয়োগ করিলেন। তিনি চন্দ্রদর্পনারায়ণ, চন্দ্রসিংহনারায়ণ, ছত্রজিৎনাজির, সমরভীমনারায়ণ, সৌররাষ্ট্রনারায়ণ, সমরপ্রতাপনারায়ণ, রণগিরিনারায়ণ, রণভীমনারায়ণ, রণযুঝারনারায়ণ, বীরঝম্পনারায়ণ, জগঝম্পনারায়ণ, অর্জ্জুননারায়ণ, হরিচক্রনারায়ণ, গজসিংহনারায়ণ, ত্রিবিক্রমনারায়ণ, প্রতাপসিংহনারায়ণ, শক্রমর্দ্দননারায়ণ, চন্দ্রহাসনারায়ণ, সুপ্রতাপনারায়ণ, হিঙ্গুলনারায়ণ, হৈতন খাঁ, রণসিংহনারায়ণ, আশাবন্তনারায়ণ, বীরসিংহনারায়ণ, সমরবীরনারায়ণ প্রভৃতি

সেনাপতিগণসহ বাইশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে প্রতাপনারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণের অধীনে প্রেরণ করা হয়। এই দলে জাঠা, খড়্গ এবং ধনুর্ব্বাণধারী দুই সহস্র ঢালী সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত গরুড়ব্যূহ রচনাপটু সেনাপতি গরুড়নারায়ণ এবং সরাইলের ঈশা খাঁ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

সেনানায়ক রাজধর, জিকুয়া গ্রামে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। প্রথম যুদ্ধেই তরপের অধিপতি সৈয়দ মুসা পরাভূত হইয়া, স্বীয় পুত্র সৈয়দ বিরাম সহ* ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাঁশের পিঞ্জরে ভরিয়া উদয়পুরে প্রেরণ করা হইল। দরবারে উপস্থিত করিবার পর, রাজাজ্ঞায় পুত্র মুক্তি পাইলেন, সৈয়দ মুসা (মুসে লস্কর) কারাগারে স্থান লাভ করিলেন।† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতার মতে সৈয়দ মুসার পুত্রের নাম সৈয়দ আদম ছিল; ইহা বিরামের নামান্তর হইতে পারে; অথবা শ্রীহট্টের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আদমকে ভ্রমপ্রযুক্ত সৈয়দ মুসার পুত্র বলা হইয়াছে।

এই যুদ্ধে শ্রীহট্টের তদানীন্তন আমিল আদম বাদশাহ, সৈয়দ মুসার সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাকেও দমন করা কর্ত্তব্যবোধে কুমার রাজধর পিতৃ আজ্ঞানুসারে সসৈন্যে শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় রাস্তায় আশঙ্কার কারণ থাকায়, সৈন্যগণ গরুড়ব্যূহ রচনা করিয়াছিল।

ত্রিপুর বাহিনীকে কিয়দ্দূর অগ্রসরের পরে জলপথের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা জিনারপুর হইয়া, সুরমা নদীপথ অবলম্বনে অগ্রসর হয়। শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা আদম এই বার্ত্তা শ্রবণে স্বীয় দলবলসহ অগ্রসর হইলেন। ত্রিপুর বাহিনী সুর্ম্মা নদী পার হইয়া গোধারাণী নামক স্থানে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইল। এই যুদ্ধে গজারোহী ত্রিপুর সেনানী ঐরাজিৎ (অরিজিৎ?) - নারায়ণ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপি তুমুল যুদ্ধের পর, ত্রিপুরার জয় হইল। বিজয়শ্রী ভূষিত রাজধর, সুর্ম্মাতীরে শিবির স্থাপন করিলেন; ফতে খাঁ, পাঠান সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন; তিনি

---

* সৈয়দ বিরামের নাম রাজমালা রচয়িতার হস্তে বিকৃত হইয়াছে। তিনি 'সৈয়দ' শব্দকে 'সৈদ'এ পরিণত করিয়া নামটী 'সৈদবিরাম' করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদ্য রাজমালায় এই নাম অতিরিক্ত মাত্রায় মার্জ্জিত হইয়া, 'সৈদ্ধিরাম' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! ইহা পরবর্ত্তী সংশোধনের ফল।

† বাঁশ ঘরা করি দুই জনেরে চালায়ে।
অতিকষ্টে বাঁশঘরে উদয়পুরে যায়ে।।
পুত্র নিল ভিন্ন লোকে বুড়া নিল আনে।
সৈদবিরাম ছোড়া হইল বুড়া বন্দিখানে।।
প্রাচীন রাজমালা — অমরমাণিক্য খণ্ড।

দেখিলেন, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রাজধরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

অতঃপর কুমার রাজধর শ্রীহট্টে যাইয়া নগর অধিকারপূর্ব্বক কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিজয়-চিহ্নস্বরূপ এক সরোবর খনন করাইয়া তাহার নাম "আদি রাজধর সাগর" রাখিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের শাসনসম্বন্ধীয় যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া রাজধর দেব, ফতে খাঁকে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ইটা গ্রাম হইয়া ঊনকোটী তীর্থে এবং তথা হইতে উদয়পুরে গিয়াছিলেন।

ফতে খাঁকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হইলে, মহারাজ অমরমাণিক্য তাঁহাকে সাদরে এবং সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দরবারে রাজ-জামাতার বাম পার্শ্বে তাঁহার উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি উদয়পুরে রাজসম্মানে ছিলেন, পঞ্চাশজন অশ্বারোহী তাঁহার অঙ্গরক্ষী ভাবে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। অতঃপর ফতে খাঁ বশ্যতা স্বীকার করায়, একটী হস্তী, পাঁচটী অশ্ব এবং নানাবিধ বস্ত্র উপহার প্রদান দ্বারা তাঁহাকে বিদায় করা হইয়াছিল। তরপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মুসাও (মুসে লস্কর) ইঁহার সঙ্গে বন্ধনদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর পাঠানগণ পুনরধিকার না-করা পর্যন্ত শ্রীহট্ট প্রদেশ ত্রিপুরার শাসনাধীন ছিল।

রাজমালার মতে ১৫০৪ শকে ফতে খাঁকে লইয়া কুমার রাজধর শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন।* অমরমাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ উৎকীর্ণ একটী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেই মুদ্রায় নিম্নোক্ত বাক্যগুলি লিখিত আছে; —

এই মুদ্রার প্রতিকৃতি এস্থলে সংযোজিত হইল। তাহা আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ অমর ১৫০৩ শকাব্দায় শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন — ১৫০৪ শকে নহে। মুদ্রা সম্বন্ধীয় প্রমাণ যে রাজমালার উক্তি অপেক্ষা প্রবল এবং নির্ভরযোগ্য, তাহা বলা

* পনর শ চাবিশক পৌষ মাস শেষে।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড — ১০ পৃষ্ঠা।

মহারাজ অমর মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয় সূচক মুদ্রা।
১৫০৩ শক।

নিষ্প্রয়োজন। রাজমালার উক্তির সহিত মুদ্রার বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কুমার রাজধর ১৫০৩ শকে শ্রীহট্ট বিজয় করিয়া, তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া শাসনশৃঙ্খলা ও দীর্ঘিকা খননাদি কার্য্য সম্পাদনের পর, ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে ফতে খাঁ-সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধ জয়ের পর শ্রীহট্টে অবস্থানের কথা রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে।

পারিবারিক কথা

রাজপরিবারের পারিবারিক প্রথার বিষয় মোটামুটি ভাবে রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে প্রদান করা হইয়াছে। তৃতীয় লহরে যে-সকল কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

বৈবাহিক বিবরণ

তৃতীয় লহরের অন্তর্গত ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে কে কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহারাজ অমরমাণিক্যের পট্টমহিষীর 'অমরাবতী' নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ ছত্র নাজিরের ভগ্নী ছিলেন, পিতার নাম পাওয়া যাইতেছে না। রাজধরমাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় লিখিত হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত ১৭০৭ শকাব্দের একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একমাত্র রাজার নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে, মহারাণীর নামের উল্লেখ নাই; সুতরাং মহারাজ রাধর কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মহিষীর নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই। যশোধরমাণিক্যের মহারাণীর 'যশরাণী' নাম পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিচয় পাওয়া যায় না। কল্যাণমাণিক্যের তিন মহিষীর মধ্যে প্রধানা মহিষীর নাম ছিল 'সহরবতী'।* অন্য মহিষীর নাম কলাবতী। আর এক মহিষীর নাম এবং মহারাণী সহরবতী প্রভৃতির পরিচয়সূচক কোন কথা পাওয়া যায় না।

প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষার চেষ্টা

মহারাজ আচোঙ্গ ফা-এর সময় রাজা ও রাণীর এক নাম নির্দ্ধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। † আচোঙ্গ ফা মহারাজ ডাঙ্গর ফা-র পিতামহ ছিলেন। আচোঙ্গ ফা খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছেন; সুতরাং রাজা ও রাণীর এক নাম রক্ষা করা ন্যূনাধিক সাতশত বৎসরের প্রাচীন প্রথা

---

* উদয়পুরস্থ জগন্নাথ দেবের মন্দির গাত্রে সংস্থিত শিলালিপির ২য় শ্লোকে পাওয়া যায়, —

"শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্য দেবস্যাদ্ভূত কর্ম্মণঃ।
আসীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা।।" ইত্যাদি।

† "আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী।
তদবধি রাজা রাণী এক নাম জানি।।"

রাজমালা — ১ম লহর, ৫৯ পৃষ্ঠা।

বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। অতঃপর কোন কোন রাজার শাসনকালে এই নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তর্গত রাজন্যবর্গের মধ্যেও উক্ত প্রাচীন প্রথা রক্ষার চেষ্টা ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের মহারাণীর নাম অমরাবতী।* মহারাজ যশোধর মাণিক্যের প্রধানা মহিষীর নাম ছিল 'গৌরীলক্ষ্মী'; তাঁহার রাজত্বকালে প্রচারিত ১৫২২ শকের একটী মুদ্রায় অঙ্কিত আছে — "শ্রীশ্রীযশোমাণিক্য দেব, শ্রীগৌরীলক্ষ্মী মহাদেবি"। ঐ শকের আর একটী মুদ্রা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ যশোধরের 'জয়া' বা 'জয়াবতী' নাম্নী আর একজন পট্টমহিষী ছিলেন। উক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে — "শ্রীশ্রীযশোমাণিক্য দেব, শ্রীলক্ষ্মীগৌরী জয়া মহাদেবীঃ"। এতদ্দ্বারা মহারাণীগণের নাম 'গৌরীলক্ষ্মী' এবং 'জয়া' থাকা প্রমাণিত হইলেও প্রাচীন প্রথা রক্ষার অনুরোধে প্রধানা মহিষীর নাম 'যশোরাণী' রাখা হইয়াছিল, রাজমালা আলোচনায় তাহা জানা যাইতেছে।† উদয়পুরস্থিত গোপীনাথের মন্দিরগাত্রস্থ ১৫৭২ শকের শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মহারাণীর নাম 'কলাবতী' ছিল।‡ ইহা রাজার নামের সহিত রাণীর নামের সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়। একটী পারিবারিক প্রাচীন প্রথা এত দীর্ঘকাল প্রচলিত রাখা, রাজগণের প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বহুবিবাহ

বহুবিবাহের ফল ভাল না হইলেও কোন রাজাই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, ইহাও একরকম পারিবারিক প্রথার মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। মহারাজ যশোধরের দুই মহিষী থাকা মুদ্রার প্রমাণদ্বারা জানা গিয়াছে। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের তিনজন মহিষী থাকিবার প্রমাণ 'শ্রেণীমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায়; —

"উপর কিল্লাতে কল্যাণ থানাদার ছিল।
প্রথমে এক বিবাহ সে কালে করিল।।

---

* "অমরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসন।।
অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি।
তান গর্ব্ভে চারিপুত্র যোগ্যবান্ অতি।।"
রাজমালা — ৩য় লহর, ২ পৃষ্ঠা।

† "যশমাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে।
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে।।
শ্রাদ্ধাদি মহোৎসব করে যশরাণী।"
রাজমালা — ৩য় লহর, ৬৩ পৃষ্ঠা।

‡ "সোমন্দে কলধৌত মঞ্জুকলসং চক্রাদি শোভং মঠং
ভক্ত্যেবাতি কলাবতীপতিরসৌ কল্যাণদেবো দদে।। ৪ ।।"
শিলালিপি সংগ্রহ — ১৮ পৃষ্ঠা।

সে রাণীর গর্ব্ভে জন্মে গোবিন্দমাণিক্য।
তদনুজ জগন্নাথ ছিল ধর্ম্মাধিক্য।।

* * * *

আরেক কনিষ্ঠা পত্নী করিল নৃপতি।
যাদব রাজবলাই তাহান সন্ততি।।
নৃপতি হইয়া কল্যাণমাণিক্য রাজন।
আর এক বিবাহ করে নৃপতি যেমন।।
সে রাণীর গর্ব্ভে জন্মে নকত রায়।
ছত্রমাণিক্য নাম হইল তাহার।।"

শ্রেণীমালা।

রাজগণের বিবাহ সংখ্যা সম্যক রাজমালায় উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন বলা যাইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে অনুল্লেখিত অনেক রাজমহিষী থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক। স্থূলকথা, সেকালের রাজগণ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন, সংখ্যার ন্যূনাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না। রাজমালা লেখক কোন কোন রাজার মহিষী সংখ্যা 'বুড়ি' হিসাবে গণনা করিয়াছেন; পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি ধরা হয়।

কোন রাজার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজ্যভার গ্রহণান্তে, মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিবার প্রথা এই সময়ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

মৃত রাজার অন্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন

মহারাজ অমরমাণিক্যের মৃতদেহ রাজধরমাণিক্যের অনুমত্যানুসারে এবং কল্যাণমাণিক্যের পরিত্যক্ত কলেবর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনুমত্যানুসারে দাহ করা হইয়াছিল। মহারাজ যশোধরমাণিক্য মথুরায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সৎকার কালে এই পদ্ধতি রক্ষিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে; —

"যশমাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে।
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে।।"

এই "যথাবিধি" বাক্যদ্বারা সৎকারের অনুমতির বিষয়ও বুঝায় কি না, এবং বুঝাইলে, কে সেই অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহারাণীর আদেশে রাজার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া নিষ্পাদিত হওয়া অসম্ভব নহে। তৎকালে কল্যাণমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব যশোধরমাণিক্যের সঙ্গে ছিলেন।* মৃত রাজার সৎকার জন্য তৎকর্ত্তৃক আদেশ হওয়াও বিচিত্র নহে।

---

* সংস্কৃত রাজমালায় কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায়; —

"পূর্ব্ব স্ত্রী গর্ভজশ্চৈকঃ পুত্রো গোবিন্দ নামকঃ।
যশমাণিক্য নিকটে স চ বারানসী স্থিত।।" — সংস্কৃত রাজমালা।

এই কালেও রাজপরিবারে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাণী অমরাবতী পতির চিতারোহণ করিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়।

সহমরণ প্রথা

ত্রিপুর রাজপরিবারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিতেন। রাজার পুত্র না থাকিলে সিংহাসনের দাবি ভ্রাতার প্রতি বর্ত্তিবার নিয়ম ছিল। এরূপস্থলে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের এবং প্রকৃতিপুঞ্জের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত। এবং সময় সময় সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইতেও দেখা যাইত। মহারাজ অমরমাণিক্য এই অশান্তি নিবারণ কল্পে 'যুবরাজ' পদের সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভনারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পরে, দ্বিতীয় পুত্র রাজধরনারায়ণকে (পরে রাজধরমাণিক্য) পুনর্ব্বার যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ বিষয়ে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে; —

যুবরাজ উপাধি দ্বারা ভাবী রাজা নির্ব্বাচন

"তার পরে আর ছিল বিধির লিখন।
রাজপুত্র মৃত্যু রাজদুর্লভনারায়ণ।।
অমরমাণিক্য রাজা শোকে অচেতন।
পরে যুবরাজ করে রাজধরনারায়ণ।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৭ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন রাজমালায় অমরমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে; —

"কত দিনে নৃপতির বড় পুত্র মৈল।
শোক পাইল নরপতি পুত্রের কারণ।।
যুবরাজ কৈল রাজধরনারায়ণ।।"

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার বাক্যও এতদনুরূপ; তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

"নানা সুখে মহারাজ প্রজাগণ পালে।
কত দিনে নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র মৈলে।।
শোক অতিশয় পায় নৃপতি তখন।
যুবরাজ করিল রাজধরনারায়ণ।।"

শ্রেণীমালা গ্রন্থেও রাজধরের 'যুবরাজ' উপাধির বিষয় উল্লেখ আছে; —

"উদয়পুর রাজ্য মগলে শাসিল।
মনু নদীতে যাইয়া রাজা মৃত্যু হৈল।।
* * * *
তান পুত্র রাজধর যুবরাজ নৃপতি।
দ্বাদশ বৎসর তিনি শাসিলেন ক্ষিতি।।"

এই সময় হইতেই ত্রিপুর রাজপরিবারে যুবরাজ নিয়োগের কল্যাণকর প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; তদবধি এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া থাকিলেও ইহার সুফল ভোগ সকল রাজা বা যুবরাজের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তদ্বিবরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভ্রম প্রণোদিত হইয়া মহারাজ কল্যাণমাণিক্যকে 'যুবরাজ' পদের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা; —

"মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে জগতের সাধারণ বিধি অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈত্রিক রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। কল্যাণমাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাস্ত্রানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

কল্যাণমাণিক্যের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় রাজা অমরমাণিক্যের শাসনকালে 'যুবরাজ' উপাধি প্রবর্ত্তিত হইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কৈলাসবাবুর এই উক্তি ভ্রমপ্রণোদিত।

রাজকুমারগণের ঠাকুর উপাধি

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজকুমার ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের 'ঠাকুর' উপাধির প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি রাজপরিবারে এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে।

পারিবারিক প্রথা সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা পরবর্ত্তী লহরে বর্ণিত হইবে।

সাহিত্যানুরাগ

ত্রিপুরেশ্বরগণ আবহমানকাল সাহিত্যানুরাগী এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তদীয় অনুজ্ঞায় রাজমালা দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। তৃতীয় লহরের অন্তর্ভূত রাজগণ সকলেই বিদ্যানুরাগী এবং বঙ্গভাষার পক্ষপাতী ছিলেন; মূল গ্রন্থ আলোচনা করিলে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণ

সাধারণ কথা

ত্রিপুরেশ্বরগণের ধর্ম্মানুরাগ এবং ধর্ম্মসংরক্ষণের চেষ্টা স্মরণাতীত কাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবায়তন প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন, ভূম্যাদি বিবিধ প্রকারের দান ও যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য সম্পাদন দ্বারা তাঁহারা বংশপরম্পরা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এবং এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত অনেক ভূপতি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

রাজমালার প্রথম লহরে বলা হইয়াছে, ত্রিপুরার রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব ছিলেন, ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তনের ফলে পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তন অল্প সময়ে ঘটে নাই। অনেককাল শৈব ধর্ম্ম আচরণের পর, তাঁহারা আপন আপন প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস অনুসারে কেহ শিব-মন্ত্রে, কেহ শক্তি-মন্ত্রে এবং কেহ বা বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছিলেন, এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পরে, উত্তরোত্তর পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়াছেন।

ধর্ম্মমত

ত্রিপুরেশ্বরগণ শৈব মতাবলম্বী থাকা কালে সগরদ্বীপ হইতে সমাগত দণ্ডিগণ তাঁহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শৈব মতের সহিত শাক্ত মতের প্রভাব রাজপরিবারে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে, কোন কোন রাজা মৈথিল ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ হইতে দীক্ষা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণের প্রভাবে রাজবংশ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হইয়াছেন, এবং তদবধি নিত্যানন্দ সন্তানগণই এই বংশের গুরু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে সময়ে, যে ভাবে প্রভু-সন্তানগণ রাজপরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে; এস্থলে রাজগণের ধর্ম্মানুমোদিত সৎ কার্য্যাবলীর কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদান করা যাইতেছে।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতেই জলাশয় প্রতিষ্ঠা বা জলদান অমোঘ পুণ্যজনক কার্য্য। আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ এই জীবহিতকর কার্য্যকে অতি উচ্চসম্মান প্রদান করিয়াছেন; তাহা করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। 'জল' শব্দের বহু পর্য্যায়ের মধ্যে 'জীবন' শব্দ পাওয়া যায়। 'রাজনির্ঘণ্ট' গ্রন্থের মতে; —

"অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।।"

জল, জীবন ধারণের প্রধানোপাদান, সুতরাং জলে ও জীবনে পার্থক্য নাই, এই কারণেই জলকে 'জীবন' বলা হইয়াছে। প্রাণীদিগকে বিশুদ্ধ বারি দান করিলে জীবন দানের ফল লাভ হয়। এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ জলাশয় দানের অমোঘ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নানা গ্রন্থে জলাশয়ের পর্য্যায় পাওয়া যায়। মেদিনীকোষ, অমরকোষ, শব্দরত্নাবলী, দ্বিরূপকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে জলাশয়ের পর্য্যায়ে, যন্ত্রকূটক, পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়াগ, তড়গ, সরোবর, সাগর, পুষ্করিণী প্রভৃতি অনেক শব্দ পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে জলাশয় অষ্টধা বিভক্ত হইয়াছে; —

জলাশয়ের পর্য্যায় ও প্রকারভেদ

"কূপবাপী পুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ।
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ।।"

জলাশয় খননের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীর মত অনেক আছে, তাহার একটী এ স্থলে প্রদান করা গেল।

জলাশয় খনন ও উৎসর্গ ফল

"সেতুবন্ধন রতা যে চ তীর্থশৌচ রতাশ্চ যে।
তড়াগ কূপ কর্ত্তারো মুচ্যান্তে তে তৃষাভয়াৎ।।"

আদিত্যপুরাণ।

জলাশয়োৎসর্গ তত্ত্বে লিখিত আছে ;—

"সংক্ষেপাত্তু প্রবক্ষামি জলদান ফলং শৃণু।
পুষ্করিণ্যাদিদানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতি বিশ্বধৃক।।"

পদ্মপুরাণে পাওয়া যায় ; —

"এতান্মহারাজ বিশেষ ধর্ম্মান্ করোতি যোঘ্যাস্ত্বথ শুদ্ধবুদ্ধিঃ।
স যাতি ব্রহ্মালয়মেক কল্পং দিবং পুনর্যাতি তথৈব দিব্যম্।।"

পদ্মপুরাণ — সৃষ্টিখণ্ড।

উক্ত পুরাণে, জলদাতার কালবিশেযে ফললাভের কথাও পাওয়া যায় ; —

"প্রাবিট্ কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোম সমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্ত ফলদায়কম্।।
বাজপেয় ফল সমং হেমন্ত শিশর স্থিতম্।
অশ্বমেধ সমং প্রাহুর্বসন্ত সময় স্থিতং।।"

জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও জলদান সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে, এ স্থলে এতদতিরিক্ত আলোচনা করিবার সুবিধা নাই।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের পুরুষানুক্রমিক পুণ্যজনক অনুষ্ঠান। রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে তাঁহাদের এই সৎকার্য্যের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ অমরমাণিক্য উদয়পুরে "অমর সাগর" খনন করিয়াছিলেন। এই বিশাল বাপী সোণামুড়া মৌজায় অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১২২৮ গজ ও প্রস্থ ৩০২ গজ। ইহার গর্ত্তে ১২ ০ বার দ্রোণ এক কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে। এই সরোবর খননোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ ব্যাপী যে সমারোহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অমরপুরে ইঁহার খনিত অমর সাগর ও ফটিক সাগর বিদ্যমান রহিয়াছে। অমরমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রাজধরমাণিক্য, উদয়পুরস্থ রাজধরনগর মৌজায় ৩৬০ গজ দীর্ঘ, ২৪০ গজ প্রস্থ এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। ইহা অধুনা প্রতিষ্ঠিত নগরের পশ্চিম দিকস্থ জামজুড়ি ছড়ার পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত। রাজধরের পুত্র যশোধর শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তাঁহার জলাশয় খননাদি পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যশোধরের পরবর্ত্তী রাজা কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণসগার ২২৪ গজ দীর্ঘ ও

ত্রিপুর রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক জলাশয় প্রতিষ্ঠা

১৬০ গজ প্রস্থ। এই সরোবর ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; এই জলাশয় সাধারণতঃ "মাতার বাড়ীর দীঘি" নামে পরিচিত। রাজমালায় পাওয়া যায়, দেবীর প্রত্যাদেশানুসারে এই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় এবং প্রথম লহরের ১২৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজায় ইঁহার খনিত ৮০x৪০ গজ বিস্তৃত আর একটী দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। কসবায় 'কল্যাণসাগর' নামে যে সুবিশাল বাপী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মহাপুরুষের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এই জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে আকার খর্ব্ব করিয়া ইহার বিশালতা এবং সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। কসবার মুন্সেফী আদালত এই সরোবরের উত্তর তীরে সংস্থাপিত হইয়াছে।

দেবালয় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা

শাস্ত্রীয় মত

দেবায়তন গঠন এবং দেবতা প্রতিষ্ঠার অমোঘ ফলের কথা শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবায়তন ও দেবতা প্রতিষ্ঠার ফল সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে; —

"কৃত্বা দেবালয়ং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবৎ চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্।।"

মঠ প্রতিষ্ঠা তত্ত্বম্।

ত্রিপুরেশ্বরগণের কার্য্য

এতদ্বিষয়ক অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাওয়া নিষ্প্রায়োজন। ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ এই সৎকার্য্যানুষ্ঠানকে পুরুষানুক্রমে অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে এবম্বিধ সদনুষ্ঠানের বিস্তর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে তৃতীয় লহরে প্রাপ্ত বিবরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া গেল।

মহারাজ অমরমাণিক্যের স্থাপিত মঠ ও বিগ্রহ

মহারাজ অমরমাণিক্য সিংহাসন লাভ করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতেই মঘ ও মুসলমান প্রভৃতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত আহবে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে, এবং সেই সূত্রে বিস্তর অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছে। তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। এই অবস্থায়ও মহারাজ অমর, পুণ্য কার্য্যে পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি উদয়পুরে প্রস্তর দ্বারা এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া জগন্নাথ দেবতা স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ অমরসাগর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদনের পর ;—

"মহাবাক্য করে রাজা জলাশয়ে গিয়া।
প্রস্তরে নির্ম্মাইল মঠ ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।।
জগন্নাথ স্থাপিত করিল সেই মঠে।
নৃত্যগীত মহোৎসব করে বহু ঠাটে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি বিগ্রহ, অমরপুর

এই মন্দিরে শিলালিপি ছিল; দুঃখের বিষয়, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তৎসাহায্যে প্রমাণ সংগ্রহ করার উপায় নাই। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, যে বৎসর অমরসাগর উৎসর্গ করা হইয়াছিল, সেই বৎসরই এই দেবালয় নির্ম্মাণ করা হয়। রাজমালার বাক্য এই; —

"পনর শ শকে অমরসাগর আরম্ভন।
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।।
*　　*　　*　　*
মহাবাক্য করে রাজা জলাশয়ে গিয়া।
প্রস্তরে নির্ম্মাইল মঠ ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া।।" ইত্যাদি

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৪ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, ১৫০০ শকে খনন আরম্ভ করিয়া, ১৫০৩ শকে অমরসাগর উৎসর্গ এবং আলোচ্য মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই জীর্ণ মন্দির বৃক্ষ-বিদলিতাবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্য এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় অমরসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে, এক মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে সংস্থাপিতা প্রস্তরময়ী বিগ্রহ "মঙ্গলচণ্ডী" নামে অভিহিতা এবং মন্দিরটী "মঙ্গলচণ্ডীর বাড়ী" নামে পরিচিত। এই মূর্ত্তি মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী নালায় পতিতাবস্থায় ছিল, স্থানীয় লোকগণ তাহা উত্তোলন করিয়া উক্ত ভগ্ন মন্দিরের সন্নিকটে একখানা টিনের গৃহে রাখিয়া অর্চ্চনা করিতেছে। এই মন্দির এবং মূর্ত্তি মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস।

মহারাজ রাজধর-মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিগ্রহ

মহারাজ রাজধরমাণিক্য উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ; —

"বিষ্ণুর মন্দির দিতে রাজার মনের আশয়।।
নির্ম্মিল মন্দির এক বিচিত্র আকার।
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল স্বহস্তে রাজার।।"

রাজধরমাণিক্য খণ্ড — ৫৩ পৃষ্ঠা।

এই জীর্ণ কলেবর দেবায়তন এখনও বর্ত্তমান আছে, সংস্কার না হইলে আর অধিককাল স্থায়ী হইবার আশা নাই।

মহারাজ যশোধর-মাণিক্যের কার্য্য

যশোধরমাণিক্য কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে, তিনি প্রাসাদ ও পুষ্করিণী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা, রাজমালা আলোচনায় ইহা জানা যায়। যশোধরমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে; —

"প্রাসাদ পুষ্কর্ণী দীঘী দিল স্থানে স্থান।
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল হৈয়া দৈব্যজ্ঞান।।"

অষ্টধাতু নির্ম্মিত চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্ত্তিসমূহ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য সুবর্ণ ও রজত-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। একমাত্র মহাদেবের মূর্ত্তিটী রৌপ্য দ্বারা এবং অন্য সমস্ত মূর্ত্তি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। এই সংস্কার কার্য্যকে 'গঠন কার্য্য' বলিয়া রাজমালায় উক্ত হইয়াছে, যথা, —

মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্যের কার্য্য

"চতুর্দ্দশ দেবতা মূর্ত্তি গঠায় নৃপতি।
সুবর্ণ রজত তাতে মনোহর অতি।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

রাজমালা প্রথম লহরে চতুর্দ্দশ দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।*

শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির-চূড়া, উদয়পুর আক্রমণকারী মঘবাহিনী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎপর মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন।† এই মন্দির ১৪২৩ শকাব্দায় নির্ম্মিত হইবার পর, ১৬০৩ শকে মহারাজ উদয়মাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার ভগিনীপতি ও সেনাপতি রণাগণনারায়ণ (রঙ্গনারায়ণ) কর্ত্তৃক একবার সংস্কৃত হইয়াছিল, মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনায় তাহা জানা গিয়াছে। মহারাজ দ্বিতীয় বার সংস্কার করাইয়াছেন। ১৫৪৮ হইতে ১৫৮২ শকের মধ্যে এই কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল। ‡এই বারের সংস্কার কার্য্যের নিদর্শন অন্যান্য বারের ন্যায় শিলালিপি দ্বারা রক্ষিত হয় নাই।

মঘগণ, অমরমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুপ্তধনের সন্ধান জন্য অমর সাগর প্রভৃতি উদয়পুরস্থিত বৃহৎ সরোবরগুলি জান কাটিয়া সেঁচিয়া ফেলিয়াছিল। কল্যাণমাণিক্য সেই সকল সরোবরের পাড় বাঁধাইয়া পুনর্ব্বার জলরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এতদ্ব্যতীত কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক উদয়পুরে এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে বিষ্ণু-মন্দির, দোলমঞ্চ ও দুর্গাবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের অন্য কীর্ত্তি চন্দ্রগোপীনাথের মন্দির; (যাহা বর্ত্তমান কালে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির নামে অভিহিত হইতেছে।) চন্দ্রগোপীনাথ

---

* রাজমালা — প্রথম লহর, ১২৯ পৃষ্ঠা।

† কালিকার মঠ-চূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল।
পুনর্ব্বার মহারাজা নির্ম্মাণ করিল।।
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

‡ দ্বিতীয় লহরের ১০০ পৃষ্ঠায় কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যলাভের কাল "১৫৪৭ শক" লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রার প্রমাণদ্বারা ১৫৪৮ শকে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হওয়া জানা যাইতেছে। এ বিষয় অতঃপর বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

বিগ্রহ মহারাজ উদয়মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত।* মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে এই বিগ্রহ মঘ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। মহারাজ কল্যা চট্টগ্রাম হইতে সেই বিগ্রহ পুনরুদ্ধার করিয়া নবনির্ম্মিত মন্দিরে স্থাপনা করেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

"সিংহ দ্বার সমীপেতে মনোহর স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ।।
চন্দ্রগোপীনাথ মূর্ত্তি চাটিগ্রামে ছিল।
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়াছিল।।
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া তখন।
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অর্চ্চন।।" †

এই মন্দির ৺মহাদেবের মন্দিরের উত্তর দিকে, একই প্রাচীরের বেষ্টনী অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির নামে পরিচিত হইলেও মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, মন্দিরটি ৺গোপীনাথ বিগ্রহকে অর্পণ করা হইয়াছিল, রাজমালার উদ্ধৃত বাক্যদ্বারাও তাহাই জানা যাইতেছে। মন্দিরদ্বয়ের উপরিভাগে সংযোজিত শিলালিপি কিয়ৎপরিমাণে বিনষ্ট এবং কৃচ্ছ্র পাঠ্য হইলেও, ভক্তিভাজন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহার যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তদালোচনায় জানা যায়, এই মন্দির মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক ১৫৭২ শকে নির্ম্মিত এবং ৺গোপীনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় বন্ধনীর অভ্যন্তরস্থ লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

(যৎপাদে বিনতা) ি(গ)রীন্দ্র পবনেন্দুকাদয়োমৌলি(ভ)
(যং দেবা অপি চিন্তয়)ন্তি সততং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডান্তরে।
(যৎকীর্ত্তিং সুবিনীত) কন্ধরতয়া গেগীয় (মানা) ত্রয়ী
(তৎপাদে ভবতা) রণেহদ্ভুত মঠং কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ।।
*কন্দর্পকান মবলি কলিতবসুশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ
ধৈর্য্যোদার্য্যাতিশৌর্যৈঃ পৃথুরঘুনহুষাজেষু যো গীয়মানঃ।
গোপীনাতায় ভক্ত্যা নিরুপমসুমঠং যোহতিবেলং মুদাদৎ
স শ্রীকল্যাণ দেবঃ সগরিমমহিমা নন্দতান্নন্দনাদৈঃ।।
শাকে পক্ষ মুনীষু চন্দ্রগণিতে মাসে শুচাবংশকে
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বিজ শুভাশীর্ভিঃ সুবাক্যেতি যা।
সোমন্দে কলধৌতমঞ্জু কলসং চক্রাদিশোভং মঠং
ভক্ত্যেবাতি কলাবতীপতিরসৌ কল্যাণ দেবো দদে।। ৪ ।।
শাকে ১৫৭২ আষাঢ়স্য ৫ অংশকে।

---

* "বহুল করিয়া যত্ন এক মঠ দিল।
চন্দ্রগোপীনাথ নাম শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল।।"
রাজমালা — ২য় লহর, ৬৮ পৃষ্ঠা।

† আলোচ্য লহরের ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত লিপির নিম্নরেখ বাক্যগুলি দুর্ব্বোধ্য, তাহা যথাযথ উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

লিপির স্থূল মর্ম্ম, —

"মহাদেব, পবন এবং চন্দ্র প্রভৃতি (যাঁহার পাদপদ্মে নত মস্তক) ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে (দেবগণও যাঁহাকে) সতত (চিন্তা করেন) এবং বেদ (যাঁহার কীর্ত্তি) পুনঃ পুনঃ গান করিতেছে, কল্যাণদেব (সংসার পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ তাঁহার পাদপদ্মে) অদ্ভুত মঠ দান করিয়াছেন। *** যিনি চন্দ্রবংশের অলঙ্কার, ধীরতা, শূরতা ও উদারতাগুণে যাঁহাকে পৃথু, রঘু এবং নহুষ প্রভৃতির মধ্যে কীর্ত্তন করা হয়, যিনি বৃদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক গোপীনাথকে এই অনুপম মঠ দান করিয়াছেন, সেই কল্যাণদেব, গৌরব ও মহিমার সহিত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে আনন্দ উপভোগ করুন। ১৫৭২ শকাব্দের ৫ই আষাঢ় মঙ্গলবারে কলাবতীর পতি অতি ভক্তিপূর্ব্বক চক্রাদি শোভিত এবং স্বর্ণ কলসে অলঙ্কৃত মঠ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদে * * * দান করেন। ১৫৭২ শকাব্দ ৫ই আষাঢ়।"*

অবস্থা আলোচনায় স্পষ্টই বোঝা যায়, ঁগোপীনাথ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত মন্দির কালক্রমে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। যে কারণে ঁবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত গৃহে শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এস্থলেও তদ্রূপ কোন কারণ সঙ্ঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।

এই মন্দিরের সম্মুখে এক চিলছত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "জগন্মোহন"। ইহার ছাদ ইত্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে, স্তম্ভের নিম্নভাগগুলি এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজমালা প্রথম লহরের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এই মন্দিরের চিত্র প্রদান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত খোয়াই নদীর তীরবর্ত্তী নিভৃত গিরিকন্দরে কল্যাণমাণিক্য এক সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন, তথায় এক প্রাসাদও নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ সময় সময় এই স্থানে বাস করিতেন। তথায় সুবৃহৎ জলাশয়, রাজবাড়ীর চিহ্ন, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম এবং কুঞ্জবন প্রভৃতি অতি ক্ষীণ স্মৃতি-চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দেবমন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্ম্মাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল, ১৩২৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৮ খ্রীঃ) প্রবল ভূমিকম্পে তাহা ধরাশায়ী ও বিচূর্ণিত হইয়াছে। জনপ্রবাদ এই যে, উক্ত মন্দিরে মহারাজ কল্যাণ, কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন সেই দেবীমূর্ত্তির কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় না। মন্দিরগাত্রে শিলালিপি সংযোজিত ছিল, অনেককাল পূর্ব্বেই তাহা অপসারিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই শিলাখণ্ড রাজধানী আগরতলায় নীত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

---

* শিলালিপি সংগ্রহ — ১৮-১৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রী কালিকাদেবীর মন্দির - কল্যাণপুর

(১) কল্যাণপুর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ
(২)(৩) উক্ত মন্দিরের ব্যবহৃত ইষ্টক।

(১) [illegible] বাড়ীর সিংহদ্বার ভগ্ন স্তূপ।

(২) উক্ত সিংহদ্বারে সংযোজিত শিলা লিপি।
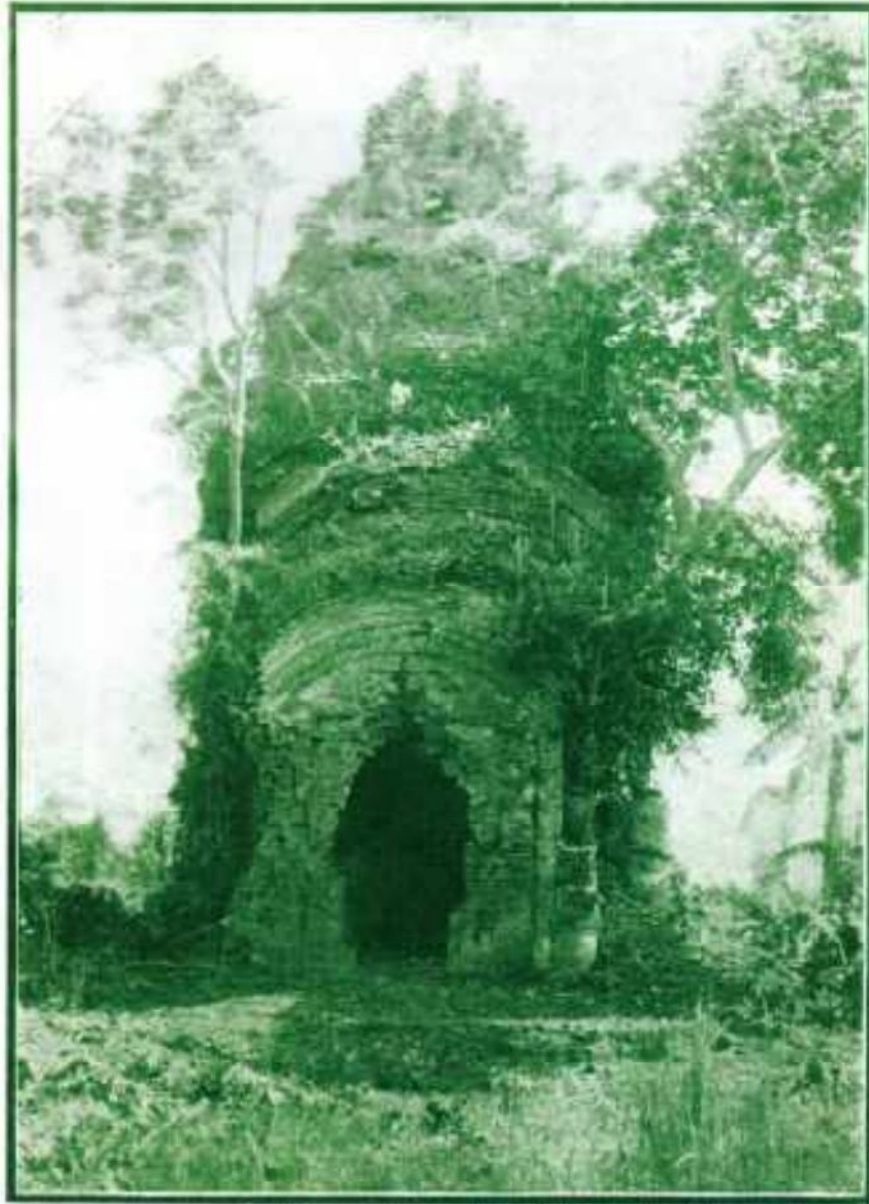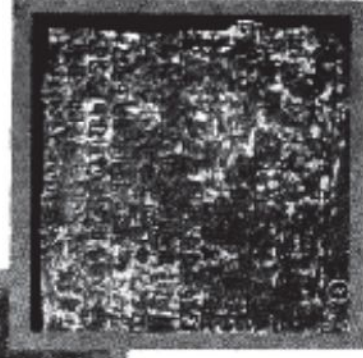
উদয়পুরের ভৈরব বিগ্রহ (মহাদেব) মহারাজ ধন্যমাণিক্যের স্থাপিত। রাজমালা প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এই বিগ্রহ ও দেবায়তনের স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

মহাদেবের বাড়ী সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত। সিংহদ্বারের উপরিভাগে, একখানা শিলালিপি সংযোজিত আছে এই লিপির অনেকাংশ বিলুপ্ত হওয়ায় পাঠোদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপির যে-সকল অংশ অবিকৃত দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাহারও কোন কোন অক্ষর নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত লিপিই এখন একমাত্র অবলম্বনীয়। তাঁহার উদ্ধার করা পাঠ নিম্নে প্রদান করা গেল।

তব সুমতা
বিতরণো নন্দিতার্থী স জীয়াৎ শ্রীশ্রীকল্যা
ণ দেব স্ত্রিপুর নরপতিঃ শ্রীপতি বাসু শ
দ্য প্রোদ্যত প্রাসাদরাজোভূপতি তু তিল
মাতঃ স্যাচ্চিরায়। যাবদ্ ব্রহ্মাণ্ড ভা
ণ্ডোদর রণ লে শ্রীহরি যা
মণ্ডলী দ্যা
সচকিত ম
প্রতাপ শ্রীশ্রীকল্যাণ দে
ঃ সম্মঠাখ্যা সবা
দশ শাকে। ১*

এই লিপির দুই স্থানে "শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব" নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে, প্রাচীরটী মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাচীরের বেধ আট হস্ত পরিমিত। ইহার উপর দিয়া অনায়াসে লোক যাতায়াত করিতে পারে। ভিতরদিক হইতে প্রাচীরের মাথায় উঠিবার সিঁড়ি আছে। অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রহরীগণ এই প্রাচীরের উপর বেড়াইয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা লক্ষ্য করিত। ইহা এত সুদৃঢ় যে, আপৎকালে এতদ্দ্বারা দুর্গের কার্য্য সাধিত হইতে পারিত। বর্ত্তমান কালে প্রাচীরের উপর প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জন্মিয়া শিকড়জাল বিস্তার দ্বারা উহাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই।

* শিলালিপি সংগ্রহ — ১০ পৃষ্ঠা।

এই বেষ্টনীর মধ্যে শিবমন্দিরসহ আরও দুইটী মন্দির বর্ত্তমান আছে। শিব মন্দিরের কথাই অগ্রে বলিব। এই মন্দিরগাত্রে সংযোজিত শিলালিপির কোন কোন অংশ বিনষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া যে লিপি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল।

মঠ মতিশয়িতং ধন্য মা
তি জীর্ণং নিরুপম মহিমা
নির্ম্মায় সান্তং তুহিনগিরি
সুতাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদাত্তং কৌতুকীনো হর
হরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ।। শাকে রামাব্ধি বা
ণা বনি পরিগণিতে ধন্য মাণিক্য দেব স্যোচ্চৈঃ পু
ণ্যায় নৃত্যচ্চতুরুন্দধিবধূগীত কীর্ত্তে মঠং তং। শ্রীশ্রী
কল্যাণ দেব স্ত্রিপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রাদা
দুৎসৃজ্য ধর্ম্মব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়।
ঃ।।৪।। শাকে, ১৫৭৩ ।।ঃ।।ঃ।।

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপির লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিম্নোক্তরূপ পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক পূর্ণিত অংশ ( ) বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করা হইল।

(প্রাদাদ্ যং শঙ্করার্থং) মঠ মতিশয়িতং ধন্যমা (ণিক্য দেবঃ)
(দৃষ্ট্বাতঞ্চা) তি জীর্ণং নিরুপমমহিমা (বীরকল্যাণ দেবঃ)।
(ভূয়ো) নির্ম্মায় সান্তং তুহিনগিরিসুতাবল্লভায়াতিবেলং
প্রাদাত্তং কৌতুকী নো হরহরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ।
শাকে রামাব্ধিবাণাবনি পরিগণিতে ধনমাণিক্য দেব-
স্যোচ্চৈঃ পুণ্যায় নৃত্যচ্চতরুন্দধিবধূগীতকীর্ত্তের্মঠং তম্।
শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব স্ত্রিপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংস ঃ
প্রাদাদুৎ সৃজ্য ধর্ম্ম ব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়।
ঃ।।৪।। শাকে, ১৫৭৩ ।।ঃ।।ঃ।।

লিপির স্থূল মর্ম্ম এই ;—

(১) মহারাজ ধন্যমাণিক্য মহাদেবের প্রীত্যর্থে যে মঠ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, হরিহরচরণ পূজাপরায়ণ নিরুপম

(১) শ্রীশ্রীমহাদেবের মন্দির — উদয়পুর।

(২) উক্ত মন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপি

(৩) শ্রী শ্রী মহাদেব লিঙ্গ বিগ্রহ।
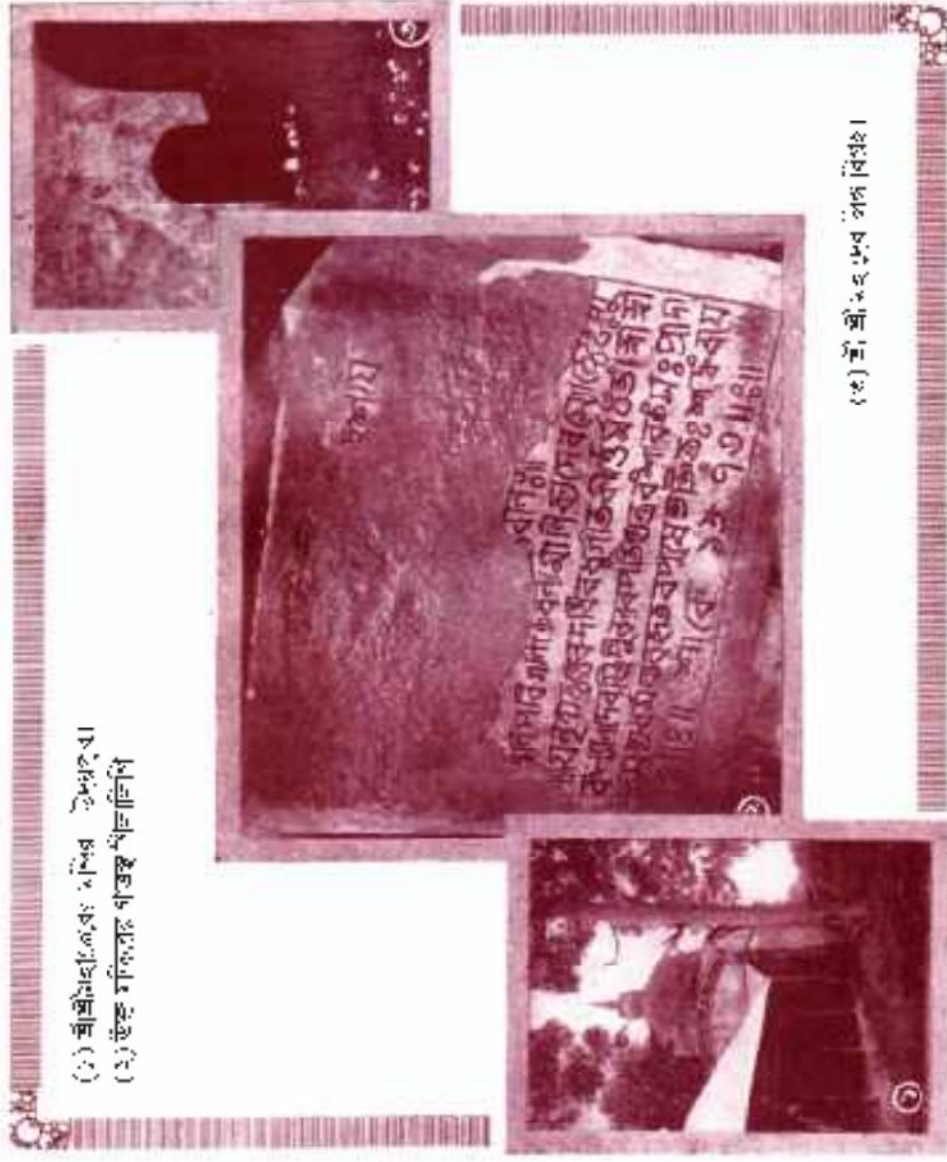
মহিমান্বিত বীর কল্যাণদেব সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করাইয়া মহাদেবকে দান করেন।

(২) চারিটী সমুদ্রবধূ নাচিতে নাচিতে যাঁহার কীর্ত্তিগান করিয়া থাকেন, সেই ধন্যমাণিক্যের প্রভূত পুণ্যার্থ চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীকল্যাণ দেব ১৫৭৩ শকে পুণ্যপ্রদ দেহ শঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্দিরটী উৎসর্গ করেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য, ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা।* প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় লহরের ১০১ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। পীঠদেবী প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালে ভৈরবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির পাঠ আলোচনায়ও তাহাই প্রতীয়মান হইবে। শিলা-শাসনে উৎকীর্ণ বাক্য দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মিত মন্দির জীর্ণ হওয়ায় মহামতি কল্যাণমাণিক্য, ধন্যমাণিক্যের পূণ্যার্থ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণের এই অনন্যসাধারণ ঔদার্য্য দর্শনে, শিলালিপির সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন; —

> "শ্লোকে দেখা যায়, ধন্যমাণিক্যের পূণ্যার্থ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মন্দিরটী মহাদেবকে দান করেন। ইহাতে কল্যাণমাণিক্যের লোকোত্তর সদাশয়তা প্রকাশ পায়। কারণ, ধন্যমাণিক্য কল্যাণমাণিক্য হইতে বহু পুরুষ অন্তর। তথাপি তিনি মন্দিরটী নিজের পিতা-পিতামহের পূণ্যার্থ উৎসর্গ না করিয়া, বহু পুরুষ অন্তর উক্ত মহাত্মার পুণ্যার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ধন্যমাণিক্য প্রথম মন্দিরের স্থাপয়িতা বলিয়াই বোধ হয়, উদারহৃদয় কল্যাণমাণিক্যের হৃদয়ে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।"
>
> শিলালিপি সংগ্রহ — ১৬ পৃষ্ঠা।

আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কল্যাণমাণিক্যের এবম্বিধ সদাচরণ দ্বারা উক্ত মন্দিরের প্রথম নির্ম্মাতা যে ধন্যমাণিক্য ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় হইয়াছে। শিলালিপিতে বিবরণ সন্নিবিষ্ট না হইলে তাহা জানিবার পথ রুদ্ধ হইত।

শিব মন্দির পুনর্ব্বার জীর্ণ হওয়ায় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের শাসনকালে জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংস্কারের কোনরূপ নিদর্শন মন্দিরগাত্রে রক্ষা করা হয় নাই।

মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ প্রস্তরময় সুবৃহৎ বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মেরুতন্ত্র, বীরমিত্রোদয়, সূত সংহিতা, যোগসার ও হেমাদ্রি ধৃত লক্ষণকাণ্ডে বাণলিঙ্গের

---

* ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;—

"আর এক মঠ তবে অপূর্ব গঠিল।
সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল।।"

ত্রিপুর বংশাবলী।

বিবরণ পাওয়া যায়। স্থূলতঃ নর্ম্মদা নদী সংজাত লিঙ্গই বাণলিঙ্গ মধ্যে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। গঙ্গা ও যমুনা নদীতেও বাণলিঙ্গ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পুরাকালে বাণাসুরের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থান করিতেছেন; তজ্জন্য এই লিঙ্গের 'বাণলিঙ্গ' নাম হইয়াছে। বাণলিঙ্গের লক্ষণ ভেদে --- ইন্দ্রলিঙ্গ, অগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠলিঙ্গ প্রভৃতি নামভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের আলোচ্য উদয়পুরের ভৈরব বিগ্রহ দণ্ডাকৃতি, শাস্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর লিঙ্গকে যাম্যলিঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাম্যলিঙ্গের লক্ষণ এই ; ---

"দণ্ডাকারং ভবোদযাম্যমথবা রসনাকৃতি।
যদযদুক্ত সহতৈর্ণ নির্নিক্তং জ্ঞায়তে তদা।
নিষিক্তং নিধনস্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু।।"

বীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্তর।

বাণলিঙ্গে সর্ব্বদা মহাদেব অবস্থান করেন, এবং এই লিঙ্গের অর্চ্চনা দ্বারা কোটি লিঙ্গ অর্চ্চনার ফল লাভ হয়।* স্ত্রী, শূদ্র সকলেরই এই লিঙ্গ অর্চ্চনার অধিকার আছে। এই বিগ্রহ সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তমণ্ডলী সমবেতের কেন্দ্রভূমি সুপবিত্র পীঠক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলের দ্বারাই অর্চ্চিত হইতেছেন।

শুনা যায়, এই বিগ্রহের অনেকাংশ ভূগর্ত্তে প্রোথিত রহিয়াছে। কথিত আছে, উদয়পুরের রাজপাট উঠাইয়া লইবার কালে লিঙ্গটী স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও উত্তোলন করিতে না পারায়, সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কৈলার গড়ের (কসবার) শ্রীশ্রীজয়কালীর মন্দির মহারাজ কল্যাণের আর একটী উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। বাঙ্গালা রাজমালায় ইহার উল্লেখ নাই, এমন একটী প্রয়োজনীয় কথা বাদ দেওয়ার হেতু নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। বাঙ্গালা পুথিতে না থাকিলেও সংস্কৃত রাজমালায় এই মন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায়; ---

"রাজা সৌ কসবা গ্রামে কৃত্বা কল্যাণ সাগরং।
তদন্তে দুর্গ মধ্যে চ স্থাপয়ামাস কালিকাং।।"

---

* "অন্যেষাং কোটি লিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং লভতে মন্ত্যো বাণ লিঙ্গৈক পূজনাৎ।।"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
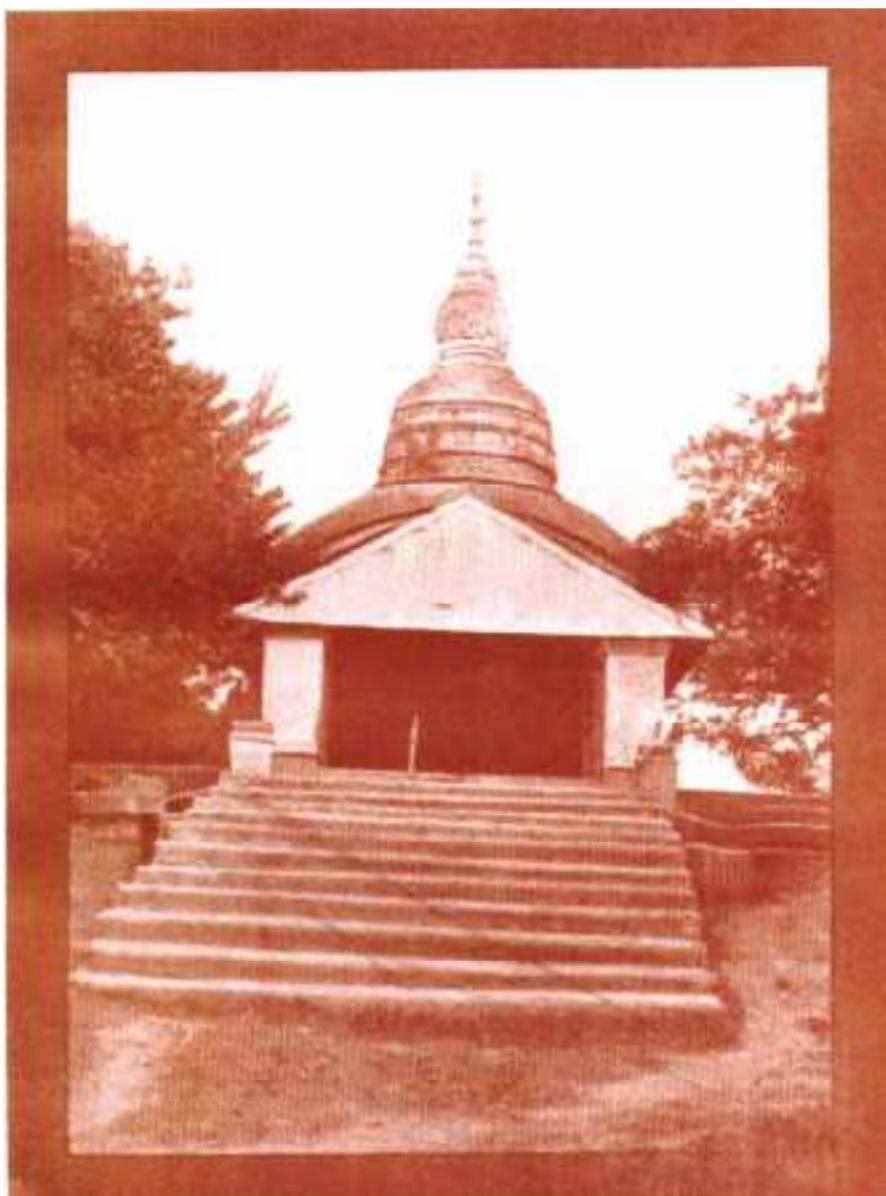
কসবার শ্রীশ্রীজয়কালীর মন্দির
(কমলা সাগর)।

শ্রেণীমালা গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সংস্কৃত রাজমালা হইতেই বিষয়টী উক্ত গ্রন্থে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে; —

"অশংক বিক্রমে ছিল জ্ঞানে মহামতি।
কল্যাণমাণিক্য নামে হইল নৃপতি।।
কসবাতে আপন নামে সাগর খনিল।
উপর কিল্লাতে কালিকা স্থাপন করিল।।"

শ্রেণীমালা।

এখানে অল্পোন্নত পর্ব্বতের সানুদেশস্থ দুর্গাভ্যন্তরে মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মূর্ত্তি মৃন্ময়ী কি পাষাণময়ী ছিল, জানিবার উপায় নাই। দেবীর মন্দির খড় ও বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত হইবার সংবাদ ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থে বিজয়মাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে; —

"তার পরে কর্ম্মচারী প্রতি আদেশিয়া।
সেনাপতি দুই জন দিল পাঠাইয়া।।
কসবা জয়কালী'পরে বান্ধ এক ঘর।
কিল্লা মধ্যে আছে দেবী পর্ব্বত শিখর।
কালী পূজা হেতু এক দ্বিজ স্থির করি।
প্রত্যহ করিবে পূজা সেই পূজাহরি।।
কামলা সহ * সেনাপতি কসবায় পৌঁছিল।
মনোরম করি এক গৃহ নির্ম্মাইল।।"

ত্রিপুর বংশাবলী।

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ বিজয় ১৪৫০ হইতে ১৪৯২ শকের মধ্যে (তাঁহার শাসনকালে) খড়ের গৃহে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বর্ত্তমান ইষ্টকালয় নির্মাণ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন; —

"দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপির অন্তভাগে কেবল 'স ১০৯৭' অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে।"

এতদ্দ্বারা কৈলাসবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; —

"মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ খোদিত লিপিতে আমরা 'স ১০৯৭' প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ

* ত্রিপুরা অঞ্চলে গৃহ নির্ম্মাতাদিগের প্রধান ব্যক্তিকে 'ছাপ্পরবন্দ' এবং তাহার সহযোগী অপর সকলকে 'কামলা' বলে।

কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরবর্ত্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।”

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮২ পৃষ্ঠা।

কৈলাসবাবুর এই অভিমতের সহিত ঐক্য হইতে পারিতেছি না। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ১৫৮২ শক পর্য্যন্ত (১৬২৬-১৬৬০ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংযোজিত শিলালিপিতে এই মন্দির নির্ম্মাণের ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত ছিল, লিপির অবস্থা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দুঃখের বিষয় এই বিকলাঙ্গ প্রস্তর ফলকদ্বারা বর্ত্তমান কালে কোন তথ্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে ১৫৪৮ শক হইতে ১৫৮২ শকের মধ্যে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ লিপিতে যে ‘স ১০৯৭’ অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা ত্রিপুরা সন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকাল। মহারাজ কল্যাণের স্বর্গারোহণের ২৭ বৎসর পরে শেষোক্ত প্রস্তরলিপি সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইবার ২৭ বৎসর পরে দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য কর্ত্তৃক তাহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল। কৈলাসবাবুর কথিত ১০৯৭ ত্রিপুরাব্দে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া থাকিলে, এক সময় পূর্ব্বোক্ত দুই খণ্ড শিলালিপি যোজনার হেতু হইত না; তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ের সংযোজিত বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্দির প্রতিবার সংস্কারের নিদর্শন স্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিলালিপি ব্যবহারের নিয়ম শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরে পরিলক্ষিত হইতেছে; এ স্থলেও সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই বুঝা যায়। উত্তর দিকস্থ ভগ্ন প্রস্তর ফলকের বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

....
নধীমতা........মান শূরেন........কুণ্ড........শিল শি........
কালিকা........পয়াতা........কালিকা প্রতিমা রম্যাঃ.......
দ্দাং শিব..................................কালিকা আযা........
বৃদ্ধি................................ কীর্ত্তে নগরে নরসং.......
তশ.................................... থাঃ কালিকা প্রীত........
য়.. রম্যাঃ সদান.............
ধ...ত বৈরিণাঃ তথৈ........
....।ঃ শকা.......................

এই অসম্পূর্ণ লিপিদ্বারা প্রকৃত মর্ম্মোদঘাটনের উপায় নাই। মন্দিরটী শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মাত্র বুঝা যায়। ইহা শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত; কিন্তু তদপেক্ষা আকারে ছোট। ইহার বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ প্রত্যেকদিকে ১২ হাত। চতুর্দ্দিকের দেওয়ালের বেধ ৪ হাত, একটী মাত্র ৪x৪ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ও পাতলা ইষ্টকের সুদৃঢ় গাঁথনিদ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, দূরস্থিত তোপের গুলিতে ইহা সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। ইহার প্রাচীনত্ব কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর।

এস্থলে ত্রিপুরেশ্বরের একটী দুর্গ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেবী মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র স্বতঃই মনে হয়, এই স্থান নির্ব্বাচনকারী সমরবিদ্যানিপুণ ছিলেন। দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে সুদৃঢ় অথচ দুর্গম পর্ব্বত প্রাচীর এবং সম্মুখ ভাগে বিস্তীর্ণ সমতল কৃষিক্ষেত্র। দুর্গটী অল্পোন্নত পাহাড়ের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এই স্থানে দাঁড়াইলে সম্মুখস্থ বহুদূরবর্ত্তী স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পশ্চাদ্দিকে আশ্রয় গ্রহণযোগ্য অনেক উপত্যকা ও গহ্বর আছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান কালে প্রস্তরময়ী দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে কৈলাসবাবু কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; —

"তিনি কৈলারগড় দুর্গমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহবাহিনী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী দশভুজা ভগবতী মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই প্রতিমার নিম্নভাগে একটী শিবলিঙ্গ খোদিত থাকায় কালীমূর্ত্তি বলিয়া আখ্যাত হয়।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮১-৮২ পৃষ্ঠা।

ইহা ভ্রমসঙ্কুল উক্তি। কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালের পূর্ব্বেই (মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময়) এখানে কালিকা বিগ্রহ স্থাপনের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদান করা হইয়াছে। সংস্কৃত রাজমালা এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থের যে বচন ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা আলোচনায় জানা যায়, কল্যাণমাণিক্য দুর্গ মধ্যে কালিকা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন — দশভুজা মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। কল্যাণমাণিক্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বিজয়মাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ কিম্বা নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার স্থাপিত মূর্ত্তি যে বর্ত্তমান মূর্ত্তি নহে, রাজমালা আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। এই মূর্ত্তি দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের শাসনকালে স্থাপন করা হইয়াছে। রাজমালায় রত্নমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে; —

"কসবাতে কালীমূর্ত্তি করিল স্থাপন।
দশভুজা ভগবতী পতিত তারণ।।

এই দশভুজা মূর্ত্তি স্থাপন কালে বিজয়মাণিক্য বা কল্যাণমাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ বিদ্যমান ছিলেন কি না এবং সেই প্রাচীন বিগ্রহের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, জানা যাইতেছে না। বর্ত্তমান মূর্ত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের রত্নমাণিক্য খণ্ডে প্রদান করা হইবে।

অন্যবিধ পুণ্যজনক কার্য্য।

অমরমাণিক্য ভূম্যাদি বিবিধ দান করিয়াছেন। তিনি জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে চৌদ্দখানা গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করায়, তদবধি 'চৌদ্দগ্রাম' নামে একটী পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সভায় দুই শত পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। মহারাজ অমর তুলাপুরুষ দান, কল্পতরু দান প্রভৃতি বিস্তর পুণ্যজনক কার্য্য করিয়াছেন।

মহারাজ রাজধরমাণিক্য হিংসাবৃত্তি বিবর্জ্জিত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান করিতেন; তাহার একপাত্র রাজপুরোহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, একপাত্র বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পুরোহিত, একপাত্র চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক (চন্তাই), এবং দুইপাত্র অপর দুই পুরোহিতকে প্রদান করা হইত। কপিলার সেবাও রাজার প্রাত্যহিক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। অমরমাণিক্যের ন্যায় ইঁহার সময়ও দুই শত পণ্ডিত দ্বারা এক সভা গঠিত হইয়াছিল; তাঁহারা সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান করিতেন। মহারাজ প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণ করিতেন।* দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর রাজভবনে শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তন হইত, এজন্য বেতনভোগী আটজন গায়ক নিযুক্ত ছিল। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম সেবা ইত্যাদি মহারাজের নিয়ত কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত মহা দান, তুলাপুরুষ দান, ভূমি দান ইত্যাদি সৎকার্য্যের দরুণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অন্তিমকালে হরিসঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্নাবস্থায় তাঁহার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল।

মহারাজ যশোধরমাণিক্য পুণ্যাত্মা, রাজধর্ম্ম প্রতিপালক এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল রাষ্ট্রীয় উপদ্রবপূর্ণ হওয়ায়, তাঁহাকে রাজ্য রক্ষার নিমিত্তই সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

---

* পুরাকালে রাজা ও ধনাঢ্য বণিক প্রভৃতি গণ্য ব্যক্তিগণ প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমনকি, ব্যাধ জাতীয় কালকেতুও রাজত্ব লাভ করিয়া এই নিয়ম পালন করিবার নিদর্শন পাওয়া যায়; যথা, —

"গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা সবে করে পূজা।।
বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হৈয়া সাবধান।।" — কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ইনিও তুলাপুরুষ দান, মহা দান, কপিলা দান, ভূমি এবং হস্তী ঘোড়া ইত্যাদি দানদ্বারা অমোঘ পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুলাপুরুষ দান এক বিরাট ব্যাপার। এতদুপলক্ষে মথুরা, বানারস, উড়িষ্যা এবং সেতুবন্ধ প্রভৃতি দূর দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও যাচক উপস্থিত হইয়া, এই মহোৎসবে আশাতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তীর্থ ভ্রমণ

তীর্থ পর্য্যটনে রাজগণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। মহারাজ যশোধরমাণিক্য শেষ জীবনে তীর্থবাসী হইয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে শ্রীবৃন্দাবন ধামে দেহরক্ষা করেন।

সামরিক বল ও সমর বিবরণ

সামরিক বল

সৈন্য সংখ্যা

মহারাজ অমরমাণিক্য দৃঢ়-হস্তে ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, রাজমালা আলোচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহারাজ অমর, তরপ দেশ ও শ্রীহট্ট বিজয়কালে একশত সেনাপতিসহ বাইশ সহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার যুদ্ধে ছত্রিশ হাজার ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সরাইলের ঈশা খাঁ-এর সাহায্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সৈনিক-বল যে নিতান্ত কম ছিল না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সৈন্যগণের শ্রেণী বিভাগ

রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, এই সময় ত্রিপুরার সামরিক বিভাগে তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, ঢালী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময় হইতে পাঠানগণ সৈনিক বিভাগে প্রবেশ লাভ করে; ইহারা প্রধানতঃ অশ্বারোহী দলভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া ও কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে চিরদিনই সামরিক বিভাগের মেরুদণ্ডস্বরূপ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীগণও প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্য ফিরিঙ্গী (পর্ত্তুগীজ) সৈন্যদ্বারা আর একটী নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন, ইহারা প্রধানতঃ গোলন্দাজের কার্য্য করিত।*

---

* পর্ত্তুগীজগণ সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতে আসিয়া, তাহাদের অনেকে স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের পাণিগ্রহণান্তে রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছিল। ইহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান

সকল বিভাগেই পার্ব্বত্য সৈনিক-পুরুষগণের আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈন্যাধ্যক্ষগণের উপাধি

এই সময় সেনাপতিগণের মধ্যে নারায়ণ, নাজির, বড়ুয়া ও সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এই সকল উপাধি নূতন নহে, অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাহা প্রবর্ত্তিত ছিল।

সেনাপতিগণের কার্য্য-দক্ষতা দ্বারা লব্ধ উপাধি

সেনাপতিগণ কার্য্যনৈপুণ্যের পারিতোষিকস্বরূপ নানাবিধ উপাধি লাভ করিতেন। এই সময় সমরভীম, সমরপ্রতাপ, রণগিরি, রণভীম, রণযুঝার, বীরঝম্প, গজঝম্প, গজসিংহ, ত্রিবিক্রম, শক্রমর্দ্দন, সুপ্রতাপ, রণসিংহ ও সমরবীর প্রভৃতি উপাধিধারী সেনাপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম জানিবার উপায় নাই; সেকালেও ইঁহারা উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের প্রয়োজন হইত না; যথা — "সমরপ্রতাপনারায়ণ, রণগিরিনারায়ণ" ইত্যাদি।

যুদ্ধাস্ত্র

যুদ্ধাস্ত্রের প্রকারভেদ

এই সময় জাঠি, খড়গ (তরবারি), ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, বন্দুক এবং তোপের সাহায্যে যুদ্ধ করা হইত। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হইলেও একাল পর্য্যন্ত জাঠি এবং তীর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র বর্জ্জনীয় ছিল না। শক্র হননের নিমিত্ত বিষমাখা তীর বন্দুক অপেক্ষা কোন অংশে কম কার্য্যকরী ছিল না। এই সময় চর্ম্মের কামান ব্যবহারের প্রথা ছিল, ইহা একবারমাত্র ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইত। শক্রপক্ষের ভীতি উৎপাদনোদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইত।*

যুদ্ধযান

পার্ব্বত্য প্রদেশে হস্তী এবং ঘোড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জলযান এবং তাঞ্জাম ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রণবাদ্য

কাড়া, ঢক্কা, ডঙ্কা, ঢোল, বাঁশী ও কর্ণাল ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্র যুদ্ধকালে বাদিত হইয়া রণোন্মত্ত সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিত।

কালেও আগরতলার সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালেও ইহাদের মধ্যে অনেক সৈনিক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এখন তাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। পর্ত্তুগীজগণের বসতি স্থান 'মেরীয়ম্ নগর' আখ্যা লাভ করিয়াছিল, এখনও সেই নাম স্থিরতর রহিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাকে 'মৈরম নগর' বলে।

* মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের সহিত যুদ্ধকালে মোগলগণ চর্ম্মের কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতঃপর সমসের গাজী কর্ত্তৃক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে তাহা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সময় ত্রিপুরার সেনাপতিগণ ব্যূহ রচনাকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যগণ গরুড়ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। এবম্বিধ ব্যূহ রচনা নিপুণ জনৈক সৈনাপতির উপাধি ছিল 'গরুড়নারায়ণ'।

ব্যূহ রচনা

দুর্গ ও সেনানিবাস

এই সময় মেহেরকুল দুর্গ, চণ্ডীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, ছয়ঘরিয়াগড়, গামারিয়াগড় এবং কল্মিগড় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন অন্যান্য দুর্গগুলি এই কালে ছিল কিনা, বুঝিবার উপায় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্ত্তৃক আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে সংস্থাপিত সেনানিবাস সমূহের মধ্যে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের সৈন্যাবাস ব্যতীত অন্যগুলি এই সময় ছিল না।

দুর্গ ও সেনানিবাসের স্থান নির্ণয়

রাজা ও রাজকুমারগণের যুদ্ধযাত্রা

মহারাজ অমরমাণিক্য স্বয়ং বীর এবং যুদ্ধবিদ্যাকুশল নরপতি ছিলেন। রাজত্ব লাভের পূর্ব্বে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভুলুয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন; এই যুদ্ধে স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তরপ ও শ্রীহট্ট আক্রমণের স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেনাপতি রাজধরনারায়ণকে প্রধান নায়করূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আরাকানের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে কুমার রাজধরনারায়ণ প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; তৃতীয় বারের যুদ্ধে মহারাজ অমর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই যুদ্ধ চট্টগ্রামে সঙ্ঘটিত হয়। মহারাজ যশোধরমাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া ভুলুয়া রাজ্য দ্বিতীয়বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য, কৈলারগড় দুর্গে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া মোগলগণের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। এই যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার গোবিন্দনারায়ণ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরিত হইয়াছিলেন।

রাজা ও রাজকুমার-গণের শৌর্য্য

সেকালে রাজা ও রাজকুমারগণ হীনবীর্য্য কিম্বা বিলাসী ছিলেন না। সকলেই দুগ্ধফেন নিভ শয্যার পরিবর্ত্তে কণ্টকাকীর্ণ সমরক্ষেত্রে শয়ন করা শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতেন। ত্রিপুর রাজ্যের যে অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা বীরত্বের অভাবে নহে — একতার অভাবে। আত্মবিরোধই এই অবনতির মূল কারণ, তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

অভিযান ও সমর

মহারাজ অমর, সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকাকালে ভুলুয়ারাজের পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতা দর্শনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভুলুয়ার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভুলুয়ার রাজগণ

ভুলুয়া অভিযান

ত্রিপুরেশ্বরদিগের অনুকরণে "মাণিক্য" উপাধি গ্রহণ করিতেছিলেন, এই উপাধি পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়ারাজের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। ভুলুয়াপতি এই আদেশের প্রত্যুত্তরে সগর্ব্বে জানাইলেন — "আপনার রাজত্ব লাভের অনেক পূর্ব্ব হইতে মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি। আমি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের জমিদার, আপনি তাঁহার সেনাপতি; সুতরাং আপনার এবম্বিধ আস্ফালন শোভনীয় নহে।"

ভুলুয়া বিজয়

ভুলুয়াপতির এই অসংযত ব্যবহারে মহারাজ অমর নিতান্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি অবিলম্বে চারি পুত্র, উজীর সর্ব্বনারায়ণ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ছত্র নাজিরকে সহ ছত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এইবারের আক্রমণে ভুলুয়া রাজ্যের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ভুলুয়া বিজয়ের পর সেই স্থানে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুর্লভনারায়ণের কর্ত্তৃত্বাধীনে এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া মহারাজ সসৈন্যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

তরপের যুদ্ধ

তরপ যুদ্ধের কারণ

মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়া বিজয়ের অল্পকাল পরে তরপের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অমরসাগর খননকার্য্যে কুলি প্রদান না করা তরপ রাজ্য আক্রমণের কারণ হইয়াছিল। এই সমর যাত্রায় একশত সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে বাইশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হয়। রাজকুমার রাজধরনারায়ণ (পরে রাজধরমাণিক্য) এই বিপুল বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতাপনারায়ণ বাঙ্গালী সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সরাইলের ঈশা খাঁ মসনদ আলী স্বীয় দলবলসহ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আশঙ্কার কারণ থাকায় গরুড়ব্যূহ রচনা দ্বারা সৈন্যদল চালিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরাবাহিনী জিকুয়া গ্রামে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তরপ আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে তরপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আদম ও তৎ পুত্র সৈয়দ বিরাম পরাজিত এবং বন্দী হওয়ায় এতদুভয়কে বাঁশের খাঁচায় পুরিয়া উদয়পুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল।*

---

* সমরক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যক্তিগণ ধৃত হলে তাদের পিঞ্জরাবদ্ধ করার প্রথা অনেককাল থেকেই চলে আসছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান সেনাপতি মোমারক খাঁ চট্টগ্রামের যুদ্ধে ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়; —

"ত্রিপুরার সেনায়ে বলে না মারিব তোকে।
রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে।।

শ্রীহট্ট বিজয়

শ্রীহট্টের তদানীন্তন পাঠান শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ, তরপের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। এই কারণে মহারাজ অমরমাণিক্যের নির্দ্দেশানুসারে কুমার রাজধর শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। তৎকালে জলপথে অভিযান হইয়াছিল। ত্রিপুর বাহিনী সুরমা নদী পথে শ্রীহট্টে উপনীত হইল। ঈশা খাঁ বাঙ্গালী সৈন্যসহ শ্রীহট্ট অভিযানেও কুমার রাজধরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাঠানগণ প্রতিপক্ষের গতিরোধের অভিপ্রায়ে সুরমা নদী পার হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, গোধারাণী গ্রামে উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার গজারোহী সেনাদলের নায়ক ঐরাজিতনারায়ণ প্রবল পরাক্রমে বিপক্ষ দলকে আক্রমণ ও বিদলিত করিয়াছিলেন। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, কবচ ভেদ করিয়া তীরসমূহ শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি প্রতিপক্ষকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। কুমার রাজধর তাঁহার সাহায্যার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঠান বাহিনী এই তীব্রবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। মধ্যাহ্ন সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া, দুই দণ্ড বেলা থাকিতে তাহার অবসান হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট আক্রমণের কারণ

সমরবিজয়ী কুমার রাজধর সুরমার দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। পাঠান শাসনকর্ত্তা এই স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর কুমার শ্রীহট্টে যাইয়া জয়-স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া, বিজয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ "আদি রাজধর সাগর" নামে এক দীর্ঘিকা খনন এবং রাজার নামে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। উক্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই মুদ্রার সাহায্যে জানা যাইতেছে, মহারাজ অমর ১৫০৩ শকে শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন। অতঃপর কুমার রাজধর কিয়ৎকাল শ্রীহট্টে অবস্থান করিয়া,

---

"এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল।
লোহার পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল।।"
রাজমালা — ২য় লহর, ৪৯ পৃষ্ঠা।

মুসলমান রাজত্বেও এই প্রথার প্রচলন থাকিবার নিদর্শন মুসলমান ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে।

শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে, বিজিত ফতে খাঁকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* কুমার, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত দুলালী গ্রামের পথে ইটা পরগণার মধ্য দিয়া ঊনকোটী তীর্থে গমন করেন। এই তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে প্রদান করা হইয়াছে।† তথায় তীর্থ কৃত্য সমাপনান্তে রাজধর সাত দিবস পথ অতিবাহনের পর, উদয়পুরে উপনীত হইয়াছিলেন।

বিজিত ফতে খাঁকে দরবারে উপস্থিত করা হইল। বীর্য্যশালী মহারাজ অমর, বীরের মর্য্যাদা জানিতেন; তিনি ফতে খাঁকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দরবারে রাজ জামাতা ও সেনাপতি দয়াবন্ত নারায়ণের বাম পার্শ্বে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী তাঁহার দেহরক্ষার্থ নিয়োজিত ছিল। সসম্মানে কিয়ৎকাল উদয়পুরে অবস্থানের পর, ফতে খাঁ ত্রিপুরার বৈশ্যতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশটী অশ্ব করস্বরূপ প্রদানের সর্ত্তে সন্ধি করিলেন। বিদায়কালে মহারাজ অমর, তাঁহাকে একটী হস্তী ও পাঁচটী ঘোটকসহ বহুমূল্য বস্ত্রাদি উপহার প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। তরপের শাসনকর্ত্তাকেও এই সময় কারামুক্ত করা হয়।

সরাইল-অভিযান

সরাইলের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ-এর সাহায্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈন্যসহ সর্ব্বনারায়ণ সিংহ উজীরকে দিল্লীর সৈনিকদলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। এই অভিযানে বিনা যুদ্ধেই দিল্লীর সৈন্যগণ প্রস্থান করিয়াছিল।

রসাঙ্গের যুদ্ধ

মহারাজ অমর রসাঙ্গ (আরাকান) বিজয়ের উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজার প্রধান পুত্র রাজধরনারায়ণ এই অভিযানে সেনা নেতৃত্ব লাভ করেন। রাজধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর দুর্লভনারায়ণ, সেনাপতি চন্দ্রদর্পনারায়ণ, চন্দ্রসিংহনারায়ণ ও ছত্রজিৎ নাজির প্রভৃতি, প্রধান সেনাপতির সহকারী ছিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্য ব্যতীত বঙ্গদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ হইতেও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নবগঠিত ফিরিঙ্গী সৈন্যদলও অভিযানের সহযাত্রী ছিল।

---

* "পনরশ চারিশকে পৌষ মাস শেষে।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১১ পৃষ্ঠা।

† রাজমালা — ২য় লহর, ১০৬-১১৫ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুরবাহিনী চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া, কর্ণফুলীতে বাঁধ দিয়া নদী পার হইয়াছিল। কুমার রাজধর পরপারে যাইয়া রামু প্রভৃতি মঘরাজের ছয়টী থানা (সেনানিবাস) হস্তগত করিয়া রামুতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহারা দেয়াঙ্গ (ডিয়াঙ্গা) ও উড়িয়া রাজ্য * আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে মঘ সৈন্যগণ

---

* উড়িয়া রাজার কথা ময়নামতীর গানে পাওয়া যাইতেছে। মেহেরকুলের রাজা গোপীচাঁদ (গোবিন্দচন্দ্র) স্বীয় জননী ময়নামতীকে বলিতেছেন, —

"আর বিভা করাইলা খাণ্ডায় জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া।।
দশদিন লড়াই কৈল উড়িয়া রাজার সনে।
চৌদ্দবুড়ি মনুষ্য কাটিলাম একদিনে।।
* * * *
যুদ্ধেতে হারিয়া নিপে গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলুম মহিম† জিনিয়া।।"

ময়নামতীর গান — ভবানী দাস।

ময়নামতীর গান পুস্তিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, গীতিকায় উল্লেখিত উড়িয়া রাজা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র চোল। রাজমালায় উড়িয়া রাজ্য ও উড়িয়া রাজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এই রাজা আরাকানরাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। উড়িষ্যা হইতে সমাগত কোন ব্যক্তি দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া রাজ্যের নাম 'উড়িয়া রাজ্য' ও রাজার নাম 'উড়িয়া রাজা' হইয়াছিল, ইঁহাই মনে হয়। রাজমালার অমরমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায়, তাঁহার সৈন্যগণ আরাকান রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রথমেই রামু প্রভৃতি ছয়টী সেনানিবাস অধিকার করে, তৎপর দেয়াঙ্গ ও উড়িয়া রাজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল, যথা; —

"রাম্বু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়।
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৭ পৃষ্ঠা।

চট্টগ্রাম, মহারাজ অমরমাণিক্যের পুত্র ও সেনাপতি রাজধর দেবের হস্তে আরাকানরাজ পরাজিত হইয়া, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবসহ উড়িয়া রাজাকে দূতস্বরূপ ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা; —

"মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়।
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায়।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৯ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উড়িয়া রাজ্য আরাকানরাজের অধীনস্থ সামন্ত-রাজ্য ছিল। আমাদের মনে হয়, রাজমালায় ও ময়নামতীর গানে উল্লেখিত উড়িয়া রাজ্য অভিন্ন। তবে, রাজমালার কথিত উড়িয়া রাজা, রাজেন্দ্র চোলের বংশধর হওয়া বিচিত্র নহে। রাজার নামোল্লেখ বা পরিচয়সূচক কোন কথা না থাকায় এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

† মহিম — এই শব্দটী ভুল বলিয়া মনে হয়। 'মহিম' না হইয়া 'মহিন' হইবে। 'মহিন' শব্দের অর্থ রাজ্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'মহিম' একটী দেশের নাম অনুমান করিয়াছেন। এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় 'মহিম' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ' বলিয়াছেন। ইহা প্রমাদপূর্ণ উক্তি বলিয়া মনে হয়।

তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপুল ত্রিপুরবাহিনী দর্শনে মঘগণ প্রথমতঃ ভীত হইয়াছিল, পরে তাহারা ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরার ফিরিঙ্গী সৈন্যগণ বিজিত থানাগুলি বিনাযুদ্ধে মঘদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়িল। প্রতিপক্ষ সেই সকল থানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মঘবাহিনী জানিতে পারিল, ত্রিপুরসৈন্য বিনা সম্বলে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা চতুর্দ্দিকে রসদ বন্ধ করিয়া দিল, এক মুষ্টি চাউল পাইবারও উপায় রহিল না। ফিরিঙ্গীগণের ব্যবহারে ত্রিপুরার সৈনিক দলে চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, আহার্য্য বস্তুর অভাবে তাহারা অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্দ্ধাহারে এবং অনাহারে কিয়দ্দিবস যুদ্ধ করিয়া তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। মঘগণ পলায়িত সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেককে বধ করিল, অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ সেনাপতিগণ পর্ব্বতজাত ঘোঙ্গা আলু ও তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও মঘগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। অনেক সৈন্য তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া ধোপা পাথরের পথে তাড়াতাড়ি নদী পার হইল; যাহারা এই স্থানকে নিরাপদ মনে করিয়া অনেক দিনের পর অন্ন ভক্ষণের আশায় রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, মঘগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে বিনাশ করিল।

অশেষ দুর্গতি ভোগের পর ওষ্ঠাগত-জীবন ত্রিপুর সৈন্যগণ চট্টগ্রামে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কুমার রাজধর প্রমুখ সৈন্যাধ্যক্ষগণ চট্টগ্রামে আসিয়া সৈন্যদলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পথে পথে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সতর্কতার সহিত রাত্রি যাপন করিলেন।

সমরবিজয়ী উন্মত্ত মঘবাহিনী চট্টগ্রামেও ত্রিপুর সৈন্যের অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারা আগমন পথে ত্রিপুর সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, এবং সেই প্রবল আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল। কুমার অমরদুর্লভনারায়ণ, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতাপনারায়ণ ও সুররাষ্ট্রনারায়ণ ঘোটকারোহণে পলায়িত মঘগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং পথে পথে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ক্রমান্বয়ে সাতটী গড় পুনরধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে এক সহস্র মঘের প্রাণহানি হইয়াছিল।

এদিকে সেনাপতিত্রয়ের --- বিশেষতঃ কুমার অমরদুর্লভের সন্ধান না পাওয়ায় রাজ-শিবিরের সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। রণক্ষেত্রে শব ঘাটিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিন শত্রু-

দমন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমার রাজধর হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে শিবিরে আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের মুষ্টিবদ্ধ তরবারি রক্তের বন্ধনে এরূপভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিল যে, হস্তে উষ্ণ জল ঢালিয়া তাহা খুলিতে হইয়াছিল।

আরাকানরাজ এই পরাজয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ উড়িয়া রাজাকে দূতস্বরূপ ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণপূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন — এবার যুদ্ধ স্থগিত রাখা হউক, আগামী বৎসর পুনর্ব্বার আহবে লিপ্ত হওয়া যাইবে। মহারাজ অমর এই প্রস্তাব অনুমোদন এবং স্বীয় শিবির উঠাইয়া লইবার আদেশ করিলেন। তিনি কুমার রাজধরকে লিখিয়াছিলেন — "দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী, তোমার যুদ্ধে যে-সকল মঘ সৈন্য ধৃত হইয়াছে, দেবীসমক্ষে বলিপ্রদান জন্য তাহাদিগকে সঙ্গে আনিও।" এই আদেশ প্রাপ্তির পর কুমার রাজধর সসৈন্যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর রাজ্যে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কুক্কুর ও শৃগালের অশুভ দ্যোতক ক্রন্দনধ্বনি, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, দেব বিগ্রহের অশ্রুপাত, ভূতের উপদ্রব প্রভৃতি দর্শনে রাজ্যময় ঘোর অশান্তির ছায়া পতিত হইল।

ত্রিপুরবাহিনীর চট্টগ্রাম পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই কল্মিগড় হইতে সংবাদ আসিল, আরাকানরাজ পর্ত্তুগীজগণের সাহায্যলাভে যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব লঙ্ঘন করিয়া চট্টগ্রামে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণে মহারাজ অমর বুঝিলেন, ত্রিপুরবাহিনীকে কপট বাক্যদ্বারা সরাইয়া দিয়া, নির্ব্বিবাদে বল সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়েই আরাকানপতি যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি রুষ্ট হইয়া, সেই দিনই যুদ্ধযাত্রার আদেশ প্রচার করিলেন। কুমার রাজধর প্রধান নেতৃত্ব লাভ করিলেন, কুমার রাজদুর্লভ প্রভৃতি সেনাপতিগণ তাঁহার সহযোগী হইলেন। কনিষ্ঠ রাজপুত্র যুঝার সিংহ কিছু উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, মহারাজ অমর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজকুমারত্রয় মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গসহ চট্টগ্রামের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন।

ত্রিপুর সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আরাকানরাজ চিন্তিত হইলেন। তিনি সুবর্ণমণ্ডিত একটী গজদন্তের টোপড় উপঢৌকনসহ ত্রিপুর শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। কি পরিমাণ সৈন্য আসিয়াছে এবং তাহাদের অবস্থাদি কিরূপ, তাহার সন্ধান নেওয়াই দূতের উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত সন্ধির প্রস্তাবও তাঁহার সঙ্গে ছিল। রাজকুমারত্রয় শিবিরে এক সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এই সময় দূত যাইয়া আরাকানরাজের প্রদত্ত টোপ ও পত্র প্রদান করিল। সেই মূল্যবান সুদৃশ্য মুকুট

লাভ করিবার নিমিত্ত ভ্রাতাগণ সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। দূত তাহা উপস্থিত করা মাত্রই কুমার রাজধর মুকুটটী এবং কুমার রাজদুর্লভ পত্রখানা গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহ মুকুট না পাইয়া কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন — "মঘদিগকে শৃগালের ন্যায় নিহত করিয়া এবম্বিধ সহস্র টোপ হস্তগত করিব।"

মঘ নরপতি দূতমুখে কুমার যুঝারের উক্তি শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত সৈন্যসজ্জা করিলেন। ত্রিপুরবাহিনীতে অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল,এজন্য মঘ সৈন্য প্রকাশ্য পথ না ধরিয়া, অরণ্যপথে অগ্রসর হইতেছিল। অশ্ব-চালনার অসুবিধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই বনপথ অবলম্বন করা হইয়াছিল।

চর আসিয়া কুমার রাজধরকে মঘের আগমন বার্ত্তা জানাইল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই কুমার যুঝার সিংহ প্রতিপক্ষকে আক্রমণের নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। মন্ত্রী এবং সৈনাপতিগণ বলিলেন --- "মঘ সৈন্য আমাদের গড় আক্রমণের জন্য আসিতেছে, এই অবস্থায় গড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ, ইহা অগ্রবর্তী হইবার সময় নহে।" সকলে মিলিয়া যুঝারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হইল না। কুমার রাজধরের সমর-নিপুণ 'বৃন্দাবন' নামক একটি ঘোড়া ছিল, যুঝার সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং নিজ ব্যবহার্য্য "জয়মঙ্গল" হস্তী রাজধরের নিমিত্ত রাখিয়া গেলেন।

কুমার যুঝার রণবেশে সজ্জিত হইয়া স্বীয় সৈন্যদলসহ রাত্রিকালে শিবির হইতে নির্গত হইলেন। বাধ্য হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ও সমস্ত দলবলসহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। প্রভাতকালে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অশ্বারোহীগণের সম্মুখে মঘ যোদ্ধৃবৃন্দ অধিককাল দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না; তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় কুমার যুঝার হস্তীদ্বারা গড় ভাঙ্গিবার অভিপ্রায়ে অশ্ব ত্যাগ করিয়া রাজধরের হস্তীতে আরোহণ করিতেছিলেন। মঘপক্ষের একটী গুলির আঘাতে হস্তী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, সে অধিককাল 'বৈঠ' অবস্থায় (বসিয়া) রহিল না, কুমার যুঝার পৃষ্ঠে আরোহণের উপক্রম করা মাত্রই হস্তীটী দাঁড়াইয়া গেল, কুমার গাদির দড়ি ধরিয়া ঝুলিতেছিলেন, এই সময় হস্তী তাঁহার বুকে লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল এবং সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটী শেলের আঘাতে কুমার রাজধরও গুরুতররূপে আহত হইলেন।

এই দুর্ঘটনায় ত্রিপুর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মঘবাহিনী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সংহার করিতে লাগিল। কুমার যুঝারের মৃতদেহ রাস্তার পার্শ্বে পতিত দেখিয়া, মঘগণ তাঁহার মস্তকটী কাটিয়া রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিল।

তাহারা এই অসঙ্গত কার্য্যের নিমিত্ত আরাকানরাজ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিল। তিনি এজন্য ত্রিপুরেশ্বরের নিকটও পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। আরাকান রাজের অধীনস্থ রাম্বু ও দুকরুয়ার শাসনকর্ত্তা আদম শাহের সহিত উক্ত রাজার অসদ্ভাব হওয়ায় আদম, ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরাকানপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহারাজ অমরমাণিক্যকে লিখিলেন — "আদম শাহকে আমার হস্তে অর্পণ করিলে আপনার সহিত প্রীতি সংস্থাপন হইবে।" মহারাজ অমর আশ্রিতকে শত্রু হস্তে অর্পণ করা অসঙ্গত বোধে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনবার্ত্তা এবং পরাজয় সংবাদ এক সঙ্গে পাইয়া মহারাজ অমর শোকে এবং ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইলেন; রাজ্যময় হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন, — "অন্য রাজার শাসনকালে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি, আমার বাহুবলে অনেকবার রাজা এবং রাজ্যের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে; বিধি বিড়ম্বনায় আপন রাজত্বকালে রাজ্য এবং পুত্রকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলাম।"

মহারাজ অমর ভাবিলেন, ইহা শোকে মুহ্যমান হইবার সময় নহে। শত্রুপক্ষ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত, পুত্রগণ সমরবিজয়ী প্রবল শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী, পরিবারবর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার মুখাপেক্ষী, এহেন আপৎকালে মহারাজ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রশোক বক্ষে চাপিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহারাজ শিবিরে উপনীত হইয়া, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে একত্রিত করিলেন; পাঠান সৈন্যদলের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করা হইল। সকলকে উৎসাহিত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিলেন।

মহারাজ অমর শিবিরে উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরে মঘবাহিনী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল; ইছাপুরা গ্রামে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হওয়ায়, ত্রিপুরার দুই সহস্র পাঠান অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা মঘদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রাজমন্ত্রী বলিলেন — "ইহাদের পশ্চাতে আরও সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা দৃষ্টিপথে আগমণ না করা পর্য্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখ।" অল্পকাল মধ্যেই দুই লক্ষ মঘ সৈন্য রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল দেখিয়া, পাঠানগণ আক্রমণ করিতে অসম্মত হইল। তাহারা মন্ত্রীর অবাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল, এবং প্রস্থানকালে ত্রিপুর সৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইল। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া ত্রিপুর সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পলাইল, রাজা স্বয়ং শিবিরে উপস্থিত আছেন, পলায়নপর সৈন্যগণ তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না, এবং রাজাকে নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুমুখে ফেলিয়া যাওয়া যে অসঙ্গত,

এ কথা ভাবিবারও অবসর পাইল না। সুযোগ পাইয়া মঘবাহিনী প্রবলবেগে শিবির আক্রমণ করিতে আসিল। মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈন্যগণ যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, চতুর্দ্দোল আরোহণে উদয়পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিজয়-মদোন্মত্ত মঘবাহিনী বিপুল বিক্রমে রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। মহারাজ অমর আত্মরক্ষায় অসমর্থহেতু পরিবারবর্গসহ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গ আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে নিস্তারলাভের নিমিত্ত ধনসম্পত্তির মমতা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, সমৃদ্ধ উদয়পুর নগর সহসা এক ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল।

এক দিকে প্রাণভয়ে পলায়নের ভিড়, অন্যদিক দিয়া আরাকানরাজ সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। এবং পনর দিবস তথায় অবস্থান করিয়া লুণ্ঠনাদি দ্বারা বিস্তর সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেন। এই সময় দুইজন দেওড়াই মঘরাজের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া গুপ্ত রাজভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর উদয়পুরে একদল সৈন্য রাখিয়া আরাকানরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ অমর অরণ্যপথে মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পরে বিবৃত হইবে।

অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আরাকানরাজের নাম রাজমালায় "সেকেন্দর সাহা" লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে, আরাকানের রাজগণ মুসলমানের অনুকরণে নাম ও উপাধি গ্রহণ করিতেন।* আদম শাহ, হোসেন শাহ ও সেলিম শাহ প্রভৃতি আরাকানের মঘ নরপতিগণের মুসলমানী নাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। রাজমালার কথিত সেকেন্দর শাহার নামান্তর 'মাংফুলা'। চট্টগ্রামের ইতিহাসে পাওয়া যায়; —

> "১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মাংফুলা নামক জনৈক পরাক্রান্ত নরপতির নাম পাওয়া যায়। তিনি পর্ত্তুগীজগণের সাহায্যে সমুদয় চট্টগ্রাম অধিকার করতঃ ত্রিপুরা রাজ্য লুণ্ঠন করেন, এবং ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া মেঘনার পারস্থ আলমদিয়া ও জুগদিয়া দুর্গ সুরক্ষিত করেন।"
>
> চট্টগ্রামের ইতিহাস — ১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৩০ পৃষ্ঠা।

রাজমালায় লিখিত আছে, ১৫১০ শকের চৈত্র মাসে মঘ কর্ত্তৃক উদয়পুর আক্রান্ত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৫৮৭ খ্রীঃ (১৫০৯ শকে) মঘবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিল। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা অমরমাণিক্যের রাজত্ব

---

* "মুসলমান নৃপতির মনস্তুষ্টির জন্য আরাকানের কোন কোন মঘ নৃপতি মুসলমানের নাম ধারণ ও মুদ্রায় কল্‌মা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।"

চট্টগ্রামের ইতিহাস — ১ম ভাগ, ৩য় অঃ, ২৫ পৃষ্ঠা।

১৫০৮ শক পর্য্যন্ত স্থিরতর থাকা নির্ণীত হইতেছে। মঘের আক্রমণ দ্বারাই তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং মঘের আক্রমণ ঐ শকেরই ঘটনা, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ

মহারাজ অমরমাণিক্যের পরলোক গমনের পর যুবরাজ রাজধর 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিপুরার সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি রাজকার্য্যে বীতস্পৃহা হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠানে লিপ্ত এবং হরিনাম কীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা দেখিলেন, ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সুযোগ। তিনি এক প্রবল বাহিনী ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুরেশ্বর মন্ত্রীবর্গের ব্যবস্থানুসারে বিপক্ষের গতিরোধের নিমিত্ত সেনাপতি চন্দ্রদর্পনারায়ণের কর্ত্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক সৈন্যদ্বারা কৈলাগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। এখানে উভয় পক্ষে অল্পকাল যুদ্ধ হইবার পর, মোগলগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল; ত্রিপুর-সেনাপতি অল্পায়াসেই বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাহাবাজ খাঁ বঙ্গের সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর রাজা মানসিংহ ঐ পদে নিয়োজিত হইলেন (১৫৮৯ খ্রীঃ ১০১৪ হিঃ)। রিয়াজ-উস্-সলাতিনের মতে মানসিংহ, বিদ্রোহী ওস্মান খাঁকে দমন করিতে অক্ষম হওয়ায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর, নিযুক্তের প্রথম বর্ষেই তাঁহাকে অবসর করিয়া, কোতবউদ্দীন খাঁ কোকলাতাশকে বঙ্গের নিজামতি প্রদান করেন। "ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীর" নামক সম্রাটের স্বরচিত গ্রন্থেও এই অপসারণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, * কিন্তু মানসিংহ কি কারণে অপসৃত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। এই কারণে সলাতিনের প্রদত্ত অবসরের হেতু সকলে স্বীকার করেন না। মোগলকর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণের সন নির্দ্ধারণোপযোগী কোন অবলম্বন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপুরা আক্রমণকারী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার ভুলুয়া বিজয়

মহারাজ রাজধরের পুত্র যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে পুনর্ব্বার ভুলুয়াপতির সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হয়। এবার মহারাজ যশোধর স্বয়ং যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া ভুলুয়ারাজ বলরাম মাণিক্যকে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। নির্ম্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠনে ভুলুয়া দেশ নিষ্পেষিত হইল, এই যুদ্ধই ভুলুয়া রাজ্যের পক্ষে পতনের মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

---

* "When I ascended the throne in the first year of my reign. I recalled Man Sing who had long been the governor of the country."

ইহার অল্পকাল পরে, ভারত সম্রাট শাহ সেলিম (জাহাঙ্গীর)* ত্রিপুরেশ্বরের হস্তী-বিভব আত্মসাৎ করিবার অভিলাষী হইলেন। তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ (ফতেজঙ্গ) কে † দিল্লীতে আহ্বান করিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের অনুজ্ঞা করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ দিল্লীর দরবার হইতে প্রধান ওমরাহ এবং সেনাপতি ইস্পিন্দার ও নুরউল্লার অধীন বহু সংখ্যক সৈন্য প্রদান করা হইল। নবাব ফতেজঙ্গ খাঁ ঢাকায় আসিয়া দিল্লী হইতে আগত বাহিনীর সহিত বঙ্গীয় সৈন্যদল যোগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সেনাপতিদ্বয়কে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তাঁহাদের বিজয়বার্ত্তা লাভের প্রতীক্ষায় ইব্রাহিম ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন।

বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক পুনরাক্রমণ

উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতে এককালে আক্রমণের অভিপ্রায়ে সেনাপতি ইস্পিন্দার খাঁ কৈলারগড়ের পথে এবং মৃজা নুরউল্লা খাঁ মেহেরকুলের পথে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ যশোধর এই সংবাদ পাইয়া প্রতিপক্ষের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত আপনার সৈন্যবল দুইভাগে বিভক্ত করিলেন; তাহাদের একদল চণ্ডীগড়ে ও অপরদল ছয়ঘরিয়াগড়ে রক্ষিত হইল।

মোগলগণ উক্ত দুইটী গড় একই কালে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; দুই পক্ষেরই বিস্তর সৈন্য আহত ও নিহত হইল। মোগল বাহিনীতে সৈন্য-সংখ্যা অত্যধিক থাকায়, তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ত্রিপুরার সৈন্যদল দুর্গদ্বয় মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। তাহারা উদয়পুরে উপনীত হইলে মহারাজ যশোধরমাণিক্য নিরুপায় হইয়া রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পট্ট-মহিষীসহ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে মোগল সেনাপতি ইস্পিন্দার খাঁ ছয়ঘরিয়াগড় হস্তগত করিয়া দ্রুতগতিতে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং অসি কোষবদ্ধ রাখিয়াই অবাধে নগর অধিকার করিলেন। তাঁহাদের লুণ্ঠন এবং অত্যাচারে রাজধানীর বর্ণনাতীত দুর্দ্দশা ঘটিল। মোগল সৈন্য পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া, মহারাজকে ধৃত ও বন্দী করিল। এতদুপলক্ষে রাজ্যের যে দারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

মহারাজ যশোধরের পর, কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্বকাল। যশোধর-মাণিক্যের রাজ্যচ্যুতির পর ত্রিপুর সেনাপতি রণজিতনারায়ণ সুযোগ পাইয়া, উদয়পুরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণস্থিত আচরঙ্গ নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া নির্ব্বিবাদে এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার

মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্যের শাসনকাল

* ইনি সম্রাট আকবরের পুত্র। ১৬০৫ — ১৬২৭ খ্রীঃ ইঁহার রাজত্বকাল।

† 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' এর মতে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৬১৭ খ্রীঃ অব্দে) ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য সিংহাসন লাভের পর ইঁহাকে আক্রমণ ও পরাভূত করিয়া আচরঙ্গ প্রদেশের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ, ভারতেশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে শাহজাহান সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। তিনি ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজাকে বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় আবার হস্তী লাভের আশায় মোগল সৈন্য, ত্রিপুরেশ্বরের কৈলার গড় দুর্গ আক্রমণ করিল। মহারাজ কল্যাণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, এ যাত্রায় মোগলদিগকে পরাভূত এবং বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী সৈন্য

সাধারণ কথা

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীগণ বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের ন্যায় ভীরু স্বভাবাপন্ন ছিল না। তাহাদের সাহস ও পরাক্রমের প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত সুদূর অতীতের কাহিনী বলিতে হইবে না, বঙ্গের ভৌমিকগণের ইতিহাসই এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, মসনদ আলী, ভূষণার সীতারাম রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের বীরদর্প একদিন ভারত সম্রাটকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইঁহাদের বাহুবলে সেকালে ফিরিঙ্গী প্রভৃতি প্রবল দস্যুদলের হস্ত হইতে এ দেশের ধন-প্রাণ রক্ষা পাইতেছিল। তখন সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সৈন্য ইঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল। দেশমাতৃকার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত, — দেশবাসীগণের সম্মান ও সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, বঙ্গের বীর পুত্রগণ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। সেকালে মেয়েলী বেশ ধারণে সমুৎসুক, মসীজীবী, মোমের পুতুলের বক্তৃতার দাপটে বঙ্গভূমি রঙ্গমঞ্চে পরিণত হইতেছিল না। লেখাপড়ার সহিত মল্লবিদ্যার চর্চ্চা, তরবারি, লাঠী ও সর্কি খেলার চর্চ্চা, অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনা শিক্ষার চেষ্টা সেকালে বাঙ্গালী সমাজের রেওয়াজ ছিল। আমরা কৈশোরকালে চশমার আবরণে চক্ষু ঢাকিয়া, সেই দূরদৃষ্টিতে বঞ্চিত হইয়াছি।

ত্রিপুরার বাঙ্গালী সৈন্য

প্রাচীনকালে কুকি, ত্রিপুরা, হালাম ও রিয়াং প্রভৃতি নানা জাতীয় পার্ব্বত্য সৈন্যের প্রভাবে ত্রিপুর রাজ্য প্রভাবান্বিত থাকিলেও কোন সময়ই বাঙ্গালী সৈন্য উপেক্ষিত হয় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল, এবং এই

শ্রেণীর সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।* মহারাজ অমরমাণিক্যের তরপ ও শ্রীহট্ট বিজয়কালে ত্রিপুরবাহিনীতে বাঙ্গালী সৈন্য বিস্তর ছিল। রাজমালায় পাওয়া যায়; —

"বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন।
তাহাতে প্রধান চলে প্রতাপনারায়ণ।।
দুই হাজার ঢালী চলে নূপুর পরিয়া।
জাঠি খড়গ চর্ম্মধারী ধনুর্ব্বাণ লৈয়া।।"

তৃতীয় লহর — ৫ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র দেখা যাইতেছে, —

"অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন।
ইছা খাঁ সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ।।"

তৃতীয় লহর — ৭ পৃষ্ঠা।

ইহার পরবর্ত্তীকালেও ত্রিপুরায় বাঙ্গালী সৈন্য রক্ষার বিস্তর প্রমাণ আছে। কিন্তু সকল সময়ই পার্ব্বত্য সৈন্যের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ত্রিপুরা ইহাদের মাতৃভূমি, ত্রিপুরেশ্বরের সহিত ইহাদের নখ-মাংস সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সৈনিক বিভাগে ইহাদের আধিপত্য লাভ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিতে হইবে।

সৈনিক দলের বিশ্বাসঘাতকতা

ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে অশ্ব চালনায় সুনিপুণ পাঠানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষার নিমিত্ত অশ্বারোহী সৈন্যের প্রয়োজন হয়; তৎকালে দশ হাজার পাঠান দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করা হইয়াছিল। পাঠান শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-সৈন্যের উপর নির্ভর করা যে বিষম প্রমাদপূর্ণ কার্য্য, মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতিকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধা ভূপতি তাহা বুঝিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই এই ভ্রমাত্মক কার্য্যের বিষময় ফল ফলিল; পাঠানগণের দুই মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল, এই সামান্য অছিলায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা মেহেরকুল দুর্গে প্রচণ্ড উজীরকে হত্যা করিল। উজীরের পুত্র সেনাপতি প্রতাপনারায়ণ পলায়নপর হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠানগণ রাজধানী লুণ্ঠন এবং রাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে মদ্যপান হেতু আত্মকলহ হওয়ায়, সেই অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ বিজয়, তৎকালে চট্টগ্রামে ছিলেন, তিনি উজীরের নিধনবার্ত্তা পাইয়া, এবং

পাঠান সৈন্য

* "চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান।
প্রচণ্ড উজীর সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান।।"

দ্বিতীয় লহর — বিজয়মাণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

পাঠানগণের দূরভিসন্ধি জানিয়া, এক সহস্র সেনাপতিসহ বিস্তর পাঠান সৈন্য চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় সুলতান সুলেমান গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি পাঠানগণের দুর্গতিতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বজাতি নির্য্যাতনের প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। গৌড়াধীপের শ্যালক মমারক খাঁ বা মহম্মদ খাঁ এই আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন। উভয় পক্ষে আটমাস কাল অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ হয় প্রথমতঃ ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু পাঠানগণ শেষ পর্য্যন্ত বিজয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, বিজয়-লক্ষ্মী ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হইলেন। পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থায় রাজধানীতে নীত হইবার পর, তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সুলেমান, দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিপন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরার সহিত তাঁহার বিরোধ চাপা পড়িয়া গেল। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে এ বিষয়ের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

মহারাজ অমর-মাণিক্যের শাসনকাল

ইহার পর মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানরাজের সহিত ত্রিপুরার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র নিহত এবং ত্রিপুরবাহিনী পরাজিত হইবার সংবাদ পাইয়া মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া, সুদৃঢ় গড় নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময় স্বীয় পাঠান সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈন্যগণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিতেছে, ইহা দৈব বিড়ম্বনা। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে গমন করিলেন, সেখানেও মঘের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পাঠানগণের অবাধ্যতাই এই অনর্থের মূল কারণ হইয়াছিল।

ফিরিঙ্গী সৈন্য

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে দেখা গেল, আরাকানের মঘগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সন্দ্বীপের উপনিবেশী পর্ত্তুগীজগণ অবাধ দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মঘদিগের সহিত যোগদান করায়, এবং আরাকান-রাজের সৈনিক বিভাগে তাহারা প্রবিষ্ট হওয়ায় মঘগণের শক্তি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহারাজ অমর কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিবার অভিপ্রায়ে নৌ-যুদ্ধ বিশারদ একদল পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী দ্বারা সামরিক বল দৃঢ় করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইহাদিগকে লইয়া আরাকানরাজ্য আক্রমণ করা হইল, ত্রিপুর সৈন্য, মঘরাজের রাম্বু প্রভৃতি ছয়টী থানা হস্তগত করিবার পর দেয়াঙ্গ (ডিয়াঙ্গা) আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে, এই সময় ত্রিপুরার ফিরিঙ্গী সৈন্যগণ

মঘরাজের বাধ্য হইয়া বিজিত থানাগুলি প্রতিপক্ষের হস্তে অর্পণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। মঘ ও ফিরিঙ্গীর মধেও পূর্ব্ব হইতেই পরস্পর সদ্ভাব ছিল, সময় সময় উভয় পক্ষে কলহ উপস্থিত হইলেও এই ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গীদিগকে হস্তগত করা মঘরাজের পক্ষে দুঃসাধ্য হইল না। এই অভাবনীয় বিপত্তি-পাতে ত্রিপুরবাহিনীর যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সেকালে পাঠান ও ফিরিঙ্গীগণ সুনিপুণ যোদ্ধা ছিল, সুতরাং তাহাদিগকে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে গ্রহণ করা এক হিসাবে নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক না হইলেও তাহাদিগকে শাসনে ও বশে রাখিবার উপযুক্ত সুদক্ষ নায়কের অভাব ছিল, সমগ্র বিষয় আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে। পরিপক্ক চালকের অধীনে থাকিলে সৈন্যগণ কথায় কথায় এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে সাহসী হইতে পারে না।

রাজা ও রাজ্যঘটিত বিবরণ

রাজধানী প্রতিষ্ঠা

রাজমালা তৃতীয় লহরে বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক কালে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন রাজার শাসনকালে নব-রাজধানী স্থাপিত হইয়া থাকিলেও স্থায়ী রাজপাট স্থানান্তরিত হয় নাই। এই সময়ে সংস্থাপিত নূতন রাজধানীর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

অমরপুরে রাজধানী

উদয়পুর রাজধানী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-প্রাচীর এবং নদী-পরিখা দ্বারা প্রাকৃতিক বিধানে সুরক্ষিত হইলেও রাজপরিবারের আত্মবিরোধ ও পুনঃ পুনঃ বঙ্গেশ্বরের সাহায্য গ্রহণের সুযোগে মুসলমানগণ সেইস্থান আক্রমণের পথঘাট বিশেষভাবে চিনিয়া লইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা পশ্চিম ও উত্তর দিক হইতে বারম্বার রাজধানী আক্রান্ত হইতে থাকে। সুযোগ পাইলে, আরাকানের মঘগণ, সন্দ্বীপে উপনিবিষ্ট পর্ত্তুগীজগণের সহযোগিতায় সময় সময় রাজ্য আক্রমণ করিতেও ছাড়িত না। মহারাজ অমর দেখিলেন, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত রাজধানীকে অধিকতর সুরক্ষিত করা আবশ্যক। তিনি স্বয়ং যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অমরপুরকে নিরাপদ স্থান মনে করিয়া, তথায় গোমতী নদীর তীরে এক দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই স্থান উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাধিক
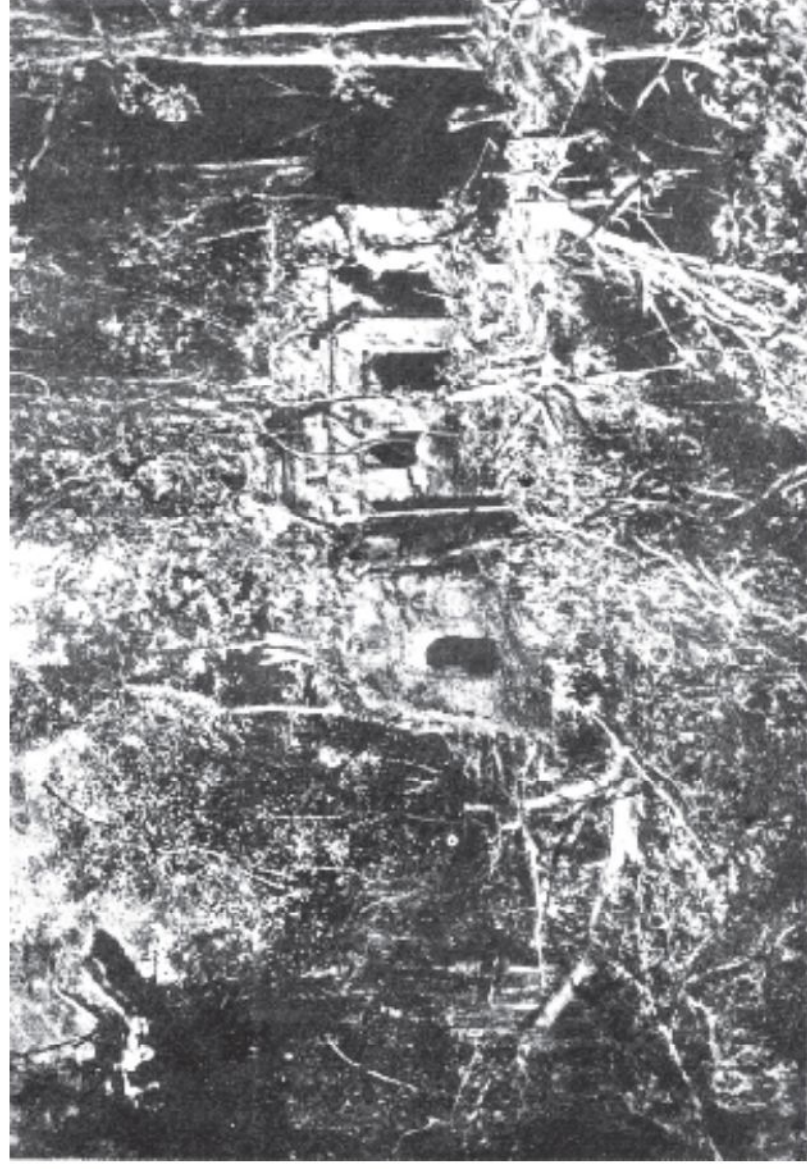
মহারাজ অমর মাণিক্যের প্রাসাদ - অমরপুর।
(এই প্রাসাদ গোমতী নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে)।

(১), (২)— অমরপুরের দুর্গ।

কারুকার্য্যখচিত শিলাস্তম্ভ — অমরপুর।

পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এতদুভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী 'বড়মুড়া' নামক উত্তর-দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বতমালা, আক্রমণকারীকে বাধা প্রদান জন্য দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ-প্রাচীর স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শত্রুর আক্রমণে উদয়পুর অরক্ষিত হইলে, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অমরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারিত, এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পথে প্রতিপক্ষ আসিয়া অমরপুর আক্রমণ করিলে উদয়পুরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবার সুবিধা ঘটিত। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী, প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে "অমরপুর" আখ্যা লাভ করিল।

অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্যের নির্মিত ত্রিতল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং তাঁহার দ্বারা খনিত অমর সাগর এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "ফটিক সাগর" নামক বিস্তৃত সরোবরের জল বর্ত্তমান কালেও অতিশয় নির্ম্মল এবং সুপেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত অমরসাগর ও ফটিকসাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী জীর্ণ মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিলাময় বিগ্রহ নিকটবর্ত্তী নালায় পতিতাবস্থায় ছিল, স্থানীয় লোকে তাহা উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিকট একখানা খড়ের গৃহে স্থাপন করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে এই মূর্ত্তি "মঙ্গলচণ্ডী" আখ্যা লাভ করিয়াছেন। মূর্ত্তিটী অষ্টভুজ বিশিষ্ট এবং গরুড়বাহন; দৃষ্টিমাত্রই ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নানাস্থানে কতিপয় ভগ্ন মন্দিরের ইষ্টকস্তূপ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি দ্বারা এইস্থানে আরও কতকগুলি ইষ্টকালয় থাকা প্রমাণিত হইতেছে। রাজ নিকেতনের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভদ্বয় উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত এবং সুচারু কারুকার্য্য খচিত। ইহা স্থানীয় কি ভিন্নদেশীয় তক্ষ-শিল্পীর নির্ম্মিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

রাতাছড়ায় রাজধানী

মহারাজ অমরমাণিক্য মঘকর্ত্তৃক উদয়পুর হইতে বিতাড়িত হইয়া বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তঃপাতী মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময় রাজ্যের দক্ষিণভাগ মঘকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও উত্তরাংশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তচ্যুত হয় নাই। মহারাজ অমর কিয়ৎকাল এখানে অবস্থান করিবার পর দেহরক্ষা করায়, তদীয় পুত্র রাজধরমাণিক্য এই স্থানেই রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন; এতদুপলক্ষে নবীন 'ভূপতির নামানুসারে স্থানের নাম "রাজধর ছড়া" রাখা হয়, সেই নাম অপভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান কালে স্থানটী 'রাতাছড়া' নামে অভিহিত হইতেছে।

মহারাজ অমর বিপন্নাবস্থায় এইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, রাজধরমাণিক্য এই স্থানেই রাজ্যভার গ্রহণ

করেন।* তিনি রাজ্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার উদয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই কারণে উক্ত স্থানে স্থায়ী বাড়ীঘরের কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। তদ্রূপ নিদর্শন না থাকিলেও এইস্থানে রাজার অবস্থানসূচক যে দুই একটী বস্তু পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত রাতাছড়া নামক স্থানের (রাজধর ছড়ার) সন্নিহিত দেমদুমছড়ার পাড় নিবাসী রামজয় ত্রিপুরার পুত্র ব্যাসমুনি ত্রিপুরা ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে রাতাছড়ায় মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে গিয়াছিল। সে ছড়াতে বাঁধ দিবার নিমিত্ত কোদালী দ্বারা উক্ত ছড়ার কিনারা হইতে মৃত্তিকা খননকালে এক হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নভাগে, একসঙ্গে অবস্থিত দুইটী ধাতুনির্ম্মিত ত্রিপদী প্রাপ্ত হয়। ত্রিপদীদ্বয়ের এক একটী পদ ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা পুরাতন ভাঙ্গা বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ জলমগ্নাবস্থায় অথবা মৃত্তিকা গর্ব্ভে নিমজ্জিত হইবার পর তাহা ভগ্ন

---

* রাজধর ছড়ায় অবস্থান সম্বন্ধে রাজমালা চতুর্থ লহরে লিখিত আছে; —

"তথা হতে চরাই বাড়ী মনু নদী তটে।
যুবরাজ ভ্রাতা হরিমণির সহিতে।।
পূর্ব্বে রাজধরমাণিক্য পাট সেইস্থান।
নদীর নাম রাজধর এইত কারণ।।
সে পর্ব্বতের নাম রাজধর মুড়া বলে।
পর্ব্বত নদীর নাম রাজধর ছিলে।।"

চতুর্থ লহর — কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিস্তৃত বিবরণযুক্ত 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায় —

"পূর্ব্বে ছিল অমরমাণিক্য নরপতি।
পূর্ব্বে রাজমালাতে লিখিছে তার কীর্ত্তি।।
রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া তিনি উদয়পুর হৈতে।
আসি নির্ম্মাইল পুরী মনু নদী তটে।।
সেই মনু নদী মধ্যে যাইয়া বিশেষে।
আর এক নদী আসি প্রবেশ হইছে।।
সেই দুই নদীর ত্রিবেণীতে করি ঘর।
তথাতে যে আছয়ে অমর নৃপবর।।
কালবশ হইয়া তিনি সেই স্থানে মরিল।
তান পুত্র রাজধর তথা রাজা হৈল।।
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি।
প্রকাশ আছয়ে নাম লোকে অদ্যাবধি।।

এই স্থানে পাকা ঘাটবিশিষ্ট পুষ্করিণী ও প্রশস্ত বাঁধা রাস্তার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।
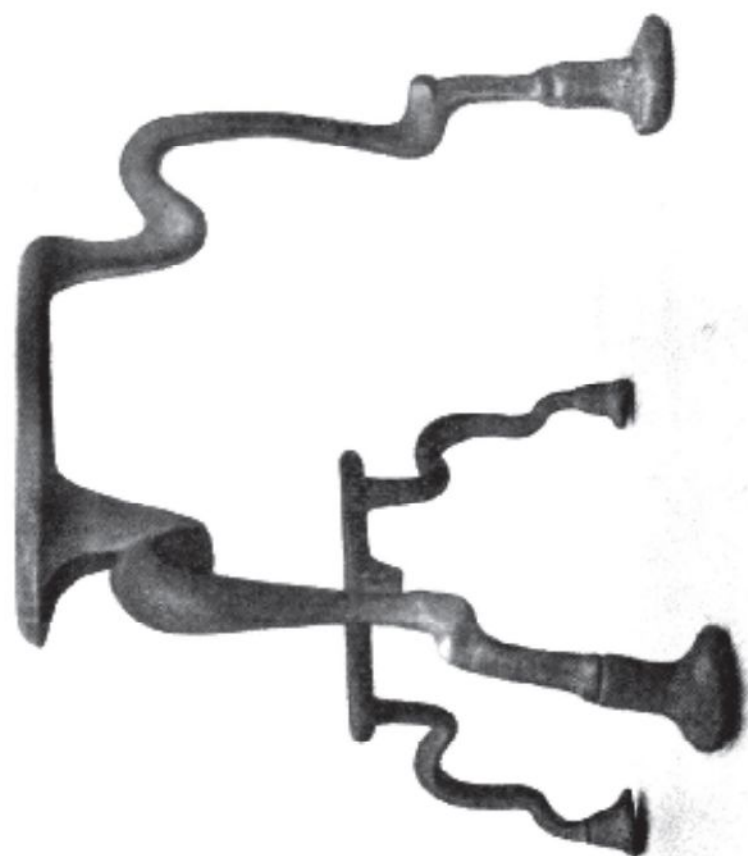
হইয়াছে। স্থানটী বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে ভগ্নাংশ দুইটী পাইবার সম্ভাবনা ছিল, ব্যাস মুনি সে বিষয়ে তাদৃশ্য যত্ন করে নাই। এখন আর তাহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

ত্রিপদীদ্বয় উল্টাভাবে (পদত্রয় ঊর্দ্ধদিকে স্থাপিতাবস্থায়) পাওয়া গিয়াছে। বড় ত্রিপদীর মধ্যে ছোটটী স্থাপিত ছিল। বস্তুদ্বয় সুবর্ণ নির্ম্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করায় ব্যাসমুনি রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় তৎসহ আগরতলায় আসিয়া রাজদরবারে অর্পণ করিয়াছে।

ত্রিপুরেশ্বরগণ যে প্রকারের ত্রিপদীতে ভোজনপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক আহার করেন, প্রাপ্ত ত্রিপদীদ্বয় তদনুরূপ আকারে গঠিত। ইহাকে সাধারণতঃ "ভোজন-বেড়" বলা হয়।

রাতাছড়ার তীরে মহারাজ অমরমাণিক্য ব্যতীত যুবরাজ কৃষ্ণমণি (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) মুসলমান কর্ত্তৃক বিতাড়িত অবস্থায় কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন রাজা অথাবা 'ভোজন-বেড়' ব্যবহারযোগ্য কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তি তথায় বাস করিবার প্রমাণ অথবা প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায় না। এরূপ নির্জ্জন ও দুরধিগম্য গিরিকন্দরে বিপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন, ধনশালী অন্য ব্যক্তির বাস করা সম্ভব হইতে পারে না। সেকালে ত্রিপুরেশ্বরগণ ব্যতীত ধাতুনির্ম্মিত ত্রিপদী ব্যবহারযোগ্য কোন ধনাঢ্য কিম্বা সভ্য ব্যক্তি তদঞ্চলে ছিল না; কুকিগণই তথাকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। বর্ত্তমান কালেও উক্ত স্থানের সান্নিধ্যে কুকিরাজগণ বাস করিতেছেন। যে স্থানে ত্রিপদী পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ছড়ার পশ্চিম তীরে জনৈক কুকি সরদারের বাড়ী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ণিত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে, ছড়ার মধ্যবর্ত্তী মৃত্তিকা গর্ব্ভে লব্ধ ত্রিপদীদ্বয় মহারাজ অমরমাণিক্যের অথবা কৃষ্ণমণি যুবরাজের ছিল, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ভৃত্যগণ তাহা ধৌত করিতে আনিয়া অসতর্কতা নিবন্ধন ছড়ার জলে ফেলিয়া গিয়াছিল, অথবা তাহা সুবর্ণ নির্ম্মিত জ্ঞানে অপহরণ করিয়া এই স্থানে লুক্কায়িত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। মহারাজ অমরমাণিক্যের অধ্যুষিত স্থানেই কৃষ্ণমণি যুবরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণমালায়' এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা;---

"তান পুত্র রাজধর তথা রাজা হৈল।।
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি।
প্রকাশ আছয়ে নাম লোকে অদ্যাবধি।।
পুনি কৃষ্ণমণি যুবরাজ সেইস্থান।
কতদিন ছিল পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।।"

কৃষ্ণমালা।

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের যৌবরাজ্য সময়ে সরাইল পরগণার জঙ্গল আবাদ করাইয়া তথায় এক আবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই বাড়ীতে সময় সময় বাস করিয়া থাকিলেও তাহা কোন সময়ই রাজধানী ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

কল্যাণপুরে রাজধানী

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজ্যলাভ করিয়া, বর্ত্তমান খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত খোয়াই নদীর তীরবর্ত্তী একটী উপত্যকা ও অল্পোন্নত পর্ব্বতমালার কিয়দংশ লইয়া এক নগর স্থাপন করেন। এখানে এক বাসভবনও নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরোবর খনন, দেবমন্দির গঠন ও বিলাস কুঞ্জাদি নির্ম্মাণদ্বারা এই স্থানকে যে মনোরম করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিনষ্টাবস্থার দ্বারাও তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখানকার কল্যাণসাগরের নাম উল্লেখযোগ্য। মহারাজের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'কল্যাণপুর' হইয়াছে। এই স্থান বর্ত্তমান রাজধানী হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, ন্যূনাধিক দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বড়মুড়া পর্ব্বশ্রেণী অতিক্রম করিয়া এখানে যাইতে হয়। এই স্থানের বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য উদয়পুর হইতে সুদূর কল্যাণপুরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ শিকার ব্যপদেশে এইস্থানে গিয়াছিলেন এবং স্থানটী মনোরম দেখিয়া, সময় সময় বাস করিবার অভিপ্রায়ে নগর স্থাপন ও পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অনেকের মতে কুকি, লুসাই ও হালাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আবাস নির্ম্মাণের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আবার কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় বাছাল জাতীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা পালিত এবং বাছাল সম্প্রদায়ের যত্নে ও আদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; এই কারণে বাছাল জাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সে কালে বড়মুড়ার সন্নিহিত নানাস্থানে বাছালগণ বাস করিত। সময় সময় তাহাদের সঙ্গলাভের অভিপ্রায়ে মহারাজ এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল জনরবের মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

এস্থলে যে-সকল রাজধানীর কথা বলা হইল, তৎসমস্ত রাজগণের সাময়িক বাসের অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সকল রাজাই স্থায়ী রাজধানী উদয়পুরে রাখিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীসমূহ দ্বারা এই স্থানের গৌরব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও কোন কোন রাজা উদয়পুরের রাজপাট অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অন্যান্য স্থানে সাময়িক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এস্থলে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, কৈলারগড় ও মাণিকভাণ্ডার প্রভৃতি স্থানে

প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য প্রদেশের নানাস্থানে আরও অনেক বাড়ীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজ-দরবার

দরবারের গঠন প্রণালী

রাজগণ প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া প্রকাশ্য দরবারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। চতুর্দ্দিকে সৈনিক প্রহরী নিযুক্ত থাকিয়া দরবার গৃহের শান্তিরক্ষা করিত। মন্ত্রী-সমাজ ব্যতীত, পণ্ডিত-মণ্ডলীও দরবারের অঙ্গীয় ছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। পদমর্য্যাদানুসারে দরবারে উপবেশনের স্থান নির্দ্ধারিত ছিল, অনেককে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত।

দরবারের কার্য্য

রাজার করণীয় রাজ্যসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা, গুরুতর অপরাধীর বিচার, শাসন ও বিচারাদি বিষয়ক নূতন প্রণালী নির্দ্ধারণ, ধর্ম ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্য্য দরবার কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। রাজকার্য্যের অবসানে, পণ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও তদ্বিষয়ক বিচার বিতর্কে অনেক সময় অতিবাহিত হইত। অপরাহ্নে পুরাণ পাঠ ও হরিনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল।

শাসনতন্ত্র ও শাসন প্রণালী

শাসনতন্ত্র

রাজমালা প্রথম লহরে সন্নিবেশিত রাজগণের শাসনকালে সেনাপতিগণের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত ছিল। সৈনিকবল ও শাসন ক্ষমতা এক হস্তে অর্পিত হওয়ায় অনেক স্থলে কু-ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে, রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক বিবরণ জানা যাইবে।* মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেনাপতিগণের হস্ত হইতে শাসনভার বিচ্ছিন্ন করিয়া নব নিয়োজিত উজীরের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন। তদবধি ত্রিপুরার শাসন বিভাগে উজীর উপাধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের সময়ে পাত্র ও মন্ত্রী পদের উল্লেখ পাওয়া যায়, উজীরের পদ এই সময়ও অক্ষুণ্ণ ছিল। ইঁহাদের দ্বারা সাময়িক ও রাষ্ট্রিক অবস্থানুযায়ী শাসন পরিষদ গঠিত হইত।

শাসন প্রণালী

মহারাজ রত্নমাণিক্য মুসলমান শাসনের আদর্শ অবলম্বনে যে শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তর্ভূত সময়েও তাহার বেশী পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। দূরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণের 'লস্কর' উপাধি এই সময়ও অব্যাহত ছিল, এতদ্ব্যতীত মহারাজ অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক 'থানাদার' উপাধি প্রবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহারাও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সকল উপাধি মুসলমান হইতে গৃহীত।

* রাজমালা — ২য় লহর, ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সময়ও বিচার এবং শাসনকার্য্য সম্পাদন জন্য লিখিত আইন বা নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থ স্বতন্ত্র আফিস বা আদালতও ছিল না। শাসনকর্ত্তাগণ ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন বিবেকানুযায়ী বিচার ও শাসনকার্য্য নিষ্পাদন করিতেন। বিচারে যে-সকল অপরাধী প্রাণদণ্ডের যোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাদের শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল।

চর নিয়োগ

প্রাচীনকালে রাজ্যের অবস্থা প্রকৃতিপুঞ্জের মনোভাব, শত্রুপক্ষের গতিবিধি এবং পররাষ্ট্রের সংবাদ ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজগণ চর নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহারা কখনও ভিক্ষুক বেশে, কখনও বা বণিক বেশে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সময় এবং প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিতে হইত। চরের কর্ত্তব্য অতীব কঠোর এবং দায়িত্বপূর্ণ; রাজগণ ইঁহাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইতেন, সুতরাং চর রাজার প্রধান সহায়। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, সুচতুর এবং সৎস্বভাবান্বিত ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে চরের কার্য্যে নিয়োগ করা হইত। অনভিজ্ঞ, অসৎ কিম্বা অযোগ্য চরের বাক্যের উপর নির্ভর করিলে, রাজাকে পদে পদে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট এবং অপ্রিয় হইতে হয়; এমনকি, বিপদাপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক চর-কার্য্যে লোক নির্ব্বাচন করা হইত। চরের যোগ্যতা ও ধীশক্তি রাজমন্ত্রী অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে চরের যে-সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে সম্যক অবস্থা বুঝা যাইবে।*

---

* নীতিশাস্ত্রে চরের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; —
"তর্কেঙ্গিতজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ স্বীয়ভাব প্রকাশকঃ।
ক্লেশায়াসসহো দক্ষঃ সর্ব্বত্র ভয় বর্জ্জিতঃ।।
সুভক্তোরাজসু তথা কার্য্যাণাং প্রতিপত্তিমান্।
নৃপো নিহন্যাচ্চারেণ পররাষ্ট্র বিচক্ষণঃ।।
কালজ্ঞো মন্ত্রকুশলান্ সংবৎসর চিকিৎসকান্।
তথান্যানপি যুঞ্জীত সমর্থান্ শুদ্ধচেতসঃ।।
অক্রুদ্ধাংশ্চ তথালুব্ধান্ দৃষ্টার্থান্ তত্ত্ব ভাষিণ।
পাষণ্ডিনস্তাপসাদীন্ পররাষ্ট্রে নিযোজয়েৎ।।
স্বদেশ পরদেশজ্ঞান্ সুশীলান্ সু বিচক্ষণান্।
বার্ত্তা হর্য্যান্ বহূংশ্চৈব চরাণাং বিনিযোজয়েৎ।।
নৈকস্য বচনে রাজা চারস্য প্রত্যয়ং বহেৎ।
দ্বয়োঃ সম্বন্ধমাজ্ঞায় তদ্‌যুক্তং কার্য্যামারভেৎ।।
তস্মাদ্রাজা প্রযুঞ্জীত চরান্ বহুমুখান্ বহূন্।
নীরেতো বামনাঃ কুব্জাস্তদ্বিধা যে চ কারবঃ।।
ভিক্ষুক্যশ্চারণা দাস্যো মালাকার্য্যঃ কলাবিদঃ।
অন্তঃপুরগতাং বার্ত্তাং নির্হরেয়ুরলক্ষিতাম্।।"
যুক্তিকল্পতরু।

ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে, চরের যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই, — তর্কে ইঙ্গিতজ্ঞ, প্রখর স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, যথাযথ ভাব প্রকাশে সক্ষম, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রমপটু, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, নির্ভীক, রাজার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ সর্ব্ব বিষয়ে প্রতিপত্তিশালী, পররাষ্ট্র-তত্ত্বজ্ঞ, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম, মন্ত্রণাপটু, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্, তথ্য সংগ্রহে সমর্থবান, বিশুদ্ধচিত্ত, ক্রোধহীন, নির্লোভ, তত্ত্বজ্ঞ, স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সুশীল, বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে বার্ত্তা সংগ্রহার্থ নিয়োগ করা সঙ্গত।

রাজা বার্ত্তা-সংগ্রহ জন্য বহু চর নিযুক্ত রাখিবেন। একজন বার্ত্তাবহের বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। অন্ততঃ দুই জনের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইবেন। নপুংসক, বামন, কুব্জ, ভিক্ষুক ও চারণ প্রভৃতি দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। অন্তঃ পুরের সংবাদ লইবার নিমিত্ত দাসীভাবে লোক প্রেরণ করিবেন, ইত্যাদি।

যুক্তিকল্পতরুর মতে চর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। রাজগণ সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্য্যে, অথবা সংবাদ প্রেরণার্থ প্রকাশ্য ভাবে যে চর নিযুক্ত করেন তাঁহারা দূত, এবং গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ চর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। গুপ্তচরের ন্যায় দূতেরও যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা আবশ্যক। প্রাচীন মতে দূতগণ নিম্নোক্ত গুণ-বিভূষিত হইবেন; —

"যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশকাল বিভাগবিৎ।।
বিজ্ঞাত দেশ কালশ্চ দূতঃ স্যাৎ স মহীক্ষিতঃ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ।।"

মৎস্যপুরাণ।

দূতগণ যথোক্তবাদী, দেশভাষায় অভিজ্ঞ অর্থাৎ যে স্থানে প্রেরিত হইবেন, সেই স্থানের ভাষায় সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল, কষ্টসহিষ্ণু, দেশ ও কাল বিবেচনায় কার্য্যপ্রণালী নির্ব্বাচনে সক্ষম, নীতিশাস্ত্রবিশারদ হওয়া আবশ্যক।

কূটনীতি পারদর্শী চাণক্য, দূতের লক্ষণ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, —

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে।।

চাণক্য নীতি।

নীতিকুশল ভূপতি ভোজরাজ দূতের লক্ষণ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, শত্রুগণের আকার ও ইঙ্গিত দর্শনে ভাব বুঝিতে সক্ষম, শত্রুর বাক্য ও ব্যঙ্গার্থ প্রভৃতি জ্ঞাতসার, প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীর, সভাসদ, সৎকুল-সম্ভূত, কার্য্যপটু, সুদৃঢ় রাজভক্ত, নির্মল-চরিত্র, মেধাবী, দেশকাল বুঝিয়া কার্য্য করিতে

সক্ষম, বপুষ্মান্, নির্ভীক, বাক্‌পটু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে দূত নিয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং এই সকল গুণবিশিষ্ট দূতই প্রশস্ত।*

উক্ত গ্রন্থের মতে দূত তিন প্রকার, বিমৃষ্যার্থ, মিতার্থ ও শাসন হারক। যে দূত কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ নিযুক্ত, তিনি বিমৃষ্যার্থ, যিনি আদিষ্ট কার্য্য করিয়াই নিরস্ত হন — উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তিনি মিতার্থ এবং যিনি পত্রাদি বাহক, তিনি শাসন হারক দূত নামে অভিহিত।

দূতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, প্রাচীনকাল হইতে, অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুর দরবারেও চর এবং দূত নিয়োগ করা হইত। বিভিন্ন রাজ্য হইতে ত্রিপুরায় দূত প্রেরিত হইবার প্রমাণও রাজমালায় আছে। গোপনে সংবাদাদি সংগ্রহ এবং প্রকাশ্যভাবে সংবাদ ও পত্রাদি বহন করা ইঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য ছিল। সুবিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য সাধিত হইত। গুপ্তচরগণ প্রয়োজন স্থলে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত চর প্রভৃতিকে ধৃত ও দরবারে উপস্থিত করিবার অধিকারী ছিলেন। ত্রিপুরায় দূত ও চর নিয়োগের এবং ভিন্ন রাজ্য হইতে ত্রিপুরায় চর প্রেরণের কতিপয় নিদর্শন নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) পশ্চাতে হেড়ম্বপতি ভ্রাতৃকে লিখিল।
এই সব তত্ত্ব পত্রে দূত পাঠাইল।।
রাজমালা — প্রথম লহর, ৩৫ পৃষ্ঠা।

(২) রক্ত আনিবারে দূত পাঠায় স্থানে স্থান।।
প্রথম লহর — ৪৫ পৃষ্ঠা।

(৩) হেড়ম্ব রাজায়ে দূত পাঠায়ে তখন।
প্রথম লহর — ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৪) ত্রিপুরার রাজায়ে দূত পাঠায়ে তখন।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক চলিয়া।।
প্রথম লহর — ৫০ পৃষ্ঠা।

---

* "পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্‌ব্যঙ্গ্যার্থস্যাপি তত্ত্ববিৎ।
সদোৎপন্নমতির্ধীরো দূতঃ স্যাৎ পৃথিবী পতেঃ।।
দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদম্।
ইঙ্গিতজ্ঞং তথা সভ্যং দক্ষং সৎকুলসম্ভবম্।।
অনুরক্তঃ শুচির্দ্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।।"
যুক্তিকল্পতরুঃ।

(৫) এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিয়োজিল।
কুষ্মাণ্ড সহিতে শুঁড়ী ধরিয়া আনিল।।
দ্বিতীয় লহর — ৫০ পৃষ্ঠা।

(৬) পুনর্ব্বার বাদসায়ে দূতকে পাঠায়ে।
দ্বিতীয় লহর — ৫২ পৃষ্ঠা।

(৭) অব্যক্ত গৌড়ের দূত আসিল দেখিতে।
দ্বিতীয় লহর — ৫৫ পৃষ্ঠা।

(৮) রণাগণ ভাই সমরজিত নারায়ণ।
শীঘ্র এক দূত পাঠাই তাহার সদন।।
দ্বিতীয় লহর — ৭৫ পৃষ্ঠা।

(৯) সেই জন কহে গিয়া আমা দূত স্থানে।
দ্বিতীয় লহর — ৭৬ পৃষ্ঠা।

(১০) দূত মুখে শুনি অমরমাণিক্য ক্রোধ হৈল।
তৃতীয় লহর — ১১ পৃষ্ঠা।

(১১) শুনিয়া সেকন্দর সা বলিল দূতেরে।
অতি শীঘ্র দূত যাও রাজসৈন্য তরে।।
তৃতীয় লহর — ৩৩ পৃষ্ঠা।

(১২) রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে।
চরে আসি জানাইল তাহার সাক্ষাতে।।
তৃতীয় লহর — ৩৪ পৃষ্ঠা।

(১৩) হেন মতে রাজসৈন্য গড়ে রহে গিয়া।
সেইকালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া।।
তৃতীয় লহর — ৬০ পৃষ্ঠা।

(১৪) রাজার উদ্দেশ্যে চর পাঠায় পর্ব্বতে।
তৃতীয় লহর — ৬১ পৃষ্ঠা।

চর ও দূত-বিষয়ক উক্ত আরও অনেক আছে, অধিক সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন।

রাজকর

ভূমির উপর অবধারিত রাজস্বের হার অতি অল্প ছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশে হস্তী, বরাহ, হরিণ ও বানর প্রভৃতি বন্যজন্তুর উপদ্রবে শস্যক্ষেত্রের বিস্তর অপচয় ঘটিত; বিশেষতঃ তৎকালে খাদ্যশস্য অতি সুলভ ছিল, এই সকল কারণে রাজস্বের হার লঘু করা হইত। রাজকর অবধারণ কালে প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। চাষী প্রজাগণ ধাতু মুদ্রা, কড়ি কিম্বা শস্যের ভাগ দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিত।

পার্ব্বত্য প্রদেশের জুমিয়া প্রজাগণ, নানাবিধ অরণ্য জন্তু, গজদন্ত, পশুর চর্ম্ম ও শৃঙ্গ, ধাতু নির্ম্মিত বিবিধ বস্তু এবং স্বহস্তে বয়িত নানাবিধ বস্ত্র বার্ষিক নজর

প্রদান করিত, তাহাই রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত। এতদ্ব্যতীত জুমোৎপন্ন তিল ও কার্পাসের নির্দ্দিষ্ট অংশ সরকার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন সম্প্রদায় রাজ সরকারী নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া, রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এই নিয়ম বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ হেতু যাহারা রাজকর হইতে বর্জ্জিত থাকে তাহাদিগকে 'হদার লোক' বলা হয়। রাজমালা প্রথম লহরের ২১৬-২১৮ পৃষ্ঠায় এই শ্রেণীর প্রজাগণের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

রাজা ও রাজ্যের অবস্থা

মহারাজ অমর, দেবমাণিক্যের পুত্র। ত্রিপুরেশ্বর দেবমাণিক্য একদা জলবিহার উপলক্ষে নৌকারোহণে গোমতী নদীপথে যাইতেছিলেন। নদীতীরে কালুয়াছড়া (কচুয়াছড়া) নামক স্থানে ত্রিপুরার 'হাজরা' উপাধিবিশিষ্ট সেনাপতির বাড়ী ছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে-কালে হাজরা, রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ সেনাপতির সহযোগে, চট্টগ্রামে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হাজরার অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী দুহিতা স্নানান্তে স্বীয় টংগৃহে বসিয়া সিক্ত কেশ শুকাইতেছিলেন, নৌ-বিহারী রাজার সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। রাজাও হাজরা-নন্দিনীর দৃষ্টিপথ এড়াইতে পারিলেন না। দর্শনমাত্রই উভয়ের মধ্যে পরস্পর আসক্তি জন্মিল। রাজা সেই কন্যাকে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া আসঙ্গলিপ্সা পূর্ণ করিলেন; কিন্তু অন্য মহিষীগণের বিরাগ ভয়ে তাহা অপ্রকাশ রাখা হইল। যথাসময়ে হাজরার কন্যা রাজঔরসে এক সুকুমার পুত্র লাভ করেন।

মহারাজ অমর-মাণিক্যের পূর্ব্ব-বিবরণ

পাঁচ বৎসর পরে হাজরা, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কমনীয়কান্তি দৌহিত্রকে দর্শন করিয়া এবং সম্যক বিবরণ অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। শিশুর 'রামদাস' নাম রাখা হইল। সেনাপতি 'হাজরা' বাছাল জাতীয় ছিলেন।

দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্যের রাজত্ব লাভ করিবার পর তিনি রামদাসের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সাদরে রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় পরিবারভুক্ত এবং রাজকুমারোচিত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম যোল বৎসর ছিল।

রামদাসের পিত্রালয়ে আগমনের পর 'অমরদেব' নাম হইল। তিনি শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই বিপুল যশ লাভ করিলেন; রাজদরবারে এবং জনসমাজে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চরিত্রগুণে তিনি সকলের সম্মান-ভাজন হইয়া উঠিলেন।

রামদাসের (অমরদেবের) আবাল্য কৈশোর-জীবন পার্ব্বত্য প্রদেশে অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি মৃগয়া-পরাগ এবং কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই শস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। যৌবনে যুদ্ধবিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল, অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি ত্রিপুরার সৈনাপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কোন রাজার শাসনকালে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজত্বসময়ে ইঁহাকে সেনাপতিরূপে পাওয়া যাইতেছে। তৎকালে তিনি 'ভীম সেনাপতি' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।* চট্টগ্রামের পাঠান সমরে প্রধান সেনাপতি রণাগণনারায়ণ (রঙ্গনারায়ণ) পরাভূত এবং উড়িয়া নারায়ণ (ভাঙ্গিল ফা) নিহত হইবার পর, মহারাজ উদয়, অমরদেবকে সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। ইনি পাঠান বাহিনীর সহিত ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যের আধিপত্য সময়েও অমরদেব সেনাপতিত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় রাজার পিসা এবং প্রধান সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন। রাজাকে ক্রীড়নকরূপে সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া কার্য্যতঃ রঙ্গনারায়ণই ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সেনাপতি অরিভীমকে চট্টগ্রামের যুদ্ধে নিয়োগ করিয়া, অমরদেবকে মেহেরকুল গড়ে এবং কিয়ৎকাল পরে তথা হইতে কল্মীগড়ে প্রেরণ করেন।

রঙ্গনারায়ণ, রাজা এবং রাজ্যের প্রতি অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয় রাজ্য-পিপাসায় অধীর হইয়া উঠিল, এবং রাজাকে বধ করিয়া সেই তৃষ্ণা নিবারণের অভিলাষী হইলেন। কিন্তু অমরদেব তাঁহার ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য দর্শনে রঙ্গনারায়ণ বুঝিলেন, অমরদেব জীবিত থাকিলে, রাজাকে বধ করিয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না; অমর তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন। রঙ্গনারায়ণের এই ভীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই অমরদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুলিত থাকিতেন। অনেক চিন্তার পর রঙ্গনারায়ণ, রাজার আদেশ পাঠাইয়া অমরদেবকে কল্মীগড় হইতে রাজধানীতে আনিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে একে অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না, — শালগ্রাম চক্র ও হরি বংশ গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া, এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার নিমিত্ত অমরদেবকে বাধ্য করিলেন, অমরের বিশ্বাসভাজন হইবার অভিপ্রায়ে রঙ্গনারায়ণ নিজেও তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। অমরকে অনিষ্ট চিন্তায় বিরত রাখাই এই

---

* "বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা ভীম সেনাপতি।
অমরমাণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি।।"
ত্রিপুর-বংশাবলী।

প্রতিজ্ঞা নিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। অমরদেবের মনে কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি ছিল না, তথাপি তিনি রঙ্গনারায়ণের প্রস্তাবানুসারে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু এবম্বিধ অহেতুক প্রতিজ্ঞাবন্ধের প্রস্তাবে তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইল; তদবইধ রঙ্গনারায়ণের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিলেন।

অমরদেবকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া রঙ্গনারায়ণ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া অমর তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু তাঁহার বিদ্যমানে রাজ্যভোগ করা যে অসম্ভব হইবে, এই বিভীষিকায় রঙ্গনারায়ণের অন্তর সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত। এজন্য রাজাকে নিহত করিবার পূর্ব্বে অমরদেবকে বধ করা তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহাকে আহারের নিমিত্ত আপন আলয়ে সাদরে আহ্বান করিলেন। অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যদানে বিহ্বল করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমন্ত্রিত অতিথিকে বধ করা স্থিরীকৃত হইল, এই কার্য্য সাধানের নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত রহিল।

সেনাপতি অমর, রজনীযোগে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রঙ্গনারায়ণের আলয়ে গমন করিয়া আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাইলেন। এই সময় জনৈক হিতৈষী ব্যক্তির ইঙ্গিতে তিনি যে আসন্ন বিপদের মুখে পতিত, তাহা বুঝিলেন। তখন সেই স্থান পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বোধে তিনি 'বাহ্য-পীড়ার' ভান করিয়া দাঁড়াইলেন। রঙ্গনারায়ণ তাঁহার পায়খানায় যাইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিতেছিলেন, অমর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, দ্বারদেশে রক্ষিত তাঁহার আরোহণের অশ্বটী নাই, তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে অন্য এক ব্যক্তি একটী অশ্বসহ সেখানে উপস্থিত ছিল, অমরদেব সেই অশ্ব বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন, রঙ্গনারায়ণের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অমরদেবের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি বাড়ীতে আসিয়া আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিলেন। এবং পর দিবস একদল সৈন্যসহ রঙ্গনারায়ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এদিকে রঙ্গনারায়ণও রাজ সৈন্যদিগকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অমরদেব চৌহাটা গ্রামে এবং রঙ্গনারায়ণ কচুয়াছড়ায় গড় বাঁধিলেন। উভয় পক্ষে এক যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে রঙ্গনারায়ণের বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তিনি স্বীয় ভ্রাতা সমরজিৎ নারায়ণকে সৈন্যসহ শীঘ্র যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অমরদেব এই সংবাদ পাইয়া চাতুরীজাল বিস্তার করিলেন; তিনি রঙ্গনারায়ণের নাম দিয়া, সমরজিৎকে এক পত্র লিখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা জনৈকি দূত দ্বারা

প্রেরণ করিলেন। রঙ্গনারায়ণের প্রেরিত পত্র পাইবার পূর্ব্বে এই পত্র সমরজিতের হস্তগত হইল, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র জ্ঞানে তাহা হাতে লইয়া, তদানীন্তন প্রথানুসারে মস্তকে স্পর্শ করাইবার নিমিত্ত শির অবনত করা মাত্রই অমরদেবের দূত তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া, সেই মুণ্ডসহ অমরদেবের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এদিকে রঙ্গনারায়ণ দর্প সহকারে উচ্চকণ্ঠে বারম্বার বলিতেছিলেন, — "সমরজিৎ বিস্তর সৈন্যসহ আসিতেছে, এবার শত্রুপক্ষকে সমূলে বিনাশ করিব।" এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অমরদেবের দূত, সমরজিতের মুণ্ডটী রঙ্গনারায়ণের শিবিরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড দর্শনে রঙ্গনারায়ণ ভাবিলেন, ভ্রাতা সমরজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ আগমনকালে সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন।

ভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দর্শনে রঙ্গনারায়ণ ভীত এবং অবিলম্বে তাঁহারও এই দশা ঘটিবে মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার আর শিবিরে অবস্থান করিবার সাহস রহিল না। সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গোপনে পলায়ন করিলেন। স্বীয় আবাসে কিম্বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি মৎস্য ধৃতার্থ খনিত ক্ষুদ্র এক খাটি-পুষ্করিণীর জলে সমস্ত শরীর নিমজ্জিত করিয়া, মৃৎপাত্রদ্বারা মস্তক আবরণপূর্ব্বক দুই দিবস তদবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। এদিকে, রঙ্গনারায়ণের পলায়িত পুত্রকে হীরাপুর গ্রামস্থ এক গৃহস্থের ঢেঁকিশালা হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করা হইল।

রঙ্গনারায়ণ দুই দিবস জলে নিমজ্জিত অবস্থায় অশেষ দুর্গতি ভোগ করিলেন, কিন্তু মৃত্যু আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, সেই গর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াও তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার সমস্ত শরীর শীতে কম্পিত হওয়ায়, মস্তকে ধৃত হাঁড়িটী ঠক্‌ঠক্ করিয়া নড়িতেছিল। তদ্দর্শনে তাঁহাকে ধৃত করা হইল; অমরদেবের আদেশানুসারে তিনি পুত্রের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ জয়মাণিক্য, স্বীয় পিসা ও প্রধান সাহায্যকারী রঙ্গনারায়ণের হত্যা-বিবরণ শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া, অমরদেবের আত্মীয় হনন দ্বারা বৈর-নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার অমরদেব রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তৎকর্ত্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত হইল, রাজা প্রমাদ গণিয়া হস্তী আরোহণে পলায়ন করিলেন। অমরদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুর্লভ, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির সন্নিহিত রাস্তায় রাজাকে আক্রমণ করিয়া ধনুর্গুণ গলদেশে জড়াইয়া, তাঁহাকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে সবলে ভূ-পাতিত এবং নিহত করিলেন। ভিন্ন বংশীয় উদয়মাণিক্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, জয়মাণিক্যের নিধন সাধনের পর রাজ্য পুনর্বার প্রাচীর রাজবংশের হস্তগত হইল।

জয়মাণিক্য নিহত হইবার পর, সেনাপতি অমরদেব ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন (১৪৯৯ শক)। তিনি প্রবল পরাক্রমের সহিত শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যলাভের পরে তাঁহার প্রথম কার্য্য অমরসাগর খনন করা; এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল

মহারাজ অমরের রাজদুর্লভ, রাজধর, অমরদুর্লভ ও যুঝার সিংহ নামক চারি পুত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। রাজা পুত্রদিগকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া সৈনিক বিভাগের মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র যুঝার সিংহ অতিশয় ক্রোধী এবং দাম্ভিক ছিলেন, তাঁহার এই স্বভাবের দরুণ অনেক সময় অনিষ্টোৎপাদিত হইয়াছে।

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের দৌর্ব্বল্যে রাজশক্তি গ্লানিলিপ্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরার চিরবশ্য প্রত্যন্তবাসী রাজন্যবর্গ এই সময় মস্তকোত্তোলন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই সময় ভুলুয়ারাজ, চিরপ্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যাভিষেক কালে রাজটিকা পরাইতে অসম্মত হন। অরমাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যে ভাবে দমন করিয়াছিলেন, এবং তদুপলক্ষে ভুলুয়া রাজ্যের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তরপের শাসনকর্ত্তা, অমরসাগর খননকার্য্যে সাহায্য না করায় মহারাজ অমর, তরপ রাজ্য ও শ্রীহট্ট বিজয় করিয়া এই অবাধ্যতার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে পূর্ব্ববঙ্গে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, অমরসাগর খননোপলক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাজমালার অন্যান্য উক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়।*

ভুলুয়া বিজয়ের পর মহারাজ অমর, এক সেনানিবাস (থানা) সংস্থাপন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুর্লভকে সেই স্থানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ভুলুয়ার 'লোনা-জল' ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই তিনি পীড়িত হওয়ায়, সেনাপতি যশোধরনারায়ণ ও রাজপুত্র রণদুর্লভনারায়ণকে সেনানিবাস রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া, কুমার রাজদুর্লভকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন, কিন্তু এই পীড়াই রাজদুর্লভের মৃত্যুর কারণ হইল। তিনি পিতা, মাতা ও সমগ্র রাজ্যকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ অমর শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি দ্বিতীয় পুত্র রাজধরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে, ত্রিপুরেশ্বরের অনুগত সরাইলের শাসনকর্ত্তা ঈশা খাঁ-এর সাহায্যার্থ মহারাজ অমর, এক অভিযান প্রেরণ করেন। ত্রিপুর সৈন্য বিনাযুদ্ধে

* "সেই কালেতে অমরমাণিক্য নৃপতি।
বঙ্গের সকল প্রজা বশ হৈল অতি।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড — ১১ পৃষ্ঠা।

শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই অভিযানের বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। এই ঘটনা দ্বারা রাজ্যের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ অমর কর্ণরোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি শয্যাগত অবস্থায় দীর্ঘকাল অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। পিতার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দর্শনে যুবরাজ রাজধরদেব হস্তী, ঘোড়া ও সৈন্যাদিসহ বিপুল আড়ম্বরের সহিত সিংহাসনারোহণ করিতে আসিলেন। কনিষ্ঠ রাজকুমার যুঝার সিংহ অগ্রজের এই অসঙ্গত ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, উলঙ্গ তরবারী হস্তে রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, — "পিতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, ভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করিতে আসিতেছেন, এই অবৈধ ব্যবহার নিতান্তই অসহনীয়।" কুমার যুঝার স্বভাবতঃই কোপনস্বভাবাপন্ন, তিনি অগ্রজের কার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, সেই বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা গৃহের একটী স্তম্ভের উপর সজোরে আঘাত করিলেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য মহারাজ অমর, পুত্রগণের আচরণ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, ইঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজা অনন্যোপায় হইয়া, উপস্থিত উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য রোগক্লিষ্ট দেবে অতিকষ্টে যাইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যুবরাজ রাজধর, স্বীয় অকার্য্য বুঝিতে পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অসহ্য রোগ যন্ত্রণায় মহারাজ শয্যাগত ছিলেন, ইহার উপর পুত্রগণের আচরণ দর্শনে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন; এমনকি, তিনি মনোকষ্টে এবং রোগযন্ত্রণায় মৃত্যু-কামনা করিতেছিলেন। রাজা গুরুতর পীড়াগ্রস্ত, রাজপুত্রগণ পরস্পর বিবাদে লিপ্ত, রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খল, এই সকল কারণে রাজধানীময় এক বিষম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইতে লাগিল, তাহাদের দ্বারা দিন দিন নানাবিধ মিথ্যা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। কথা উঠিল,— সোয়াশত শিশু বধ করিলে রাজা আরোগ্য লাভ করিবেন। এই ভিত্তিহীন জনরবে সকলেই শিশু সন্তানদিগের প্রমাদ গণিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল, কখন কাহার সন্তান ধরিয়া নিয়া বধ করে, এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। অনেকে আপন আপন সন্তানগণসহ স্থানান্তরিত হইল, অনেকে দূরবর্ত্তী স্থানের আত্মীয়দিগের আশ্রয়ে পুত্রদিগকে পাঠাইতে লাগিল। নগরময় এই ব্যাকুলতার সময় আবার গুজব উঠিল, উদয়পুর শীঘ্রই জলপ্লাবিত হইবে, আড়াই শত প্রাণী মাত্র জীবিত থাকিবে, আর সমস্তই ভীষণ প্লাবনে নিমগ্ন হইবে। সরলবিশ্বাসী নগরবাসিগণ এই কথাও বিশ্বাস করিল। দেশময় এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পতিত হইল, সকলেরই মুখমণ্ডল ভয়ে, চিন্তায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকে জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্ত কদলীবৃক্ষের ভেলা প্রস্তুত করিল। কখন কোন্ বিপদ উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় জনসাধারণ আহার

নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি গুরুতর অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। অনেকে আত্মজীবন ও পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইল।

এই সকল অমূলক জনরব এবং দেশময় অশান্তি-উদ্বেগের কথা মহারাজ অমরমাণিক্যের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া রুগ্নশয্যা হইতে আদেশ করিলেন — "মিথ্যা জনরবকারীকে ধরিয়া আনা হউক।" রাজপুরুষগণ বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনরবকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ বুঝিল, প্রচারিত জনরবগুলি সমস্তই অমূলক। রাজপুরুষগণের চেষ্টায় দিন দিন নূতন কথা উঠিবার স্রোতটাও বন্ধ হইল। এদিকে রাজা আরোগ্য লাভ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন সকলেরই অন্তর হইতে অমূলক ভীতি ও অশান্তি ভাব অন্তর্হিত হইল।

আরাকানরাজের সামন্ত, রাম্বু (রামু) ও ছকরুয়ার শাসনকর্ত্তা আদম শাহের সহিত আরাকানপতি মাংফুলার মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, আদম বিপন্নাবস্থায় ত্রিপুরেশ্বরের স্মরণাপন্ন হইলেন, তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া উদয়পুরে রাখা হইয়াছিল। এই কারণে মহারাজ অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির বিবাদের সূত্রপাত হয়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজধরনারায়ণ সৈনিক দলের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কুমার অমরদুর্লভনারায়ণ, সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রদর্পনারায়ণ, চন্দ্রসিংহ-নারায়ণ ছত্রজিৎ নাজীর প্রভৃতি তাঁহার সহকারী হইলেন। বঙ্গের ভৌমিকগণও এই সময় মহারাজ অমরকে সৈন্যবল দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গী সৈন্যদল এই অভিযানের অভিনব শক্তি ছিল। কুমার রাজধর বিপুল বাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ফিরিঙ্গী সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ত্রিপুরবাহিনী প্রথমতঃ পরাজিত এবং বিপন্ন হইয়া থাকিলেও চট্টগ্রামে আসিয়া তাঁহারা মঘদিগকে বিশেষভাবে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানরাজ স্বীয় অনুগত উড়িয়া রাজাকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন, ত্রিপুরেশ্বর সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রহিলেন।

দুর্দ্দিন আগমনের পূর্ব্বে তাহার সূচনা লক্ষিত হইয়া থাকে। অমরমাণিক্যের রাজত্বকালেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আরাকানের যুদ্ধ স্থগিত থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক দুর্ঘটনা আরম্ভ হইল। আসন্ন বিপদের সংবাদ জ্ঞাপক তুর্য্যধ্বনির ন্যায় কুক্কুর ও শৃগালের অশিব-কোলাহলে নগর ও বাজার ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গ্রাম্য দেবতার নিশীথ রোদনধ্বনিতে সমগ্র নগর মুখরিত হইতে লাগিল। দেব-বিগ্রহের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে দেখা গেল। উল্কাপাত ও

ভূমিকম্পে নানাবিধ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইল। ভূতের ভয়ে রাজধানী বিভীষিকাময় হইয়া দাঁড়াইল। রাজা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না।

সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে কল্মীগড় দুর্গ হইতে সংবাদ আসিল, আরাকানরাজ সর্ত্তভঙ্গ করিয়া, যুদ্ধ স্থগিতের নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ সসৈন্যে আসিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। এই সময় পর্ত্তুগীজগণ আরাকানরাজের সাহায্যকারী ছিল।

এ যাত্রায় আরাকানরাজের প্রেরিত গজদন্ত নির্ম্মিত মুকুট লইয়া অমরমাণিক্যের পুত্রগণের মধ্যে যেরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এবং কুমার যুঝার সিংহ এতদুপলক্ষে আরাকানরাজের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

গজদন্ত নির্ম্মিত মুকুট গ্রহণ উপলক্ষে কুমারগণের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন; —

"যে একতা শূন্য হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, যে একতাহীনতায় আমাদিগকে যবন পদানত হইতে হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই একতা অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরোহিত হইল। একতাশূন্য হইয়া কুমারগণ যে কেবল চট্টগ্রামাদি হারাইয়াছিলেন এমত নহে, তাহাতেই ত্রিপুরার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। কুমারেরা সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরাকানপতি এই সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পরমাহলাদিত চিত্তে ত্রিপুর সৈন্য আক্রমণ করেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭৩ পৃষ্ঠা।

রাজমালার সারসঙ্কলয়িতা লঙ্ সাহেব (Rev. James Long) এতৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন; —

"On this the king of the Mugs wished to make peace and sent the brothers a crown of ivory as a present, a dispute arose among them as to who shuld possess it, and one who lost it abused the Mugs."

Journal of Asiatic Society of Bengal. — Vol. XIX.

মর্ম্ম ঃ— মঘরাজ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটী হস্তীদন্তের মুকুট ভ্রাতৃত্রয়কে উপহার প্রদান করিলেন; কিন্তু ইহাতে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল — ভ্রাতাগণের মধ্যে কে ইহা গ্রহণ করিবেন? যিনি পাইলেন না, তিনি মঘদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগলেন।

ভ্রাতৃত্রয়ের এই মনোমালিন্য হেতু রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ণ মাত্রায় শুধরাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজ চট্টগ্রামের শিবিরে ছিলেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার প্রেরিত মুকুট লইয়া ত্রিপুরার রাজকুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। এই সুযোগে তিনি ত্রিপুর শিবির আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ রাজকুমার যুঝার সিংহ নিহত এবং কুমার রাজধর গুরুতররূপে আহত হওয়ায়, যুদ্ধে পরাভব ঘটিল।

অতঃপর পুত্রশোকানল বক্ষে চাপিয়া মহারাজ অমর স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে বহু চেষ্টায় একত্রিত করিয়া, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইছাপুরা নামক স্থানে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইল। এই সময় ত্রিপুরার পাঠান সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ যে ভাবে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং মঘগণ অত্যাচার ও লুণ্ঠন দ্বারা রাজধানীর যে দুর্গতি ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

উদয়পুর বিজেতা আরাকানপতি স্বরাজ্যে পৌঁছিয়াই পুনর্ব্বার মহারাজ অমরমাণিক্যকে পত্রদ্বারা জানাইলেন — আদম শাহকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি ত্রিপুরেশ্বরের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ অমর এই পত্রের উত্তরে জানাইলেন — "ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মঘের বোধগম্য নহে, আশ্রিতকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। দৈব বিড়ম্বনায় আমার একটী পুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলেও আরও দুই পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহারাও যদি তোমার হস্তে নিহত হয়, তথাপি আশ্রিত আদম শাহকে প্রদান করিব না।"

মঘ কর্ত্তৃক উদয়পুর বিজয়ের কালনির্ণায়ক নিম্নোদ্ধৃত উক্তি রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"পনর শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে।
প্রথমে আসিলা মঘ উদয়পুরেতে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪২ পৃষ্ঠা।

এই নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ নহে। মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, মহারাজ অমর পরলোক- প্রাপ্ত হইবার পর, তৎপুত্র রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। রাজমালার অন্যান্য উক্তির সহিত এই বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ১৫০৭ শকের (১৫৮৫ খ্রীঃ) চৈত্র মাসে মহারাজ অমর রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া, মনু নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫০৮ শকের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের কিয়দংশ নানাবিধ অশান্তির সহিত তথায় অতিবাহিত হইবার পর, সেই আষাঢ় মাসেই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, * এবং তৎকালে মহারাজ রাজধরমাণিক্য রাজ্যাধিকারী হইয়া ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে উদয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। † ১৫০৮ শকে অমরমাণিক্যের মৃত্যু এবং

---

* "এই মতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাস।
শোকেতে বিহ্বল রাজা ছাড়য়ে নিশ্বাস।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪৫ পৃষ্ঠা।

† "ভাদ্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণপক্ষ তাতে।
উদয়পুরে চলে রাজা মহারণ্য পথে।।"

রাজধরমাণিক্য খণ্ড — ৫১ পৃষ্ঠা।

রাজধরমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, ইহা মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, সুতরাং ১৫১০ শকের চৈত্র মাসে মঘ কর্ত্তৃক অমরমাণিক্য আক্রান্ত হইতে পারেন না; ইহা ১৫০৭ শকের চৈত্র মাসের ঘটনা, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে এরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

মহারাজ কিয়ৎকাল তেতৈয়াতে অবস্থান করিবার পর, মনুনদীর তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান রাতাছড়া নামক স্থানে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। পুত্রশোকে এবং যুদ্ধে পরাজয় জনিত অনুতাপে তাঁহার হৃদয় অবিরত দগ্ধ হইতেছিল। কালের কুটিল চক্রাবর্ত্তনে চতুর্দ্দিক হইতে অভাবনীয় উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময় রাজার শ্যালক, হিতকামী এবং পরাক্রান্ত সেনাপতি ছত্রজিৎ নাজিরের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রচিত হইল --- তিনি বিস্তর ত্রিপুর প্রজা লইয়া, পূর্ব্ব কুলের (কুকি প্রদেশের) প্রজাবর্গের সাহায্যে এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সময়ের দোষে মহারাজ অমর, একথা সহজেই বিশ্বাস করিলেন। দুই শত সৈন্য দ্বারা নাজির ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রাজমহিষী, ভ্রাতার ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত ছিলেন, এখন তাঁহার রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন --- "নাজিরের অভিসন্ধি ভাল দেখা যাইতেছে না, তার পক্ষে আমাদিগকে বধ এবং পুত্রগণকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্য অধিকার করা বিচিত্র নহে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য ও পরিবারবর্গকে নিষ্কণ্টক করাই শ্রেয়ঃ।" রাজাও তাহাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। দুই দিবস কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবার পর ছত্র নাজির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা পাইলেন। তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেনাপতি চন্দ্রসিংহ ও তৎপর আশু-নারায়ণের প্রতি আদেশ হইল, তাঁহারা পশ্চাৎপদ হওয়ায়, চন্দ্রদর্পনারায়ণের প্রতি এই ভার অর্পিত হইল; তিনি নাজিরকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলেন। ছত্রজিৎ মনুনদীতে স্নান করিয়া সন্ধ্যাতর্পণাদি সমাপনান্তে ভগবানের পাদপদ্মে অন্তিম-প্রার্থনা জানাইলেন। পরে, ঘাতকের অস্ত্রাঘাত গ্রহণের নিমিত্ত রামনাম স্মরণপূর্ব্বক শির নত করিয়া বসিলেন, খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইল।

জনপ্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, সে বিষয়ে সন্ধান না লইয়া ছত্রজিৎ নাজিরকে বধ করায় মহারাজ অমর, সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।* রাজমহিষী,

---

* মহারাজ অমরমাণিক্য পরলোকগমন করিবার পর, সকলই বলিতে লাগিল, অবিচারে ছত্রনাজিরকে বধ করা, মহারাজার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে, —

"লোক বাদে নাজির বধে করি অবিচার।
অমরমাণিক্য মৃত্যু লোকেতে প্রচার।।

ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাকে বধ করিবার পক্ষে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃবিয়োগের পর রমণীসুলভ মমতায় ও শোকে তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। এই দারুণ শোকের সহিত পুত্রশোক মিলিত হওয়ায়, রাজমহিষী মুহ্যমানা হইয়া অহোরাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের দুরবস্থাজনিত আত্মগ্লানি, পুত্রশোক, রাজমহিষীর অবিরাম রোদনধ্বনি, যুদ্ধে পতি পুত্রহারা রমণীবৃন্দের আর্ত্তনাদ ইত্যাদি নানাবিধ উদ্বেগে রাজার মন ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার উপর আবার চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের হৃদয়ও ধৈর্য্যহারা হইল। গুরুতর অশান্তি ও অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি রাজ্যভোগ অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। মহারাজ চৈত্র মাসে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাকুলচিত্তে অতিবাহিত করিলেন। আষাঢ় মাসে গোপনে অহিফেন ভক্ষণদ্বারা শোকতাপময় পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন; পতিপ্রাণা রাজমহিষী অমরাবতী মহাদেবী, পতির সহগামিনী হইলেন।*

মহারাজ রাজধর-মাণিক্যের শাসনকাল

অমরমাণিক্যের পরলোক প্রাপ্তির পর যুবরাজ রাজধর "মাণিক্য" উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। মনুনদীর তীরেই তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতা মাতার বিয়োগজনিত শোকে এবং রাজধানী পরিত্যাগ হেতুক মনোকষ্টে তিনি নিতান্তই অশান্তিতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

মঘগণ রাজত্ব লাভের অভিলাষী ছিল না, শত্রুতা সাধন এবং লুণ্ঠনই তাহাদের অভিপ্রেত ছিল। কিয়ৎকাল উদয়পুরে অবস্থান করিয়া, অত্যাচার সাধন ও ধনরত্নাদির

"রাজ ধর্ম্মে লিখিয়াছে বিচার রাজার।
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্ব্বার।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড, — ৪৯ পৃষ্ঠা।

* যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যভ্রষ্টজনিত অপমান অসহনীয় হওয়ায়, দেহপাত করিবার দৃষ্টান্ত ভারতে নিতান্ত বিরল নহে। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে; —

গজনীর অধীশ্বর সুলতান মামুদ দশ সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ায় কাবুলের সীমান্তবর্ত্তী শাহী বংশীয় বৃদ্ধ রাজা জয়পাল, তাঁহার অগ্রগতিতে বাধা প্রদান জন্য পেশবারের সন্নিহিত স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু এই দুর্ব্বিষহ অপমান লইয়া আর জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা রহিল না। তিনি সজ্জিত চিতায় আরোহণ করিয়া, তাহাতে স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর ঘটনা।

সন্ধান লইয়াছিল, প্রচুর বিভব লুণ্ঠন করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

এই সময় উদয়পুর হইতে দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল, — মঘগণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী, সেনাপতি, ভ্রাতা ও পুত্র প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া, মহারাজ শুভলগ্নে উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খুটিমুড়া (খুটামারা) বাম দিকে রাখিয়া ধ্বজনগর, বিশালগড় ও ডোমঘাটির উপর দিয়া পার্ব্বত্য পথে মহারাজ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। ইহা ভাদ্রমাসের প্রথম ভাগের কথা। জুমিয়াগণের জুমে ধান্য পক্ক হইয়া উঠিতেছিল, নানাবিধ ফুলফলে জুমক্ষেত্রগুলি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডাররূপে শোভা পাইতেছিল। রাজা সেই সকল মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। নবীন ভূপতির আগমনে মৃতকল্প নগরী যেন নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। সকলে জয়ধ্বনি দ্বারা রাজাকে বরণ করিয়া লইল। 'সেলাম বাড়ি' বাদ্য দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করা হইল।

মহারাজ রাজধর প্রজাবৎসল, ধার্ম্মিক, দয়ালু এবং দানশীল ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। হরিনাম কীর্ত্তন, পুরাণ শ্রবণ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এমন ধার্ম্মিক এবং শান্তিপ্রিয় রাজাও মুসলমানগণের উপদ্রবে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বিষয়-বিতৃষ্ণার ভাব দর্শনে বঙ্গেশ্বর মনে করিলেন, ত্রিপুরা আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সময়। ত্রিপুরার হস্তীসম্পদ হস্তগত করাই এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি চন্দ্রদর্পনারায়ণের পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া মোগলবাহিনীকে কৈলারগড় হইতেই পশ্চাৎপদ হইতে হইল। এবার রীতিমত যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটে নাই।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ রাজধরের রাজত্ব সময়ে অন্য কোনরূপ অশান্তিজনক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষব্যাপী রাজত্বে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উপদ্রব ছিল না। রাজ্যসুখ শান্তিপূর্ণ এবং ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা হরিনাম কীর্ত্তনে বিহ্বল অবস্থায় গোমতীর জলে নিমজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাষ্ট্রীয় অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মহারাজ রাজধর-মাণিক্যের শাসনকাল

অতঃপর মহারাজ যশোধরমাণিক্যের রাজত্বকাল। ইনি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, প্রজাবৎসল এবং আশ্রিতপালক রাজা ছিলেন। ইঁহার শাসনকালে আরাকানরাজের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, কিয়ৎকাল রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল; কিন্তু এই সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

এই সময় আবার ভুলুয়ার রাজা ত্রিপুরার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। মহারাজ

যশোধর তাঁহাকে দমন করিয়া ভুলুয়া রাজ্য পুনর্ব্বার লুণ্ঠনদ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন। ভুলুয়াপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া এ যাত্রায়ও পরিত্রাণ লাভ করেন।

ভুলুয়ার যুদ্ধের অল্পকাল পরেই আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রাম লইয়া পুনর্ব্বার বিবাদ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে, —

"তার পরে মহারাজা হোসন সাহা সনে।
তার সঙ্গে বৈরিভাব জন্মিল তখনে।।
এ সব বৃত্তান্ত সকল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাহা ব্যবহার।।"

যশোধরমাণিক্য খণ্ড — ৫৯ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন রাজমালায়ও এই বিবাদের ফল লিখিত হয় নাই। এতদ্দরুণ অনেকে মনে করেন, এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল; ইহা অনুমান মাত্র। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের উপায় নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; তিনি যশোধরমাণিক্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, — "সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে মঘদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য অস্ত্রধারী হইতে হইয়াছিল।" * তিনি এই অস্ত্র ধারণের ফলাফল সম্বন্ধীয় কোন কথাই বলেন নাই।

ইহার অল্পকাল পরে, ত্রিপুরার অরণ্যজাত হস্তীর প্রতি দিল্লীর সম্রাট শাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) লুব্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি এই বিপুল সম্পদ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁকে (ফতেজঙ্গ) দিল্লীতে ডাকিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য আদেশ দিলেন; এবং ইস্পিন্দর খাঁ ও মির্জ্জা নুরউল্লা খাঁ নামক ওমরাহদ্বয়কে এই কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিস্তর সৈন্যসহ নবাব ফতেজঙ্গের সঙ্গে দিলেন। তাঁহারা ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের সৈন্যদলের সম্মিলনে সামরিক বল দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন।

নবাব ফতেজঙ্গ ঢাকাতে থাকিয়া ওমরাহদ্বয়কে সসৈন্যে ত্রিপুরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। মোগল সৈন্য ত্রিপুরার সন্নিহিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ইস্পিন্দর অর্দ্ধ সৈন্যসহ কৈলারগড় দুর্গের দিকে এবং নুরউল্লা অবশিষ্ট সৈন্যসহ মেহেরকুল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা উভয় দুর্গের সন্নিহিত স্থানে ছাউনী করিয়া, আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহারাজ যশোধর এই বার্ত্তা পাইয়া রাজধানী সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত সৈন্য-দিগকে দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ (মেহেরকুল হইতে আগমনের পথে অবস্থিত) চণ্ডীগড়ে, আর এক ভাগ (কৈলারগড় অতিক্রম করিয়া আগমনের পথে স্থাপিত) ছয়ঘরিয়াগড়ে প্রেরণ করিলেন। যোগ্যতর সেনাপতিগণের হস্তে উক্ত উভয় গড়

* কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭৬ পৃষ্ঠা।

রক্ষার ভার অর্পিত হইল। এইভাবে আত্মবল দৃঢ় করিয়াও তিনি মোগলের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। মোগলগণ আসিয়া রাজধানী অধিকার করিল। মহারাজ যশোধর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও মুসলমানের হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। তাহারা লুণ্ঠন ও অত্যাচারে উদয়পুর জনশূন্য করিবার পর, তথায় অবস্থান করিয়া, পলায়িত রাজার সন্ধানের নিমিত্ত পর্ব্বতাভ্যন্তরে দলে দলে চর প্রেরণ করিল। অল্পকাল মধ্যে মহারাজ মোগল সৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন। সৈন্যবল অভাবে তিনি বিপক্ষকে বাধা প্রদান করিতে অক্ষম, রাজমহিষী সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করিবার পক্ষেও বিঘ্ন ঘটিল। এই অবস্থায় তিনি মোগল কর্ত্তৃক ধৃত ও উদয়পুরে নীত হইলেন। সেনাপতি ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা, রাজাসহ কিয়দ্দিবস উদয়পুরে থাকিয়া নব-বিজিত রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। পরিশেষে তথায় এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া, তাঁহারা রাজাসহ ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজের এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থায় রাজ্যত্যাগের ঘটনায় এবং রাজধানীর দুর্দ্দশা দর্শনে একটী করুণরসাত্মক গ্রাম্যগীতি রচিত হইয়াছিল; উদয়পুর অঞ্চলের কৃষকগণ বর্ত্তমান কালেও ক্ষেত্রে ধান্যের চারা রোপণকালে শ্রম লাঘবার্থ সকলে মিলিয়া সমস্বরে সেই সারিগান গাহিয়া থাকে। দুঃখের কথা, গানটীর সমগ্র ভাগ এখন আর কাহারও জানা নাই। ইহার যতটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল; ---

"রাজা কৈ গেলা রে ---

তোমার সোণার উদয়পুর কারে দিলা রে!
কতদূরে গিয়া রাজা
ফির‍্যা ফির‍্যা চায়,
(আমার) সোণার মোড়ান পাল্কী
মোঙ্গলে দৌড়ায় —
দুয্খ রহিল রে!
পানিত্ কান্দে পানি কাউরী
শুক্নায় কান্দে উদ,*
উদয়পুরের গোয়ালা কান্দে
কারে দিবাম্ দুধ ---
দুয্খ রহিল রে!

---

* মনুষ্যের দুঃখ দর্শনে, পশুপক্ষী প্রভৃতির নয়নে শোকাশ্রু বিগলিত হইবার বর্ণনা ইহাই প্রথম নহে। প্রাচীন গ্রাম্য কবিগণের মধ্যে অনেকেই ইতর প্রাণীর চক্ষুতে, মনুষ্য সমাজের সহিত সহানুভূতিসূচক অশ্রু দর্শন করিয়াছেন; এমনকি, তাঁহারা বৃক্ষলতাকে পর্য্যন্ত কাঁদাইতে ছাড়েন

সুবুদ্ধি রাজার কিবা —
কুবুদ্ধি হইল,
চাউলের থলি থুইয়া রাজা
সোনার থলি লৈল *—
দুষ্‌খ রহিল রে!"

নবাব ফতেজঙ্গের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তিনি নবাব হইনেত আশানুরূপ সদ্ব্যবহার পাইলেন না। অল্পকাল মধ্যেই রাজাকে দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা হইল। বাদশাহ জাহাঙ্গীর, মহারাজ যশোধরকে রাজোচিত সম্মানের সহিত সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, — "আপনাকে মুক্তিদান করিতেছি, আপনার যে-সকল হস্তী আছে তাহা আমাকে প্রদান করিতে হইবে।"

নাই। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত "মাণিক্যচন্দ্রের গান" আলোচনা করিলে পাওয়া যাইবে, গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণজনিত শোকাবেগ বর্ণনোপলক্ষে কবি বলিয়াছেন, —

"কান্দয়ে নগরবাসী রাজা পানে চায়্যা।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে আর শিশু মায়্যা।।
রাণীর ক্রন্দনে নদী উথলে সাগর।
পাইসালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর।।
সারি শুয়া পক্ষী কান্দে না করে আহার।
দাস দাসী কান্দে রাজার করি হাহাকার।।"

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, —

"গাছ কান্দে গাছানী কান্দে গাছের কান্দে পাতা।
বনর হরিণী কান্দে হেঁট করি মাথা।।
ঘাঁটিয়ালর ঘাটত্ কান্দে বাইশ কাহন নাও।" ইত্যাদি।

ভবানী দাসের রচিত ময়নামতীর গানেও এই ভাবের কবিতা পাওয়া যায়, অন্যত্রও ইহার অভাব নাই।

বৈষ্ণব কবিগণ ইতর প্রাণীর নয়নে শোকাশ্রু এবং প্রেমাশ্রু দুই-ই দর্শন করিয়াছেন। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। নবদ্বীপে, কীর্ত্তন রসোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কঞ্জ-নয়নে প্রেমাশ্রু সন্দর্শনে বিহ্বল হইয়া, —

"জলের জীব কান্দে দেখিয়া প্রতিবিম্ব
কাননে কান্দয়ে পশু পাখী।
তরুয়া পুলকিত, পাষাণ দরবিত,
অন্ধ কান্দয়ে ডাকি ডাকি।।" ইত্যাদি।

* পথ অতিবাহন কালে চাউলের অভাবে রাজাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্যই এবম্বিধ উক্তি করা হইয়াছে।

মোগল মসজিদ - উদয়পুর

আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষণ প্রয়াসী মহারাজ যশোধর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, মোগলগণ রাজ্যের নানাবিধ দুরবস্থা ঘটাইয়াছে, আত্ম মর্য্যাদাও অপরিসীম ম্লান হইয়াছে, ইহার উপর আবার সম্রাটকে হস্তী প্রদান দ্বারা দুর্গতিগ্রস্ত রাজসম্মানকে অধিকতর হেয় করিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজত্ব গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না; সম্রাটের অনুমতি গ্রহণে তীর্থবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

মহারাজ, রাজমহিষীসহ প্রথমতঃ ৺কাশীধামে গমন করিলেন। সেনাপতি কল্যাণদেবের (কল্যাণমাণিক্যের) জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব মহারাজের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল কাশীতে অবস্থান করিবার পর, প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করিয়া মথুরাতে গমন করেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবন বাসে অতিবাহিত হয়; বৃদ্ধ বয়সে তিন দিবস জ্বর ভোগের পর মহারাজের শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তি ঘটিল।

এদিকে মোগলগণের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে সমগ্র রাজ্য জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। উদয়পুরের প্রধান ব্যক্তিগণ জীবন ও সম্মান রক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। যাহারা অনন্যোপায় হইয়া উদয়পুরে রহিল, মোগলগণের অত্যাচারে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। মুসলমানেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হিন্দুগণের ধর্ম্মকার্য্যে বাধা ঘটাইতে লাগিল, ৺ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও ৺চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দিল। মগগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ইহারাও দীঘি ও সাগরগুলি সেঁচিয়া গুপ্তধনের সন্ধান লইয়াছিল। এইরূপে পূর্ণ আড়াই বৎসরকাল রাজ্যবাসিগণ মোগল শাসনের কু-ফল ভোগ করিয়া, দুঃখে কষ্টে কালযাপন করিতেছিল।

অতঃপর দৈবের বিচিত্র বিধানে মোগলগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল; দিন দিন রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমানগণ বুঝিল, স্থান ত্যাগ না করিলে সমূলে বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। তাহারা বাধ্য হইয়া উদয়পুরের ছাউনী উঠাইয়া, মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল।

পূর্ব্বোক্ত আড়াই বৎসরে মোগলবাহিনী রাজ্যের যে দুর্গতি ঘটাইয়াছিল, তাহা শুধরাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। মোগলেরা উদয়পুরে স্থায়িত্ব লাভের আশা করিয়াছিল, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহা না ঘটিলেও তাহারা মেহেরকুলে আসিয়া কয়েকটী পরগণা স্থায়িভাবে দখল করিয়া বসিল। তদবধি রাজ্যের নিম্ন-ভূভাগ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত ও মুসলমানের কুক্ষিগত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল; তদ্বিবরণ পরে প্রমাণ করা যাইবে।

উদয়পুরে অবস্থানকালে মোগলগণ বিজয়-চিহ্নস্বরূপ এক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইতেছিল, তাহার কার্য্য শেষ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। গোমতী

নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী পুরাতন রাজনিকেতনের সম্মুখে, সমভূমিতে ছাদ্‌বিহীন মস্‌জিদ অদ্যাপি মোগলবিজয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ইষ্টকালয় 'মোগল-মস্‌জিদ' নামে প্রসিদ্ধ।

মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে আউলিয়া ও দরবেশ প্রভৃতি মুসলমান ধার্ম্মিক পুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ই চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রথিতযশা আউলিয়া বদরসাহেব উদয়পুরে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে, রাজবাড়ীর সন্নিহিত স্থানে দোচালা গৃহের আকারবিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত একটী গৃহ বিদ্যমান আছে, তাহা 'বদর মোকাম' নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, আতারাম ও বুধিরাম নামক নরসুন্দর জাতীয় ভ্রাতৃযুগল বদর সাহেবের লোকাতীত বিভূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; বদর সাহেব স্বয়ং তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তদবধি তাহারা এই দরগার খাদিম (সেবাইত) নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান খাদিমগণ উক্ত ভ্রাতৃযুগলের বংশধর বলিয়া জনপ্রবাদে জানা যায়। এই দরগায় আলো প্রদানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজসরকার হইতে 'চেরাগী মিনাহ' ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। সেই মিনাহের সনন্দ বিনষ্ট হওয়ায়, এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইবার দরুণ ভূমির পরিচয় বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা রহিত হইয়াছে। মন্দিরটী জীর্ণদশায় পতিত হইয়াছিল, কিয়ৎকাল যাবৎ আগরতলাস্থ নাজির মেস্তরী নামক জনৈক কন্ট্রাক্টর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতি বৎসর নিজ ব্যয়ে ইহার সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এই ক্ষেত্রে উক্ত কন্ট্রাক্টরের সদাশয়তা ও ধর্ম্মপ্রবণতা প্রশংসনীয়।

মোগলগণ উদয়পুর ছাড়িয়া যাওয়ার পর, রাজপারিষদ্বর্গ ও প্রজাসাধারণ ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাসস্থান অবলম্বন করিল। কিন্তু রাজ্য রাজাহীন, শত্রুপক্ষ অনতিদূরে বাস করিতেছে, এই অবস্থায় সশঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগল, এবং অবিলম্বে রাজা নির্ব্বাচন করা বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করিল।

মহারাজ যশোধরের উত্তরাধিকারী পুত্র, পৌত্র কিম্বা ভ্রাতা না থাকায়, তিনি তীর্থ যাত্রাকালে সেনাপতি কল্যাণদেবকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রীবর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ বুঝিলেন, এই সময় দৃঢ়হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করা আবশ্যক। একমাত্র সেনাপতি কল্যাণদেবই রাজত্বলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, বিশেষতঃ তিনি রাজবংশীয় এবং তাঁহাকে রাজা করা হইলে মহারাজ যশোধরের অভিপ্রায় রক্ষিত হইবে। সুতরাং সকলে মিলিয়া কল্যাণদেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করাই সঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন।

কল্যাণদেবের পরিচয় বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে পাওয়া যায়; —

"মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর।
তার বংশে কচু ফা নাম হইল তাহার।।
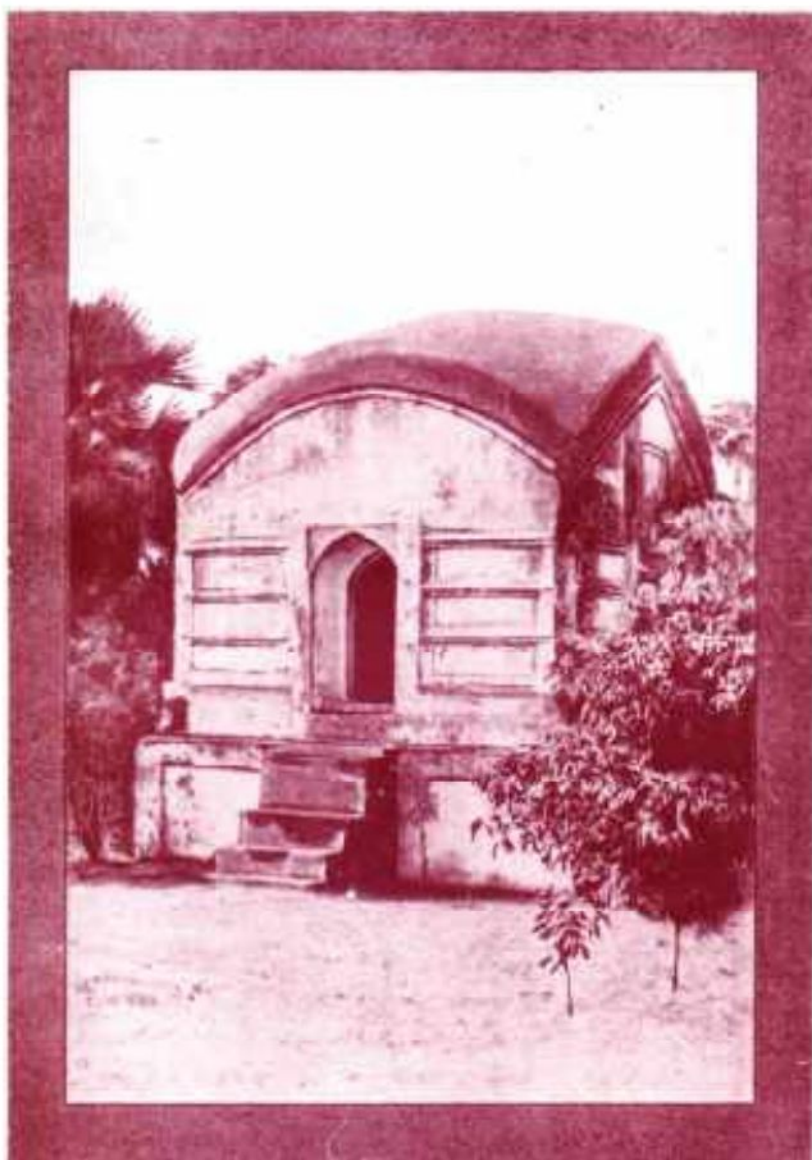
বদর মোকাম — উদয়পুর।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীররায় নামেতে।
তাহার কনিষ্ঠ বগিনী যুঝার মা পরেতে।।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুর্লভ নাম যার।
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণ নাম তার।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৯ পৃষ্ঠা

অন্যত্র পাওয়া যায়; —

"অতি বৃদ্ধ রণদুর্লভ কৈলাগড়ে ছিল।
থানাদারী কর্ম্মে তারে নৃপে নিয়োজিল।।
কল্যাণদেবের সেই মাতামহ হয়।
কৈলাগড়ে জন্ম কল্যাণ সেই ত সময়।।"

* * * *

কল্যাণদেবের মাতা হামতার মা নাম।
কচু ফা তাহার পিতা জ্ঞান অনুপাম।।
পুরন্দর আর নাম তাহার যে ছিল।
তুলসী ঘাটেতে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল।।

* * * *

দুর্লভ কল্যাণরায় দুই শিশুকালে।
মাতামহ দুর্লভরায় তাকে জিজ্ঞাসিলে।।
তোমা দুই জনা শিশু কি খাইতে মনে।
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আমা স্থানে।।
রণদুর্লভে কহে হংস পাইলে খাই।
কল্যাণে বলে আমি দুগ্ধ যেন চাই।।
দুর্লভনারায়ণ তাহা শুনিয়া হাসয়।
হংসমান দুগ্ধমান দুই নাম রাখয়।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২১ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে; —

"রাজার বংশেতে ছিল কচুরায় নামে।
তস্য পুত্র কল্যাণরায় ছিল পরাক্রমে।।

রাজমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বংশ-পত্রিকা আলোচনা করিলে নিম্নলিখিতমত দাঁড়াইবে।
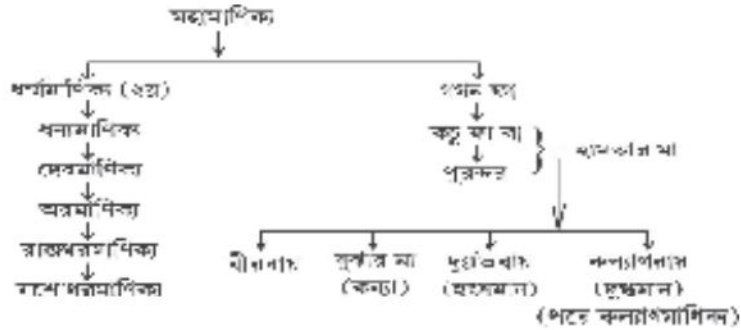
যশোধরমাণিক্যের জন্মগ্রহণের আট মাস পরে কল্যাণমাণিক্য জন্মিয়াছিলেন।* ইঁহার কোষ্ঠীর ফল এই লহরের ১৯শ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। যশোধর ও কল্যাণদেবের জন্মপত্রিকা আলোচনায় জানা যাইতেছে, উভয়ের বয়ঃক্রমে আট মাস মাত্র প্রভেদ। বংশ-পত্রিকা আলোচনায় দেখা যায়, মহারাজ যশোধর, মহামাণিক্য হইতে গণনায় সপ্তম স্থানীয় এবং কল্যাণদেব চতুর্থ স্থানীয়; এবম্বিধ পার্থক্য সম্ভবপর হইতে পারে না। রাজমালার বাক্যদ্বারাও এ বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়, যথা —

"মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর।
তার বংশে কচু ফা নাম হইল তাহার।।"

এই কচু ফা-এর পুত্র কল্যাণদেব। কচু ফা-কে গগন ফা-এর বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে — পুত্র বলা হয় নাই। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, গগন ফা ও কচু ফা-এর মধ্যবর্ত্তী দুই তিনটী নাম বাদ পড়িয়াছে। এখন আর এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের উপায় নাই।

কল্যাণদেবের মাতামহ সেনাপতি রণদুর্লভনারায়ণ কৈলার গড় দুর্গে নিযুক্ত থাকাকালে সেই স্থানে কল্যাণদেবের জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি মাতামহদ্বারাই পালিত হইয়াছেন। রণদুর্লভনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তির পর তিনি উদয়পুরে নীত হইয়াছিলেন। উদয়পুরে আগমনের পর কল্যাণদেব কাহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, জানা যাইতেছে না। তিনি মাসী পিসীদ্বারা পালিত হইয়াছিলেন, এরূপ একটা আভাস পাওয়া যায়। একদা মহারাজ অমরমাণিক্য চতুর্দ্দোল আরোহণে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় ; —

"কল্যাণ দেবকে শিখায় মাসী পিসীগণ।
রাজার চৌদোলে জল সিচিতে তখন।।
পঞ্চ বৎসর বালক কল্যাণ দেব হয়।
রাজার চৌদোলে জল সিচে সে সময়।।
দেখিয়া অমর দেব হাসিতে লাগিল।
কাহার বালক বলি নৃপে জিজ্ঞাসিল।।
কচু ফার পুত্র বলি কহে সর্ব্বজন।
মাসী পিসী কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২২ পৃষ্ঠা।

---

* "পনর শ দুই শক ভাদ্রমাস তাতে।
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে।।
যশোধর জন্ম হতে অষ্ট মাস পর।
কল্যাণ দেবের জন্ম হইয়াছে তৎপর।।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৯ পৃষ্ঠা।

কল্যাণমাণিক্য শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় বাছাল জাতিদ্বারা পালিত হইয়াছিলেন, এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত থাকিবার কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। সেই প্রবাদ বাক্যের মর্ম্ম এইরূপ, --- কল্যাণমাণিক্যের পিতা কচু ফা বা পুরন্দর, একদা মৃগয়ার্থ সৈন্যসহ বনগমন করিয়াছিলেন। তিনি একটী পলায়িত মৃগের পশ্চাতে অশ্ব ধাবিত করায়, স্বীয় অনুচরবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্নকালে প্রখর রবিকরে উত্তাপিত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া, তিনি জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক বাছালের গৃহে উপনীত হইলেন, এবং তথায় জলপান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। বাছালের একটী রূপবতী যুবতী কন্যা ছিল, আগন্তুক তদ্দর্শনে রূপমুগ্ধ হইলেন। যুবতীও রাজপরিবারস্থ যুবকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিলেন। উভয়ে গন্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই যুবতীর গর্ব্ভে, কচু ফা-এর সহযোগে কল্যাণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা, কল্যাণদেবের মাতামহ বাছাল জাতীয় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে উক্ত প্রবাদবাক্য ছাড়া অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে।

বাল্যকাল হইতেই কল্যাণদেবকে শিষ্ট-শান্ত এবং ধর্ম্মানুরক্ত দেখা গিয়াছে। তিনি অন্য বালকগণের সহিত না মিশিয়া একাকী ধূলিখেলা উপলক্ষে শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। যৌবনে তিনি সৈনাপত্য লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; শ্রেণীমালায় পাওয়া যায় ; ---

> "কসবা উপর কিল্লা থানা নৃপতির।
> কল্যাণরায় সেনাপতি যুদ্ধে মহাবীর।।
> সেই থানাতে তিনি ছিল থানাদার।
> সৈন্য সেনা রক্ষা করে যুদ্ধের মাঝার।।
> অশংক বিক্রমে ছিল জ্ঞানে মহামতি।" ইত্যাদি

মহারাজ যশোধরমাণিক্য, ইঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তা দর্শনে মুগ্ধ ছিলেন, এই কারণেই তীর্থ যাত্রাকালে ইঁহাকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জ, তাঁহার আদেশ সঙ্গত জ্ঞানে শিরোধার্য্য করিয়া, কল্যাণদেবকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন, তিনি কল্যাণমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন।

মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্যের শাসনকাল

রাজত্বলাভের পর মহারাজ কল্যাণের প্রথম কার্য্য হইল --- মোগলের ভয়ে পলায়িত অমাত্য, সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রজাবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় স্থানে পূর্ব্বভাবে স্থাপিত করা, --- তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্যদানে দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করা এবং মোগলকর্ত্তৃক বিধবস্ত মন্দির ও জলাশয় ইত্যাদির সংস্কার করা। এই সময় কাহাকেও প্রীতিপ্রদর্শন দ্বারা,

কাহাকেও আর্থিক সাহায্য দ্বারা এবং কাহাকেও বা বলপ্রয়োগ দ্বারা বাধ্য করিতে হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রজাগণ রাজভক্তির নিদর্শনসূচক ভেটসহ উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। এই সংগঠন কার্য্যে মহারাজের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

মহারাজ রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন; তাঁহার সৎকার্য্যাবলীর আভাস পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। তাহাদের সুবিধাকল্পে মহারাজ ভূমিসংক্রান্ত করের হার হ্রাস করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিষয়ে সুব্যবস্থার খ্যাতি শুনিয়া, দিন দিন প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অল্পকাল মধ্যেই রাজ্য সুখ-সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

মুসলমান অধিকৃত সময়ে সুযোগ পাইয়া রাজ্যের যে-সকল অংশ অপর ব্যক্তিগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহা পুনরাধিকার করিয়া রাজ্যের নষ্টোদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু মহারাজ অমরমাণিক্যের সময় কুমারগণের অবিমৃষ্য-কারিতার দরুণ যে ক্ষতি ঘটিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহার সম্যক পূরণ করিতে সমর্থ হন নাই। চট্টগ্রামে মঘগণের সহিত আহবে লিপ্ত হইয়া ইনি জয়লাভ করেন। এযাত্রায় অমরমাণিক্যের সময়ে অপহৃত চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ মঘগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে, মণিপুররাজ ত্রিপুরা হইতে লোক ধৃত করিয়া নেওয়ার কথা মণিপুরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে; —

"English Era 1634-35, — 1556 (Shak), Khagemba raided on Tipperah and brought 200 Captives. There was famine in this year on account of the scarcity of rain, Khagemba's wife distributed paddy on gratis amongst the poor, she also inspected the conditions of the villagers and relieved them from the difficulty."

মর্ম্ম ঃ— ১৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৫৬ শক — খাগেম্বা, ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং ২০০ (দুই শত) কয়েদী ধরিয়া আনেন।

ত্রিপুরার ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই; ইহার প্রকৃত তথ্য উদঘাটকের অন্য সূত্রও পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশের সুবিধা ঘটিল না।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান, পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবার আশা করিতেছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা বেগম মেহেরউন্নিসা (নূরজাহান) পতির উপর এমনি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, সেই প্রাধান্যের সুযোগে তিনি শাহজাহানকে বঞ্চিত করিয়া, স্বীয় কন্যা-জামাতা

শাহজাদা শাহরিয়রকে সিংহাসন প্রদানের চেষ্টায় প্রবৃত্তা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাহানের অনিষ্টজনক নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বেগমের প্ররোচনায় সম্রাটও দিন দিন পুত্রর প্রতি বীত-রাগ হইতেছিলেন। শাহজাহান এই অনিষ্টদায়ক গৃহবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তিনি অনন্যোপায় হইয়া পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কয়েকটী যুদ্ধও হইল। শাহজাহান বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া তথাকার নিজাম ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, "বঙ্গদেশ অধিকার করা আমার ইচ্ছিত নহে, — আমার উদ্দেশ্য অনেক উচ্চ। কিন্তু যখন পথিমধ্যে পতিত হইয়াছে, তখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। আপনি ধনপ্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা করিলে দিল্লী অভিমুখে নিঃসঙ্কোচে গমন করিতে পারেন; অথবা এ দেশে বাস করা অভিপ্রেত হইলে, আপনার ইঙ্গিত স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে পারেন।" ইব্রাহিম খাঁ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন — "বাদশাহ আমাকে এ দেশ রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, জীবন থাকিতে আমি তাহা রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইব না।" * অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শাহজাহান ইব্রাহিম খাঁকে নিহত করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। খান খানানের পুত্র দারাব খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু এই ব্যক্তি সময় বুঝিয়া, শাহজাহানের অবাধ্য হইয়াছিলেন; পরিশেষে সম্রাটের নির্দ্দেশানুসারে তিনি মহাবৎ খাঁ-এর হস্তে নিহত হইলেন।

শাহজাহান, বারাণসীর সন্নিহিত স্থানে সম্রাটের সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। এ দিকে সম্রাট বঙ্গের শাসনকার্য্যে ক্রমান্বয়ে খানাজাদ খাঁ, নবাব মোবারক খাঁ ও ফেদাই খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিতকাল পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এবং শাহজাহান দক্ষিণাপথ হইতে আগমনপূর্ব্বক তদীয় শ্বশুর আসফ খাঁ-এর সাহায্যে ভ্রাতাদিগকে অপসারিত করিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন (১০৩৭ হিঃ ১৬২৮ খ্রীঃ)। তিনি সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ফেদাই খাঁ-এর স্থলে নবাব কাসেম খাঁকে বাঙ্গালার শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। কাসেমের পরলোকগমনের পর, নবাব আজম খাঁ ও তৎপর নবাব এস্‌লাম খাঁ বঙ্গের সুবেদারী পদ লাভ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি দক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে উজীরের পদ প্রদান করিয়া নিজ দরবারে গ্রহণ এবং স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা মোহম্মদ সুজাকে বঙ্গের সুবাদারের পদে অভিষিক্ত করিলেন।

---

* রিয়াজ-উস্-সলাতিন গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যানে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সুজা ১০৪৮ হিং সনে (১৬৩৯ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে আগমন করিয়া আকবর নগরে (রাজমহলে) অবস্থান করিয়া, স্বীয় শ্বশুর ও সহকারী শাসনকর্ত্তা নবাব আজম খাঁকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) প্রেরণ করিলেন। তিনি আট বৎসর কাল নৈপুণ্যের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করিবার পর, শাহজাহানের রাজত্বের বিংশ বৎসরে পিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তাঁহাকে কাবুলের শাসনভার প্রদান করা সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় নবাব এতেকাদ খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার শাসনকাল দুই বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার শাহজাদা সুজাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

সুজার প্রথমবারের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তী-সম্পদের প্রতি সম্রাদের প্রতি সম্রাটের লোলুপ-দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি ত্রিপুরেশ্বর হইতে নজরস্বরূপ হস্তী গ্রহণের নিমিত্ত বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ করিলেন; এবং যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিসহ একসহস্র অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। তাহারা বঙ্গেশ্বরের নিয়োজিত সৈন্যদলসহ মিলিতভাবে কৈলার গড়ের সন্নিধানে আসিয়া ছাউনী করিল। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য দুর্গরক্ষার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব প্রমুখ সৈন্যদলসহ স্বয়ং কৈলার গড়ে আসিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মোগল পক্ষের কামানোর গোলা রাজদুর্গে পতিত হইতেছিল; রাজকুমার গোবিন্দদেব, একটী গোলা হাতে লইয়া পিতৃসকাসে উপস্থিত হইয়া বলিলেন --- ''অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টিতে দুর্গ অরক্ষণীয় মনে হইতেছে, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যুদ্ধ চলিতে পারে?'' মোগলবাহিনীর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করাই কুমারের উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজ, পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং পরুষবাক্যে বলিলেন --- "এ জীবনে অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কখনও ভীত হই নাই এবং শত্রুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপনও করি নাই। সন্ধি করা তোমার অভিপ্রেত হইলে তাহা করিতে পার, আমি এই যুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিব না।'' রাজগুরু দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, মহারাজ সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার চরণে ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিলেন।

পিতার ব্যবহার দর্শনে গোবিন্দদেব ভীত এবং লজ্জিত হইলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে ত্রিপুরবাহিনী মোগলদিগকে আক্রমণ করিল; সেই আক্রমণ অসহনীয় হওয়ায় মোগল সেনাপতি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মোগলগণের পুনর্ব্বার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার মত সাহস বা সম্বল ছিল না; এ যাত্রায় পরাজয় কলঙ্ক লইয়াই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

যুদ্ধাবসানে মহারাজ কল্যাণ উৎফুল্লচিত্তে দরবার আহ্বান করিলেন; এবং পাত্রমিত্রাদি পরিবেষ্টিত সভায়, রাজকুমার গোবিন্দদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল। তখনই মাঙ্গলিক উৎসবের দিন অবধারিত হইল; শুভদিনে শুভক্ষণে গোবিন্দদেব যুবরাজ পদবী লাভ করিলেন।

অতঃপর সুযোগ্য পুত্রের হস্তে রাজকার্য্যের সম্যক ভার অর্পণ করিয়া মহারাজ কল্যাণ নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মোদ্দেশ্যে তিনি যে-সকল সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

মহারাজ কল্যাণ ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন।* তিনি ১৫৪৮ শকে (৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে) রাজ্যলাভ করেন। ১৫৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখে তাঁহার গোলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। মহারাজ বাতরোগগ্রস্ত হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় তিন দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন।

রাজমালা তৃতীয় লহরেরঅন্তর্ভূত রাজগণের শাসনকালে রাজ্যের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। স্থূলতঃ, পারিবারিক বিরোধ এবং পাঠান ও ফিরিঙ্গী সৈন্যগণের অবাধ্যতার দরুণ এই সময় রাজ্যের বিস্তর ক্ষতি এবং কিয়ৎপরিমাণে রাজনৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না; মহারাজের পীড়িতাবস্থায় কুমার রাজধরের সিংহাসন অধিকার করিবার লালসা, তদুপলক্ষে কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহের অগ্রজের প্রতি অসংযত ব্যবহার,† চট্টগ্রামে আরাকানরাজের প্রেরিত গজদন্তের মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের মধ্যে মনোমালিন্য ‡ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে কুমারগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইঁহাদের কোন কোন কার্য্য দ্বারা বুঝা যায়, রাজাও সকল সময় পুত্রদিগকে বশে রাখিতে সক্ষম ছিলেন না। এরূপ ব্যবস্থায় রাজ্য ও রাজার যেরূপ অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক, বিপুল প্রতিভার অধিকারী সত্ত্বেও মহারাজ অমরের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজগণও তাদৃশ্য সুখ-শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই; মঘ ও মুসলমান দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর্য্যুপরি পেষণে ত্রিপুরেশ্বরদিগকে উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে হইয়াছিল।

রাজা ও রাণীর ঔদার্য্য

শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া উদয়পুরে নীত হওয়ার পর, মহারাজ অমরমাণিক্য সেই বিজিত শত্রুর প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে মহারাজের অসীম ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।§ সরাইলের ঈশা খাঁ মোগল বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আশ্রয়

* এই লহরের ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৪ পৃষ্ঠা।
‡ অমরমাণিক্য খণ্ড — ৩৪ পৃষ্ঠা। § অমরমাণিক্য খণ্ড — ১০ পৃষ্ঠা।

গ্রহণ করেন। এই সময় ঈশা খাঁ মহারাণীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রাজা-রাণীর যে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহা লোকোত্তর উদারতার পরিচায়ক। ত্রিপুরার রাজা ও রাণীগণের এবম্বিধ কৃপালাভে অনেকেই ধন্য হইবার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অনেক পাওয়া গিয়াছে, অতঃপরও পাওয়া যাইবে।

সামাজিক অবস্থা

সামাজিক বিবরণ রাজমালায় বেশী কিছু পাওয়া যায় না। সেকালে সকলেই ধর্ম্মানুরক্ত, সরল বিশ্বাসী, সত্যবাদী, সৎসাহসী এবং বীর্য্যশালী ছিল, এই মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। নানাবিধ অমূলক বাক্য প্রচার দ্বারা জনসাধারণের ভীতি-উৎপাদনকারী দুষ্ট লোকেরও অভাব ছিল না। সরল হৃদয় প্রকৃতিপুঞ্জ সেই সকল জনরব সহজেই বিশ্বাস করিত, এবং ভাবী বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। আলোচ্য তৃতীয় লহরে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

সুরার প্রভাব

সে-কালের সমাজে মদিরার প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল, রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে এ বিষয়ের বিস্তর নির্দ্দশন পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় লহরেও এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই লহরের অন্তর্নিবিষ্ট রাজা অমরমাণিক্য মদ্যপান করিতেন, দ্বিতীয় লহরে এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ জয়মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ মদ্যদানে বিহ্বল করিয়া অমরদেবকে বধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, অমরদেব স্বয়ং বলিয়াছেন; —

"আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে।
মদ্য পান করাইয়া চাহিল মারিতে।।"

রাজমালা — ২য় লহর, ৭৪ পৃষ্ঠা।

মহারাজ অমরমাণিক্যের নিয়োজিত সেনাপতি ও লস্কর (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা) মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মাতুল ছিলেন। রাজমালায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে পাওয়া যাইতেছে; —

"গামারিয়া কিল্লায় থাকে কল্যাণ মাতুল।
গামারী লস্করী কাজে করে অপ্রতুল।।
অন্ন মাংস সদা কাল তার পাকে হয়।
উষ্ণ থাকিতেসে যে ভোজন করয়।।
কুৎসিত প্রকৃতি তার শিকদারি চালা।
প্রাতঃকালে বৈসে খাইতে হয় বহু বেলা।।
মদ্য বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে।
অন্য জনে জল খাইলে কিলায় ভোজনে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৬ পৃষ্ঠা।

সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং জলস্পর্শ করিতেন না, মদ্য দ্বারা জলের অভাব পূর্ণ করিতেন; অন্যকে জলপান করিতে দেখিলেও তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইত; এমনকি, জলপায়ী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য শাসন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না! একদা তিনি স্বীয় জামাতাসহ এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, এই সময় জামাতাকে জল পান করিতে দেখিয়া শ্বশুর অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং ভোজনপাত্র ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া জামাতার পৃষ্ঠে সজোরে পাঁচটি কিল মারিয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন — "ভাতের সঙ্গে মদ্যপান না করিয়া জলপান করিতেছ? তোমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য লোক দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হইবার আশা নাই।"*

যে সমাজের উন্নতস্তরের এবম্বিধ অবস্থা, তাহার নিম্নস্তরের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। যে সমাজের প্রতি গৃহে অবাধে মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, যে সমাজে মদিরার উপকরণ আপামর সাধারণ প্রস্তুত করিতে অধিকারী, মদিরা চুঁয়ান যে সমাজের পারিবারিক একটী প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত, পরিবারস্থ গুরু-লঘু সকলে মিলিয়া এক পাত্রে মদ্যপান করিতে যে সমাজের লোক চির অভ্যস্ত, সেই দেশে — সেই সমাজে মদিরার স্রোত যে কত প্রবল হইতে পারে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। সে কালের পার্ব্বত্য সমাজ বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার জানিত না, সুতরাং অভাবও ছিল না, আপন আপন জুমোৎপন্ন বস্তু লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইত, আর নাচিয়া গাহিয়া ও পান করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর থাকিত।

ভূতের উপদ্রব

ভূত সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব জাতিতে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়েই বদ্ধমূল রহিয়াছে। হিন্দুগণ ভূত বা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে মানিয়া থাকেন, ইহা হিন্দুগণের মনগড়া ভাব নহে — শাস্ত্রের কথা। ত্রিপুরা রাজ্যে এক কালে ভৌতিক উপদ্রবের আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল

---

* সুনামা কন্যা তার জামাই পাঠান রায়।
শ্বশুর নিকটে অন্ন বসি সেই খায়।।
অন্ন মাংস খাইয়া জল তৃষ্ণা হৈল তান।
শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান।।
জামাতার জল পান দেখিয়া শ্বশুর।
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে যেন মত্তশূর।।
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা।
তোমা হতে আমা কর্ম্ম না হবে সর্ব্বথা।।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৬ পৃষ্ঠা।

হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে এতদ্বিষয়ক বিশ্বাস নিতান্তই প্রবল হইয়াছিল এবং সমগ্র রাজধানী ভূতের ভয়ে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। স্বয়ং মহারাজও ভূতের অস্তিত্ব প্রতিপাদক অনেক কথা বলিয়াছেন। পথে ঘাটে মানুষকে ভূতে আক্রমণ করিত, দেবালয়ে অত্যাচার করিত, গাছে চড়িয়া ডিগ্‌বাজী খেলিত, ইত্যাদি ভীতিজনক অনেক ভৌতিক কাণ্ডের কথা তৃতীয় লহরে পাওয়া যায়।

মুদ্রা

মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে এই সময়ও প্রাচীন প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজার নামের সহিত পট্টমহিষীর নাম এবং প্রচলনের শকাঙ্ক উৎকীর্ণ করাই মুদ্রা প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম ছিল। বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মৃতি রক্ষাকল্পেও মুদ্রা নির্ম্মিত হইত; মহারাজ অমরমাণিক্য শ্রীহট্ট বিজয়োপলক্ষে নূতন মুদ্রা প্রচলন করিবার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। এক রাজার শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে, বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিদর্শন অনেক আছে। রাজার একাধিক পট্টমহিষী থাকাবস্থায় প্রত্যেক মহিষীর নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

কড়িমুদ্রা

এই সময়ও কড়িদ্বারা মুদ্রার কার্য্য সাধিত হইত, আলোচ্য তৃতীয় লহরের অনেক স্থানেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য জয় করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন তাহার তালিকায় পাওয়া যাইতেছে, —

"গো মূল্য চারিপণ ছাগ দুইপণ।
মনুষ্যের মূল্য হৈল এক এক কাহন।।" ইত্যাদি।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৩ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা কড়িমুদ্রা প্রচলিত থাকিবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

অতঃপর মহারাজ অমর, মঘকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তিনি পুনরাক্রান্ত হওয়ায় বলিয়াছিলেন; —

"কৌড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আমা বিদ্যমান।।
উদয়পুর আসি মঘ কিছু না পাইব।
ধনহীন বলি আমা মঘেতে কহিব।।
রাজার আজ্ঞায় কড়ি আনে সেইক্ষণ।
কৌড়িপুঞ্জ রাখিলেক রাজার ভবন।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪১ পৃষ্ঠা।

মুদ্রারূপে কড়ি ব্যবহৃত হইবার ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সেকালে টাকার ভগ্নাংশের কার্য্য ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে কড়িদ্বারাই নিষ্পাদিত হইত।

এই সময় পর্য্যন্ত রাজ্যের আরণ্য প্রাণীর মধ্যে হস্তীর ন্যায় ঘোটকও অপ্রাপ্য ছিল না। পার্ব্বত্য প্রজাগণ এই সময়ও রাজার উপঢৌকনস্বরূপ অন্যান্য বস্তুর সহিত ঘোটক প্রদান করিত। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজ্যলাভ করিবার পর,—

রাজ্যের বিশেষত্ব

"পর্ব্বতিয়া কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ।।
ঘোটক গবয় বস্ত্র লইয়া তখন।।
থাল ঘোঙ্গ গজদন্ত আনিল তখন।
নানা ভেট লইয়া আইসে নৃপতি সদন।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড — ৬৬ পৃষ্ঠা।

এতদ্ব্যতীত খনিজ সম্পদ পূর্ব্বের ন্যায় এই সময়ও ছিল, কিন্তু তাহার উদ্ধারকল্পে কোনরূপ অনুষ্ঠান হইবার পরিচয় পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার হস্তী-বিভব বর্ত্তমান কালেও যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রাচীন কালের তুলনায় নানা কারণে এই সম্পদ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়াছে।

রাজগণের কাল নির্ণয়

রাজমালা তৃতীয় লহরে যে-সকল রাজার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদের রাজত্বকাল নিরূপণ জন্য এস্থলে চেষ্টা করা হইবে।

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল লইয়া তৃতীয় লহরের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার বাল্যকালের অবস্থাদি পূর্ব্বে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইবে, প্রথমাবস্থায় ইঁহার 'রামদাস' নাম ছিল। সৈনাপত্য লাভের পর, 'ভীম সেনাপতি' * ও 'অমরদেব' নামকরণ হয়। তিনি রাজত্ব লাভের পর, 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিয়া 'অমরমাণিক্য' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

মহারাজ অমর-মাণিক্যের শাসনকাল

অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ত্রিপুর বংশাবলীর মতে তিনি ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, — মহারাজ অমর ১০০৭ ত্রিং (১৫৯৭ খৃঃ) হইতে ১০২১ ত্রিং (১৬১১ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। † চাকলা রোশনাবাদের সেটলমেন্ট অফিসার কমিং সাহেব (J. G. Cumming I.C.S.) এবং History of Tripura গ্রন্থের প্রণেতা সেণ্ডিস্ সাহেব (E. F. Sandys)‡ কৈলাসবাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন। রাজমালার সমালোচক লঙ্ সাহেব (Rev. James Long) অমরমাণিক্যের

---

* "বিজয়মাণিক্য ভ্রাতা ভীম সেনাপতি।
অমরমাণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি।।"

ত্রিপুর বংশাবলী।

† কৈলাসবাবু রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৬৮ পৃষ্ঠা।

‡ History of Tripura — Page 18.

রাজ্যলাভের সময় নির্দ্দেশ করেন নাই; মহারাজ ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্ট বিজয় করিবার কথা বলিয়াছেন।* এতৎসম্বন্ধে রাজমালার উক্তি অন্যরূপ, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে; —

"চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব রাজা।
পনরশ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১১ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়; —

"চৌদ্দশত উনশত শকে অমরদেব হৈল।
পনর শত পূরা বর্ষে ভুলুয়া লুটিল।।"

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার ভাষা প্রাচীন রাজমালার বাক্যের অনুরূপ। মহারাজ অমর, ১৪৯৯ শকে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, রাজমালার বাক্য দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে। ১৪৯৯ শকে ৯৮৭ ত্রিপুরাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ ছিল; সুতরাং কৈলাসবাবু প্রভৃতির মতের সহিত রাজমালার মতের বিশ বৎসর পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। ত্রিপুর বংশাবলীর মতের সহিত কৈলাসবাবু প্রভৃতির মতের এক বৎসর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কি কারণে রাজমালার সহিত তাঁহাদের মতের এবম্বিধ অসামঞ্জস্য ঘটিল, উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই তাহা বলেন নাই।

এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মহারাজ অমরমাণিক্যের অমরসাগর খননকালে শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের শাসনকর্ত্তা, কুলি প্রদান দ্বারা সাহায্য না করায়, এই অবাধ্য শাসনকর্ত্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান জন্য মহারাজ অমর তরপ রাজ্য আক্রমণ ও তথাকার শাসনকর্ত্তাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীহট্টের তদানীন্তন আলিম আদম শাহ তরপের সাহায্যকারী ছিলেন, এই অপরাধে মহারাজ অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রান্ত ও বিজিত হয়। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, এই বিজয় ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ) ঘটিয়াছিল। শ্রীহট্ট বিজয়ের স্মৃতি রক্ষাকল্পে মহারাজ যে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

* Journal of Asiatic Society of Bengal — Vol. XIX.
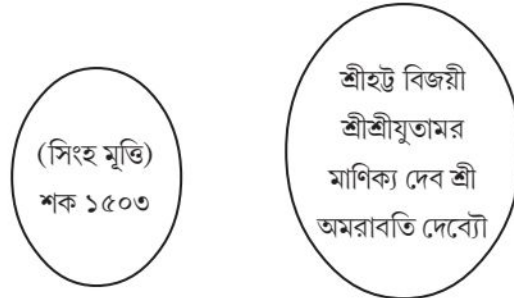
মুদ্রার প্রমাণ অকাট্য, সুতরাং ১৫০৩ শকে যে শ্রীহট্ট জয় করা হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়িত ভাবে নির্দ্ধারিত হইতেছে। রাজমালা আলোচনায় ইহাও জানা যায়, শ্রীহট্ট বিজয়ের পর, কুমার রাজধর কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে শ্রীহট্টের পরাজিত ও বন্দীকৃত শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁকে সহ শ্রীহট্ট ত্যাগ করেন। রাজমালায় এতৎ সম্বন্ধে লিখিত আছে; —

"পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে।
মাঘের পনের দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।।
রাজধর চলিল দুলালী গ্রাম পথে।
ইটা গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটী তীর্থে।।" ইত্যাদি।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ১০ পৃষ্ঠা।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায়ও ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে কুমার রাজধর শ্রীহট্ট ত্যাগ করিবার কথা লিখিত আছে। রেভারেণ্ড্ লঙ্ সাহেব, শ্রীহট্ট পরিত্যাগের কালকেই তদ্দেশ বিজয়ের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য এই; —

"Amar Manik resolved on Virtuous deeds by digging tanks; he ordered all the landlords of his kingdom to send coolies for this purpose, accordingly nine Zemindars sent 7300 coolies. The Zemindar of Taraf in Sylhet refused, and army of 22,000 men was sent against him, his son was taken prisoner, put into a cage, and brought to Udayapur. The Raja, next (A. D. 1582) marched an army against the Mohammadan commander of Sylhet whom he defeated. The order of the troops in battle resembled in figure the sacred bird *gaduda*, the two generals in the van represented the beak, the troops on the flanks are wing, and the main army the body; during the fight both parties became fatigued when a suspension of arms took place by mutual agreement; they afterwards resumed the battle, when the Musalmans were defeated."

J.A.S.B. — Vol. XIX.

উদ্ধৃত অংশে লিখিত ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ ও রাজমালার কথিত ১৫০৪ শকে কোন পার্থক্য নাই। কৈলাসবাবু বলেন, — "সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল।"* ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে ১৫২১ শক হয়। সেণ্ডিস্ সাহেব তরপের যুদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকিলেও সময় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পূর্ব্বকথিত মুদ্রার প্রমাণ মিলাইলে দেখা যাইবে, যিনি রাজত্ব লাভের পর ১৫০৩ শকে (১৫৯১ খ্রীঃ) শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার

* কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭ পৃষ্ঠা।

রাজ্য লাভের সময় ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খ্রীঃ) কোনক্রমেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। রাজমালার নির্দ্দেশিত ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ) মহারাজ অমরমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতেই অবধারণ করিয়া আসিতেছি।* অধুনা মহারাজ অমরের ১৪৯৯ শকের একটী রৌপ্যমুদ্রা আমাদের হস্তগত হওয়ায়, উক্ত নির্দ্ধারণ সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ বাক্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হইল।

এই মুদ্রাই যে মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালের প্রথম মুদ্রা, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে; কারণ, অমরমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা জয়মাণিক্য ১৪৯৯ শকে কিয়ৎকাল রাজত্ব করা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।† সুতরাং অমরমাণিক্যের প্রচারিত তৎপূর্ব্বের (১৪৯৯ শকের পূর্ব্বের) মুদ্রা থাকিতে পারে না। এই মুদ্রা দ্বারা ইহাই প্রমামিত হইতেছে, যে ১৪৯৯ শকের প্রথম ভাগে জয়মাণিক্যের রাজত্বকাল শেষ হওয়ায়, অমরমাণিক্য ঐ শকের শেষ ভাগে রাজা হইয়া ইহা প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৪৯৯ শকই যে ইঁহার রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত সময়, এই মুদ্রা দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতেছে।

কৈলাসবাবু যে ১০০৭ ত্রিপুরাব্দ (১৫১৯ শক) অমরমাণিক্যের রাজ্যলাভের সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, মৌদ্রিক প্রমাণের নিকট তাহা টিকিতেছে না। মহারাজ অমর ১৫১৯ শকে রাজা হইয়া থাকিলে, ১৪৯৯ শকে তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলন হইতে পারিত না; রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কাহারও নামে মুদ্রা প্রচলিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব এবং নিয়মবিরুদ্ধ কথা। আরও দেখা যাইতেছে, মহারাজ অমর রাজত্ব লাভ করিবার পর ১৫০০ শকে ভুলুয়া রাজ্য ও ১৫০৩ শকে তরপ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি যে ১৫০০ শকের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ রাজমালায় যে তাঁহার রাজ্যলাভের সময় ১৪৯৯ শক লিখিত হইয়াছে, মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থিত হওয়ায়, এই উক্তির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হইয়াছে।

---

* রাজমালা — দ্বিতীয় লহর, ৮৫ পৃষ্ঠা।

† রাজমালা — ২য় লহর, ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অমরমাণিক্য কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয় লইয়াও মতবাদ লক্ষিত হয়। কৈলাসবাবু, সেণ্ডিস্ সাহেব ও কমিং সাহেবের মতে মহারাজ অমর ১৫৯৭ খ্রীঃ হইতে ১৬১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। কোন সূত্র অবলম্বনে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা কেহই বলেন নাই। কাল পরম্পরা ইঁহারা একে অন্যের সিদ্ধান্ত নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের এই নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ নহে।

রাজমালার নির্দ্ধারিত সময়ও প্রমাদপূর্ণ। মঘ কর্ত্তৃক উদয়পুর আক্রমণের সময় হইতেই মহারাজ অমরের রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল। এই আক্রমণ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে;—

"পনের শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে।
প্রথমে আসিলা মঘ উদয়পুরেতে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪২ পৃষ্ঠা।

ইহা আমাদের সম্পাদ্য রাজমালার বাক্য। প্রাচীন রাজমালার সহিত এই বাক্যের সামঞ্জস্য নাই। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে;—

"কাল নভ শর চন্দ্র শক চৈত্র মাসে।
প্রথম আসিল মঘ উদয়পুর দেশে।।"

কাল ৩, নভ ০, শর ৫, চন্দ্র ১। অঙ্কের বামাগতি, সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা ১৫০৩ শক বলা হইয়াছে। রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত পংক্তিদ্বয় অবিকলভাবে লিখিত হইয়াছে। অথচ উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র অমরমাণিক্যের মনুনদী তীরে অবস্থান বিষয়ক বিবরণে লিখিত হইয়াছে;—

"এহিরূপে তিন মাস অরণ্যে আছিল।
পনর শ ছয় শকাব্দা এ সব ঘটিল।।"

এখন দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্পাদ্য রাজমালার মতে অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৯৯ শক হইতে ১৫১০ শক পর্য্যন্ত এগার বৎসর, প্রাচীন রাজমালার মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৩ শক পর্য্যন্ত চারি বৎসর এবং রাজাবাবুর বাড়ীর গ্রন্থ মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৬ শক পর্য্যন্ত সাত বৎসর নির্ণীত হইয়াছে।

মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রচলিত ১৪৯৯ ও ১৫০৩ শকের মুদ্রার মধ্যে শেষোক্ত মুদ্রা শ্রীহট্ট বিজয়োপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালের ১৫০৩ শকের পরে উৎকীর্ণ কোনও মুদ্রা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মহারাজ অমরের পরবর্ত্তী, মহারাজ রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকে উৎকীর্ণ রৌপ্য মুদ্রা আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং ইহাই যে তাঁহার প্রথম মুদ্রা, তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫০৮ শকেরই অবসান হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহারাজ অমরের তিরোধানের পূর্ব্বে, তৎপরবর্ত্তী রাজার রাজত্ব লাভ বা মুদ্রা প্রচলন করা সম্ভব হইতে পারে না।

মহারাজ অমরমাণিক্যের ১৪৯৯ শকের মুদ্রা দ্বারা রাজত্ব লাভের কাল পাওয়া গিয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা (মহারাজ রাজধরমাণিক্যের) ১৫০৮ শকের উৎকীর্ণ মুদ্রা দ্বারা অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষ সময়ও নির্ণীত হইতেছে। অতএব তিনি ১৪৯৯ হইতে ১৫০৮ শক পর্য্যন্ত (১৫৭৭---১৫৮৬ খ্রীঃ) নয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করা মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে; এই নির্দ্ধারণই প্রমাদশূন্য ও গ্রহণীয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের প্রাচীনত্ব নির্ণয়োপলক্ষে মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে,* তৎকালে উক্ত মহারাজের কিম্বা মহারাজ রাজধরমাণিক্যের মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই কারণে কমিং সাহেব ও সেণ্ডিস্ সাহেব প্রভৃতির বাক্যের প্রনিত নির্ভর করিয়া অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল চৌদ্দ বৎসর ধরা হইয়াছিল, এবং সেই হিসাবে তাঁহার পরলোক গমনের কাল ১৫১৩ শক (১৫৯১ খ্রীঃ) নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্ত রাজাদ্বয়ের প্রচারিত মুদ্রা লাভের পর এই নির্দ্ধারণ ভুল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। উক্ত ভুলের দ্বারা মহারাজের রাজত্ব কাল পাঁচ বৎসর অধিক ধরা হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত হিসাব দ্বারা রাজমালা দ্বিতীয় লহরের বয়স যে সার্দ্ধত্রিশত বৎসর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এই সামান্য ভুলের দরুণ তাহা পরিবর্ত্তনের কোনরূপ কারণ ঘটে নাই। স্থূলকথা, মহারাজ অমরের রাজত্বকাল চৌদ্দ বৎসর না ধরিয়া, নয় বৎসর ধরিতে হইবে। তিনি ১৪৯৯ শকের শেষ ভাগ হইতে ১৫০৮ শকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, মুদ্রার সাহায্যে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

মহারাজ রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব কাল

মহারাজ রাজধরমাণিক্য, অমরমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা। কৈলাসবাবু, কমিং সাহেব ও সেণ্ডিস্ সাহেব প্রভৃতির মতে মহারাজ রাজধর ১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খ্রীঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। রাজমালায় ইঁহার রাজত্বকাল নির্দ্দেশক কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না। রাজধরের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ অমর ১৫০৮ শকের (১৫৮৬ খ্রীঃ) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করা জানা গিয়াছে, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের ১৫০৮ শকের মুদ্রা দ্বারা

* রাজমালা --- ২য় লহর, ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রমাণিত হইতেছে, তিনি এই শকেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে।
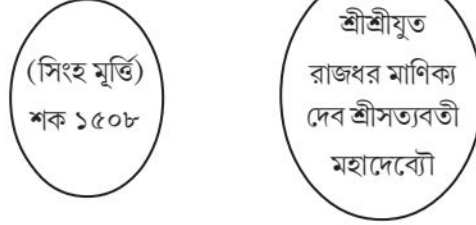
ইহা মহারাজ রাজধরের প্রথম মুদ্রা। রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব অবসানের কাল নির্ণয় জন্য তৎপরবর্ত্তী রাজা যশোধরমাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ দুর্লভ হইয়াছে। শেষোক্ত মহারাজের ১৫২২ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহাই তাঁহার প্রথম প্রচারিত মুদ্রা বলিয়া জানা যাইতেছে। সুতরাং ১৫২১ শকে (১৫৯৯ খ্রীঃ) রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, এরূপ অবধারণ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা মহারাজ রাজধরের রাজত্বকাল ১৫০৮ শকের শেষ ভাগ হইতে ১৫২১ শক পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূন চৌদ্দ বৎসর নির্ণীত হইতেছে।

মহারাজ যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকাল

মহারাজ যশোধরমাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রার সাহায্যে তাঁহার রাজত্ব ১৫২২ শকে (১৬০০ খ্রীঃ) আরম্ভ হইবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উক্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ মুদ্রিত আছে;—
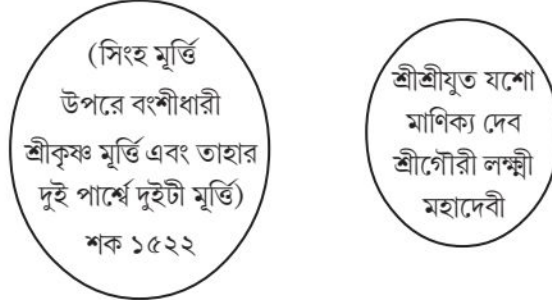
রাজমালার উক্তির সহিত এই মুদ্রা-লিপির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না। রাজমালায় লিখিত আছে;—

> "পনর শ তের শক হইল যখন।
> রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন।।
> তান পুত্র যশোধর হইলেক রাজা।
> পাত্র মিত্র মন্ত্রী বশ করে সৈন্য প্রজা।।"
>
> যশোধরমাণিক্য খণ্ড — ৫৭ পৃষ্ঠা।

ইহার অল্প পরেই পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে;—

"পনর শ চব্বিশ শকে যশ রাজা হৈল।
যেনমত নাম রাজা সেই খ্যাতি হৈল।।"

যশোমাণিক্য খণ্ড — ৫৯ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত উভয় উক্তিতে পরস্পর ১১ বৎসর তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ ইহার কোন বাক্যই মুদ্রার প্রমাণের সহিত ঐক্য হইতেছে না। প্রথম বাক্যদ্বারা মুদ্রায় উৎকীর্ণ সময়ের (১৫২২ শকের) দশ বৎসর পূর্ব্বে, এবং শেষোক্ত বাক্য দ্বারা দুই বৎসর পরে মহারাজের রাজ্যলাভের কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে। এবম্বিধ অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান জন্য প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ১৫২৪ শকে মহারাজের রাজত্ব আরম্ভ হইবার কথা পাওয়া যায়,* ১৫১৩ শকের উল্লেখ নাই। অবস্থানুসারে বুঝা যায়, ১৫২৪ শকই রাজমালার নির্দ্ধারিত সময়, লিপিকার প্রমাদে ১৫১৩ শক লিখিত হইয়াছে।

কৈলাসবাবু, মিঃ কমিং সাহেব ও মিঃ সেণ্ডিস্ সাহেব প্রভৃতি ১৬১৩ খ্রীঃ হইতে ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ যশোধরের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৩৫ শক ছিল। এই নির্দ্ধারণ কি মূল্যে করা হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই; রাজমালার উক্তি অথবা মুদ্রার প্রমাণ, কোনটার সহিতই এই নির্দ্ধারণের মিল নাই। মুদ্রার প্রমাণ সকল অবস্থায়ই অকাট্য এবং সংশয় বিবর্জ্জিত; বিশেষতঃ এবম্বিধ মত বৈষম্যের স্থলে মুদ্রার প্রমাণই একমাত্র অবলম্বনীয়। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যশোধরের ১৫২২ শকের উৎকীর্ণ একটী মুদ্রার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে; মুদ্রায় রাজার নামের সহিত মহারাণী গৌরীলক্ষ্মী মহাদেবীর নামাঙ্কিত রহিয়াছে। রাজার একাধিক পট্টমহিষী থাকিলে, রাজ্যাভিষেক কালে প্রত্যেক মহিষীর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুতের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ যশোধরমাণিক্য একই সময়ে দ্বিবিধ মুদ্রা প্রচলন করিবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত মুদ্রা ব্যতীত আর একটী মুদ্রার লিপির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল।

(সিংহ মূর্ত্তির
উপরে বংশীধারী
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি
তাহার দুই পার্শ্বে
দুইটী মূর্ত্তি)
শক ১৫২২

শ্রীশ্রী যশো
মাণিক্য দেব
শ্রীলক্ষ্মীগৌরী
জয়া মহাদেবীঃ

---
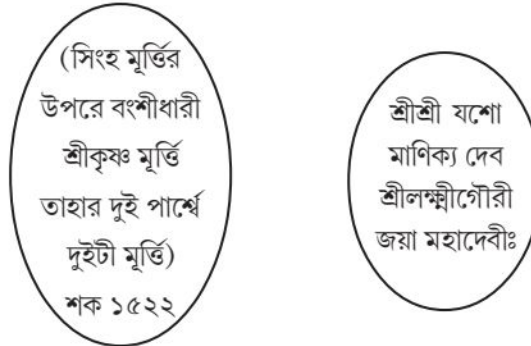
* প্রাচীন রাজমালায় যশোমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে; —

"পনর শ চব্বিশ শকে ত রাজা হৈল।
নানা সুখ ভোগ রাজা অশেষ করিল।।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ যশোধরের গৌরীলক্ষ্মী ও জয়াবতী নাম্নী দুই জন পট্টমহিষী ছিলেন। উক্ত উভয় মুদ্রা এক সময়ে মুদ্রিত হওয়ায়, ইহাই যে মহারাজের রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা তাহা সহজেই বুঝা যায়।

১৫০১ শকে মহারাজ যশোধরের জন্ম হয়, তাঁহার জন্মপত্রিকার বিবরণ দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে* ১৫২২ শকে রাজ্যলাভ কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ছিল। ১৫৪৫ শকে (১৬২৩ খ্রীঃ) তিনি মোগল কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া তীর্থাশ্রম অবলম্বন করেন। ২৩ বৎসরকাল রাজ্য ভোগের পর, ৪৪ বৎসর বয়সে মহারাজ তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। ২৮ বৎসর কাল তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানের পর, ১৫৭৩ শকে (১৬৫১ খ্রীঃ) তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ রাজ্যভ্রষ্ট অবস্থায় ২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং ১৫২২ শক (১৬০০ খ্রীঃ) হইতে ১৫৪৫ শক (১৬২৩ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছেন।

মোগল শাসনকাল

মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে পরাভূত করিয়া মোগলগণ ১৫৪৫ শকের শেষ ভাগে সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহারা আড়াই বৎসর কাল উচ্ছৃঙ্খলভাবে শাসন দণ্ড পরিচালনের পর, মহামারীর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমভূমিতে (মেহেরকুলে) যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। তদবধি সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ স্থায়িভাবে মোগলগণের হস্তে রহিয়া গেল, পার্ব্বত্য প্রদেশ পুনর্ব্বার রাজবংশের হস্তগত হইল। ১৫৪৫ শকের (১৬২৩ খ্রীঃ) শেষ ভাগ হইতে ১৫৪৭ শক (১৬২৫ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত রাজ্যের সমগ্র ভাগ মোগল শক্তির শাসনাধীনে ছিল।

মহারাজ কল্যাণ-মাণিক্যের শাসনকাল

মহারাজ যশোধরমাণিক্যের অভিপ্রায়ানুসারে সেনাপতি কল্যাণ দেব ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইলেও মোগলবাহিনী বিদূরিত করিয়া, রাজ্যে পুনরধিকার স্থাপনের চেষ্টায় তাঁহাকে আড়াই বৎসর কাল বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। দৈবানুকূল্য হেতু মোগলগণ উদয়পুর পরিত্যাগ করায়, ইত্যবসরে মহারাজ কল্যাণ রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন, কিন্তু সমভূমির যে অংশ লইয়া মুসলমানগণ মেহেরকুলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, সেই অংশের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না।

মোগলগণের উদয়পুর পরিত্যাগের পর, তাহাদের অত্যাচারে পলায়িত নগরবাসিগণ পুনর্ব্বার স্বীয় স্বীয় আবাসে আসিয়া অবস্থিত হইল। কিন্তু রাজাহীন রাজ্যে বাস করা নিরাপদ নহে দেখিয়া তাহারা রাজা নির্ব্বাচনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। যশোধরমাণিক্য আর রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না, ইহা সকলেই

---

* অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জানিয়াছিল।* এইজন্যই কল্যাণদেবকে রাজত্ব প্রদানের নিমিত্ত মহারাজ যশোধর অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাই মানিয়া লইল। ১৫৪৮ শকের শেষভাগে সকলে মিলিয়া কল্যাণদেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। তৎকালে যে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একটী মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উক্ত মুদ্রায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই মুদ্রায় মহারাণীর নাম সংযোজিত হয় নাই। প্রচলিত পদ্ধতি এরূপ ভাবে উল্লঙঘন করিবার কারণ বর্ত্তমান কালে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। এই মুদ্রায় সিংহের উপরিভাগে একটী শিবলিঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে; এরূপ অঙ্কনের নিদর্শন রাজমালায়ও পাওয়া যায়।† কোন কোন রাজার মুদ্রায় সিংহের উপরিভাগে একটী ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা শৈব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিচায়ক। ত্রিপুরেশ্বরগণ পূর্ব্বে যে শৈব ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহারই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

রাজমালায়, মহারাজ কল্যাণের রাজ্যলাভের সময় মুদ্রার প্রমাণ অপেক্ষা এক বৎসর অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইতেছে। আমাদের সম্পাদ্য গ্রন্থে লিখিত আছে; —

"পনর শ সাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল।
শুভদিনে মহারাজা মোহর মারিল।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড — ৬৬ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন রাজমালার সহিত এই বাক্যের মিল নাই। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে; —

"পনর শ পাচ্চল্লিশ শকে রাজা হৈল।
শুভদিনে মহারাজা মোহর মারিল।।"

---

* "যশধরমাণিক্য রাজা মথুরা গমন।
রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন।।"

যশোধরমাণিক্য খণ্ড — ৬৫ পৃষ্ঠা।

† "পনর শ সাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল।
শুভ দিনে মহারাজা মোহর মারিল।।
শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে।
আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে।।"

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড — ৬৬ পৃষ্ঠা।

(২৩২, ২৩৭, ২৩৬, ২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(১) অমর মাণিক্যের মুদ্রা, ১৪৯৯ শক (২) রাজধর মাণিক্যের মুদ্রা, ১৫০৮ শক। (৩) যশোধর মাণিক্যের মুদ্রা, ১৫২২ শক। (৪) কল্যাণ মাণিক্যের মুদ্রা ১৫৪৮ শক

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, —

"পনর শত পাচ্চল্লিশ শকে রাজা হৈল।
তদবধি নানা সুখে রাজ্য ভোগ কৈল।।"

প্রাচীন রাজমালা।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির বাক্য প্রাচীন রাজমালার উক্তির অনুরূপ; দুই স্থানেই মহারাজ কল্যাণ ১৫৪৫ শকে রাজ্যলাভ করিবার কথা লিখিত আছে। আমাদের সম্পাদ্য রাজমালার সহিত অন্যান্য গ্রন্থের এবম্বিধ অসামঞ্জস্যের বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রাচীন রাজমালা ও রাজাবাবুর বাড়ীর গ্রন্থে মহারাজ যশোধরমাণিক্যের রাজত্বের অবসান কালে (১৫৪৫ শক) হইতে, মহারাজ কল্যাণের রাজত্বকাল গণনা করা হইয়াছে, এবং মোগল-শাসনকাল উক্ত রাজার রাজত্ব মধ্যে ধরিয়া রাজ্য লাভের সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর আমাদের সম্পাদ্য গ্রন্থে মুসলমান শাসনকাল বাদ দিয়া ১৫৪৭ শকে রাজ্যলাভের সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। মুদ্রার প্রমাণের সহিত শেষোক্ত নির্দ্ধারণের যে এক বৎসর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হিসাবের গোলমালে ঘটিয়া থাকিবে।

কৈলাসবাবুর মতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে, কমিং সাহেব ও সেণ্ডিস্ সাহেবের মতে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ, ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৫০৭ শকাব্দ অভিন্ন; ইঁহারা আমাদের সম্পাদ্য রাজমালার নির্দ্ধারিত সময় গ্রহণ করিয়াছেন। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা ১৫৪৮ শকে মহারাজ কল্যাণ রাজ্যলাভ করা জানা যাইতেছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে ১৫৪৮ শকে (১০৩৬ ত্রিং) কল্যাণমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহা নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত মনে হয়। ইহা ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ১০০ পৃষ্ঠায় মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব ১৫৪৭ শকে আরম্ভ হইবার বিষয় লিখিত হইয়াছে। তৎকালে এই রাজার মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় রাজমালার বাক্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তদ্দরুণ মুদ্রার সাহায্যে নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত এক বৎসরের পার্থক্য ঘটিয়াছে।

১৫৮২ শকে (১০৭০ ত্রিং, ১৬৬০ খ্রীঃ) কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বের অবসান ও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে; —

"পনর শ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস শেষে।
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাশে।।
মঙ্গল বাসর তিথি কৃষ্ণা নবমীতে।
তিন দণ্ড রাত্রিতে রাজা স্বর্গ তাতে।।

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড — ৭৬ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা পাওয়া যাইতেছে, ১৫৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে মহারাজের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। রাজমালার মতে মহারাজ ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লীলা সম্বরণ করেন। তিনি ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,* ১৫৮২ শকে গোলোক-গত হইয়াছেন; সুতরাং মোটামুটি হিসাবে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরই দাঁড়াইতেছে।

মহারাজের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ পক্ষে রাজমালাকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে মহারাজ কল্যাণের রাজত্বকাল ৩৭ বৎসর।† শ্রেণীমলা গ্রন্থেও এই মত গৃহীত হইয়াছে, যথা—

"কল্যাণমাণিক্য রাজা বহু পুণ্যতর।
রাজত্ব করিলা তিনি সাত্রিশ বৎসর।।"

শ্রেণীমালা।

কৈলাসবাবুর মতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ হইতে ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর, মিঃ ই, এফ, সেণ্ডিস্ (E. F. Sandys) ও মিঃ কমিং (J. G. Cumming) সাহেবের মতে ১৬২৫ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজত্ব করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাসবাবুর বাক্যের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব; ১৫৪৮ শকে (১৬২৫ খ্রীঃ) আরম্ভ ও ১৫৮২ শকে (১৫৬০ খ্রীঃ) শেষ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব ৩৪ বৎসর নির্ণীত হইতেছে। রাজমালাকার ৩ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ৩৭ বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কৈলাসবাবু প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণ মহারাজের রাজত্বকাল যে ৩৪ বৎসর অবধারণ করিয়াছেন, আমাদের হিসাবের সহিত সেই অবধারণের একতা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকাল মুদ্রার সাহায্য গ্রহণে যেরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (১৫৪৮-১৫৮২ শক), তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না।

কল্যাণমাণিক্য তৃতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা। অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত পাঁচ জন রাজার বিবরণ লইয়া এই লহর রচিত হইয়াছে।

---

* "পনর শ দুই শক ভাদ্র মাস তাতে।
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড — ১৯ পৃষ্ঠা।

† "আশী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছিল।
সাত্রিশ বৎসর রাজা রাজত্ব করিল।।"
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড — ৭৮ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারা এই সকল রাজার রাজত্বকাল যেরূপ নির্দ্ধারিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

নাম		শকাব্দ	ত্রিপুরাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ
অমরমাণিক্য	...	১৪৯৯-১৫০৮	৯৮৭-৯৯৬	১৫৭৭-১৫৮৬
রাজধরমাণিক্য	...	১৫০৮-১৫২১	৯৯৬-১০০৯	১৫৮৬-১৫৯৯
যশোধরমাণিক্য	...	১৫২২-১৫৪৫	১০১০-১০৩৩	১৬০০-১৬২৩
মোগল শাসন	...	১৫৪৫-১৫৪৭	১০৩৩-১০৩৫	১৬২৩-১৬২৫
কল্যাণমাণিক্য	...	১৫৪৮-১৫৮২	১০৩৬-১০৭০	১৬২৫-১৬৬০

উজীরভবনে রক্ষিত তালিকায় তৃতীয় লহরের অন্তর্নিবিষ্ট রাজগণের যে রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রমাদপূর্ণ; সুতরাং এস্থলে সেই তালিকা অবলম্বনের সুবিধা ঘটিল না। 'ত্রিপুর-বংশাবলী' পুস্তিকায় এতৎসংসৃষ্ট অংশের পত্র বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদিগকে তৎসাহায্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

ফুলকুমারী

রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমরমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে; —

"ফুল কোয়ড়ি ছড়া নাম তাহার নিকট।
তার তীরে দুই বৃক্ষ আছিলেক বট।।" ইত্যাদি।

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২২ পৃষ্ঠা।

'ফুলকুমারী' শব্দকে এস্থলে 'ফুল কোয়ড়ি' করা হইয়াছে। ১৬০২ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুন মাসে, তদানীন্তন সহকারী রাজস্ব-সচিব স্বর্গীয় কিশোরীমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সহযাত্রী হইয়া সরকারী কার্য্যোপলক্ষে প্রথম উদয়পুর দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তৎকালে নগরীর চতুর্দ্দিক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায়, আশপাশের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি সম্যকরূপে দেখা যাইতে পারে নাই। কিন্তু, সেই যাত্রায়ই ফুলকুমারী মৌজা, ফুলকুমারী ঘাট, ফুলকুমারী ছড়া, ফুলকুমারী কুঞ্জ প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিয়া, 'ফুলকুমারী' নামোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলাম। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানা গেল, খিল পাড়া গ্রামে অতি বৃদ্ধ একটী মুসলমান বাস করিতেছেন, তিনি উদয়পুরের অনেক পুরাতন ঘটনার সংবাদ অবগত আছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয়ের তথ্য জানা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি চলচ্ছক্তিবিহীন স্থবির।

রাজস্ব-সচিব মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে অনেক চেষ্টার পর, পাল্কী দ্বারা বৃদ্ধকে আমাদের অবস্থিতি স্থানে আনা হইল। তাঁহার নাম মহম্মদ হাছিম, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের কাছাকাছি ছিল, তিনি শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ লাহোর দেশ হইতে সমাগত বলিয়া, সমাজে এই বংশের সম্মান যথেষ্ট আছে। এই বৃদ্ধ উদয়পুরের অনেক প্রাচীন কাহিনী বলিলেন, সেই সুযোগে আমি অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, রাজমালা সম্পাদন কার্য্যে তাহা প্রয়োজনে লাগিতেছে।

'ফুলকুমারী' শব্দ উদ্ভবের কোন বিবরণ জানা থাকিলে তাহা বলিবার নিমিত্ত বৃদ্ধকে অনুরোধ করা হইল। তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর বলিলেন, "এতৎ সম্বন্ধীয় একটী কিম্বদন্তী আমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।" এই ভূমিকার পর বৃদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

ফুলকুমারী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। উদয়পুর নগরীর উপকণ্ঠস্থিত বর্ত্তমান ফুলকুমারী মৌজায় তাঁহার বাড়ী ছিল। একদা মহারাজ (উক্ত কুমারীর পিতা) কুমারীর বাস ভবনের সন্নিহিত স্থানে একটী দীর্ঘিকা খননকার্য্য আরম্ভ করেন। খনিত মৃত্তিকা কুমারীর বাড়ীর সীমান্তবর্ত্তী স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। রাজ-জামাতা অতিশয় উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ীর উপর মৃত্তিকা ফেলিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, খননকারীদিগকে সেই স্থানে মৃত্তিকা ফেলিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাহারা কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। এই সংবাদ রাজার গোচর হইলে, তিনি জামাতার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, — "যে স্থানে মাটি ফেলা হইতেছে, সেই স্থানেই ফেলা হইবে, এবিষয়ে কাহারও আপত্তি শুনা যাইবে না।" রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং মৃত্তিকা খননকারীদিগকে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজ-জামাতার ক্রোধের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, যেখানে মাটি ফেলা হয়, তিনি সেই স্থানেই যাইয়া বসিয়া পড়িতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, — "যদি এখানে মাটি ফেলাই রাজার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে আমার মাথার উপর ফেল, আমি কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিব না।" আবার কার্য্য বন্ধ হইল, — রাজদরবারে সংবাদ গেল। জামাতার অবাধ্যতা দর্শনে মহারাজ কোপাবিষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন, — "জামাতাকে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলা হউক, তদনুসারে সে স্থান ত্যাগ না করিলে, তাহার উপরেই মৃত্তিকা ফেলিতে হইবে।" জামাতাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, এবম্বিধ আদেশ অবগত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না, পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া মৃত্তিকার চাপে নরলীলা সাঙ্গ করিলেন।

এই দুর্ঘটনায় সদ্য-শোকসন্তপ্তা রোরুদ্যমানা রাজকন্যা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন — "আমার সমস্ত সুখ-শান্তি

চিরজীবনের তরে নির্ম্মূল হইল। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অধিকতর দুঃখের কথা।"

কন্যার দুর্গতি দর্শনে পিতার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার নিমিত্ত তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া, কুমারীকে প্রবোধ বলিলেন — "মা, তোমার স্বামীর অবাধ্যতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সে জন্য তুমি দুঃখিতা হইও না, তোমার নাম যাহাতে চিরস্মরণীয় হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

পতিহন্তা পিতার বাক্যে রাজকন্যা প্রবুদ্ধা হইতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় ভবনের সন্নিহিত গোমতী নদীতে নিমজ্জিতা হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এই ঘটনায় রাজা অত্যন্ত দুঃখিত এবং স্বীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য এত অনর্থ ঘটিল দেখিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কন্যার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, কন্যার বসতি স্থানের নাম ফুলকুমারী মৌজা, তাঁহার জীবন বিসর্জ্জনের ঘাটের নাম ফুলকুমারী ঘাট, তৎসন্নিহিত একটী ছড়ার নাম ফুলকুমারী ছড়া এবং একটী মনোজ্ঞ টীলায় অবস্থিত কুঞ্জবনের ফুলকুমারী কুঞ্জ নাম প্রদান করিলেন। তদবধি এইসকল নাম অক্ষুণ্ণ থাকিয়া কুমারীর স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

বদর মোকামের জনৈক বৃদ্ধ খাদিমও এই কিম্বদন্তী সমর্থন করিয়াছিলেন। ফুলকুমারী কোন্ রাজার কন্যা, পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ বা খাদিম তাহা বলিতে পারেন নাই। কিম্বদন্তী কালপরম্পরা রঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ভিত্তিহীন হইবার নহে। ত্রিপুরায় প্রচলিত অনেক কিম্বদন্তীর সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলেও গ্রাম, নদীর ঘাট, পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী প্রভৃতির 'ফুলকুমারী' নামকরণ দ্বারা, এই নামে এক রাজকুমারী থাকিবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি কোন রাজার কন্যা ছিলেন, অনুধাবনা দ্বারা তাহাও নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকায় পাওয়া গিয়াছে, রাজকুমারীর বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে সরোবর খনিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার বাসস্থানসহ একটী ভূ-খণ্ডের 'ফুলকুমারী গ্রাম' নাম দেওয়া হইয়াছিল, সেই নাম অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায়, একমাত্র ধন্যসাগর বা ধনীসাগর ব্যতীত ফুলকুমারী মৌজায় অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য জলাশয় নাই। তাহা মহারাজ ধন্যমাণিক্যের খনিত। পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী অবিশ্বাস না করিলে, এই সরোবর খননোপলক্ষেই আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং ফুলকুমারী মহারাজ ধন্যমাণিক্যের দুহিতা ছিলেন, এরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে এতদতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত রাজা এবম্বিধ নিষ্ঠুর ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, একথা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু রাজ-চরিত্র

নিতান্তই দুর্জ্ঞেয়, কখন কি ভাব ধারণ করে, বুঝিয়া উঠা সহজসাধ্য নহে; নীতিশাস্ত্রও ইহাই বলিয়াছেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ধন্যমাণিক্যের ন্যায় প্রতিভাশালী রাজারও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হওয়া বিচিত্র নহে।

হস্তী-বিজ্ঞান
(দ্বিতীয়াংশ)

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে (২১৫-২২৯ পৃষ্ঠা) হস্তী-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেক কথা বলিবার আছে। এস্থলে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করা হইবে।

প্রাচীন মতে হস্তীর লক্ষণ সম্বন্ধীয় আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তৎকালে বলা হইয়াছিল, "প্রাদেশিক প্রথানুসারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, শুণ্ড, দন্ত, নখ ও পুচ্ছ ইত্যাদির লক্ষণানুসারে হস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা নির্ণয় করা হয়।" সর্ব্বাগ্রে এই প্রাদেশিক প্রথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে; ইহা হস্তীবিষয়ক ত্রিপুরা অঞ্চলের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলম্বনে সংগৃহীত হইয়াছে।

মস্তক

যে হস্তীর (বিশেষতঃ গুণ্ডার) অবয়বের তুলনায় মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং গমনকালে মস্তক উত্তোলন করিয়া চলে, তাহাই সুলক্ষণযুক্ত হস্তী। ইহা সুদৃশ্যও বটে। অবয়বের তুলনায় মস্তক ছোট হইলে, তাহা হস্তীর দুর্ব্বলতার লক্ষণ; ইহা দৃষ্টি-কুৎসিতও বটে।

তালু বা টাক্‌রা

হস্তীর তালু বা টাক্‌রাকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা — সিয়া তালু, গোলাপ তালু, ছিটা তালু ও কৃষ্ণ তালু। যে হস্তীর তালু শ্বেতাভ কিম্বা গোলাপাভ এবং অন্যবিধ দাগ বিবর্জ্জিত, তাহাকে গোলাপ তালু বলা হয়। গোলাপ-তালুবিশিষ্ট হস্তী সুলক্ষণযুক্ত এবং প্রভুর কল্যাণদায়ক। যে তালু শ্বেতাভ বা গোলাপী আভাযুক্ত বর্ণের উপর কাল ছিট (বিন্দু বিন্দু চিহ্ন) বিশিষ্ট, তাহাকে ছিটা তালু বলে। ছিটা তালুর হস্তী মধ্যম (উৎকৃষ্ট বা নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে) লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিগণ্য। কৃষ্ণ বর্ণের তালুতে সাদা ছিট থাকিলে তাহাকে সিয়াতালু বলে। সিয়াতালুবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং প্রভুর অনিষ্টকারী হইয়া থাকে।
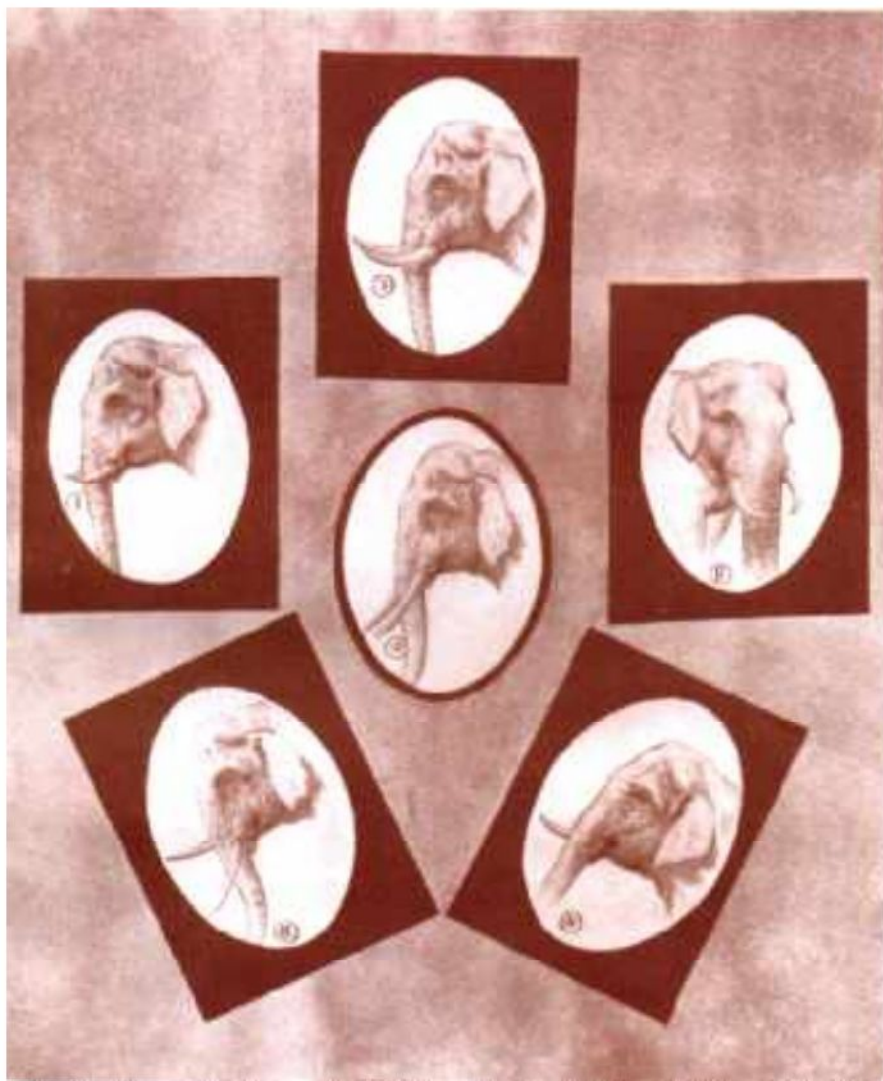
গজ-দন্তের আদর্শ
(১) পালং দাঁত। (২) মগী দাঁত। (৩) পাতাল দাঁত। (৪) শূকর দাঁত।
(৫) স্বর্গ-পাতাল দাঁত। (৬) এক দন্ত (গণেশ দাঁত)

যে তালু নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণ তালু বলে। কৃষ্ণতালুযুক্ত হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা কুলক্ষণাবিষ্ট, এবং প্রভুর অশেষ অশুভকারী হয়।

চক্ষু

হস্তীর চক্ষু সাদা আভাবিশিষ্ট হইলে তাহাকে 'করঞ্জা চক্ষু' বলা হয়। এই প্রকারের চক্ষু মন্দ লক্ষণাক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত। তদ্ভিন্ন অন্য বর্ণবিশিষ্ট চক্ষু ভাল লক্ষণযুক্ত বলিয়া ধরা হয়। যে হস্তীর দৃষ্টি সরল, তাহাই সুলক্ষণযুক্ত। তির্য্যক্ দৃষ্টি, তল চক্ষু (নিম্ন দৃষ্টি) ঘূর্ণায়মান দৃষ্টিবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং বিশ্বাসের অযোগ্য।

দন্ত

হস্তীর দাঁত সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; — পালং দাঁত, পাতাল দাঁত, মগী দাঁত, শূকর দাঁত, স্বর্গ-পাতাল দাঁত ও গণেশ দাঁত।

হস্তীর দুইটী দাঁত সমান, চেয়ারের হাতের ন্যায় সমবাঁকবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ হইলে তাহাকে পালং দাঁত বলে। এই শ্রেণীর দন্ত হস্তীর সুলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত এবং সুদৃশ্য। পালং দাঁতের অনুরূপ সমান বাঁকবিশিষ্ট খাটো দাঁতকে মগী দাঁত বলা হয়, এতদনুরূপ দন্তবিশিষ্ট হস্তী মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে; ইহা দৃশ্যতঃ কুৎসিত নহে। যে দন্ত পরস্পর সম্মুখের দিকে বাঁকা, তাহা শূকর দাঁত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ দন্তযুক্ত হস্তী সুদৃশ্য না হইলেও লক্ষণ সম্বন্ধে মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। যে দাঁত নীচের দিকে সোজা নামে, তাহা পাতাল দাঁত, একটী নীচু ও একটী উঁচু ও একটী উঁচু হইয়া আড়ভাবে দন্ত বাহির হইলে তাহাকে স্বর্গ-পাতাল দাঁত বলে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর দন্তবিশিষ্ট হস্তী কুলক্ষণাক্রান্ত এবং দেখিতে কুৎসিত। এক দন্তবিশিষ্ট হস্তীকে 'গণেশ' বলা হয়, এই প্রকারের হস্তী শুভদায়ক, দন্তটী বাম দিকে থাকিলে অধিকতর সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

দন্তের বর্ণ সম্বন্ধেও বিচার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের দন্ত সুলক্ষণাক্রান্ত এবং লাল আভাবিশিষ্ট দন্ত কুলক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। মোটা দন্তবিশিষ্ট হস্তী শক্তিশালী হইয়া থাকে।

গজদন্ত প্রসিদ্ধ পণ্যদ্রব্য; বণিকগণ দ্বারা দন্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার অগ্রভাগস্থ নিরেট অংশ 'আকাশ', মধ্য ভাগের ফাঁপা অংশ 'চুড়িদার', এবং গোড়ার পাতলা অংশ "চীনাইবার" নামে অভিহিত হয়। দন্তের অগ্রভাগই অধিক মূল্যবান এবং সমধিক কার্য্যোপযোগী।

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল হইতে গজদন্তের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা বিবিধ কারুকার্য্যখচিত বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশে গজদন্তের দ্বারা যে-সকল কারুকার্য্যখচিত বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহা সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আদরণীয় হইতেছে। প্রাচীন শিল্পীগণ দন্তের পরিসর হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার উপায় জানিতে, বর্ত্তমান কালে সেই কৌশল কাহারও জানা নাই। থিওফিলাস নামক জনৈক প্রাচীন পণ্ডিতের মতে গজদন্তকে ক্ষার, লবণ, গন্ধক দ্রাবক (Sulphuroc Acid) ও শিরকায় (Vinegar) ভিজাইয়া রাখিলে তাহা মোমের ন্যায় নরম হয়, তখন উহার আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি কিম্বা ইচ্ছানুরূপ আকার-বিশিষ্ট করা সহজ হয়। এবং তাহাকে কেবল শিরকায় ভিজাইলে পুনর্ব্বার কঠিন হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা হইয়াছে কি না অবগত নহি। রাসায়নিক ক্রিয়া অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ; কি উপায়ে বস্তুর কোন্ অবস্থা ঘটে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সুদৃঢ় গজদন্ত ভেকের শ্বাসে যেরূপ ক্ষয় হয়, তাহা দর্শন করিলে সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইবে।

ত্রিপুরায় গজদন্ত দ্বারা, কারুকার্য্যখচিত নানাবিধ ব্যবহার্য্য ও প্রয়োজনীয় বস্তু নির্ম্মিত হয়। তথাকার রাজসিংহাসন গজদন্তখচিত। নিরেট দন্তদ্বারা বসিবার আসন (চেয়ার) প্রস্তুত হয়। হস্তিদন্তের সূক্ষ্ম বেতি দ্বারা পাটী বয়ন করা হয়। সতরঞ্চ খেলার গুঁটি হস্তিদন্তে নির্ম্মিত হইতেছে। বিবিধ প্রকারের খেলনা, প্রতিকৃতি ইত্যাদি নানাপ্রকারের সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রাচীনকাল হইতে গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।

পৃষ্ঠ

হস্তীর পৃষ্ঠদেশের দাঁড়া (মেরুদণ্ড) অল্প বাঁকা এবং পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলে তাহাকে 'ছম্বল পীঠ' বলে। এই প্রকারের পৃষ্ঠবিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা আরামদায়ক। এই শ্রেণীর হস্তী উত্তম এবং সুলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বিশেষ আদরণীয়।

পৃষ্ঠের দাঁড়া ধনুকের ন্যায় বাঁকা এবং পীঠ অপ্রশস্ত হইলে, তাহাকে 'ছত্রখুম পীঠ' বলা হয়। এবম্বিধ পৃষ্ঠবিশিষ্ট হস্তী দৃশ্যতঃ কুৎসিত এবং মন্দ লক্ষণাক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত। ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ আরামদায়ক নহে। সোজা মেরুদণ্ড, হস্তীর দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

উদর

হস্তীর উদরের দুই পাশে দাঁড়ার ন্যায় দুইটী মাংসপিণ্ড সম্মুখের পায়ের পশ্চাৎ ভাগ হইতে পেছনের পায়ের সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান অবস্থায় থাকে, ইহাকে 'বাত্তি' বলা হয়। এই প্রকারে দুই বাত্তিবিশিষ্ট হস্তী সুলক্ষণযুক্ত এবং প্রভুর মঙ্গলকারী।

কোন কোন হস্তীর পূর্ব্বোক্তরূপ উদরের দুই পাশে দুইটী বাত্তি না হইয়া, উদরের মধ্য ভাগে লম্বমান অবস্থায় একটী মাত্র বাত্তি থাকে। একবাত্তি যুক্ত হস্তী

গজদন্তের কারুশিল্পের আদর্শ।

(১) গজদন্ত নির্ম্মিত পুতুল, খেলনা ও কারুকার্য্যখচিত গজদন্ত।

(২) গজদন্ত নির্ম্মিত আসন (চেয়ার)।

(৩) গজদন্তের বেতিদ্বারা তৈয়ারী প্রমাণ পাটী।

(৪) গজদন্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি।

(৫) গজদন্ত নির্ম্মিত ঘোড়া-সোয়ার মূর্ত্তি।

(৬) গজদন্ত নির্ম্মিত নর-কঙ্কাল।

মেষ পৃষ্ঠের আদর্শ।

(১) ধনুক পীঠ

(২) ছত্রধুন পীঠ।
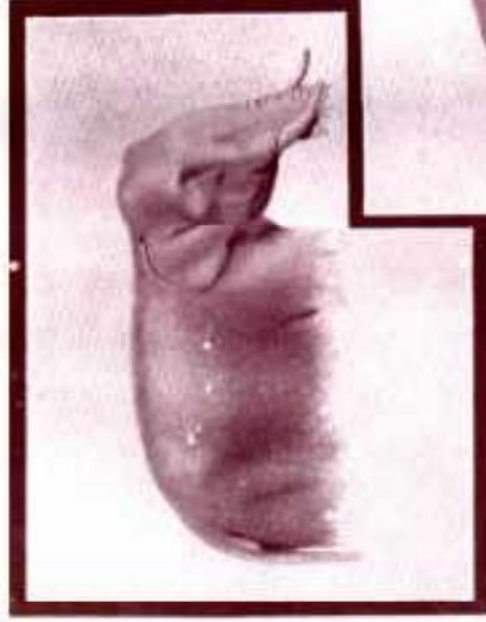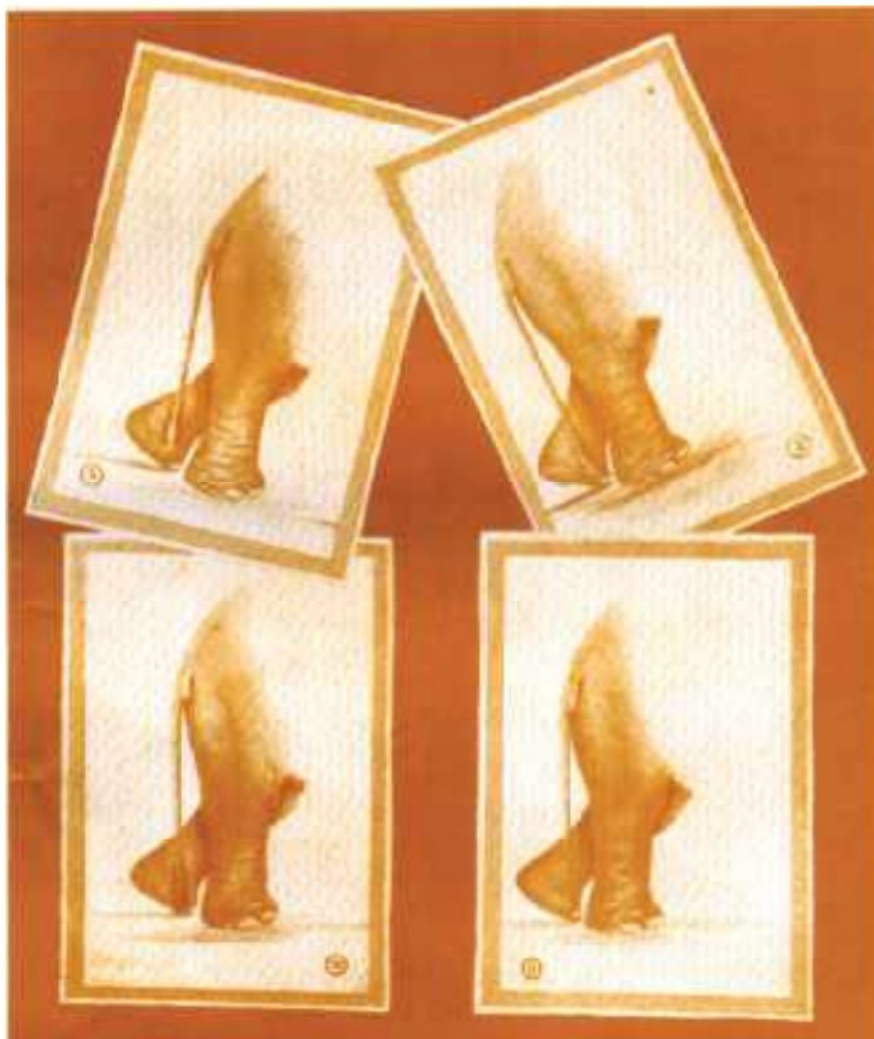
(লাঙ্গুলের অগ্রভাগের) হস্তীর দোমের আদর্শ।
(১) পাণ্ডখী দোম। (২) বালখণ্ডী দোম। (৩) ঝাড় দোম। (৪) বাড়িয়া।

দুর্লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রভুর অমঙ্গলকারী। এই শ্রেণীর হস্তী দৃশ্যতঃ কুৎসিত হইয়া থাকে।

নখ

যে হস্তীর চারি পায়ে সর্ব্বসুদ্ধ ১৮টী নখ থাকে, সেই হস্তী সুলক্ষণবিশিষ্ট এবং প্রতিপালকের শ্রীবর্দ্ধক। ১৬ কি ১৭ নখবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট নখ শুভ এবং কাল বর্ণের নখ অশুভ চিহ্নমধ্যে পরিগণিত হয়।

দোম (লাঙ্গুলের অগ্রভাগ)

হস্তীর লেজের অগ্রভাগকে প্রাদেশিক ভাষায় 'দোম' বলা হয়। হস্তীর দোম আকৃতিভেদে নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লাঙ্গুলের অগ্রভাগের দুইদিকে ঘন লোমাবলী জন্মিয়া অগ্রভাগটী চেপ্টা আকার ধারণ করিলে, তাহাকে 'পাঙ্খী দোম' বলে। এই শ্রেণীর লেজবিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য এবং সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। পুচ্ছের অগ্রভাগের দুই পার্শ্বে অল্প লোম থাকিলে তাহাকে 'বালখণ্ডী দোম' বলা হয়, এবম্বিধ দোমযুক্ত হস্তী মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। লেজের অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে লোম নির্গত হইয়া গোলাকার ধারণ করিলে, তাহাকে 'ঝাড়ু দোম' বলা হয়। এই প্রকারের দোমবিশিষ্ট হস্তী নিকৃষ্ট এবং দোষযুক্ত বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে। যে হস্তীর লেজের অগ্রভাগ নাই, তাহাকে 'বাড়িয়া' বলে। বাড়িয়া হস্তী কুদৃশ্য হইলেও কুলক্ষণাক্রান্ত মধ্যে গণনীয় নহে। সময় সময় বাঁশের ধারাল ফাটা অংশের দ্বারা কিম্বা অন্যবিধ কারণে হস্তীর লেজের অগ্রভাগ কর্ত্তিত হয়। দুই হস্তীর মধ্যে পরস্পর কলহ হইলে অনেক সময় একে অন্যের লেজ দাঁতদ্বারা কাটিয়া দেয়, সাধারতণঃ এই সকল কারণেই হস্তী 'বাড়িয়া' হইয়া থাকে।

বর্ণ

সাধারণতঃ কৃষ্ণ বর্ণের হস্তী সুদৃশ্য এবং কল্যাণকর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। তাম্র-আভাবিশিষ্ট বর্ণকে হস্তীর মন্দ লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। মসৃণ চর্ম্মবিশিষ্ট হস্তী স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে।

গজমুক্তা

মুক্তা একমাত্র হস্তীতেই জন্মে, এমন নহে। সচরাচর শুক্তিমুক্তাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আরও

কোন কোন জন্তুতে কিম্বা উদ্ভিজ্জাদি বস্তুতে মুক্তা জন্মিয়া থাকে। রাজ নির্ঘণ্টের মতে, ---

"মাতঙ্গোরগমীন-পোত্রি শিরসস্ত্বক্-সার-শঙ্খাম্বুভৃচ্ছুক্তীনামদরাচ্চ মৌক্তিক মণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা।।" রাজনির্ঘণ্ট।

গরুড়পুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, যথা, ---

"দ্বিপেন্দ্র জীমূত বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণু জানি।
মুক্তা ফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভুরি।।"

গরুড়পুরাণ --- ৬৯ অধ্যায়।

বৃহৎসংহিতার মতে হস্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, অভ্র, বাঁশ, তিমিমৎস্য, এবং শূকর হইতে মুক্তার জন্ম হয়। শুক্রনীতির মতে — মৎস্য, সর্প, শূকর, শঙ্খ, বাঁশ, মেঘ এবং শুক্তি, এই সকলে মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অগ্নিপুরাণের মতে — শুক্তি, শঙ্খ, নাগদন্ত, কুম্ভ, শূকর, মৎস্য, বংশ ও মেঘ হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়।

যুক্তিকল্পতরুর মতে হস্তী, সর্প, শূকর, ও মৎস্যের মস্তকে এবং বংশ, ঝিনুক ও শঙ্খের উদরে মুক্তার উদ্ভব হয়, যথা ঃ---

"গজাহিকোল মৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তা ফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সার শুক্তি শঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা ফলোদ্ভবঃ।।"

যুক্তিকল্পতরুঃ।

ভাব প্রকাশ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, এস্থলে একমাত্র গজমুক্তার বিষয়ই আলোচ্য। শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মতে হস্তী, সর্প ও শূকরাদির মস্তকে মুক্তা উদ্ভবের কথা থাকিলেও হস্তীর মস্তকে মুক্তা জন্মিবার নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং আধুনিক পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেন না। গজদন্তই মুক্তার আকর স্থান। অদ্যাপি যে কয়টা গজমুক্তা দেখা গিয়াছে এবং যে সকলের বিবরণ শুনা গিয়াছে, তৎসমস্ত হস্তীর দন্তেই পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থের মতে হস্তীর কুম্ভ এবং দন্তকোষ মুক্তা উৎপত্তির স্থান।

চাণক্য বলিয়াছেন — "মৌক্তিকং ন গজে গজে" অর্থাৎ সকল হস্তীতেই মুক্তা জন্মে না। কোন্ প্রকারের হস্তীতে মুক্তা পাওয়া যায়, যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে; —

"মাতঙ্গজা যেতু বিশুদ্ধ বংশ্যাস্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকং তেষু বৃত্তং আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্।।
বক্ষ্যে গজ পরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্ব্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধ মুদীস্যতে।।

ব্রাহ্মণ পীত শুক্লন্তু ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীতশ্যামন্তু বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রংস্যাৎ পীত নীলকম্।।"

যুক্তিকল্পতরু।

মর্ম্ম ঃ— যে-সকল হস্তী বিশুদ্ধ বংশজাত, তাহাদের মস্তকে মুক্তা উৎপন্ন হয়। কোন কোন হস্তীতে সুগোল, ঈষৎ পীতাভ এবং ছায়া (কান্তি)* বিহীন মুক্তা জন্মে। হস্তীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণী বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি প্রকার (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ রক্তবর্ণ, বৈশ্য জাতীয় মুক্তা পীতাভ শ্যামবর্ণ এবং শূদ্র জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ নীলবর্ণ হওয়া থাকে।

বৃহৎ সংহিতার মতে রবি অথবা সোমবারে পুষ্যা কিম্বা শ্রবণা নক্ষত্রে যে-সকল ঐরাবত জাতীয় হস্তীর জন্ম হয় এবং উত্তরায়ণ কালে, চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে যে-সকল ভদ্র জাতীয় হস্তী জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের দন্তকোষে এবং কুম্ভে অধিক পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, সিংহল, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রক, তাম্রপল্লী, পারসব, কৌবের, পাণ্ড্যবাটক এবং হৈম প্রভৃতি দেশে গজমুক্তা উৎপন্ন হয়। দেশভেদে, মুক্তার আকার, বর্ণ এবং ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটিবার কথাও বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে।

মুক্তা পরীক্ষা

এই মহার্ঘ রত্ন শুভ এবং অশুভ লক্ষণাক্রান্ত আছে, সেই সকল দোষ বা গুণ এবং মুক্তার জ্যোতিঃ, বর্ণ ইত্যাদি পরীক্ষণীয় বিষয়। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, গরুড় পুরাণ, শুক্রনীতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই রত্ন পরীক্ষার উপায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত ইহার লক্ষণাদি নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এস্থলে তদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। সুলক্ষণাক্রান্ত মুক্তা ধারণের শুভ ফল বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক কথা পাওয়া যায়। মুক্তা কেবল বিলাসদ্রব্য নহে, উপকারীও বটে।

---

* মুক্তার বর্ণস্ফুরণের (জ্যোতির) নাম ছায়া। শাস্ত্রে চারি প্রকার ছায়ার উল্লেখ পাওয়া যায় — পীত, মধুর, শুভ্র ও নীল। পীত ছায়া লক্ষ্মীযুক্তা, মধুর ছায়া বুদ্ধিদায়িকা, শুক্ল ছায়া যশোবর্দ্ধনকারিণী এবং নীল ছায়া সৌভাগ্যদাত্রী।

"চতুর্দ্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্ব পরীক্ষকৈঃ।।
পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধি বর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী।।"

যুক্তিকল্পতরু।

অনেক সময় মুক্তা-ব্যবসায়িগণ কৃত্রিম মুক্তা দ্বারা গ্রাহকদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণে মুক্তার কৃত্রিমতা পরীক্ষার প্রণালী প্রদান করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল জাতীয় মুক্তাই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। শুক্তি-মুক্তা পরীক্ষার নিমিত্ত এই প্রক্রিয়া সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে গরুড়পুরাণের বাক্য প্রদান করা যাইতেছে, —

> "যস্মিন্ কৃত্রিম সন্দেহঃ কচিদ্ভবতি মৌক্তিকে।
> উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে।।
> ব্রীহিভির্মদ্দনীয়ং বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
> যত্তুনা যাতি বৈবর্ণং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্।।"

মর্ম্ম ঃ— কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলে, লবণযুক্ত উষ্ণ জল বা ঘৃতে একরাত্রি নিমজ্জিতাবস্থায় রাখিয়া দেখিবে; অথবা মুক্তা শুষ্ক বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্যদ্বারা মর্দ্দন করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

যুক্তিকল্পতরু মতে — লবণ ও ক্ষারযুক্ত গোমূত্রে মুক্তা ভিজাইয়া রাখিয়া, কিম্বা তাহা অগ্নিতাপে দিয়া, পরে ধান্য সহিত মর্দ্দন করিলে কৃত্রিম মুক্তা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং অকৃত্রিম হইলে তাহার কান্তি উজ্জ্বল হইবে।

শুক্রনীতিতে পাওয়া যায় — মুক্তাকে জলমিশ্রিত লবণ ও ক্ষারপূর্ণ পাত্রে কিম্বা ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে শালী ধান্যের তুষদ্বারা মর্দ্দন করিবে। ইহাতে বিকৃত না হইলে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

যে-সকল দেশ গজমুক্তার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত গজেও মুক্তা জন্মিয়া থাকে। তথাকার উৎপন্ন গজমুক্তা প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট দেখা যায়; তদ্দেশে সুগোল মুক্তা নিতান্ত দুর্লভ, এবং তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না।

গজমুক্তার উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টতা ও দোষ-গুণ নিরূপণ, মূল্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বলিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না। ভাবপ্রকাশ, রাজবল্লভ, যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা, শুক্রনীতি, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও তন্ত্রসার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে মুক্তা সম্বন্ধীয় বিবরণ পাওয়া যাইবে।

হস্তীর উপকারিতা

হস্তীর দ্বারা মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে হস্তী যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্র বাহুল্যের যুগে গজারোহী যোদ্ধার বিপদাশঙ্কা অধিক বলিয়া, হস্তীদ্বারা যুদ্ধপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তু বহনাদি কার্য্যে এখনও স্থলবিশেষে হস্তী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য অরণ্য হইতে সুবৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া নেওয়া এবং বস্তুজাত ও মনুষ্য বহনাদি কার্য্য হস্তীদ্বারা সর্ব্বদাই সাধিত হইতেছে। শিকার কার্য্যে হস্তী

প্রধান অবলম্বন। পালিত হস্তীর সাহায্য ব্যতীত বন্য হস্তী ধৃত ও প্রথমাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব। উৎসবাদি উপলক্ষে হস্তী শোভা-যাত্রার প্রধান অঙ্গ। অনেকে নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন জন্য হস্তী ভাড়া প্রদান দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এদ্ব্যতীত হস্তীদ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকারে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পালিত হস্তী প্রায় সমস্তই অরণ্য হইতে ধৃত হইতেছে। সচরাচর পালিত হস্তীর বাচ্চা জন্মিতে দেখা যায় না। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস, হস্তী পালন করিলে কখনও তাহার বাচ্চা হয় না; এই বিশ্বাস সমূলক নহে। পালিত হস্তীকে সর্ব্বদা মুক্তাবস্থায় জঙ্গলে চরিতে দিলে, তাহার বাচ্চা জন্মিয়া থাকে। ত্রিপুর রাজ্যে সচরাচরই পালিতাবস্থায় হস্তিনীকে বাচ্চা প্রসব করিতে দেখা যায়। কোন কোন হস্তিনী একাধিকবার সন্তান প্রসব করিতেছে।

হস্তী ধৃত

পালিত হস্তীর বাচ্চা জন্মিলেও তাহার সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজের অভাব মোচন হইতে পারে না। পালিত হস্তীর অধিকাংশই অরণ্যজাত, তাহা ধৃত করিয়া পোষ মানাইয়া ব্যবহারে আনিতে হয়।

হস্তী ধৃত করিবার প্রণালী সকল দেশে এক রকম নহে। আবার কোন দেশেই সকল সময় এক প্রণালী অনুসৃত হয় না, কার্য্যদক্ষতা ও বহুদর্শিতার ফলে ক্রমশঃ সুবিধাজনক নিয়ম অবলম্বিত হইতেছে। তাহার ফলে পূর্ব্ব নিয়ম আংশিক পরিবর্ত্তিত হওয়া অনিবার্য্য। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সময় হস্তী ধৃত করিবার চারি প্রকার প্রণালী প্রচলিত থাকিবার বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে এ দেশে সেই সকল প্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে।

অধুনা 'খেদা' প্রণালী হস্তী ধৃত করিবার প্রধান উপায়। হস্তীযূথকে খেদাইয়া আনিয়া আবদ্ধ করা হয় বলিয়া এই প্রণালী 'খেদা' নামে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে খেদা দুই প্রণালীতে হইয়া থাকে; প্রধান প্রণালীর নাম 'মেলা খেদা'; দ্বিতীয় প্রণালীকে 'বাংড়ি খেদা' বলে। এতদ্ব্যতীত ফাঁশী, পরতালা ও ফাঁদ দ্বারাও হস্তী ধৃত করা হয়। এই সকল উপায়ের কার্য্যপ্রণালী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মেলা খেদা

খেদার কর্ম্মচারীর প্রকার ও সংখ্যা

ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত নিয়মানুসারে মেলা খেদা দ্বারা হস্তী ধৃত করিতে ন্যূনকল্পে আড়াইশত লোকের প্রয়োজন হয়। তদপেক্ষা অধিক লোক লইলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে পাঞ্জালী, মাঝি, সরদার, কুলি বা গড়ুয়া প্রধানতঃ এই কয়টী শ্রেণী থাকে।

ইহাদের সকলের উপরে যে ব্যক্তি কার্য্য করে, ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে তাহারা 'মোক্তার' ও দক্ষিণ অঞ্চলে 'জমাদার' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ একজন জমাদার বা মোক্তার, ১০ জন মাঝি, ১ জন হিসাব-রক্ষক ও ১ জন মৌলবী নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক মাঝির অধীনে বিশজন হইতে ত্রিশজন পর্য্যন্ত কুলি বা গড়ুয়া থাকে, এবং সরদারের অধীনে ১০ জন সিপাহী রাখা হয়। প্রত্যেক খেদায় একজন ডাক্তার নিযুক্ত থাকে। ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর অঞ্চলস্থ শ্রীহট্ট জেলা বাসী এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম নিবাসী মুসলমানগণ খেদার কার্য্যে সুনিপুণ বিধায় সাধারণতঃ তাহাদের দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কৈলাসহর বিভাগেও এই কার্য্যের লোক পাওয়া যায়।

কর্ম্মচারী নিয়োগ

খেদার কার্য্যে যে-সকল লোক লওয়া হয়, অনেকস্থলে তাহাদিগকে তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে হয়। তিন মাসের মধ্যে খেদার কার্য্য শেষ হইলে তাহাদিগকে আর বেতন দিতে হয় না, বেতন ব্যতীত আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয়। তিন মাসের ন্যূন সময়ে খেদার কার্য্য শেষ হইলে, কর্ম্মচারিগণ অগ্রিম গৃহীত অতিরিক্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু তিন মাসের অধিক সময় কার্য্য করাইলে, অতিরিক্ত কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দিতে হয়। প্রত্যেক মাঝিকে একরারনামায় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা প্রদান করা হয়।

খেদার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ

লোক নিযুক্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আহারোপযোগী রসদ সংগ্রহ করিয়া কোন সুবিধাজনক স্থানে মজুদ রাখিতে হয়। চাউল, ডাল, তৈল, লবণ, হরিদ্রা, মরিচ, পলাণ্ডু, রসুন, তামাক, রাবগুড় ও শুষ্ক মৎস্য — সাধারণতঃ এই সংগ্রহ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সময় প্রত্যেক মাঝিকে লোহার কড়াই ও বাল্‌তি প্রদান করিতে হয়, কার্য্যান্তে বিদায় হইবার সময় কর্ম্মচারিগণ তাহা ফিরাইয়া দেয়। রসদ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে খেদার কার্য্যোপযোগী দাও, কুড়াল, খন্তা ও কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়।

ঝাপমাঝি ও পাঞ্জালী

পূর্ব্বোক্ত ১০ জন মাঝির মধ্যে একজনের উপাধি 'ঝাপমাঝি'। কোঠের ঝাপ (দরজা) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ইহার করণীয়। ইহার অধীনে যে-সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে 'পাঞ্জালী' বলে। ইহারাই সর্ব্বাগ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, হস্তীর গতিবিধির সন্ধান নিয়া থাকে। হস্তিযূথের পাঁজাল অনুসন্ধানকারী বলিয়াই ইহারা 'পাঞ্জারী' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

সরদার ও সিপাহি

সরদারের অধীনস্থ সিপাহিগণ বন্দুকধারী। প্রত্যেক মাঝির অধীনস্থ গড়ুয়া-গণের তত্ত্বাবধানের জন্য এক একজন সিপাহী নিযুক্ত থাকে। কোন মাঝি বা তাহাদের অধীনস্থ গড়ুয়া পলাইয়া না যায়, কার্য্যে

অবহেলা না করে, রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া না পড়ে এবং হস্তী পাতবেড় ভেদ করিয়া চলিয়া না যায়, তাহা দেখা সিপাহিগণের প্রধান কার্য্য। হস্তী বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলে সিপাহিগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের গতি রোধ করে।

পর্ব্বতে যাত্রা

খেদার সমস্ত কর্ম্মচারী সংগৃহীত হইলে, তাহাদিগের নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ইত্যাদি বিবরণ (প্রত্যেক মাঝি বা সরদারের অধীনস্থ লোকের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া) রেজিষ্টরীভুক্ত করা হয়। এই সময় মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতঃপর ৭ দিবসের অথবা ১০ দিবসের উপযোগী রসদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সেই রসদ ফুরাইবার পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী প্রতি সপ্তাহের রসদ নির্দ্দিষ্ট গুদাম হইতে খেদা স্থানে প্রেরণ করিতে হয়। খেদার কর্ম্মচারীবর্গ মিলিয়া দেবোদ্দেশে একটী 'সিন্নি' করিয়া নমাজ পড়ে। তৎপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক সিন্নি গ্রহণ করে। কোন কোন সময় বকড়ি জবাই করিয়া, কোন সময় বা গুড় ও জল দ্বারা পরমান্ন রন্ধন করিয়া সিন্নি করা হয়।

প্রত্যেক গড়ুয়ার দুইটী টুকড়ি ও এক এক কানা ভাড়-বাঁশ থাকে। তাহারা রসদের জিনিষ, নিজ নিজ বস্ত্র ও বিছানা এবং বাসনপত্র টুকড়িতে পুরিয়া ভাড়-বাঁশের সাহায্যে স্কন্ধে বহন করে। পরে জমাদার বা মোক্তারের আদেশানুসারে প্রত্যেক মাঝি তদধীনস্থ গড়ুয়াগণসহ নম্বর অনুসারে পর পর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকে। তাহাদের এই অভিযান দর্শন করিলে যুদ্ধযাত্রার কথা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সৈনিক বিভাগের নিয়ম প্রণালীর সহিত খেদার কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে।

এই দলবলকে সাধারণতঃ "বহর" বলা হয়। যে স্থানে হস্তী থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক কি দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে তাহারা ছাউনী করিয়া হস্তীর সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় থাকে। এই সময় সাধারণতঃ পার্ব্বত্য পল্লীর সন্নিকটে অথবা উপত্যকা ভূমিতে, পাতার ছাউনী ও বেড়াদ্বারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে।

পাঞ্জালীর কার্য্য

জনবহর পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে অথবা তৎ সমসাময়িক কালে হস্তীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত পাঞ্জালিগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নানাদিকে গমন করিয়া থাকে। একদল অন্যদলের সন্ধান লইবার সুবিধার নিমিত্ত, তাহারা যে পথে যায়, সেই পথের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বৃক্ষশাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া বাম পার্শ্বে দূরে দূরে বিছাইয়া যায়। তাহারা যে দিক হইতে আসিয়াছে, শাখার অগ্রভাগ সেই দিকে এবং যে দিকে যাইতেছে,

কর্ত্তিত ভাগ (গোড়া) সেই দিকে রাখিয়া স্থাপন করিয়া যায়। পশ্চাদনুসরণকারিগণ সেই চিহ্ন ধরিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

এই সময় তাহাদিগকে অতি সন্তর্পণে চলা-ফিরা করিতে হয়। জঙ্গল নাড়িয়া চলা, উচ্চরবে কথা বলা বা ডাকাডাকি করা নিষিদ্ধ। মুলি বাঁশের চুঙ্গদ্বারা নির্ম্মিত বাঁশীদ্বারা সাঙ্কেতিক শব্দ করা হয় মাত্র। হস্তিযূথ কোন ক্রমে তাহাদের গতিবিধির টের পাইলে, দ্রুতগমনে স্থানান্তরে চলিয়া যায়। হাতীর দলের সন্ধান পাইলে পাঞ্জালিগণ সঙ্গোপনে পশ্চাদনুসরণ করে। যতদিন হস্তীগুলি একস্থানে স্থির না হয়, তত দিন পাঞ্জালিগণ পেছন ছাড়ে না। সমস্ত দিন জঙ্গলে থাকিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করে, রাত্রিতে নিকটবর্ত্তী কোনও পার্ব্বত্য পল্লীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। নিকটে লোকালয় না থাকিলে, বৃক্ষারূঢ় হইয়া রাত্রি যাপন করিতে হয়।

যে স্থানে অধিককাল আহারোপযোগী খাদ্যবস্তু আছে, নিবিড় অরণ্যাচ্ছাদিত থাকায় যে স্থান স্বভাবতঃই সুশীতল এবং যেখানে পার্ব্বত্য ছড়া প্রবাহিত হইতেছে, হস্তি-যূথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত সেইস্থানে অবস্থান করে। এরূপ স্থানে হস্তীগুলি পৌঁছিলে, পাঞ্জালিগণ তাহার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া স্থানীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। যদি বুঝা যায়, সেই স্থানে শীঘ্র আহার্য্যের অভাব ঘটিবে না, হস্তীর জলপান ও জলকেলির সুবন্দোবস্ত আছে, এবং খেদার পক্ষে স্থানটী সুবিধাজনক, তবে পাঞ্জালী দলের দুই তিন ব্যক্তি দ্রুতগতিতে মোক্তার বা জমাদারের নিকট যাইয়া সেই সংবাদ জানায়। যে-সকল পাঞ্জালী হস্তিযূথের সঙ্গে থাকে, তাহারা অতি সন্তর্পণে জঙ্গল বেড়াইয়া, কোন স্থান দিয়া বেড় করিলে সুবিধা ঘটিবে তাহা নির্ব্বাচন করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা কর্ত্তন করিয়া গন্তব্য পথের চিহ্ন রাখে।

পাতবেড়

পাঞ্জালী সংবাদ প্রদান করা মাত্র জমাদার বা মোক্তার, জঙ্গলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় দলের প্রতি আদেশ করেন। এই আদেশ অবগত হওয়া মাত্র অবিলম্বে সকলকে প্রস্তুত হইতে হয়; এমনকি, রন্ধিত অন্ন ভক্ষণেরও সময় দেওয়া হয় না। দশ পনর মিনিটের মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া সকলেই ভার স্কন্ধে লইয়া দাঁড়ায়। তখন মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ডাকা হয়। তদনুসারে ১নং মাঝি ও তাহার অধীনস্থ গড়ুয়াগণ একের পেছনে অন্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পেছনে ২নং মাঝি ও তাহার অধীনস্থ লোক, তাহার পেছনে ৩ নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত মাঝিগণ পরপর ভাবে দাঁড়ায়। এই ভাবে সুদীর্ঘ একটী মনুষ্য শ্রেণী গঠিত হয়। এই শ্রেণীর সর্ব্বাগ্রে, জঙ্গল হইতে প্রত্যাগত পাঞ্জালিগণ পথ-প্রদর্শক রূপে গমন করে। এক এক মাঝির দলবলের পেছনে এক একজন সিপাহী থাকে। জমাদার বা মোক্তার সকলের পেছনে অগ্রসর হয়।
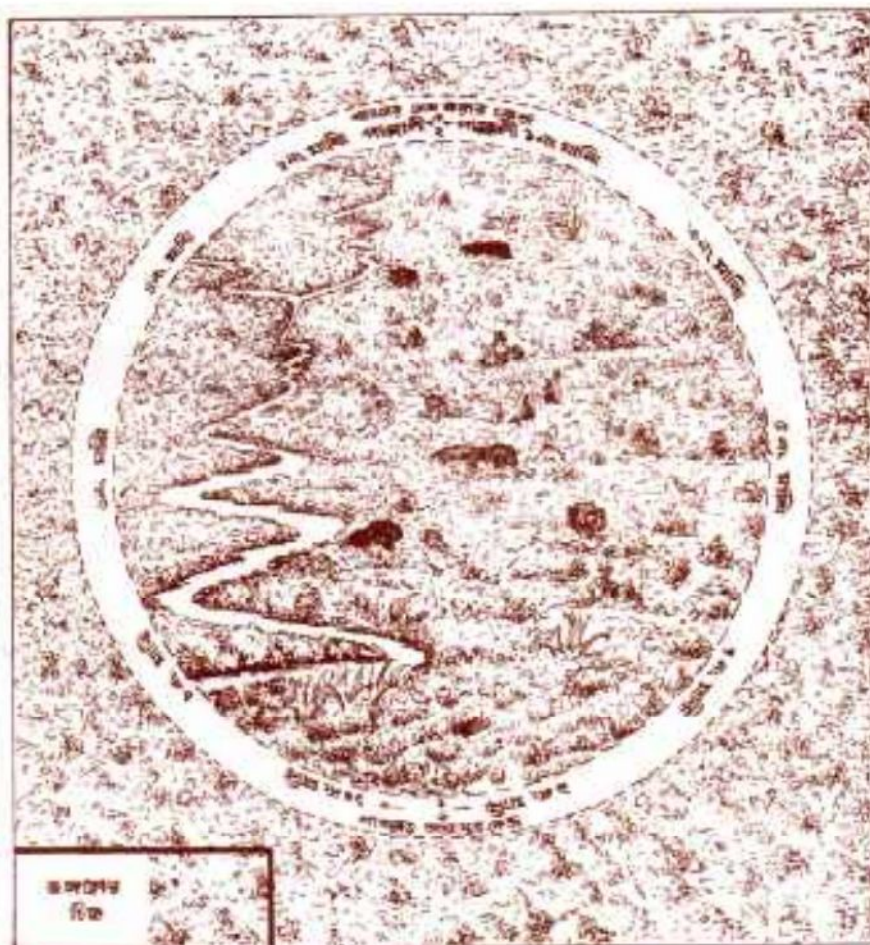
হস্তী খেদার পাতবেড়

এই অভিযানকালে কথা বলা বা কোনরূপ শব্দ করা নিষিদ্ধ। কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

কোন্ স্থান হইতে পাতবেড় আরম্ভ হইবে, পাঞ্জালিগণ পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখে। জনবহর সেই স্থানে পৌঁছিলে, পূর্ব্ব শৃঙ্খলা স্থির রাখিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া যায়।

ডাইন ও বাম, দুই দিক দিয়া লোক যাইতে হস্তী বেড় করে। এই সময় জমাদার অগ্রবর্ত্তী হইয়া, রেজিষ্টরী অনুসারে মাঝিগণের নাম ডাকিয়া বলেন, "১নং মাঝি ডাইনদিকে" — "২নং মাঝি তাহার অধীনস্থ লোকসহ বামদিকে রওয়ানা হয়। দক্ষিণদিকে ১নং মাঝির পেছনে ৩নং মাঝি, বামদিকে ২নং মাঝির পেছনে ৪নং মাঝি, এরূপভাবে ১০নং মাঝি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলিয়া থাকে। তাহাদের পথপ্রদর্শক দুইজন পাঞ্জালী দুই দলের অগ্রবর্ত্তী হয়। এই সময় যে প্রণালীতে লোক চালান হয়, তাহা সঙ্গীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

পাতবেড় কালে চিত্রের (১) চিহ্নিত স্থান হইতে ডাইন ও বাম দুইদিকে লোক প্রেরিত হয়, (২) চিহ্নিত স্থানে যাইয়া উভয় দিগের অগ্রবর্ত্তী পাঞ্জালী মিলিত হইলে বুঝা গেল, বেড় শেষ হইয়াছে। দুই দিকেই লোক যাইবার সময়, পাঞ্জালীর ইঙ্গিতানুসারে কিছু দূরে দূরে যাইয়া দুইজন করিয়া লোক দাঁড়াইয়া যায়। এইভাবে বেষ্টনী রেখার সকল অংশেই লোক থাকে, সুতরাং হস্তিযূথ লোকের বেড়ের ভিতর পতিত হয়। এই বেড়কে "পাতবেড়" বলে।

পাতবেড় দুইদিকে লোক প্রেরণ কালে সকলকেই নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। এতগুলি লোক এরূপ সতর্কতার সহিত জঙ্গলে প্রবেশ করে যে, শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দও বড় বেশী হয় না। উভয়দিকের পাঞ্জালী পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকসহ (২) চিহ্নিত স্থানে মিলিত হওয়া মাত্র তাহারা উল্লাসভরে 'আল্লা আল্লা' ধ্বনি করিয়া উঠে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে বেড়স্থিত সকলেই উচ্চরবে আল্লার নাম উচ্চারণ করে। অকস্মাৎ চারিদিকে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তিযূথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বেড়ের ভিতরে ছুটাছুটি করিতে থাকে। তাহাদের পায়ের দাপটে ও জঙ্গল নাড়ার সর্‌সর্ শব্দে এক গভীর রবের সৃষ্টি হয়। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার পরে সমস্ত হস্তী ভীতভাবে একস্থানে জড় হইয়া যায়।

বেড় মিলিবার পরে ফাড়ি বা ঢালা কাটিবার কার্য্য আরম্ভ হয়। যে পথে বেড়ের লোকগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে, সেই সীমারেখার জঙ্গল কাটিয়া চতুর্দ্দিকে ২০। ২৫ হাত প্রশস্ত এক ফাড়ি পথ প্রস্তুত করা হয়। এই কার্য্যে অধিক বিলম্ব হয় না। প্রত্যেকের হস্তে দাও ও কুঠার থাকে, এবং সকলেই আপন আপন সম্মুখস্থ স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পথ করে। ফাড়ি রাস্তায় ছড়া পড়িলে, বনজাত বৃক্ষদ্বারা তৎক্ষণাৎ

পুল প্রস্তুত করা হয়। উচ্চ টিলা অতিক্রম করিতে হইলে, তাহার দুইদিকে মই বাঁধিয়া আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা করা হয়।

ফাড়িকাটা শেষ হইলে, জঙ্গল হইতে বৃক্ষ, লতা ও খড় সংগ্রহ করিয়া কিছু দূরে দূরে মাঝি ও গড়ুয়াগণের অবস্থান জন্য বাচাড়ি ঘর প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রত্যেক ঘর লোক বসিয়া যায়, এই ঘরকে "পাতা" বলে। প্রতি ঘরে দিনের বেলায় একজন ও রাত্রিতে দুইজন করিয়া লোক থাকে। হস্তী ফাড়িপথ অতিক্রম করিয়া বেড় হইতে বাহির হইয়া যাইতে চাহিলে বাধা প্রদান করাই ইহাদের কার্য্য। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে বৃহৎ অগ্নির ধূনি জ্বালান হয়। আগুন দেখিলে হস্তী এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ ভয়ে নিকটে আসে না। কোন সময় হস্তী বেড়ের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, গড়ুয়াগণ, উল্কা জ্বালাইয়া এবং কোলাহল করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। মুলিবাঁশ দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা ছোট দুই খণ্ড বাঁশের পরস্পর আঘাতদ্বারা 'ঠক্ ঠক্' শব্দ করা হয়। সেই শব্দ হস্তীর পক্ষে নিতান্তই ভীতিপ্রদ। যেস্থলে এই সকল উপায়ে হস্তীর গতিরোধ করা অসম্ভব হয়, সেইস্থলে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক একজন সিপাহী এক এক মাঝির অধীনস্থ লোকদিকের তত্ত্বাবধান করিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তাহারা আপন আপন এলাকা খণ্ডে ঘুরিয়া পাহাড়া দেয় এবং প্রয়োজন স্থলে বন্দুক ব্যবহার করে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত বন্দুকের আওয়াজ করা নিষিদ্ধ; কারণ, বন্দুকের শব্দ শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে হস্তীগণ আর সেই শব্দকে ভয় করে না, তদ্দরুণ পরবর্ত্তী কাজের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। প্রশস্ত নদী পাতবেড়ের ভিতরে ফেলিতে হইলে, নৌকা বা ভেলাদ্বারা নদী-গর্ব্ভে পাহারা বসান হয়। নতুনবা নদীর ভিতর দিয়া হস্তী বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

রাত্রিতে প্রত্যেক পাতাঘরে দুইজন লোক থাকে, পালাক্রমে তাহাদের একজন জাগ্রত থাকে, একজন ঘুমায়; দুইজন এককালীন নিদ্রিত হইলে, সেই স্থান দিয়া হস্তী বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, এজন্য সমস্ত রাত্রি পাতবেড়ে রোঁদ ফিরিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত রাখিতে হয়। অনেক সময়, মোক্‌তার বা জমাদারের ক্যাম্প হইতে কোন একটী বস্তু একটী পাতার লোকের হাতে দিয়া আদেশ করা হয়, ইহা সমগ্র বেড় ঘুড়াইয়া আনিতে হইবে। যে লোকের হস্তে বস্তুটি প্রদান করা হয়, সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পাতার লোকের হস্তে তাহা পৌঁছাইয়া দেয়। এরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে একে অন্যের হস্তে প্রদান করায় বস্তুটী সমস্ত বেড় ঘুড়িয়া অল্পকালের মধ্যেই মোক্তার বা জমাদারের হস্তে আইসে। তখন বুঝা যায়, বেড়ের সকলেই জাগ্রত আছে। মধ্যবর্ত্তী কোন পাতার লোক উক্ত বস্তু লইয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, বস্তুটী আটক হইয়া যায়। তখন কে ঘুমাইল, অনুসন্ধান জন্য লোক বাহির হয়। পাতার সকল লোক এককালীন নিদ্রিত হওয়া গুরুতর
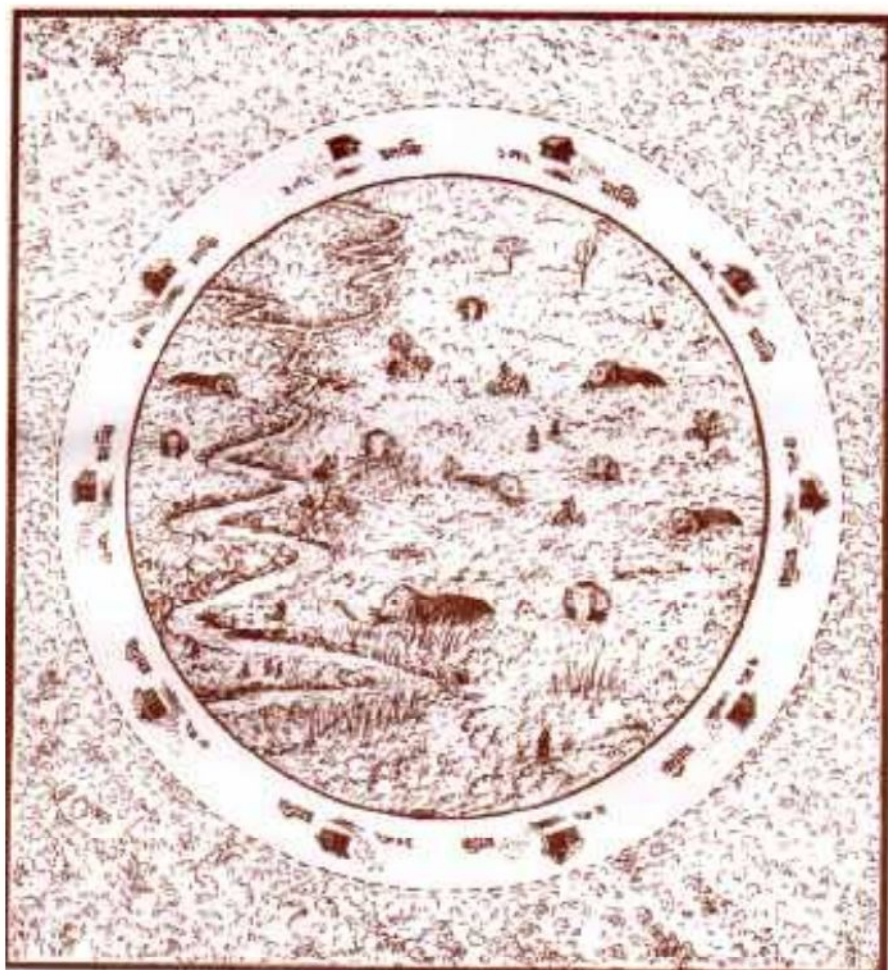
পাতবেড় রক্ষার প্রণালী

অপরাধের কার্য্য এবং তজ্জন্য কঠোর প্রহারদণ্ড ভেপাগ করিতে হয়; সেই দণ্ড প্রদানে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব ঘটে না।

পাতবেড়ের পরিধি অনেক সময় ৪। ৫ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই পরিধির মধ্যে হস্তিযূথ ইচ্ছানুরূপ চলাফিরা করে। তাহারা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া আহার করে, ছড়ার জলে স্নান করে। তাহারা যে বিপদাপন্ন, তাহা বড় একটা বুঝিতে পারে না। আসন্নপ্রসবা হস্তিনী বেড়ে পড়িলে, অনেক সময় বেড়ের ভিতরেই প্রসব করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ ভাবে ১৫। ২০ দিন পর্য্যন্ত হস্তী পাতবেড়ে রাখিতে হয়। অধিক কাল বেড়ে রাখিলে হস্তীগুলি আবদ্ধাবস্থায় থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং আহার্য্য বস্তু ফুরাইয়া আসিলে তাহাদিগকে বেড়ে রাখা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং পাতবেড় হওয়ার পর যত শীঘ্র পরবর্ত্তী কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে, ততই শুভ ফল লাভের আশা করা যায়।

পাতবেড়ের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে খেদার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং কার্য্যের সুফল সম্পূর্ণরূপে পাঞ্জালিগণের কৃতকার্য্যের উপর নির্ভর করে। তাহাদের ত্রুটীপ্রযুক্ত অনেক সময় পাতবেড় উপলক্ষেই খেদার কার্য্য পণ্ড হইতে দেখা যায়। তাহারা যদি পাতবেড়ের পার্শ্বে অঙ্কিত চিত্রের (১) চিহ্নিত কেন্দ্র হইতে ডাইন ও বাম দিকে যাইয়া শেষ মাথা (চিত্রের ২ চিহ্নিত স্থান) মিলাইয়া না উঠিতে পারে, তবে পার্শ্বে অঙ্কিত রেখানুরূপ বেড়ের সীমারেখার এক মাথা ভিতরে প্রবিষ্ট হয় ও অপর মাথা বাহির হইয়া পড়ে। অর্থাৎ (১) চিহ্নিত কেন্দ্র হইতে দুই দিকে প্রেরিত লোক (২) চিহ্নিত কেন্দ্রে যাইয়া মিলিত হইতে পারে না। তদ্দরুণ উভয় মাথার মধ্যভাগে যে ফাঁক থাকে, সেই ফাঁক দিয়া হস্তিযূথ বেড় হইতে বাহির হইয়া যায়। অনেক সময় আবার এক দলভুক্ত হস্তীর কতক বেড়ের ভিতরে এবং কতক বাহিরে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় ভিতরের হস্তীগুলি বাহিরের হস্তীর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে এবং পাতবেড় রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বাহিরের হস্তীদলও উহাদিগকে ছাড়িয়া অধিক দূরে যায় না, পাতবেড়ের কাছে কাছে চরিয়া বেড়ায়, এবং উভয় দলে ডাকাডাকি করিয়া, মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে। তদ্দরুণ বেড়ের অভ্যন্তরস্থ হস্তীগণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক সময় আবার সমগ্র হস্তীর পাল বেড়ের বাহিরে পতিত হওয়ায়, পাতবেড় নিষ্ফল হয়।
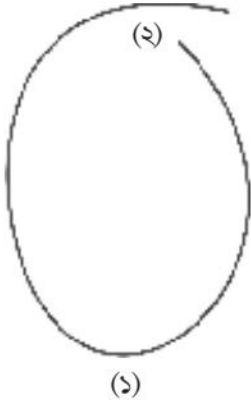
দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল এক বেড়ে পতিত হইতেও দেখা যায়। তাহারা এক বেড়ের ভিতরে, স্বতন্ত্র ভাবে চলাফিরা করে, একত্র মিলিত হয় না; ধৃত হইবার কালেও প্রায়ই এক সঙ্গে ধরা পড়ে না।

কোঠ বা গড় নির্ম্মাণ

হস্তী আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষাদি দ্বারা একটী সুদৃঢ় খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়। প্রাদেশিক ভাষায় তাহাকে কোঠ বা গড় বলে।

পাতবেড়ের কার্য্য শেষ হওয়ার পর, কোঠ প্রস্তুতের স্থান নির্ব্বাচন করা হয়; এই কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বেড়ের ভিতরে কোন্ কোন্ স্থানে হস্তী-দোয়ালের (যাতায়াতের রাস্তার) অংশ পতিত হইয়াছে, সেই দোয়ালে সর্ব্বদা যাতায়াতের চিহ্ন আছে কি না, হস্তীকে তাড়া করিলে কোন্‌দিকে ধাবমান হইবার সম্ভাবনা অধিক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কোঠের স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়। এক বা একাধিক দোয়ালের উপর কোঠ নির্ম্মাণ করাই বিধেয়; কারণ হস্তীগণ যে পথে সর্ব্বদা গমনাগমন করে, তাড়া পাইলে সেই পথেই পলায়ন করিতে চাহে। সুতরাং দোয়ালের উপর কোঠ প্রস্তুত করা হইলে হস্তী সহজে কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই স্থান পাতবেড়ের অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে নির্ব্বাচিত হয় — বেড়ের বাহিরে নহে।

কোঠের স্থান নির্ব্বাচিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া, সেই স্থানে সংগ্রহ করা হয়। পাতবেড়ের বাহির হইতে বৃক্ষ আহরণ করা বিধেয়, বেড়ের ভিতরে বৃক্ষ কর্ত্তন করা নিষিদ্ধ, তদ্দ্বারা হস্তীর ভীতি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে। এই সময়, দিনের বেলা পাতবেড়ের প্রত্যেক পাতায় এক একজন লোক রাখিয়া অন্য সকলকে কোঠ প্রস্তুতের কার্য্যে ব্যাপৃত করা হয়। দিবাভাগে হস্তীগুলি বেড়ের মধ্যভাগে গভীর অরণ্যে বিচরণ করে, বেড় অতিক্রম করিতে চেষ্টিত হয় না, সুরতাং প্রত্যেক পাতায় একজন লোক রাখিলেই চলে। নিয়োজিত লোকগণ সমস্ত দিন কোঠের কার্য্য করিয়া, সন্ধ্যার সময় আপন আপন পাতায় ফিরিয়া যায়, এবং রাত্রিতে নিয়মানুসারে পাতবেড়ে পাহারা দিয়া থাকে।

পাতবেড়ে পতিত হস্তীর আনুমানিক সংখ্যা বিবেচনায় কোঠ অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড় করা হয়। প্রাচীন প্রথানুসারে বৃত্তাকারে এবং গবর্ণমেন্টের খেদা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেণ্ডার্‌সন্ সাহেবের মতানুযায়ী অষ্ট কোণ আকারে কোঠ প্রস্তুত করা হয়। যতজন মাঝি নিযুক্ত থাকে, কোঠের পরিধিকে তত সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ এক এক মাঝির জিম্মা করা হয়। তাহারা আপন অধীনস্থ লোকজন লইয়া স্বীয় স্বীয় অংশের সম্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই ভাবে সকলের সমবেত চেষ্টায় কোঠ নির্ম্মিত হয়।

সরল এবং সুদৃঢ় বৃক্ষ খণ্ডসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘন ঘন প্রোথিত করিয়া কোঠ প্রস্তুত করা হয়। এই সকল বৃক্ষ খণ্ডের অনূ্যন ৩। ৪ ফুট পরিমিত অংশ ভুগর্ত্তে প্রোথিত হয় এবং মৃত্তিকার উপরে অন্ততঃ ১০ ফুট পরিমাণ উচ্চ থাকে।
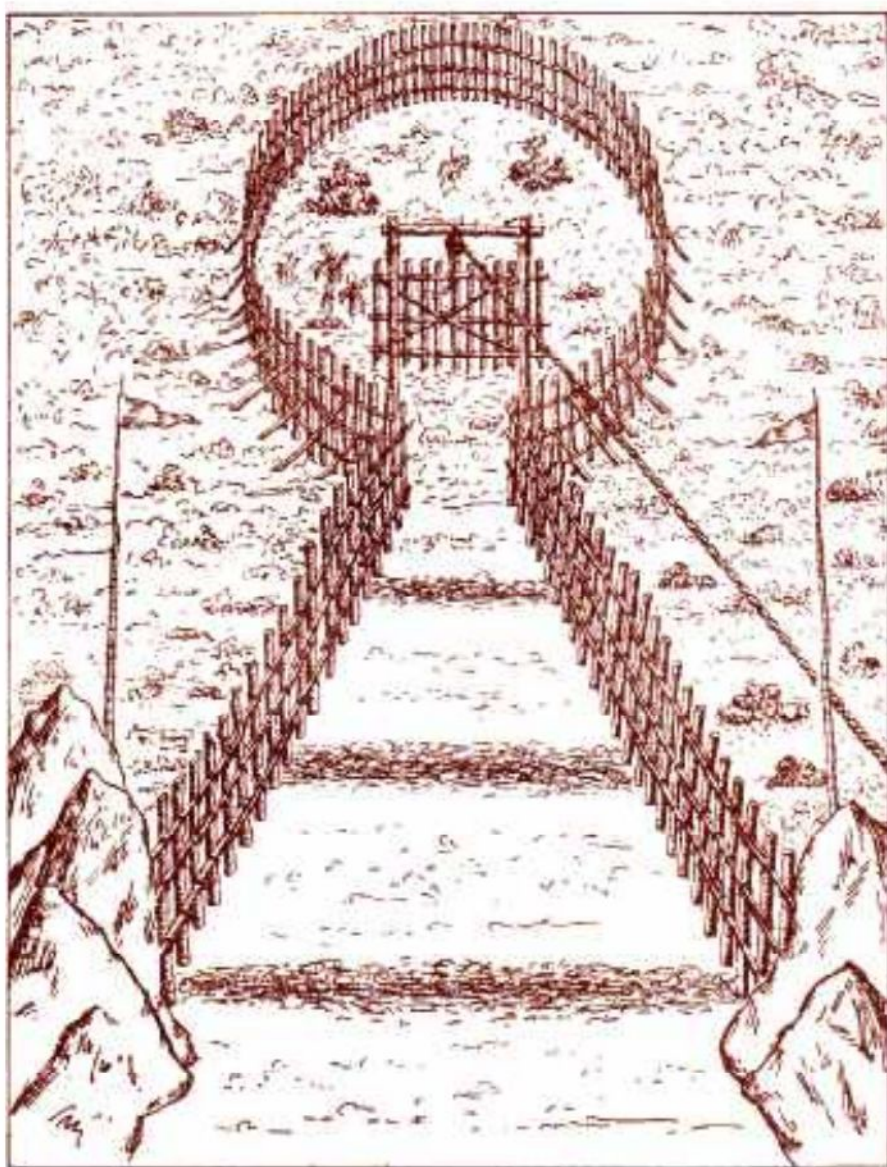
হস্তী আবদ্ধ করিবার কোঠ বা গড়।

ইহার পর বৃক্ষখণ্ড দ্বারা ঘন ঘন লাইন বাঁধা হয়। পর্ব্বতজাত উদাল বা উজাল বৃক্ষের ত্বকে পাকান দড়ি দ্বারা বন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত বৃক্ষের ত্বক দ্বারা নির্ম্মিত দড়ি, পাটের দড়ি অপেক্ষা কম মজবুত নহে। যেদিকে হস্তী থাকে, সেই দিকে একটী মাত্র প্রবেশ দ্বার রাখিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়। এবং দরজার দুই পার্শ্ব হইতে, সম্মুখের দিকে ক্রমবিস্তৃত ভাবে দুইটী বাহু প্রসারণ করা হয়। এই বাহুদ্বয়কে "আন্নি" বা ''পাইরালা" বলে। স্থানের অবস্থানুসারে আন্নি দুইটী সময় সময় বহুদূর বিস্তৃত করিতে হয়। অসম্ভব না হইলে ইহার শেষ মাথা পার্ব্বত্য টিলার সহিত সংলগ্ন করাই সুবিধাজনক।

সেণ্ডারসন্ সাহেবের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কোঠের দরজার ঊর্দ্ধভাগে কপিকলের সাহায্যে একটী ঝাঁপ রাখা হয়, হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইলে সেই ঝাঁপ ফেলিয়া দরজা বন্ধ করা হইয়া থাকে। সেই ঝাঁপের ভিতর পীঠে কাষ্ঠের গায় তীক্ষ্ণ লৌহের পেরেগ্ ঘন ঘন প্রোথিত থাকে। তদ্দরুণ ভিতর হইতে জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিবার পক্ষে বাধা ঘটে। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে এখন এই নিয়মেই কার্য্য হইতেছে। উত্তর অঞ্চলে ঝাঁপের পরিবর্ত্তে তিনটী হুড়্কা রাখা হয়। মজবুত বৃক্ষ দ্বারা এই হুড়্কা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার পর, লোকে হুড়্কা টানিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। শেষোক্ত প্রণালী বিশেষ আশঙ্কাজনক, এবং কোন কোন সময় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি খেদাকারীগণ সেই চির অভ্যস্ত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না।

কোঠ বাঁধিবার কার্য্য শেষ হইবার পর, পত্রবিশিষ্ট মুলি বাঁশ এবং তাজা বৃক্ষ পত্রাদির ছাউনি দ্বারা কোঠ ও আন্নির বেড়াগুলি সম্যকরূপে আচ্ছাদিত করা হয়। তথায় নূতন কাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে, কিম্বা খোয়াড় প্রস্তুত করা হইয়াছে, হস্তীযূথ তাহা বুঝিতে পারিলে, তাহারা কোঠে প্রবেশ করিতে চাহে না। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অনেক কোঠে হস্তী প্রবেশ করাইতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, স্থান পরিবর্ত্তন ও নূতন কোঠ প্রস্তুতের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হস্তীগণ কোঠ নির্ম্মাণ কালের অবস্থা দর্শন করিলে তাহাদিগকে সেই পথে আর আনা যাইতে পারে না। এজন্য কোঠের স্থানে হস্তী যাইতে বাধা প্রদান জন্য রাত্রিতে প্রহরী রাখা হয়। দিনেরবেলা কর্ম্মচারিগণের কোলাহল শুনিয়া হস্তী আপনা হইতেই দূরে থাকে।

কোঠের ভিতরে প্রবেশদ্বারের স্থান বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট স্থানের বেড়ার গোড়ায় চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া সামান্য পরিমাণ গভীর ও দুই বা তিন হস্ত প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়। তাহা দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত হস্তীগণ কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টায় বিরত থাকে। অনেক সময় পরিখা অগ্রাহ্য করিয়া কোঠ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেও চেষ্টিত হয়। এই কারণে যতদূর সম্ভব দৃঢ় করিয়া কোঠ বাঁধা হয়, এবং বাহির পিঠে বৃক্ষখণ্ড দ্বারা ঘন ঘন ঠেস দিয়া অধিকতর দৃঢ় করা হয়। তদ্দরুণ ভিতর হইতে

ধাক্কা দিয়া গড় ভগ্ন করা হাতীর পক্ষে অসাধ্য হইয়া থাকে। শুষ্ক খড় ও পত্রাদি দ্বারা আন্নি বা পাইরালার মুখে (তুলিতে) একটী এবং মধ্যভাগে পর পর ভাবে ছয়টী এক পাশের আন্নি হইতে অন্য পাশের আন্নি পর্য্যন্ত আইল প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে কেরাসিন তৈল ছড়াইয়া সিক্ত করিয়া রাখা হয়। এই সকল খড়ের আইলকে 'আলা' বলে। অনেক স্থলে এই আলার মধ্যে তুবড়ি ও বোমা প্রভৃতি আতস বাজি গুঁজিয়া দেওয়া হয়।

হস্তী তাড়াকারীগণের আন্নির মুখ নির্দ্দেশ করিবার সুবিধার্থ দুইদিকের আন্নির মাথায় দুইটী উচ্চ বৃক্ষের শিরে এক একটী পতাকা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কর্ম্মচারিগণ দূরবর্ত্তী গভীর অরণ্য হইতে সেই পতাকা লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে হস্তী তাড়াইয়া আনে। এবং উভয় পতাকার মধ্য দিয়া যাহাতে হস্তিযূথ প্রবিষ্ট হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

কোঠ প্রস্তুতের কার্য্যোপলক্ষে যে-সকল কাষ্ঠখণ্ড চতুর্দ্দিকে পতিত হয় তাহা সরাইয়া, খনিত মৃত্তিকাদি শুষ্ক পত্রদ্বারা আবৃত করা হয়। স্থূলকথা, সেই পথে আসিতে অথবা কোঠে প্রবেশ করিতে হস্তীর কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তদ্রূপভাবে সজ্জিত করিতে হয়।

হস্তী খেদান

কোঠ প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হইলে, হস্তী তাড়াইয়া কোঠের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়; এই কার্য্যকে 'ডাকি' বলে।

'ডাকি' আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক পাতায় দুইজন লোক নিযুক্ত রাখিয়া এবং ধূনির আগুন প্রবল ভাবে জ্বালিয়া পাতবেড় দৃঢ় করা হয়। হস্তীদিগকে তাড়া করিলে পাতবেড় অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে, এই কারণেই পাতবেড় দৃঢ় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অতঃপর সকলে মিলিতভাবে নমাজ করে ও সিন্নি গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপর পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া একে অন্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করে। এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হওয়া বিচিত্র নহে, এরূপভাবে বিদায় গ্রহণ করিবার তাহাই কারণ। এই সময় অনেকে কাঁদিয়া ফেলে।

খেদা উপলক্ষিত অন্যান্য কার্য্যাপেক্ষা ডাকির কার্য্য নিতান্ত বিপজ্জনক। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে প্রতি মুহূর্ত্তে হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা থাকে। অনেকের এই কার্য্যে যাত্রার সঙ্গেই জীবনযাত্রার শেষ হইতে দেখা যায়। মৃত ব্যক্তিগণের শেষ কার্য্য সম্পাদনোপযোগী জিনিস ও নববস্ত্রাদি রসদের সঙ্গে পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। তদ্দ্বারা সঙ্গীয় মৌলবী মৃতের অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন।
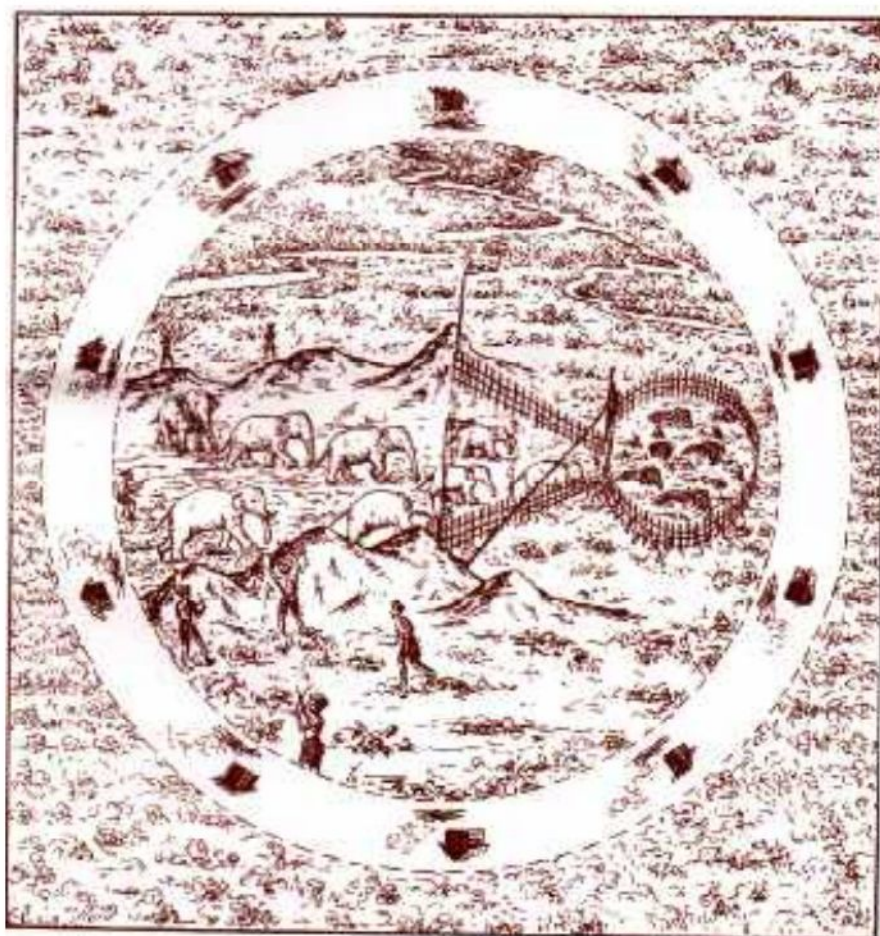
হস্তী খেদাইয়া কোঠে নেওয়ার দৃশ্য।

পাতবেড়ের যে সীমায় কোঠ প্রস্তুত করা হয়, তাহার বিপরীত দিকের সীমায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লোক দণ্ডায়মান হয়। তাহাদের সকলেরই হস্তে ছোট ছোট দুইখণ্ড বাঁশ থাকে, কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক থাকে। এতদ্ব্যতীত ঢোল, কাড়া ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ও বোমা, তুবড়ি প্রভৃতি আতস বাজি সঙ্গে লওয়া হয়। তৎপর ইহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া, ঢোল ও কাড়া বাজাইয়া এবং হস্তস্থিত বংশ খণ্ডদ্বয় 'ঠক্ ঠক্' শব্দে বাজাইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই আকস্মিক সোরগোলে ভীত হইয়া হস্তিযূথ প্রাণভয়ে দৌড়িয়া কোঠের দিকে ছুটিয়া যায়।

এই সময়ের দৃশ্য যেমন আমোদজনক, তেমনি ভয়াবহ। হাতীর দল সন্ত্রস্ত ভাবে মুলিবাঁশের বন ও বৃক্ষাদি সমন্বিত ঘোর অরণ্য বিদলিত করিয়া যখন ছুটিয়া যায়, তখন বাঁশ ও বৃক্ষাদি ভঙ্গের মুহুর্মুহুঃ মর্ম্মর শব্দ, পদদলিত বাঁশের গাইট ফাটিবার পট পট শব্দ, এবং হস্তিযূথের গাত্রঘর্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের সোঁ সোঁ শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিজনক উচ্চ শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দুইটী ট্রেইন একসঙ্গে চলিলেও বোধহয় এত উচ্চ ও গভীর শব্দ হয় না। ইহার উপর আবার হস্তীর চীৎকার রব, তাড়াকারীগণের চীৎকার ও বাজি বন্দুকের শব্দ মিলিত হইয়া ভীষণ বিভীষিকার উৎপাদন করে। সমগ্র জঙ্গল মর্দ্দিত করিয়া যখন হস্তিযূথ প্রাণভয়ে তীরবেগে ছুটিয়া আসে, তখন মনে হয় যেন তাহাদের অমিতবেগে বাতাসের গতি ফিরিয়া যাইতেছে। এই সময় হস্তীর সম্মুখের দিকে (কোঠের নিকট) যে-সকল লোক থাকে, তাহাদিগকে নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে হয়। সম্মুখের দিকে কোনরূপ শব্দ পাইলে অথবা কাহাকেও নড়িতে চড়িতে দেখিলে হস্তিযূথ হঠাৎ পেছনের দিকে ফিরিয়া যায়। তাহাদিগকে আন্নির মুখে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া তাড়াকারীদের উদ্দেশ্য থাকে, এবং তদনুরোধে কখনও অগ্রবর্ত্তী হইয়া এবং কখনও পেছনে হটিয়া তাড়া করে।

হস্তীগুলি আন্নির মুখে প্রবিষ্ট হইলে আর ডাইনে বাঁয়ে যাইবার সুবিধা থাকে না। হয় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কোঠে প্রবেশ করিবে, না হয় পেছনের দিকে ফিরিয়া যাইবে। পেছনে পালাইতে না পারে, এজন্য তৎকালে পেছন হইতে ঘোরতর চীৎকার, বাজি বন্দুকের শব্দ ও বাদ্যযন্ত্রের কোলাহল এত প্রবলভাবে চলে যে, সেই সকল ভীতিকার কোলাহলে ও হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনাজনিত আনন্দে কোঠের নিকটস্থ সকলেরই বুক দুরুদুরু করিতে থাকে। এই সময় মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, এমন সহাসী বা ধৈর্য্যশালী লোক বড় বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে খড় ও কেরাসিন তৈলদ্বারা যে-সকল আলা প্রস্তুত করা হয়, হস্তিযূথ তাহার এক একটী পাড় হইয়া আসিলেই পেছনের দিক হইতে সেই আলায় অগ্নি

প্রদান করা হয়। হস্তী পেছনের দিকে ফিরিতে উদ্যত হইলে, অগ্নি দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার কোঠের দিকে ধাবিত হয়। এই সময় হস্তীগুলিকে থামিবার বা কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ দেওয়া হয় না। এরূপ ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোন কোন সময় আন্নির বেড়া ভাঙ্গিয়া হস্তীযূথ ডাইনে বা বামদিকে পলাইয়া যায়; ইহা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। আন্নি ভাঙ্গিয়া বাহির হইলেও হস্তীগুলি পাতবেড়ের ভিতরেই থাকে এবং পুনর্ব্বার কোঠে আনিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোন কোন সময় লোক-কোলাহল, বাজি বন্দুক এবং আলার অগ্নি অগ্রাহ্য করিয়া হস্তীর দল আন্নি হইতে পেছনের দিকে পলাইয়া যাইতেও দেখা যায়।

হস্তীগুলি কোঠে প্রবেশকালে প্রায়ই শ্রেণীবদ্ধভাবে একটীর পশ্চাতে অন্যটী ছুটিয়া যায়; এবং কোঠের বেড়ার ধার ধরিয়া চতুষ্পার্শ্ব বৈষ্টন কতরঃ আবার প্রবেশদ্বারের দিকে আগত হয়। সমস্ত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই ক্ষিপ্র হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। দরজা বন্ধ করিবার দুইটী প্রণালীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দরজা বন্ধ করিবার অবকাশে হস্তী দ্বারদেশে আসিতে চাহিলে, অগ্নির হল্‌কা জ্বালাইয়া, তৎপক্ষে বাধাপ্রদান করা হয়। এবং অগ্নির বাধা না মানিলে, জাঠা অস্ত্রের আঘাত ও বন্দুকের সাহায্যে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় কোঠের চতুর্দ্দিকে জাঠা লইয়া লোক দাঁড়াইয়া যায়। কোনদিকে কোঠ ভাঙ্গিয়া হস্তী বাহির হইবার চেষ্টা করিলে সোরগোল করিয়া এবং জাঠার আঘাত করিয়া ফিরাইতে হয়। হস্তীগুলি যে পথে প্রবেশ করে, সেই পথে বাহির হইবার নিমিত্তই বিশেষ চেষ্টিত থাকে। সুতরাং দ্বারদেশ বিশেষ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা হয় এবং অস্ত্রাদিসহ সতর্ক প্রহরী দণ্ডায়মান থাকে।

এই সময় পালের প্রধান দুই একটী হস্তীর কার্য্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কোঠের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। তখন কান দুইটী ও লেজ খাড়া করিয়া, শুঁড় গুটাইয়া এবং চক্ষু পাকাইয়া যে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা দেখিলে নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে ক্রমে পেছনের দিকে হটিয়া, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দরজার উপর পড়ে, এবং শুণ্ডের গোড়াভাগ দ্বারা আঘাত করিয়া দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। দরজার কাষ্ঠে প্রোথিত সুদৃঢ় লৌহ শলাকার আঘাতে হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডের গোড়াভাগ ক্ষতবিক্ষত হয়, অজস্রধারে রক্তপাত হইতে থাকে, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুনঃ পুনঃ দরজার উপর আঘাত করিতে থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং উপর্য্যুপরি আঘাতে কাতর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হয় না।

দুই দলভুক্ত হস্তী এক বেড়ে পতিত হইলে, তাহারা স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া বেড়ের মধ্যে বিচরণ করে। তাহাদিগকে একসঙ্গে কোঠে নেওয়াও অসম্ভব হয়।

প্রথমবারে যে-সকল হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়, সেগুলিকে বাহির করিয়া পুনর্ব্বার অন্য হস্তী কোঠে আনা হয়। এক দলভুক্ত হস্তী ও দুই তিনবারে অল্প অল্প করিয়া কোঠে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়।

খেদার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পাতবেড় দৃঢ় রাখিতে হয়। নতুবা কোঠে প্রবেশে বাকী হস্তীগুলি বেড় অতিক্রম করিয়া পালাইবার আশঙ্কা থাকে।

হস্তী বন্ধন

হস্তিযূথ কোঠে আবদ্ধ হইবার পর, তাহাদিগকে বাঁধিবার অনুষ্ঠান করা হয়। যে দিন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়, সময় থাকিলে সেই দিনই, অথবা তাহার পরদিন এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন কোন সময় রাত্রিতেও হস্তী বাঁধা হয়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্য এবং আশঙ্কাজনক।

বন্যহস্তী কোঠে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই পাতবেড়ে কি পরিমাণ হস্তী আছে, তাহার একটা আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়, এবং তাহাদিগকে বাঁধিতে ও প্রতিপালন করিতে যত সংখ্যক পালিত হস্তীর প্রয়োজন মনে হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া খেদাস্থান হইতে এক বা দেড় মাইল দূরবর্ত্তী জায়গায় রাখা হয়। খেদার নিকটে পালিত হস্তী রাখিলে বন্যহস্তীগণ তাহাদের গাত্রগন্ধ অনুভব করে, এবং অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। এজন্য পুরাতন হস্তী দূরবর্ত্তী স্থানে রাখা হয় এবং ডাকপড়া মাত্র খেদাস্থানে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মাহুতগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় তাহারা সংগৃহীত পাট দ্বারা বন্যহস্তী বাঁধিবার দড়ি প্রস্তুত করিতে থাকে।

বন্যহস্তী কোঠে আবদ্ধ হইবার সংবাদ পাওয়া মাত্র মাহুতগণ আপন আপন হস্তী লইয়া খেদাস্থানে উপস্থিত হয়। হস্তীর পৃষ্ঠে মোটা কাছি (দোমা) এবং অপেক্ষাকৃত সরু কাছি লওয়া হয়। মাহুতগণের হস্তে জাঠা থাকে। তাহারা হস্তীর ঘাড়ে ও পৃষ্ঠে উবোত ভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে।

কোঠের প্রবেশদ্বার ব্যতীত অন্য একটী স্থান কাটিয়া পালিত হস্তী প্রবেশের রাস্তা করা হয়। প্রবেশদ্বার দ্বারা বন্য হস্তীগুলি বাহির হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে, সুতরাং সেই দ্বার উদঘাটন করা হয় না। যে স্থানে পুরাতন হস্তী প্রবেশের দরজা কাটা হয়, সেই স্থানে একটী বা দুইটী বলবান গুণ্ডা হস্তী প্রহরীস্বরূপ রাখা হয়। বন্যহস্তী সেইপথে বাহির হইতে চাহিলে, দ্বাররক্ষক হস্তী তাহাদিগকে মারিয়া সরাইয়া দেয়। উক্ত পথে এক একটী করিয়া পালিত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়; প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠে দুইজন লোক থাকে, তাহারা এরূপ ভাবে শায়িত থাকে, যেন সহসা বন্যহস্তীগণের লক্ষ্যীকৃত না হয়। সমস্ত হস্তী প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের প্রবেশদ্বার তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া ফেলা হয়।

কোঠের ভিতর পালিতা কুন্‌কী হস্তী নেওয়া হয়, গুণ্ডা হস্তী দ্বারা কোঠের অভ্যন্তরস্থ কার্য্য সাধিত হয় না। পুরাতন হস্তী যখন কোঠে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন বন্য হস্তীগুলি কোঠের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চকিত দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে থাকে। অনেক সময়, বন্য হস্তীগুলি সিপাহীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কাণ ও লেজ খাড়া করিয়া এবং শুণ্ড উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। প্রধান কল্পের দুই তিনটী হস্তীতে পালিত হস্তীদিগকে আক্রমণ করে। পালিত হস্তীগুলিও মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে বন্য হস্তীগুলিকে দন্ত, শুণ্ড ও পদাদি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। এক একটী বন্য হস্তীকে তিন চারিটী পালিত হস্তী দ্বারা প্রহার করা হয়। এরূপ ভাবে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। এবং আক্রমণকারী বন্য হস্তীগুলি মাইর খাইয়া ভীতভাবে আপন দলে যাইয়া মিশে। সকল সময় এই অবস্থা ঘটে না।

হস্তীগুলি কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিপন্নাবস্থা অনুভব করিয়া থাকে। কিয়ৎকাল উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটী এবং কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, ভীত ও অবসন্নাবস্থায় অনেকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, এবং অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকে। অনেক অল্পবয়স্ক বাচ্চা জননীর পেটের নীচে লুক্কায়িত হইয়া সভয়ে চীৎকার আরম্ভ করে। পুরাতন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার পর, বন্যা হস্তীগুলি যেন আর এক নূতন বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিয়ৎকাল ছুটাছুটী ও পালিত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইবার পরে, সকলে এক স্থানে জড় হয়, এবং একে অন্যের শরীরের আড়ালে লুক্কায়িত হইতে চাহে। অনেকগুলি শিংমৎস্য জলপূর্ণ হাঁড়িতে রাখিলে তাহারা যেমন পরস্পর উলটপালট খেলে, এই সময় হস্তীগুলি ঠিক তদ্রূপ ভাবে একের আড়ালে অন্যে গা ঢাকা দিতে চাহে; একের পেটের নীচে অন্যে মাথা লুকায়।

এই সময় পালিত হস্তী দ্বারা বন্য হস্তীগুলিকে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার বেষ্টন করা হয়। এবং সকল হস্তীরই মস্তক ব্যূহের বাহিরের দিকে রাখিয়া পেছন দ্বারা ঠাসিয়া বন্য হস্তীগুলিকে বেড়ের মধ্যভাগে চাপিয়া রাখে।

কোঠে প্রবিষ্টা পালিত হস্তিনীগুলির মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বলশালিনী, শিক্ষিতা এবং সতর্ক, তাহাকেই হস্তী বন্ধনের প্রধান সহায়ারূপে গ্রহণ করা হয়। বন্ধনকার্য্যে সুপটু এবং ক্ষিপ্রহস্ত জনৈক দাইদার (মাহুতগণের সরদার) এই হস্তিনীর পৃষ্ঠে থাকে। এবং তাহার উঠানামার জন্য হস্তিনীর পৃষ্ঠদেশ হইতে দুই গাছি দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে মইয়ের পাটির ন্যায় খণ্ড খণ্ড দড়ি বাঁধা হয়, এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবার ও পৃষ্ঠে উঠিবার সিড়ির কার্য্য সাধিত হয়। সাধারণতঃ ইহাতে 'সিড়ি' এবং উক্ত হস্তিনীকে 'সিড়ির হাতী' বলা হয়।

দাইদার ধীরে ধীরে সিড়ির সাহায্যে মাটিতে নামিয়া কুন্‌কীর বুকের নীচে উপবিষ্ট হয়। এবং বন্য হস্তীর পেছনের পায়ে একখানা ছোট কঞ্চির লাঠিদ্বারা

আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া দেখে, সে লাথি দিতে অথবা আক্রমণ করিতে চাহে কি না। সুবিধা পাইলেই পেছনের দুই পায়ে দড়ির ঘন ঘন পেঁচ উঠাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধিয়া ফেলে। এই বাঁধকে 'পরতালা' বলে।

পরতালা করিবার কালে দাইদারের জীবন নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে বন্য হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা থাকে। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে সিড়ি বাহিয়া হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়া যায়। তদ্রূপ উপায় অবলম্বনের সুযোগ না পাইলে সিড়ির কুন্‌কীর প্রতি নির্ভর করিতে হয়। উক্ত কুন্‌কী, আক্রমণকারী বন্য হস্তীকে শুঁড় দ্বারা ঠেলা দিয়া, দাইদারকে বুকের নীচে রাখিয়া, এবং অনেক সময় শুণ্ড দ্বারা বন্যহস্তীকে ঠেলিয়া বা হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া, দাইদারকে রক্ষা করে। এই সময় দাইদারের জীবন রক্ষার ভার অনেক পরিমাণে সিড়ির কুন্‌কীর উপরই ন্যস্ত থাকে।

পূর্ব্বোক্তরূপ পেছনের পা পরতালা করা হইলে হস্তীকে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া ফেলে। এবং পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহার গলদেশে মোটা একটী কাছি (দোমা) বাঁধিয়া সেই দোমাটী সম্মুখের দিকে অবস্থিত অন্য একটী গাছের সহিত বাঁধে। বন্ধন দশায় পতিত হইলে হস্তীগুলি বাঁধ ছিঁড়িবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সময় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আছড়ে পড়ে, মাটিতে দন্তাঘাত করে এবং আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তৎকালে ইহাদের মুক্তির চেষ্টা, অধীনরতা এবং অশ্রুপাত দর্শন করিলে, নির্দ্দয় হৃদয়েও দুঃখের উদ্রেক হইতে দেখা যায়।

একে একে সমস্ত হস্তী পূর্ব্বোক্তরূপে বন্ধন করা হয়। দুগ্ধপায়ী ছোট বাচ্চাগুলি বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, তাহারা আপনা হইতেই জননীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা একটু বড় হইলে, তাহাদের গলায় একগাছি দড়ি বাঁধিয়া মায়ের সঙ্গে রাখা হয়, নতুবা তাহারা মায়ের মমতা ও দুগ্ধ পানের আকর্ষণ বিস্মৃত হইয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া পালায়।

সমস্ত হস্তী বাঁধা হইলে, তাহাদিগকে কোঠ হইতে একে একে বাহির করা হয়; সে আর এক গুরুতর ব্যাপার। যে পথে পালিত হস্তী কোঠে প্রবেশ করান হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহা উন্মুক্ত করিয়া বন্য হস্তী সেই পথেই বাহির করা হয়। হস্তীর অবস্থা, আকার ও বল বিবেচনায় কাহারও গলায় একটি এবং কাহারও গলায় দুইটী দোমা লাগান হয়; তাহার অন্য মাথা এক একটী পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহারা ঐ দোমার সাহায্যে বন্য হস্তীকে টানিয়া লইয়া যায়। বন্য হস্তী সম্মুখের দিকে ছুটিয়া অগ্রবর্ত্তী পালিত হস্তীকে আঘাত করিতে পারে এবং বল প্রকাশের সুবিধা পায়, এজন্য পিছনের পায়ে কাছি বাঁধিয়া, অন্য পালিত হস্তী দ্বারা পিছনের দিকে টান রাখা হয়, তদ্দরুণ সম্মুখের হস্তীকে আক্রমণ অথবা সম্মুখের দিকে অতিরিক্ত বল প্রকাশ করিতে পারে না।

এরূপভাবে অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে কাছি বাঁধিয়া পালিত হস্তী দ্বারা টানিয়া যখন বন্য হস্তীকে কোঠ হইতে বাহির করা হয়, তখন তাহারা আর এক অজানিত অভিনব বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠে, কোঠ হইতে বাহির হইতে চায় না, যেন অগত্যা সেই অবস্থাকেই শ্লাঘ্য জ্ঞান করে। বাহির করিবার কালে চীৎ-কাৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া, মাটিতে দাঁত বিদ্ধ করিয়া এবং বৃক্ষাদিতে মাথা ঠেকাইয়া সজোরে কোঠের ভিতরে থাকিতে চেষ্টা করে। আবার, বহুক্ষণের চেষ্টায় অতিকষ্টে কোঠ হইতে মাথা বাহির করিতে পারিলে, তখন পলায়নের জন্য এমন বেগে ধাবমান হয় যে, তিন চারিটী পালিত হস্তী প্রাণপণে টানিয়াও সহজে থামাইতে পারে না; ভীমবেগে পালিত হস্তীগুলিকে জঙ্গলের দিকে টানিয়া লইয়া চলে। তখন পুরাতন হস্তীগুলি অতিরিক্ত বল প্রয়োগের দরুণ মলমূত্র ত্যাগের সহিত চীৎকার করিতে থাকে।

কোঠ হইতে বহিষ্কৃত হস্তী বন্ধন করিবার উপযুক্ত স্থান পূর্ব্বেই নির্ব্বাচন করা হয়। সেই স্থানটী নদী কিম্বা পার্ব্বত্য ছড়ার সন্নিহিত হওয়া আবশ্যক; নূতন হস্তীর পক্ষে জল একান্ত প্রয়োজনীয়। হস্তীগুলি কোঠ হইতে বাহির করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃক্ষের সহিত বন্ধন করা হয়।

যে-সকল হস্তী বাঁধা হয়, পাতবেড়ের ভিতর তদতিরিক্ত আরও হস্তী থাকিলে কোঠের যে-সকল অংশের ক্ষতি হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সেগুলিকে কোঠে আবদ্ধ ও বন্ধন করা হয়।

ইহাই মেলা খেদার মোটামুটি প্রণালী। এতদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ও কার্য্য প্রণালীর কথা রহিয়া গেল, তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হয়। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তৎসমুদয় জানিয়া লওয়া কঠিন হয় না। পুরাতন খেদাকারিগণ সে-সকল বিষয়ে বিশেষ অভ্যস্ত থাকে।

বাংড়ি খেদা

এই প্রণালীতে খেদা করিতে, ১০০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত লোক লওয়া হয়। মেলা খেদার প্রণালী অনুসরণে হস্তীর সন্ধান লইয়া, পাতবেড় করিতে হয়। এই বেড়ের পরিধি প্রায়ই অর্দ্ধ মাইলের অধিক লওয়া হয় না। বেড়ের চতুর্দ্দিকে ৯ ফুট প্রশস্ত ও ১-½ ফুট গভীর পরিখা খনন করিতে হয়; এবং তন্মধ্যে বৃক্ষদ্বারা মেলা খেদার প্রণালীতে কোঠ প্রস্তুত করিয়া, হস্তী তাড়াইয়া আনিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করান হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হস্তী বন্ধন ও কোঠ হইতে বাহির করা হয়।

বাংড়ি খেদায় লোকবল ও অর্থব্যয় কম লাগে। হস্তীর ছোট ছোট দল থাকিলে এই প্রণালীতে ধৃত করাই সুবিধাজনক। বৃহৎ দলবদ্ধ হস্তী বাংড়ি খেদায় ধৃত করা অসম্ভব হয়, তজ্জন্য মেলা খেদা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয় প্রণালী

হস্তিগণ আরোহণ করিতে অক্ষম, এমন দুইটী উন্নত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমির (গিরি সঙ্কটের) মধ্য দিয়া হস্তীর দোয়াল (সর্ব্বদা গমনাগমনের পথ) থাকিলে, কোঠ প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে উক্ত গিরি-সঙ্কটের মুখ দুইটী বৃক্ষের বেড়া দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। এবং যে দিকে হস্তী বিচরণ করিতেছে, সেইদিকে প্রবেশদ্বার রাখিয়া, কোঠের ন্যায় পত্রাদির ছাউনির দ্বারা বেড়াগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। অতঃপর হস্তী আগমনের প্রতীক্ষায় কোঠের নিকট অতি অল্প সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত রাখা হয়। অনেকসময় হস্তিযূথ পথক্রমে আপনারাই আসিয়া কোঠে প্রবিষ্ট হয়, তৎকালে প্রহরীগণ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই হস্তীগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরে পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহাদিগকে বাঁধিতে হয়। অনেক সময় হস্তিযূথ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে কোঠের নিকটবর্ত্তী হইবার পর, সামান্য তাড়া করিলেই চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়া কোঠে যাইয়া পড়ে।

ফাঁসী শিকার

যে স্থানে বন্যহস্তী চড়িতে থাকে, পুরাতন কুন্‌কী হাতী লইয়া তথায় যাইয়া, ধীরে ধীরে বন্য হস্তীর সঙ্গে মিলাইয়া লয়। পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া একটী সুদৃঢ় দড়ি বাঁধিয়া, তৎসহ ফাঁসির দড়ির এক মাথা বন্ধন করা হয়, এবং বন্য হস্তীর সাহায্যে সেই ফাঁদ বন্যহস্তীর গলদেশে পরাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম হস্তীর দ্বারা গলায় ফাঁদ পরান মাত্র দ্বিতীয় একটী হাতীর সাহায্যে আর একটী ফাঁদ পরাইয়া দিতে হইবে। নতুবা অনেক সময় ফাঁদের দড়ি ছিন্ন করিয়া বন্য হস্তী পলায়ন করে, অথবা একদিক হইতে টান পড়ার দরুণ গলদেশে এরূপভাবে ফাঁসী আঁটিয়া যায় যে, তদ্দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আবদ্ধ হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই প্রণালীতে হস্তী ধৃত করিতে হইলে পালিত হস্তিনীগুলি বিশেষ বলিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। এই উপায়ে দুই চারিটীর অধিক হস্তী ধৃত করিবার সুবিধা ঘটে না। ছোট কুন্‌কী অথবা বাচ্চা হাতী এই প্রণালীতে ধৃত করা যাইতে পারে। বৃহৎ গুণ্ডা কিম্বা বলশালিনী কুন্‌কীদিগকে এতদুপায়ে ধৃত করা সহজসাধ্য নহে।

পরতালা শিকার

মদমত্ত বন্য গুণ্ডাহস্তী সময় সময় যূথভ্রষ্ট হইয়া পালিত কুন্‌কী হস্তিনীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। তখন পাঁচ সাতটী কুনকী দ্বারা তাহাকে বেড় করিয়া, কোঠের ভিতর আবদ্ধ হস্তীকে পরতালা করিবার নিয়মানুসারে, পেছনের দুইটী পা বাঁধিয়া ফেলে এবং তৎপর গলায় দোমা পরাইয়া বৃক্ষের সহিত বন্ধন করে। এই কার্য্যে

দাইদারের বিশেষ কৃতিত্ব চাই, আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়া তাহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

ফাঁদ শিকার

যূথভ্রষ্ট বন্য গুণ্ডা আসিয়া পালিত কুন্‌কীর সহিত মিলিত হইলে, সেই কুন্‌কীকে একটী বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া, একটী সুদৃঢ় দড়ির একমাথা উক্ত বৃক্ষের সন্নিহিত অন্য বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক অপর মাথায় ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখা হয়। এবং ফাঁদের দুই পার্শ্বে দুইগাছি সরু দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি দুইটীর অপর মাথা বৃক্ষস্থিত মানুষের হস্তে রাখা হয়। ফাঁদের দড়ি আবর্জ্জনাদি দ্বারা এরূপভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহা সমাগত বন্যহস্তীর দৃষ্টিগোচর না হয়। গুণ্ডাটী কুন্‌কীর আশেপাশে বেড়াইতে থাকে। বারম্বার যাতায়াত করিবার সময় ফাঁদের ভিতর পা ফেলিলেই বৃক্ষের উপরে অবস্থিত লোক ফাঁদের সহিত আবদ্ধ সরু দড়ি হঠাৎ উপরের দিকে টানিয়া লয়। তখন ফাঁদটী হস্তীর পায়ের উপরের দিকে উঠে এবং আঁটিয়া যায়। এই সরু দড়িকে 'কাল-রশি' বলে।

দড়ি ছিঁড়িবার নিমিত্ত হস্তীটী যত চেষ্টা করে, ফাঁদ ততই বেশী আঁটিতে থাকে। তৎপর পালিত পাঁচ সাতটী হাতীর বেড়ে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হস্তীর পেছনের পদদ্বয় বন্ধন ও গলায় দোমা পরান হয়।

কোন কোন সময় ফাঁসীর দড়ি ছিঁড়িয়া, অথবা দুই পায়ের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা ফাঁসী খুলিয়া, আবদ্ধ হস্তী পলায়ন করিয়া থাকে। পেছনের পদদ্বয় পরতালা না করা পর্য্যন্ত তাহাকে আবদ্ধ রাখিবার আশা করা যাইতে পারে না।

সচরাচর যে-সকল প্রণালীতে হস্তী ধৃত করা হয়, তাহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইল। প্রাচীনকালে অন্য প্রকারের প্রণালী অবলম্বিত হইত, বর্ত্তমানকালে তাহা প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার বিবরণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

হস্তী বন্ধন করিবার পর প্রতিদিন জলে নিয়া স্নান করাইতে হয়। সেই সময়ই তাহারা জলপান করিয়া থাকে। কোন কোন সময় বন্যহস্তীকে জল হইতে সহজে উঠান যায় না; তিন চারিটী পালিত হস্তী দ্বারা টানিয়া উঠাইতে হয়। এই সময় বন্ধন খোলা, পুনর্ব্বার বন্ধন করা, জলাশয়ে নেওয়া ও ফিরাইয়া আনা প্রভৃতি বন্যহস্তীর সমস্ত কার্য্যই পালিত হস্তীর সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের আহার্য্য বস্তুও পালিত হস্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়।

কাছির ঘর্ষণে ধৃত হস্তীর পায়ে এবং গলায় ঘা হইয়া থাকে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত হস্তীগুলি বন্ধন ছিন্ন করিবার নিমিত্ত নানা উপায়ে বল প্রকাশ করে। ক্ষত হইবার পর তাহার উপর দড়ির ঘর্ষণ পড়িলে অত্যন্ত বেদনা পায়, এই কারণে অধিক বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না, এবং ঘায়ের যাতনায় হস্তীগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কোন কোন সময় দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা, মাতাকে বন্ধনমুক্ত করিবার নিমিত্ত ছোট শুঁড়

দ্বারা বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিতে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলির এই কার্য্য দর্শন করিলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। বিস্তর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, কোন কোন সময় বাচ্চাগুলি ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। অনেক কুন্‌কী বাঁধা পরিবার পরে, ক্রোধে এবং দুঃখে এমন উন্মত্তা হয় যে, স্বীয় বাচ্চাকে দুগ্ধ প্রদান করে না। শিশু দুগ্ধ পান করিতে আসিলেই তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে লাথি মারিয়া বা শুঁড়ের আঘাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। এই অবস্থায় অনেক বাচ্চা দুগ্ধের অভাবে এবং গুরুতর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুণ্ডাগুলির ক্রোধ এবং অভিমান নিতান্ত প্রবল। এই জাতীয় অনেক হস্তী বন্ধন দশায় পতিত হইলে, অনাহারে জীবন ত্যাগ করে। কোন কোন হস্তী ক্রোধান্ধ হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে সজোরে পতিত হইয়া মাটীতে দণ্ডাঘাত করে, এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অনেক সময় বল প্রয়োগের দরুণ কোন কোন হস্তীর গলার দোমা আঁটিয়া ফাঁসী লাগে এবং তদ্দরুণ তাহার মৃত্যু হয়। এই সকল কারণে বন্যহস্তীর নিকট সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরী থাকে, এবং আকস্মিক ঘটনায়, প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কতিপয় পালিত হস্তী সর্ব্বদা নিকটে রাখা হয়।

সাইস্তা কার্য্য

বন্যহস্তীকে পোষ মানাইবার নিমিত্ত যে-সকল কার্য্য করা হয়, তাহাকে 'সাইস্তা' বলে। সাইস্তা কার্য্যে সুনিপুণ দাইদার ও মাহুত নিযুক্ত করিতে হয়। এই সময় হস্তীর কোন রকম মন্দ অভ্যাস জন্মিলে তাহা সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া উঠে; এজন্য হস্তী সাইস্তা করিবার কালে দোষ সংশোধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

সাজ করা

সাইস্তার প্রথম কার্য্য হস্তীকে সাজে তোলা। অগ্রভাগের পদদ্বয় এবং পশ্চাদ্ভাগের দুই পা পরতালা করিয়া বাঁধিতে হয়। তৎপর বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া একগাছি দনি বাঁধিতে হয়, তাহাকে 'ফারা' বলে। ইহার পর, অন্য একগাছি দড়ির মধ্যভাগ গলদেশের নিম্নে ঝুলাইয়া দিয়া তাহার দুই মাথা মস্তকের দুই পাশ দিয়া (দুই স্কন্ধের উপর দিয়া) পৃষ্ঠে উঠাইয়া পশ্চাদ্দিকে লেজের নিম্নভাগ জড়াইয়া বাঁধিতে হয়, ইহার প্রচলিত নাম 'দুব্‌লা'। পেটে আর একগাছি দড়ি বাঁধিতে হয়, তাহাকে 'পেট্টি' বলে। অতঃপর, পেছনের দুই পায়ের উপর ঝুলাইয়া, পৃষ্ঠদেশের দড়ির সঙ্গে আর একগাছি দড়ি বাঁধা হয়, তাহার নাম 'তুর্‌পান'। গলায় মালা আকারে কয়েক পেঁচ দড়ি বাঁধা হয়, তাহাকে 'দুল্‌শী' বলে। এতদ্ব্যতীত গলায় পূর্ব্ববৎ দোমা বাঁধা থাকে। এই কার্য্যকে 'সাজ' বলা হয়।

ইহার পর একটী মূলী বাঁশের অগ্রভাগের কিয়দংশ থেঁত্‌লাইয়া ঝাঁটার শলাকার ন্যায় করা হয়। এবং দূর হইতে তাহা হস্তীর সর্ব্বাঙ্গে বুলাইতে থাকে। নূতন হস্তীর শরীরে সুড়সুড়ি অতিশয় প্রবল। বংশ শলাকা দ্বারা অঙ্গ চুল্‌কানী তাহার অসহনীয় হয়, এবং শরীর নানা ভাবে বাঁকা করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। অনেক সময় উলটপালট হইয়া গড়াগড়ি করে। এই ভাবে দুই তিন দিন চুলকাইলে সুড়সুড়ি কমিয়া যায়।

চুলকান

ইহার পর পেছনে লোক যাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে হাতীর গায়ে হাত বুলায়। ইহাও প্রথম প্রথম হস্তী অসহ্য বোধ করে, ক্রমে সহিয়া যায়। এই সময় হস্তীর লেজের অগ্রভাগে দড়ি বাঁধিয়া, লেজটিকে উপরের দিকে পৃষ্টের দড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, নতুবা মনুষ্য পেছনে গেলেই লেজের আঘাত করিয়া থাকে। এত সজোরে আঘাত করে যে, তাহাতে মনুষ্যের প্রাণান্তও ঘটিতে পারে।

হাত বুলান

অতঃপর পেছনের পায়ে ঝুলান দড়িতে (তুরপানে) পদ স্থাপন করিয়া এবং লেজের নীচ হইতে গলা পর্য্যন্ত বাঁধা দড়ি (দুব্‌লা) দৃঢ় হস্তে ধরিয়া একটী লোক পেছনের পায়ের উপর দাঁড়ায়। হস্তী তাহাকে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে। যখন মনুষ্যটীর তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হয়, তখন লাফাইয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার চড়িয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় হস্তীর পাছায় এবং পৃষ্ঠের যে অংশ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক পাওয়া যায়, সেই অংশে হাত বুলাইতে থাকে। এই কার্য্য কতকটা সহিয়া গেলে, মনুষ্যটী দড়ি ধরিয়া অল্পে অল্পে পৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়, এবং ক্রমে পৃষ্ঠে চড়িয়া বসে। এই সময় সর্ব্বদাই হস্তীর সর্ব্ব শরীরে হাত বুলাইতে হয়। পৃষ্ঠে চড়িতে হস্তী আপত্তি না করিলে ক্রমে দুই পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া আসনে (ঘাড়ের পেছন ভাগে) যাইয়া বসে। তিন দিবসের মধ্যেই হস্তীর পৃষ্ঠে উপবেশন করা যাইতে পারে। হস্তী দুষ্ট বা অতি ক্রোধী হইলে, এই কার্য্যে কিছু অধিক সময় লাগে।

পৃষ্ঠে চড়া

হস্তী, পৃষ্ঠে লোক লইতে অভ্যস্ত হইলে, দুইটী পালিত হস্তী দুই পাশে রাখিয়া, তাহাদের পেটে জড়ান দড়ির সহিত বন্য হস্তীর গলদেশস্থ দুইগাছি দড়ি বাঁধিয়া দেয়, এবং পালিত হস্তীদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে লইয়া ময়দানে বাহির করে। এই সময় জাঠাধারী একটী লোক অগ্রগামী হয়, এবং পাশে ও পেছনে জাঠাসহ লোক থাকে। পালিত হস্তীদ্বয়ের মধ্য হইতে বন্য হস্তীটী অগ্রে, পশ্চাতে কিম্বা পার্শ্বে সরিয়া যাইতে চাহিলে, জাঠার আঘাতদ্বারা তাহাকে দমন করা হয়। হস্তী বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সাইস্তার সকল কার্য্যেই মাহুতগণ তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া থাকে, জাঠার আঘাত, দায়ের

জোড় ফিরান

কোপ ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে। এইরূপ মাইর খাইবার ভয়েই হস্তীগুলি বশতাপন্ন হইয়া থাকে।

'বৈঠ্' শিক্ষাদান

পূর্ব্বোক্ত ভাবে দুই তিন দিন ময়দান ফিরাইয়া বন্য হস্তীর পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে মেরুদণ্ডের চারি অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে দায়ের দ্বারা কাটিয়া একটী ক্ষত করা হয়। এই ক্ষতকে 'ঘাট' বলে। অতঃপর পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহাকে জলে নামাইয়া পৃষ্ঠস্থিত মাহুত পৃষ্ঠের ঘায়ের উপর কঞ্চির অগ্রভাগদ্বারা সজোরে চাপ দিয়া অতিশয় দুঃখ দেয় এবং 'বৈঠ্ — বৈঠ্' রবে চীৎকার করে। হস্তীটী যাতনায় অধীর হইয়া উলট পালট হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, এবং জলের ভিতর বসিয়া পড়ে। অনেক সময় মাহুতকে পীঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়, জলে পতিত হওয়ায়, সে দুঃখ পায় না।

এইভাবে ক্রমে 'বৈঠ্' শব্দ শুনিলেই বসিতে হইবে, হস্তী তাহা বুঝে। শব্দ শুনিয়া না বসিলে ঘায়ে খোঁচা দেওয়া হয়, এবং বসিলে আর খোঁচা দেয় না, ইহাই বসিতে শিখিবার মূল কারণ। জলের ভিতর বিনা আপত্তিতে বসিতে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে স্থলে বসান হয়।

ক্রমান্বয়ে ১৫ দিবস দুইবেলা জোড় ফিরাইবার পর, একটী পালিত হস্তী পরিত্যাগ করিয়া, একটী হস্তীর সহিত বাঁধিয়া ফিরান হয়; ইহাকে 'একছড়া' বলে। এইভাবে ১৫ দিবস চলিতে অভ্যাস করিবার পরে, পালিত হস্তী হইতে পৃথক করিয়া চলাফিরা করান হয়, এই সময় পালিত হস্তী সঙ্গে থাকে। হস্তীকে চলাফিরা শিক্ষা দিবার কালে পূর্ব্বাপরই তাহার ঘাড়ে মাহুত উপবিষ্ট থাকে, এবং ইঙ্গিত করিয়া, মাহুতের ইচ্ছানুরূপ চলিতে শিক্ষা দেয়।

মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে হস্তী উঠিতে, বসিতে এবং চলিতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য 'বোল' (সাঙ্কেতিক শব্দ) বুঝান হয়। সেই সকল শব্দানুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, প্রয়োজনীয় নানাবিধ কার্য্য শিখান হয়। হস্তীগুলি শান্ত, অনুগত ও কার্য্যক্ষম হওয়া, মাহুতের যত্ন ও পটুতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

হস্তী পালন

খাদ্য নির্ব্বাচন

নবধৃত হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য এবং যত্নসাপেক্ষ; খাদ্যের উপরও এবিষয় অনেকটা নির্ভর করে। কদলী বৃক্ষ, ডুমুর কিম্বা বটের ডাল, কচি ধান্যসহ ধান্য গাছ, বাঁশপাতা, বাঁশের করুল (নবোদগত বাঁশ), নল, তারা, খাগড়া, দল-ঘাস, ইক্ষু ইত্যাদি অবস্থাভেদে খাদ্য প্রদান করিতে হয়।

অধিক কলাগাছ খাইতে দিলে বর্ষার সময় হস্তীর শরীরে জলের ভার হইবার আশঙ্কা থাকে। অধিক বটের ডালা খাওয়াইলে অনেক সময় চক্ষুরোগ জন্মে।

তারা ভক্ষণে হস্তীর শরীরে গরম ক্রিয়া করে এবং জলের ভার লাঘব হয়। বাঁশের পাতা এবং করুল বিশেষ পুষ্টিকর ও হস্তীর পক্ষে উপাদেয় খাদ্য। কচিধান্য ও ইক্ষু বিষঘ্ন হইয়া থাকে। হস্তীকে ক্রমান্বয়ে রুটী ও চাউল খাইতেও অভ্যস্ত করা হয়। যে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বত বা কাঁচা ঘাস ইত্যাদি পাইবার সুবিধা নাই, সেই স্থানে রুটী, ধান্য, চাউল ও হালুয়া ইত্যাদি হস্তীর আহার্য্য নির্দ্ধারণ করা হয়।

সাইস্তা করিবার কালে হস্তীর পায়ে, গলায় ও অন্যান্য অঙ্গে ঘা করিয়া থাকে, সেই সকল ঘা সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া প্রতিকারজনক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা অনেক সময় ঘায়ে পোকা জন্মিয়া ও পচন ধরিয়া কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে কোন কোন হস্তীর মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যবিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ

পরিষ্কার ও শুষ্ক স্থানে হস্তী বন্ধন করিতে হয়। তাহার উপরে ছায়া থাকা আবশ্যক এবং স্থানটী সানবাঁধা হওয়া ভাল। হস্তী বন্ধন স্থানের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য এবং মলমূত্রাদি সর্ব্বদা স্থানান্তরিত করিতে হয়। মলমূত্রাদির মধ্যে হস্তী বাঁধিলে অল্প দিনের মধ্যেই পায়ের তলায় রোগ জন্মে এবং সর্ব্বদা রৌদ্রে বাঁধা রাখিলে তদ্দরুণ হস্তীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

প্রতিদিন জলে নামাইয়া হস্তীকে স্নান করান আবশ্যক। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝামা ও নারিকেলের ছোবড়াদ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়; তাহাতে চর্ম্মের মসৃণত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ মস্তকে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত, তাহাতে হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

হস্তীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণে আহার প্রদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। অল্পাহারে হস্তী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। অধিক দিন এক প্রকারের আহার্য্য প্রদান করাও সঙ্গত নহে, সময় সময় তাহা পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

হস্তীর দ্বারা তাহার সাধ্যাতিরিক্ত ভার বহন করাইলে, গুরুতর ভারি বস্তু টানাইলে, কিম্বা উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম প্রদান না করিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে খাটাইলে, অল্পকালের মধ্যেই হস্তীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া থাকে এবং তাহাই অনেক হস্তীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

কোন কোন প্রদেশে অধিকাংশ সময় হস্তীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া রাখা হয়। এরূপ স্থলে হস্তীর সম্মুখের দুই পা পরস্পর লোহার বেড়ী ও সুদৃঢ় দড়িদ্বারা বাঁধিয়া ছাড়িতে হয়; এবং প্রতিদিন তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা সঙ্গত। পূর্ব্বোক্ত রূপ পায়ের বাঁধকে 'বাগুা' বলে। কোন কারণে বাগুা ছিঁড়িয়া গেলে অথবা বেড়ী ভঙ্গ হইলে, অনেক হস্তী গভীর অরণ্যে পলায়ন করে এবং বন্যহস্তীর দলে মিশিয়া বন্যভাবাপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন অনেক পুরাতন হস্তী, বন্যহস্তীর সহিত পুনর্ব্বার খেদায় ধৃত হইতে দেখা যায়।

হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় বাঁধা থাকায়, জলে কিম্বা কাদায় পড়িয়া অথবা জঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইবার — এমনকি, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে, এই কারণেও অরণ্যে বিচরণ কালে সর্ব্বদা হস্তীর সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এই সময় বন্য গুণ্ডা হস্তীকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইবারও ভয় থাকে। বাচ্চা হস্তীগুলিকে অনেক সময় ব্যাঘ্রে আক্রমণ ও বধ করে।

হস্তীর পীড়া ও চিকিৎসা

হস্তীর ব্যাধি অনেক পরিমাণে মনুষ্যের ব্যাধির অনুরূপ দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হস্তী-চিকিৎসা বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন পুরাণ গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎসমুদয় আলোচনায় ইহাই জানা যায় যে, সাধারণতঃ মনুষ্যের শরীরে যে-সকল ব্যাধি জন্মিতে দেখা যায়, হস্তীর দেহেও সেই সকল ব্যাধি জন্মিয়া থাকে; ইহার চিকিৎসাও মনুষ্যের চিকিৎসাপ্রণালীতে হওয়া বিধেয়। গরুড়পুরাণ মতে মনুষ্যের চতুর্গুণ মাত্রায় হস্তীর নিমিত্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়। বৃহস্পতি সংহিতা, পরাশর সংহিতা, অগ্নিপুরাণ, পালকাপ্য ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে হস্তীচিকিৎসা বিষয়ক অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যমতেও গজায়ুর্ব্বেদের প্রণালীতেই হস্তীর চিকিৎসা হইয়া থাকে।

বন্যহস্তিগণ স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ আপনারাই ঔষধ সংগ্রহ করিয়া লয়। লবণযুক্ত মাটি, আঁটাল মাটি প্রভৃতি দ্বারাও ইহাদের ঔষধের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার অতিরিক্ত মাটি বিশেষতঃ বেলে মাটি ভক্ষণ করিয়া হস্তীকে অসুস্থ হইয়া পড়িতেও দেখা যায়।

মনুষ্যের পীড়া উপশমের নিমিত্ত যেমন শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি দৈবকার্য্য করা হয়, হস্তীর পীড়া নিবারণকল্পেও তদ্রূপ অনুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে; —

> "গজোপসর্গ ব্যাধীণাং শমনং শান্তি কর্ম্ম চ।
> পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রাণ ব্রাহ্মণে কপিলাং দদেৎ।।
> দন্তি দন্তদ্বয়ে মালাং নিবধ্নীয়াদু পোষিতঃ।
> মন্ত্রণং মন্ত্রিতা বৈদ্যো বচা সিদ্ধার্থ কামলে।।
> সূর্য্যাদ্যাঃ শিব দুর্গা শ্রীর্বিষ্ণুনা রক্ষসাঙ্গণঃ।
> বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটৈঃ।।" ইত্যাদি।
>
> গরুড়পুরাণ — ২০৭ অধ্যায়।

আয়ুর্বেদীয় অথবা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে হস্তীর রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে যে-সকল বিধান আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন। তজ্জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য্য। হস্তিবহুল ত্রিপুরা রাজ্যে, হস্তী চিকিৎসা বিষয়ে সুনিপুণ ও বহুদর্শী ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায়, হস্তীর রোগ নির্ণয় ও মুষ্টিযোগ চিকিৎসার প্রচলন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

তৎকালে পরীক্ষোত্তীর্ণ পশু চিকিৎসক ছিল না, এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই চিকিৎসা কার্য্য সাধিত হইত, তাহাতে সুফলও পাওয়া যাইত। অস্ত্রোপচারের প্রথাও ছিল, অনেক সময় ভাঙ্গা বোতলের চাড়া দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লৌহময় অস্ত্র প্রয়োগের প্রথাও বিরল ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা 'হস্তী চিকিৎসা' নামে বঙ্গ ভাষায় একখানা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছল। হস্তীর রোগ নির্ণয়, রোগের প্রকৃতি, ঔষধ নির্ব্বাচন ও ঔষধ প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা তাহাতে বিবৃত ছিল। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের সময় এই মূল্যবান গ্রন্থখানা মুদ্রণের আদেশ হইয়াছিল, নানা কারণে সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৎপর রাজ-গ্রন্থাগার হইতে ইহা কোথায় গেল, খোঁজ-খবর নাই। এবম্বিধ মূল্যবান একখানা প্রাচীন পুথি নিবষ্ট হওয়া নিতান্তই দুঃখের কথা, ক্ষতিজনকও বটে।

বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরা অঞ্চলে দাইদার ও মাহুত প্রভৃতি দ্বারা হস্তীর যে-সকল রোগের মুষ্টিযোগ চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহার দুই চারিটীর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

পীড়া

জহর বাত ঃ ইহা বাত রোগবিশেষ। এই রোগের আক্রমণে হস্তীর কোন কোন অঙ্গ বিকল ও অবশ হইয়া পড়ে। এতদ্দ্বারা পেছনের দিক আক্রান্ত হইলে, হস্তী বাঁচিবার আশা থাকে, সম্মুখের দিক আক্রান্ত হইলে প্রায়ই জীবনরক্ষা হয় না। এই রোগে পা আক্রান্ত হইলে হস্তী অচল হইয়া থাকে, এবং মুখের দিক আক্রান্ত হইলে আহারে অশক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা

পানকা লতার শিকড় (ইহা বনজাত লতা) ।৵ আধ পোয়া

রক্তচিতার মূল ।৵ আধ পোয়া

ইহা বাটিয়া চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তীকে খাওয়াইবে।

মাটী খাওয়া ঃ হস্তীগণ অনেক সময় পীড়া উপশমের নিমিত্ত স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে মাটী খাইয়া থাকে। আঁটাল মাটী অনেক সময় উপকারী হয়। কিন্তু তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিলে, অথবা বেলে মাটী খাইলে উদর স্ফীত হইয়া উঠে, দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে, উদরে ক্রিমি জন্মে এবং পাতলা বাহ্য হইতে থাকে।

ঝকরিয়া গোটার (লাটার) শাঁস ৫ কি ৬টী দানা।

লাল রেড়ির (ভেরণের) পাতা ৭ কি ৮টী।

লবণ ।৵ আধ পোয়া

বাটিয়া একবারে খাওয়াইতে হয়। ইহাতে মাটী ভক্ষণ জনিত উপদ্রব নিবারিত হয়; এবং পেট পরিষ্কার হইয়া থাকে। একবারে কাজ না হইলে, একাধিকবার এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

পীড়া

জলের ভার ঃ অনেক সময় হস্তীর উদরে, গলায়, অথবা সর্ব্বশরীরে জলের আধিক্য হেতু কোন কোন অঙ্গ স্ফীত হয়। এই কারণে হস্তী আহারাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা তন্দ্রাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে। এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়। নূতন ধৃত হস্তীর এই রোগ জন্মিবার আশঙ্কা বেশী থাকে। দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত ভাবে কদলী বৃক্ষ ভক্ষণেও এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা

এক্‌সা ব্রাণ্ডি	/।৵ দেড় পোয়া।
চিনা বারুদ	/। এক পোয়া।
মুসাব্বর	/। এক পোয়া।

এই সকল বস্তু মর্দ্দন করিয়া মিলাইবে। ইহাকে প্রলেপের উপযোগী (কর্দ্দমের ন্যায়) করিতে হইবে এবং এতদ্দ্বারা জলভারাক্রান্ত স্থানে বারম্বার প্রলেপ দিবে।

কোন কোন অবস্থায় একমাত্র মুসাব্বরের প্রলেপেও উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

হস্তীর শরীরে জল নামিলে, কিম্বা বাতা-ক্রান্ত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধেও উপকার হইয়া থাকে।

এক্‌সা ব্রাণ্ডি	১ এক পাইণ্ট।
চিড়া	/১ এক সের।
ইক্ষুগুড়	/॥ অর্দ্ধ সের।
লবণ	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।

এই সকল জিনিস মিলিত করিয়া কলা গাছের খোসাদ্বারা জড়াইয়া খাওয়াইতে হয়।

অন্য প্রকার ঃ

কালেশ্বর (কেউড়তা) গাছের শিকড়	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
মন গাছের ফুল	/ এক ছটাক।
জঙ্গি হরতকী	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
কাঁটানটের মূল	/। এক পোয়া।
সোহাগা	/ এক ছটাক।
বিষ কচু	/ এক ছটাক।

একত্রে মর্দ্দন করিয়া হস্তীকে খাওয়াইবে।

প্রকারান্তর ঃ

কাঁচা হরিদ্রা	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
ইক্ষুগুড়	/॥ অর্দ্ধ সের।
কাল লবণ	১০ অর্দ্ধ ছটাক।

মিলিত করিয়া হস্তীকে ভক্ষণ করাইলে রোগের উপশম হয়।

পীড়া

শরীরে বেদনা হইলে ঃ অনেক সময় হস্তীর অবস্থাদি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সে শরীরের বেদনায় কষ্ট ভোগ করিতেছে। সোয়ারসহ সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে, অতিরিক্ত ভার বহন বা ভারি বস্তু টানিলে, অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে হস্তীর শারীরিক বেদনা অনুভূত হয়।

চিকিৎসা

এই অসুখ নিবারণের নিমিত্ত যে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তাহাকে 'তাতার' বলে। তাতার প্রস্তুতের প্রণালী এই ;—

গরম জল	দশ সের।
সাদা তামাকু	অৰ্দ্ধ সের।
লঙ্কা মরিচ	এক পোয়া।
মুসাব্বর	অৰ্দ্ধ সের।
তারপিন তৈল	এক পোয়া।
লবণ	অৰ্দ্ধ সের।

এই সকল বস্তুর সহিত নিসিন্ধা পাতা ও ধূতুরা পাতা মিলাইয়া সিদ্ধ করিবে। জল রাব গুড়ের ন্যায় রং ধরিলে, সহ্যানুরূপ গরম থাকিতে পীড়িত স্থানে ধারা দিবে। এই ভাবে বারম্বার জল ঢালিলেই পীড়ার উপশম হয়।

একবারের সিদ্ধ করা জল বারম্বার গরম করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আগ্রন্বা ঃ পৃষ্ঠদেশে, মেরুদণ্ডে এবং পেটে দদ্রু জাতীয় শ্বেতবর্ণের এক প্রকার চৰ্ম্মরোগ হয়। ইহাকে প্রাদেশিক ভাষায় 'চাট্টা' বলে। এই রোগে সৰ্ব্বদাই চুলকানি থাকে, এবং পৃষ্ঠে গাদি বাঁধিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে, এবং পিঠ ঝাড়িয়া সমস্ত জিনিস ফেলিয়া দিতে চায়।

দালানের পুরাতন চুণ জলদ্বারা মৰ্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা অথবা তামাকুর পাতা ভিজান জলদ্বারা পীড়িত স্থানে বারম্বার লেপ দিতে হয়। এই ঔষধ উপৰ্য্যুপরি কিয়দ্দিবস ব্যবহার করিলে রোগ সারিয়া যায়।

সাঞ্জাপ ঃ পায়ের তলায়, নখের ফাঁকে এবং চতুপার্শ্বে চৰ্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া তাহা পচিতে থাকে। এই রোগগ্রস্ত হস্তী চলাফিরা করিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে।

হস্তরী মলমূত্র পূরিত অপরিষ্কৃত স্থানে হস্তী বন্ধন করিলে এই রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং হস্তী বন্ধনের স্থান সৰ্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

ধারাল অস্ত্রদ্বারা বৰ্দ্ধিত চৰ্ম্মগুলি চাঁচিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর সমপরিমাণ সরিষার তৈল ও ধূপ মিলিত করিয়া, পীড়িত স্থানে পুরু প্রলেপ প্রদান করিবে। অতঃপর এক খানা দা অথবা কাস্তিয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া লাল করিবে এবং তাহা প্রলেপের উপর বুলাইয়া ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিবে। ইহার পরে দালানের পুরাতন চুণ জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

পীড়া

ক্ষত রোগ ঃ বন্ধন রজ্জুর ঘর্ষণে, অস্ত্রাঘাতে কিম্বা অন্য কারণে হস্তীর শরীরে ক্ষত হইয়া থাকে। তাহা রীতিমত পরিষ্কার না করিলে এবং ঔষধ প্রয়োগ না হইলে, অনেক সময় ক্ষতস্থান পঁচিয়া উঠে এবং পোকা পড়ে। ঘাড়ের ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া অনেক সময় ঘাড়ের শিরা পর্য্যন্ত পচ ধরে এবং তদ্দরুণ হস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা

ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া,

আঁটাল মাটী	/২ দুই সের।
তামাকু পত্র	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
তারপিন তৈল	/। এক পোয়া।
আলকাতরা বা ফিনাইল	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
কাল খয়ের	/। এক পোয়া।
ধূপচূর্ণ	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।

এই সকল বস্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত জ্বাল দিয়া কিছু ঘন হইলে নামাইবে, এবং উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া পাট দ্বারা নির্ম্মিত মোটা তুলি দ্বারা ক্ষতস্থানে বারম্বার প্রলেপ দিবে। ঔষধ উষ্ণ থাকা আবশ্যক।

যে-কোন প্রকারের ক্ষত পচ ধরিলে বা অপরিষ্কার হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত —

জয়পাল বৃক্ষের পাতা	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
রসুন	/৵ অর্দ্ধ পোয়া।
লবণ	/ এক ছটাক।

বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে সমস্ত ময়লা কাটিয়া ক্ষত পরিষ্কার হয়।

দম্বল ঃ অনেক সময় হস্তীর শরীরে দম্বল (বৃহদাকারের ফোড়া) হইয়া থাকে। সচরাচর পৃষ্ঠদেশেই এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়; অতিরিক্ত ভার বহন বা গদি, চারজামা প্রভৃতিসহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ জন্য এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পুঁজ জন্মিয়া অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হয়।

মিলাইবার ঔষধ

আকন পাতা	/। এক পোয়া।
তামাকু পাতা	/। এক পোয়া।
তারপিন তৈল	/। এক পোয়া।
কাপড় ধোয়ার সাবান	/॥ আধ সের।

সমস্ত ঔষধ বাটীয়া তারপিন তৈলের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে দম্বল মিলাইয়া যায়।

তুঁতিয়া	/। এক পোয়া।
শ্বেতধূপ	/॥ অর্দ্ধ সের।
দারমুজ (শঙ্খবিষ)	।৷ অর্দ্ধ তোলা।
মাখন	/। এক পোয়া।
তিল তৈল	/১ এক সের।

একত্রে জ্বাল দিয়া রুগ্ন স্থানে মালিশ করিলে দম্বল মিলাইয়া যায়।

পীড়া	চিকিৎসা
মুখের নীচে জলের ভার ঃ হস্তীর মুখের নিম্নভাগ ও গলার উপরিভাগে অনেক সময় জলের ভার হইবার দরুণ স্ফীত হইয়া উঠে। এই রোগে হস্তী দুর্ব্বল হয় এবং আহার করিতে কষ্ট বোধ করে।	ব্রাণ্ডি ১ এক পাইন্ট। চিনা বারুদ /৷ এক পোয়া। মিশ্রিত করিয়া স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে রোগ আরোগ্য হয়।
বাহ্য অপরিষ্কার ঃ হস্তীর বাহ্য পরিষ্কার না হইলে, উদর স্ফীত হয়, আহারে অরুচি ঘটে, এবং হস্তী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।	গোলক চাঁপা (গুলাচি) ফুলের রস এক কাচ্চা পরিমাণে, চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তীকে খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অধিক পরিমাণে বাহ্য হইলে, দধি ও চিড়া মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।
কম্পন রোগ ঃ কোন হস্তী বাত রোগে আক্রান্ত হইলে সর্ব্বদা শরীর কাঁপিতে থাকে। এবং হস্তী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।	লাটা (ঝগড়িয়া গোটা) /৵ অর্দ্ধ পোয়া। ঐ লতার অগ্রভাগ /৵ অর্দ্ধ পোয়া। কাঁচা হরিদ্রা /৵ অর্দ্ধ পোয়া। অপমার্গের (উত্তোতলেংড়া) মূল /৵ অর্দ্ধ পোয়া। এই সকল ঔষধ বাটিয়া চাউলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে রোগ প্রশমিত হয়।
উদরে ক্রিমি হইলে ঃ পুনঃ পুনঃ বাহ্যের সঙ্গে ক্রিমি নির্গত হয়, পেটের বেদনায় হস্তী অস্থির থাকে, এবং ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।	লাল রেড়ি (ভেরণ) পাতা ।১ এক সের। ফিটকারী /৷ এক পোয়া। ইহা বাটিয়া, অগ্নিতাপে গরম করিয়া, চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।
হস্তীর দুর্ব্বলতা ঃ মাটী খাইবার দরুণ বা অন্য কারণে হস্তী দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকে। এবং অনেক সময় ইহাই হস্তীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।	তুলসী পাতা /৵ অর্দ্ধ পোয়া। বেল পাতা /৵ অর্দ্ধ পোয়া। কালা লবণ / এক ছটাক। বাটিয়া চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

পীড়া	চিকিৎসা
পোষ্টাই ঃ হস্তী সুস্থ থাকা অবস্থায় পোষ্টাই খাওয়াইলে কোন রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না, এবং হস্তী সবল থাকে।	**পোষ্টাই তৈরীর উপকরণ ঃ**

জমানী (জইন)........ /১ এক সের।
মেথি .... /১ এক সের।
ধন্যা .... /১ এক সের।
মৌরী (মিঠা জিরা) .... /১ এক সের।
জিরা .... /১ এক সের।
হরীতকী .... /১ এক সের।
কৃষ্ণজিরা .... /১ এক সের।
ব্রাণ্ডি .... /৪ চারি সের।
গুড় .... /৪ চারি সের।
এলাচি .... /॥ অর্দ্ধ সের।
যষ্টিমধু .... /॥ অর্দ্ধ সের।
পিপ্পলী .... /॥ অর্দ্ধ সের।
কুচিলা .... /॥ অর্দ্ধ সের।
দারুচিনি .... /॥ অর্দ্ধ সের।
লবঙ্গ .... /॥ অর্দ্ধ সের।
হিং .... /॥ অর্দ্ধ সের।
মধু .... /॥ অর্দ্ধ সের।
জায়ফল .... /৸ তিন পোয়া।
যত্রিক .... /। এক পোয়া।
কুড় .... /। এক পোয়া।
শুণ্ঠি .... /। এক পোয়া।
মুথা .... /। এক পোয়া।
ঘৃত .... /১ এক সের।

শক্ত বস্তুগুলি বাটিয়া সমস্ত মিশ্রিত ভাবে প্রতিবারে অর্দ্ধ সের পরিমাণে দিনে এক বার খাওয়াইবে।

বার বাঙ্গালা

রাজমালা তৃতীয় লহরের প্রারম্ভ ভাগেই পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ অমরমাণিক্যের অমরসাগর খননকার্য্যে বার বাঙ্গালার রাজ-সংজ্ঞক জমিদারগণ মজুর প্রদানদ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি হইতে কি পরিমাণ সাহায্য

লাভ হইয়াছিল, মহারাজ অমর তাহা জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, সুবুদ্ধি বিশ্বাস সেই হিসাব প্রদান করিয়া* পরিশেষে বলিলেন, ---

"কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ৪ পৃষ্ঠা।

মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ কালেও বার বঙ্গালার আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন, এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে;—

"সিদ্ধান্ত বাগীশ কহে কর অবধান।
রসাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান।।
শুভদিন শুভক্ষণ করিল তখন।
যুদ্ধের সেনাপতি হৈল রাজধর নারায়ণ।।
* * * *
দ্বাদশ বাঙ্গালা সৈন্য চলিল সহিতে।
সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড — ২৭ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রয়োজন স্থলে ত্রিপুরেশ্বরগণ বার বাঙ্গালার সাহায্য পাইতেন। ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে-সকল ভূ-ভাগ প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ দ্বারা শাসিত হইতেছিল, তাঁহারা 'বার ভূঞা' বা দ্বাদশ ভৌমিক নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলি 'বার বাঙ্গালা' বা 'দ্বাদশ বাঙ্গলা' নামে পরিচিত ছিল।

বার ভূঞাগণের শাসিত স্থানসমূহ 'বার বাঙ্গালা' নাম লাভ করিয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের শাসন, বঙ্গদেশের গণ্ডি অতিক্রমপূর্ব্বক উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক উইলফোর্ড, গঙ্গা ও পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী 'ব'-দ্বীপকে বার-ভূঞাগণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, † কিন্তু তাঁহারা 'ব'-দ্বীপের সীমার বাহিরেও হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর তট হইতে, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানগুলিসহ উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল, এবং এই আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

বার ভূঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক প্রথা কতকালের, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের 'ভূ-ঞা' উপাধি যে নিতান্ত আধুনিক নয়, তাহা জানিবার উপায় দুর্ঘট নহে। এ বিষয় লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। ইলিয়ট্ সাহেবের অনূদিত আকবরনামা, ডাক্তার ওয়াইজ-এর 'বার ভূঞা' শীর্ষক প্রবন্ধ, ‡

---

* উক্ত হিসাব এই লহরের ৮৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

† Asiatic Researches — Vol. XIV. Page — 451.

‡ Journal of Asiatic Society of Bengal — 1873.

ঁকৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভারতী পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্, প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজ', সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য', নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক চিত্র', সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস, আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের 'বার ভূঞা' এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের 'বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আলোচনা করিলে ভূঞাগণের অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর ভৌমিকগণই এস্থলে আলোচনার বিষয়ীভূত। তৎপূর্ব্বেও যে ভূঞা উপাধিযুক্ত শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব ছিল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ আমাদিগকে সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। ব্যাধরাজা কালকেতুর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মুকুন্দরাম বলিয়াছেন; —

"অভিষেক করাইল বসিলেক খাটে।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে।।
নিজ হস্তে নরপতি টিপ দিলা ভালে।
যত ভূঞা মিলিয়া খাটায় তার তলে।।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে; —

"গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা সবে করে পূজা।।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কবি ঘনরামও বার ভূঞার উল্লেখ করিয়াছেন; —

"রায়রেঞা বারভূঞা বৈসে সারি সারি।
কোলে করি কাগজ যতেক কর্ম্মচারী।।"

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

অন্যস্থানে লিখিত হইয়াছে; —

"হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বারভূঞা।
রায়রাঞা মোগল পাঠান মীর মিঞা।।"

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে একাধিকার বার ভূঞার উল্লেখ করিয়াছেন; —

(১) "বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।"
(২) "বারভূঞা বেষ্টিত ভূপতি কর ভূষা।।"

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল।

অনেকে মনে করেন, মুসলমান শাসনকালেই বার ভূঞার শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক নহে; হিন্দু রাজত্বেও এবম্বিধ প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিবার

নিদর্শন পাওয়া যায়। মেদিনী কোষে 'দ্বাদশ রাজকম্' শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল রাজার অধিকৃত প্রদেশ বা রাজ্যের বিস্তৃতি বড় বেশী ছিল না। বিংশতি যোজন হইতে চত্বারিংশদ্ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিকারী হইলেন দ্বাদশ রাজকের অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য হইতেন। ভরতের মতে দ্বাদশ রাজ-মণ্ডলের ঈশ্বর সম্রাট পদবাচ্য হইতেন। মনুসংহিতায় দ্বাদশ প্রকার সামন্ত রাজার কথা পাওয়া যায়।* এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ মণ্ডল বা বার ভূঞা উপাধিক শাসনকর্ত্তাগণের শাসন প্রথা আধুনিক নহে।

আবার, অনেকের মতে, সকল সময়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বার জন শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব ছিল না। 'দ্বাদশ' শব্দটী হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয়; অনেকে মিলিয়া কোন কাজ করিলেই তাহাকে 'বার ওয়ারি' নাম দেওয়া হয়, বহু লোক সমবেতভাবে কোন কার্য্য পণ্ড করিলে তাহাকে 'বার ভূতের কারখানা' বলিতে সর্ব্বদাই শুনা যায়। এই প্রথার বশীভূত হইয়াই, প্রাচীন কালে শাসনকর্ত্তাগণের 'দ্বাদশ ভৌমিক' নাম হইয়াছিল। ইঁহাদের সংখ্যা কখনও বার জনের অধিক এবং কখনও বা বার জনের ন্যূন থাকিলেও তাহারা 'বার ভূঞা' নামেই অভিহিত হইতেন। এবং তাঁহাদের সকলে একর সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিবার কথাও অনেকে স্বীকার করেন না। পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধি-কালে, শাসনসূত্র শিথিল হইয়া পড়ায়, সুযোগ পাইয়া ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূঞার অভ্যুদয় হইয়াছিল।

বার ভূঞার সংখ্যা ও নাম অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু একের সহিত অন্যের উক্তির সম্যক একতা পরিলক্ষিত হইতেছে না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে জেসুইট সম্প্রদায়ের মিশনরী ডু-জারিক, বঙ্গদেশ ভ্রমণকারী ফার্ণাণ্ডেজ কর্ত্তৃক পাইমেণ্টার নিকট লিখিত পত্রাবলী অবলম্বনে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন † তাহাতে বার ভূঞার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবার কথাও লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সকলের নামোল্লেখ করেন নাই; মাত্র চারি জনের নাম দিয়াছেন। মিঃ উইলফোর্ড বার ভূঞার উল্লেখ করিয়াছেন, ‡ ব্লকম্যান সাহেবও বার ভূঞার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, § ইঁহারা কিন্তু নামোল্লেখ করেন নাই। ডাক্তার ওয়াইজ্ এ বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি (১) ভাওয়ালের ফজল গাজি, (২) বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, (৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, (৪) বাকলার কন্দর্প রায়, (৫) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ (৬) চ্যাণ্ডিকানের প্রতাপাদিত্য, (৭) ভূষণার মুকুন্দ রায় — এই সাত

* মনুসংহিতা — ৭ম অধ্যায়।

† Oxford History of India — V. A. Smith.

‡ Wilford, Asiatic Researches — Vol. XIV. p. 451.

§ Blochmann's Contributions to the History and Geography of Bengal— p. 18.

জনের মাত্র নাম প্রদান করিয়াছেন।* বিভারিজ সাহেবও বার ভূঞার কতক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। † ইঁহাদের কেহই বার জনের নাম দিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী যে-সকল লেখক বারটী নাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একে অন্যের উক্তি স্বীকার করেন নাই। যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা যে বার জনের নাম প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ঈশা খাঁ মসনদ আলী ... ... খিজিরপুর বা কত্রাভূ।
(২) প্রতাপাদিত্য ... ... যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান।
(৩) চাঁদ রায় ও কেদার রায় ... ... শ্রীপুর বা বিক্রমপুর।
(৪) কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ... ... বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ।
(৫) লক্ষ্মণমাণিক্য ... ... ভুলুয়া।
(৬) মুকুন্দরাম রায় ... ... ভূষণা বা ফতেহাবাদ।
(৭) ফজল গাজী, চাঁদ গাজী ... ... ভাওয়াল বা চাঁদপ্রতাপ।
(৮) হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর ... ... বিষ্ণুপুর।
(৯) কংসনারায়ণ ... ... তাহিরপুর।
(১০) রামকৃষ্ণ ... ... সাতৈর বা সান্তোল।
(১১) পীতাম্বর ও নীলাম্বর ... ... পুটিয়া।
(১২) ঈশা খাঁ লোহানী ও ওস্‌মান খাঁ ... ... উড়িষ্যা ও হিজলী।

এই তালিকা সম্বন্ধেও মতবৈষম্য আছে। স্থূল কথা, আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদীসম্মত ভূঞার তালিকা কেহই প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান কালে নির্ব্বিরোধী তালিকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। 'বঙ্গীয় সমাজ' প্রণেতা শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে, ভাওয়ালের ব্রাহ্মণ রাজবংশ বার ভূঞার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন; 'বার ভূঞা' প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশয় ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। আমরাও সতীশবাবুর বাক্য সমর্থন করিতে পারিতেছি না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত ভাওয়াল প্রদেশ গাজী বংশ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, ইহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ রাজবংশের অভ্যুদয় তাহার পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে, তৎকালে ভূঞাগণের শাসন ও ভূঞা উপাধি রূপান্তরিত হইয়াছিল।

অগত্যা পক্ষে সতীশবাবুর প্রদত্ত তালিকাই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত তালিকার অন্তর্গত ভূঞাগণের পরিচয়সূচক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপর পৃষ্ঠে দেওয়া যাইতেছে।

---

* Dr. J. Wise — J. A. S. B. — 1874, 1875.

† Beveridge, Backergunj — P. 29.

১। **ঈশা খাঁ মসনদ আলী ঃ**— ইঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে, পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। (এই লহরের ১২৮ — ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

২। **প্রতাপাদিত্য ঃ**--- শ্রীহরির (বিক্রমাদিত্যের) ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বা তাহার কিছু পরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরি তৎপূর্ব্বেই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সুলেমানের কৃপায় যশোহরে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পুত্রের নাম রাখা হইল --- গোপীনাথ। গোপীনাথের জন্ম কোষ্ঠীর ফল আলোচনা করিয়া দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন, তিনি 'পিতৃহন্তা' হইবেন। দৈব বিড়ম্বনায়, গোপীনাথের জন্মের পঞ্চম দিনে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটিল, শ্রীহরি পত্নীবিয়োগে দারুণ মর্ম্মপীড়া পাইলেন, ইহার উপর আবার পুত্র, পিতৃঘাতী হইবে জানিয়া, তাঁহার মনোকষ্ট অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। এই সকল কারণে তিনি পুত্রের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বিরক্তিভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন।

শ্রীহরি, টোডরমল্লের সহায়তায় মোগল বাদশাহ মহামতি আকবর হইতে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া, মোগলের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময় হইতেই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের আরম্ভ হইয়াছিল (১৫৭৭ খ্রীঃ)।

তিনি স্বীয় পুত্র গোপীনাথকে যুবরাজ করিয়া প্রতাপাদিত্য নাম প্রদান করিলেন। প্রতাপ, পিতার বিরাগভাজন হইলেও তাঁহার খুল্লতাত জানকীবল্লভ (বসন্ত রায়) ও তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী, প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, জানকীবল্লভের জ্যেষ্ঠা পত্নী নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং প্রতাপই তাঁহাদের অপত্য স্নেহের সম্যক অধিকারী হইলেন। পিতৃব্য পত্নীর স্নেহ মমতা গুণে প্রতাপ কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই।

প্রতাপ শৈশবে নিতান্তই শান্তশিষ্ট ছিলেন, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধাশক্তির বলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, পারস্য ও বঙ্গভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল, অনেক কৃতবিদ্য শস্ত্রবিদ্ কর্ত্তৃক, বিশেষতঃ স্বীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সাহায্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায় বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র ছিলেন, উভয় ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাব যথেষ্ট ছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বের নিমিত্ত বসন্তরায়ের অসাধারণ খ্যাতি ছিল; কার্য্যতঃ তিনিই যশোহরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ক উন্নতিকল্পে যত্নবান ছিলেন। পিতার বিরাগভাজন হইয়াও পিতার অধিক স্নেহশীল পিতৃব্যের যত্ন ও চেষ্টায় এবং তাঁহারই সুশিক্ষা দানের ফলে প্রতাপ বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় হইলেন, এই কার্য্যে তাঁহার নৈপুণ্যও যথেষ্ট ছিল। এই সময় কায়স্থ জাতীয় সূর্য্যকান্ত ও ব্রাহ্মণ জাতীয় শঙ্কর নামক দুই জন যুবক প্রতাপের সহচর হইয়াছিল। প্রতাপ সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, এবং তিন বন্ধুতে মিলিয়া নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। বিক্রমাদিত্য প্রতিনিয়ত পুত্রের অত্যাচারের বার্ত্তা পাইয়া, এবং তাঁহার কোষ্ঠীর ফল স্মরণ করিয়া, এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুত্রের বিনাশ সাধন দ্বারা উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে যাত্রায় বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তিনি নিস্তার পাইয়াছিলেন।

দুর্দান্ত প্রতাপকে লইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উভয় ভ্রাতায় পরামর্শদ্বারা স্থির করিলেন, বিবাহ করাইলে প্রতাপের ঔদ্ধত্য দূর হইবে এবং সঙ্গীগণের সঙ্গও পরিত্যাগ করিবে। পুত্রকে বিবাহ করান হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তদ্দর্শনে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় পুনর্ব্বার পরামর্শ করিলেন, প্রতাপকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আগ্রার দরবারে রাখা সঙ্গত। সেখানে রাজনীতি ও সমরনীতি ইত্যাদি শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ঘটিবে, অথচ দরবারে একজন প্রতিনিধি রাখিবার নিয়মও রক্ষা হইবে। প্রতাপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, বসন্ত রায়ের প্ররোচনায়ই এরূপ ঘটিল। তিনি রাজ পুত্রোচিত যানবাহনাদিসহ শীঘ্রই আগ্রা যাত্রা করিলেন, অনুচর সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

প্রতাপ আগ্রা গমনের পূর্ব্ব হইতেই টোডরমল্ল সম্রাটের দরবারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি 'রাজ' উপাধি ও উজীরের পদ লাভ করিয়া বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পত্র লইয়া প্রতাপ, টোডরমল্লের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনিই প্রতাপকে দরবারে পরিচিত করিয়া দিলেন। প্রতাপের কমনীয় কান্তি ও বীরোচিত অঙ্গ গঠন দর্শনে সম্রাট বিমুগ্ধ হইলেন, তাঁহাকে আদরের সহিত দরবারে গ্রহণ করা হইল (১৫৮৭ খ্রীঃ)।

প্রতাপ উত্তরোত্তর সম্রাট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইতে লাগিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দরবারে কবিতার সমস্যা পূরণ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা দরবারে পৃথ্বীরাজকে সঙ্গী পাইয়াছিলেন। সে-কালে, আগ্রা নগরীর সকলেরই মুখে রাণা প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী শুনা যাইতেছিল। তাহা শুনিয়া, বিশেষতঃ পৃথ্বীরাজের নিকট রাণা প্রতাপের অসীম পরাক্রমের বিবরণ অবগত হইয়া, প্রতাপাদিত্যের বীর-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতাপ সিংহকে দেবতা জ্ঞানে, মনে মনে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করিতেছিলেন, এই সময় প্রতাপ, স্বীয় প্রধান অনুচর সূর্য্যকান্ত ও শঙ্করকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। চিতোরে যাইয়া, রাজপুত জাতির বীরত্ব খ্যাতিতে প্রতাপের অন্তর

এক নবীন প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, — যে উপায়ই হউক, মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে হইবে।

রাজ্য হাতে না পাইলে স্বাধীনতা ঘোষণার সুবিধা হইতে পারে না, পিতা ও পিতৃব্যকে বুঝাইয়া স্বীয় মতের অনুবর্ত্তী করা অসম্ভব, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া প্রতাপ, যশোর রাজ্য স্বহস্তে আনিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আগ্রায় অবস্থানকালে, যশোহরের দেয় রাজস্ব বসন্ত রায় কর্ত্তৃক প্রতাপের নিকট প্রেরিত হইত। প্রতাপ কয়েকটী কিস্তির রাজকর যথাস্থানে প্রদান না করিয়া আত্মসাৎ করিলেন, এবং সম্রাটকে জানাইলেন যে, যশোহরের রাজস্ব রীতিমত প্রদান করা হইতেছে না।

এই সময়ে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, রাজা টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে গমন করিয়াছেন। এই সুযোগে প্রতাপ বাদশাহকে জানাইলেন --- তাঁহাকে যশোহরের রাজত্ব-সনন্দ প্রদান করা হইলে, তিনি বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া, মোগলের চিরানুগত হইয়া থাকিবেন। বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। প্রতাপ রাজত্বের সনন্দ পাইয়া সম্রাট-দত্ত খেলাত ও সৈন্য-সামন্তসহ স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। এবং অতর্কিতভাবে যশোহরে উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন, (১৫৮২ খ্রীঃ)।

প্রতাপের এই আকস্মিক আক্রমণে নগরময় বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল, বুঝি বা এবারই প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল ফলিয়া যায়। কিন্তু রাজা বসন্ত রায়ের কৌশলে প্রতাপ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। পিতা এবং পিতৃব্য একত্রিত হইয়া প্রতাপকে বলিলেন, --- "তোমার বাদশাহ হইতে সনন্দ গ্রহণ করা উত্তম কার্য্য হইয়াছে; আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আর রাজ্য শাসনের শক্তি নাই, সুতরাং তুমি কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়।" প্রতাপ দেখিলেন, পিতা বা পিতৃব্য তাঁহার উদ্দেশ্যের বিরোধী নহেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের সস্নেহ সদয় ব্যবহারে প্রতাপ বিমুগ্ধ হইলেন, তাঁহার বিদ্রোহ-ভার তিরোহিত হইল। তিনি রাজত্ব লাভের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমার ভাবেই রাজ্যশাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা এবং পিতৃব্য তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন না।

বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায়। ইঁহার সহিত প্রতাপের সদ্ভাব ছিল না। এই সূত্রে পারিবারিক মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রতাপ বসন্ত রায়কে পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, এখন সেই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। প্রতাপের পিতা দেখিলেন, সমস্ত সম্পত্তি প্রতাপের হস্তে থাকিলে গৃহ-বিবাদে অচিরেই ধ্বংসমুখে পতিত হইতে হইবে। তিনি রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া। ॥৵০ (দশ) আনা অংশ প্রতাপকে এবং ৷৵০ (ছয়) আনা অংশ

বসন্ত রায়কে অর্পণ করিলেন। বসন্ত রায়ের পুত্রগণের সম্পত্তি বিভাগে ঘোর আপত্তি থাকলেও বসন্ত রায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাহা মানিয়া লইলেন।

প্রতাপ, উভয় অংশের রাজধানী এক স্থানে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুন্দরবন আবাদ দ্বারা ধুমঘাটে, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গম স্থানে, নূতন দুর্গ ও তৎসন্নিকটে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় প্রতাপাদিত্যের পিতা, রাজা বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করিলেন, ইহা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

পিতৃ বিয়োগের পর, বসন্ত রায়ের প্রযত্নে প্রতাপ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এবং নূতন রাজধানীর কার্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত রহিলেন। এই সময় জঙ্গল আবাদ উপলক্ষে গভীর অরণ্যমধ্যে জীর্ণ মন্দিরে অবস্থিতা শ্রী শ্রীযশোহরেশ্বরী দেবী বিগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল।* এই ঘটনাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ মনে করিয়া প্রতাপ বিশেষ উৎসাহিত হইলেন, জনসাধারণও দেবানুগৃহীত বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিল।

এই সময় মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নিমিত্ত প্রতাপ নানাদেশীয় ভুঞাগণের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। বসন্ত রায় এই পরামর্শে যোগদান করিলেন না। তিনি প্রতাপকে বুঝাইলেন, এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার এখনও সময় হয় নাই। এই সময় অকৃতকার্য্য হইলে ভবিষ্যতের আশা নির্ম্মূল হইবে। অতএব এই প্রস্তাবে নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। প্রতাপ তাহা বুঝিলেন না, তাঁহার উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান জন্য বসন্ত রায়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বসন্ত রায় বুঝিলেন, প্রতাপের ভবিষ্যৎ নিতান্ত বিপদ-সঙ্কুল। তদবধি তিনি প্রতাপ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন।

প্রতাপাদিত্য মোগল বিদ্বেষী হইলেও ঘটনা পরম্পরা পাঠানের বিরুদ্ধে উড়িষ্যা অভিযান কালে মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই যাত্রায় তিনি উড়িষ্যা হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহ আনয়ন করেন। এই বিগ্রহ ধূমঘাটের সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য, আশৈশব পিতৃব্য বসন্ত রায় হইতে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের সন্তানহীনা প্রাধানা পত্নী প্রতাপকে আপন সন্তান জ্ঞানে লালনপালন করিয়াছেন। ইঁহাদের স্নেহগুণে প্রতাপ মায়ের অভাব বুঝিতে পারেন নাই। প্রতাপের সুখ-সমৃদ্ধি ও সম্মান প্রতিপত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত

---

* যশোহরেশ্বরী পীঠ দেবী। সত্যযুগ হইতে এই পীঠস্থান জাগ্রত ছিল। ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে, এখানে দেবীর বাহু ও পদ পতিত হইয়াছিল। তন্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে ;—

"যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যুশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবস্তত্র সর্ব্ব সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।"

তন্ত্র চূড়ামণি।

বসন্ত রায় সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন এবং তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ প্রতাপ সর্ব্বদাই পিতৃব্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার সদুপদেশকে মন্দ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বসন্ত রায়ের পুত্রগণের সহিত, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায়ের সহিত পূর্ব্ব হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল, সেই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং এই সূত্রে বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষবহ্নি দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় তাঁহার বিদ্বেষের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(১) বসন্ত রায়ের পুত্রগণের সহিত প্রতাপের সর্ব্বদাই কলহ-বিবাদ হইত, বসন্ত রায়ের দ্বিতীয়া পত্নীও প্রতাপকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই ব্যাপারে প্রতাপ মনে করিতেন, পিতৃব্য বসন্ত রায় অন্তরালে থাকিয়া এই কলহ বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের প্রতি কোপাবিষ্ট ছিলেন।

(২) প্রতাপাদিত্যকে সদুদ্দেশ্যে আগ্রার দরবারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, বসন্ত রায়ই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতাপ মনে করিলেন, পিতৃব্য কৌশলে তাঁহাকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাও বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের আক্রোশ বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

(৩) মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নিমিত্ত প্রতাপকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা বসন্ত রায়ের মন্দ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই প্রতাপ মনে করিলেন। সেইসূত্রে তিনি পিতৃব্যের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন।

(৪) চাকসিরি (চকশ্রী) পরগণার অধিকার লইয়া উভযের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, প্রতাপ অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের উপর এত বিদ্বেষান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া উপদ্রব নিবারণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বসন্ত রায় অনেক সহ্য করিয়াও বিবাদের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহারে তিনিও ক্রমশঃ উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সুতরাং বিবাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

এরূপ মনোমালিন্য চলিবার সময়ও বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রতাপাদিত্যের নিকটই থাকিতেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক সম্পাদন করিতেন। পিতৃশ্রাদ্ধকালেও প্রধান্য পত্নীকে লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এবার দ্বিতীয় পত্নীর প্ররোচনায় বসন্ত রায় প্রথমা পত্নীকে আনিলেন না, একমাত্র প্রতাপাদিত্যকে শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই ঘটনায় বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী নিজেকে নিতান্ত অপমানিতা মনে করিলেন, এবং প্রতাপও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

প্রতাপ স্বয়ং যোদ্ধবেশে সুসজ্জিত হইয়া কতিপয় উৎকৃষ্ট শরীররক্ষীসহ পিতৃব্যের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি রায়গড় দুর্গে (বসন্ত রায়ের বাড়ীতে) প্রবেশ করা মাত্র, তাঁহাকে যোদ্ধৃবেশে আগমন করিতে দেখিয়া, গোবিন্দ রায় (বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) শঙ্কান্বিত হইলেন ; তিনি মনে করিলেন, প্রতাপ তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। কোনরূপ বাক্যালাপ হইবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ, দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমান্বয়ে দুইটী তীর নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যক্রমে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রতাপের জীবন রক্ষা হইল। এই ঘটনায় প্রতাপের কোপানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে তীরবেগে যাইয়া গোবিন্দ রায়কে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিষম কোলাহল উত্থিত হইল। শ্রাদ্ধস্থান হইতে বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হইবার সংবাদ পাইলেন। পুত্রহন্তার প্রতি বসন্ত রায় অসাধারণ স্নেহশীল হইলেও এই দারুণ দুর্ঘটনায় তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। বসন্ত রায় বীর এবং সাহসী, তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাঁহার 'গঙ্গাজল' (তরবারির নাম) আনিতে ভৃত্যকে বলিলেন। ভৃত্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া, এক ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া উপস্থিত করিল। ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্য সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, হস্তস্থিত তরবারির এক আঘাতে বসন্ত রায়ের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। পিতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহশীল পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যাদ্বারা তাঁহার কুষ্ঠীর ফল ফলিল। ইহা সম্ভবতঃ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

প্রতাপাদিত্য উগ্র স্বভাবের দরুণ যেমন বহুলোকের অপ্রিয় ছিলেন, তেমন দানশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজনও হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধনদ্বারা তিনি যে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরদিগকে পর্য্যন্ত তাহার কু-ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। রামরাম বসুর মতে প্রতাপ, গোবিন্দ রায়ের গর্ব্ভবতী স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, মাতৃস্থানীয়া মহারাণী, পতিহত্যার কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহারা হইলেন। তিনি শোকে, ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া অনেক আর্ত্তনাদ করিলেন। পরিশেষে পতির ছিন্নশির লইয়া চিতারোহণ করিলেন। মৃত্যুকালে সতী, পতিহন্তা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—"তোমার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজগ্রস্ত হইবে।" উত্তেজনাবশে, বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতাপাদিত্য, চতুর্দ্দিক ভাবিবার অবসর না পাইয়া পিতৃব্যকে হত্যা করিলেন, কিন্তু এই অকার্য্যের দরুণ তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। এই সময় হইতে রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার বিস্তর অবনতি ঘটিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য কেবল হুজুগপ্রিয় ছিলেন না, তিনি বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন-কথা আলাচনা করিলে পদে পদে এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজত্ব লাভের পর প্রায় দশ বৎসরকাল তিনি যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন।

বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর রূপ বসু নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয় বসন্ত রায়ের পুত্রদিগকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত পাঠানগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তৎকালে পাঠানগণ মোগলকর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া, সগরদ্বীপের পরপারে হিজলীতে অবস্থান করিয়া বল সঞ্চয় করিতেছিল। পক্ষান্তরে, মঘ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদল সর্ব্বদাই নদীপথে আসিয়া লুণ্ঠন, নরহত্যা ও মনুষ্য চুরি ইত্যাদি নানাবিধ অত্যাচারে লিপ্ত ছিল। প্রতাপ বুঝিলেন, জলদস্যুর অত্যাচার নিবারণ জন্য সগরদ্বীপে এক সুদৃঢ় সেনানিবাস স্থাপন করা আবশ্যক। কিন্তু হিজলীর পাঠানদিগকে দমন করিতে না পারিলে এখানকার দুর্গ নিরাপদ হইবে না। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তিনি সগরদ্বীপে নৌ-বাহিনীর একটী কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি প্রবলবেগে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে পাঠান দলপতি ঈশা খাঁ ও তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পরে প্রতাপাদিত্য জয়লাভ করেন। এই সময় হইতে প্রতাপ হিজলীতে এক সেনানিবাস ও সগরদ্বীপে নৌ-বিভাগের এক প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন।

পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া মোগলগণ বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপনের সন্ধিকালে বঙ্গের ভৌমিকগণ পরস্পর মিলিত ভাবে দেশমাতৃকার উদ্ধার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং সকলেই আত্মবল বৃদ্ধির নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় অন্যান্য ভূঞাগণের ন্যায় প্রত্যাপদিত্যও প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কথিত আছে, তিনি নিজ নামের মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সীমাও প্রসারিত হইয়াছিল। দক্ষিণদিকে সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রতাপের রাজ্য বিস্তার করিবার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ২৪ পরগণার সমগ্র ভাগ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

মোগলগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেছিলেন না। এই সময় ভূঞাগণ পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেশময় ভীষণ বিদ্রোহ- বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই সময় টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আসিয়া, ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে বলে এবং কাহাকেও কৌশলে বাধ্য করিলেন বটে, প্রকৃতপক্ষে তদ্দ্বারা কোন কার্য্যোদ্ধার হইল না। তাঁহার কৃত

রাজস্বের হিসাব কাগজেই নিবদ্ধ রহিল। তদ্দ্বারা রাজকোষের কোন উপকার হইল না।

খাঁ আজম বা শাহাবাজ খাঁ বঙ্গদেশে আসিয়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর উড়িষ্যা বিজয়ী মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে রাজমহলে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন।* এই সময় ভৌমিক সমাজ পাঠানদিগের সহিত মিলিতভাবে মোগলের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমেই স্বীয় পুত্র দুর্জ্জয় সিংহ প্রমুখ মোগলবাহিনী দ্বারা ভুষণা অধিকার করেন। এই সময় ক্রমান্বয়ে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থান মোগলের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই মানসিংহ দক্ষিণাপথে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ বঙ্গের সুবেদারী লাভ করিলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করায়, তৎপুত্র মহাসিংহ পিতৃ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাঁহার সময়ে ভূঞাগণ মস্তকোত্তলন করিলেন। শ্রীপুরে কেদার রায় এবং যশোহরে প্রতাপাদিত্য এই সময় বিশেষ প্রতাপান্বিত ছিলেন, ভূষণার মুকুন্দ রায়ও মোগলশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই সুযোগে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজ্যের সীমা প্রসারণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন (১৫৯৯ খ্রী)। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি বহু প্রদেশ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন।

মানসিংহ সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাস্ত করিয়া ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ভৌমিকদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে আসিতে হইয়াছিল। তিনি ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় যশোহরের দিকে যাত্রা করিলেন।

ক্রমান্বয়ে কতিপয় দিবস যুদ্ধ হইবার পর, প্রতাপ পরাজিত হইয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

জ্ঞাতি-বিরোধ এবং সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাবই প্রতাপের এবম্বিধ পরাজয়ের প্রধান কারণ। বসন্ত রায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা, সামান্য দোষে স্ত্রীলোকের স্তন কর্ত্তন করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর ব্যবহারের সুরাসক্ত প্রতাপের প্রতি সকলেই বিরক্ত ছিল। বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের পুত্র কুচ রায়কে যুদ্ধকালে মান সিংহের সহযাত্রী দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ভাব পোষণ করিতেছিল। কুচ রায়, পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া সুখী হউক, ইহা সকলের অভিপ্রেত ছিল। মানসিংহের সহিত সন্ধির ফলে কুচ রায় যশোহর রাজ্যের ।৵০ আনা অংশ লাভ করিলেন এবং প্রতাপ ।।৵০ আনা অংশ লইয়া, মোগল সম্রাটের সামন্তরাজ রূপে পরিগণিত হইলেন।

* Stewart's History of Bengal. - P. 205.

সম্রাট আকবরের পরলোকগমনের পর, তৎপুত্র জাহাঙ্গীর ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া দেখিলেন, বঙ্গদেশ তখনও ভূঞাগণের হস্তেই রহিয়াছে। তাঁহারা মানসিংহের প্রযত্নে যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন না এটা জাহাঙ্গীরের সহ্য হইল না ; তিনি বঙ্গের ভৌমিকদিগকে নির্ম্মুল করিতে প্রয়াসী হইলেন। ক্রমান্বয়ে কুতুবউদ্দীন ও জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ-এর পরে, ইস্‌লাম খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করা হইল। ইনি এ দেশে আসিয়াই ভূঞাগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের অনেকেই নব নিয়োজিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন। প্রতাপ স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া স্বীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন; কিন্তু নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, প্রতাপকে আসিতে বলিলেন। প্রতাপ, বাধ্য হইয়া নবাবের সহিত দেখা করিলেন, তাঁহাকে মোগল পক্ষে যে-সকল কার্য্য করিতে বলা হইল তাহা সম্পাদন জন্য সম্মতি প্রদান করিয়া আসিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই করিলেন না।

প্রতাপের এবম্বিধ ব্যবহারের কোপাবিষ্ট হইয়া ইসলাম খাঁ যশোহর রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মোগলগণের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইয়া প্রতাপের চৈতন্য হইল, তিনি বঙ্গদেশ জয়ের নিমিত্ত মোগলের সাহায্যকল্পে ৮০ খানা রণপোতসহ স্বীয় পুত্রকে ঘোড়াঘাটে নবাবসমীপে প্রেরণ করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া প্রতাপকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্যদল অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিলেন।

পথে কয়েকটী যুদ্ধ হইল, তাহাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটিয়াছিল। মোগল সৈন্য ক্রমশঃ যশোহরের সন্নিহিত হইল। এই সময় প্রতাপ বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভূঞাগণের মধ্যে বাকলার রাজা রামচন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করিয়াও মোগল কর্ত্তৃক ঢাকায় নজরবন্দী কয়েদী ভাবে আবদ্ধ রহিলেন। কেদার রায়ও মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত। অন্যান্য ভূঞাগণের কেহ যুদ্ধে পরাস্ত ও কেহ বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগলের পক্ষাবলম্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য লাভের আশা নাই। একাকী প্রতাপ, সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফলকাম হইবেন, এমন আশা রহিল না। তথাপি তিনি নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, সাধ্যানুসারে দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। এবং উপায়ান্তর না দেখে মোগল সেনাপতি ইনায়েৎম খাঁ-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইনায়েৎ প্রতাপের অবস্থা বুঝিয়া, সন্ধির প্রস্তাব আগ্রাহ্য করিলেন।

মোগলগণ যশোহর দুর্গ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর জয়লাভ করিল। প্রতাপ স্বীয় পুত্র উদয়াদিত্য-সহ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন পিতা পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল, আর অযথা যুদ্ধ করিয়া সৈন্যক্ষয় ও প্রজার

ধন-প্রাণ বিপন্ন করা সঙ্গত হইবে না। এই সময় আত্মসমর্পণ করিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করাই সঙ্গত।

প্রতাপ দুইজন মাত্র মন্ত্রী সমভিব্যহারে মোগল সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ-এর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি, প্রত্যপকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাকে হস্তগত করিয়া, নবাব দরবারে স্বীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাই সেনাপতির উদ্দেশ্য ছিল।

ইনায়েৎ খাঁ প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গেলেন। তাঁহার সৈন্যাবাস যশোহরে রহিল। প্রতাপ, যথাসময়ে ঢাকায় পৌছিয়া, ইনায়েৎ খাঁ-এর সহিত, নবাব ইস্‌লাম খাঁ-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাবের আদেশে প্রতাপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং তাঁহার রাজ্য, মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। ইনায়েৎ খাঁ তথাকার প্রথম শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইলেন।

প্রতাপ সন্ধির আশায় ঢাকায় যাইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এদিকে মোগল সেনাপতি মীর্জ্জা সহন প্রমুখ সৈন্যদল যশোহর রাজ্য লুণ্ঠন ও স্ত্রীলোকগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। উদয়াদিত্য অনুনয় বিনয় দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল দর্শিল না ; অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় প্রতাপাদিত্য কারাবদ্ধ হইবার সংবাদ পাইয়া উদয়াদিত্য ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বারম্বার মোগলদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে, সম্মুখ সমরে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিলেন।

উদয়াদিত্যের মৃত্যু সংবাদ দুর্গে পৌছামাত্র, মহারাণী শরৎকুমারী, পুরমহিলাগণ সহ গুপ্তদ্বার পথে, নৌকাযোগে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং যমুনাতে নৌকা পৌছিলে, নৌকার তলদেশ ভঙ্গ করিয়া, জলমগ্ন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুদিন কারাযন্ত্রণা ভোগের পর, নবাব ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় আগ্রায় সম্রাট দরবারে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাকে আগ্রায় পৌছান যাইতে পারে নাই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর সেখানেই তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

প্রতাপের জীবনীর অনেক কথাই বলা হইল না, এস্থলে তাহা বলিবার উপায়ও নাই। ইহা প্রতাপ-চরিত্রের রেখা-চিত্র মাত্র। যে-সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইঁহার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৩। চাঁদ রায় ও কেদার রায় ঃ— এই ভ্রাতৃযুগল বিক্রমপুরের শাসন-কর্ত্তা এবং ভূঞাগণের মধ্যে প্রধান কল্পের ছিলেন। ইঁহাদের বিবরণ এই লহরের

৯০—৯৭ পৃষ্ঠায় যাহা প্রদান করা হইয়াছে, এই গ্রন্থে তদতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণের প্রতিই নির্ভয় করিতে হইল।

৪। **কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ঃ**— ইঁহারা বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই লহরের ৯৭—১০৪ পৃষ্ঠায় ইঁহাদের মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

৫। **লক্ষ্মণমাণিক্য ঃ**— ইনি ভুলুয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য ও তৎ পুত্র বলরামমাণিক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই লহরের ১১৭—১২৮ পৃষ্ঠায় প্রদন করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

৬। **মুকুন্দরাম রায় ঃ**— ইনি ভূষণা বা ফতেহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে সেনাপতি মুনায়েম খাঁ বঙ্গের বিদ্রোহ দমন জন্য আগমন করেন, এই সময় মোরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি ভূষণা বা ফতেহাবাদের বিদ্রোহ দমন করেন।

দায়ুদ ও মুনায়েম খাঁ-এর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইবার পর, ফতেহাবাদ বিজেতা মোরাদকে জলেশ্বরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করা হয়। মুনায়েম খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দায়ুদ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় মোরাদ পুনর্ব্বার ফতেহাবাদে প্রেরিত ও তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সুযোগে ভূষণার অধিপতি মুকুন্দ রায় মোরাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিয়া সমগ্র ফতেহাবাদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বেভারিজ সহেবের অনুবাদিত আকবরনামা গ্রন্থে পাওয়া যায়,–

"Murad Khan died a natural death. Mukunda the land holder of that part of the country, invited his sons as his guests and put them to death and laid hold of his estate."

Akbarnama (Beveridge) Vol. 3. P. 469.

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে টোডরমল্ল বঙ্গদেশে শাসন শৃঙ্খলার নিমিত্ত আগমনকালে মুকুন্দরামকে ভূষণার ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম সুচতুর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বাহ্যতঃ বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং সময় সময় সামান্য পেসকস্‌ও পাঠাইতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সম্রাট আকবরের সময় যে দেশব্যাপী বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, মুকুন্দরাম তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত ভূঞাগণের পতনের পরেও মুকুন্দরাম কিয়ৎকাল স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ইসলাম খাঁ বঙ্গের প্রধান কল্পের ভূঞাদিগকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুকুন্দরামের সহিত আঁটিয়া আসিতে পারেন নাই। ইসলাম খাঁ

মুকুন্দরামের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া তাঁহারই সাহায্যে কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় মুকুন্দ, পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদারের পদ লাভ করেন। কিয়ৎকাল পরে সেই পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিৎকে নিযুক্ত করিয়া মুকুন্দ ভূষণায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাটের পেসকস্ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে, এই সময় মুকুন্দরাম, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই উক্তি সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও মুকুন্দ রায় যে মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মুকুন্দ রায়ের পর তদীর পুত্র সত্রাজিৎ, বঙ্গের সুবেদার ইসলাম খাঁ-এর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অধ্যাপক সার যদুনাথ সরকার মহাশয় যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আলোচনায় জানা যায়, ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতিপরয় হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন।* কোজ হাজোঁ (কামরূপ) পুনর্ব্বার অধিকারের প্রয়োজন হওয়ায় নবাব, রাজসৈন্যের সহিত গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করিয়া, মোগল বাহিনীর গতিবিধির কথা বলিয়া দেওয়ায়, সেই অপরাধে তিনি অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে ঢাকায় নিয়া হত্যা করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূষণা রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়াছিল।

৭। **ফজলগাজী ও চাঁদগাজী** ঃ— ভাওয়ালের ফজলগাজীর স্থূল বিবরণ এই লহরের ১০৪—১০৫ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। চাঁদ প্রতাপের চাঁদগাজী ও ফজলগাজী একই বংশসম্ভূত। ফজলগাজী যখন ভাওয়াল অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, তখন চাঁদ প্রতাপে চাঁদগাজীর আধিপত্য ছিল। বার ভূঞার তালিকায় ইঁহাদিগকে গাজী বংশীয় বলিয়া একত্রিত ভাবে ধরা হইয়াছে।

৮। **হামিরমল্ল বা বীর হাম্বীর** ঃ— ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজা। ইনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভুঞাগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিবান ছিলেন।

বৃন্দাবনের সন্নিহিত জয়পুরের রাজবংশীয় এক শাখা হইতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বিষ্ণুপুরে রাজ্য স্থাপন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। জয়পুরের রাজা পুরুষোত্তম ভ্রমণোপলক্ষে রাজ্য হইতে সস্ত্রীক বহির্গত হইয়া, বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তৎকালে বিষ্ণুপুর নিবিড় অরণ্যসস্কুল এবং বাগ্‌দী প্রভৃতি বন্য জাতির আবাসভূমি ছিল। রাজমহিষী এই অরণ্যময় প্রদেশের পান্থশালায় অবস্থান কালে একটী পুত্র প্রসব করেন। সদ্যজাত শিশুসন্তানসহ রাণীকে লইয়া।

* প্রবাসী— ১৩২৬, প্রথম খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা।

পথ অতিবাহন করা অসম্ভব বিধায় রাজা, তাঁহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহার পর রাণীও অন্তর্হিতা হইলেন। তিনি কি অবস্থায় কোথায় গিয়েছিলেন, অথবা হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই।

অতঃপর শ্রীকাশ মিতিয়া নামক জনৈক বাগ্‌দী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইয়া অরণ্য-মধ্যে সদ্যজাত শিশুটীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পাইয়া আপন আলয়ে লইয়া যায়, এবং সাত বৎসর পর্য্যন্ত সযত্নে লালন-পালন করে। ইহার পর জনৈক ব্রাহ্মণ বালকের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, এবং সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তিনি বালককে গোচারণ ও গৃহের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেন। এই সময়ও বাগ্‌দীগণের কৃপায়ই বালক বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার দৈনিক আহার্য্য বাগ্‌দিগণ হইতে পাইত। এই নিরাশ্রম বালক রঘুনাথ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কথিত আছে, এক দিন বালক পলায়িত গাভীর সন্ধানে বনভ্রমণ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায়, একটী বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই সময় একটী বিষধর সর্প তাহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। তৎকালে প্রতিপালক ব্রাহ্মণ বালকের সন্ধানে আসিয়া, তদবস্থা দর্শনে বালক যে ভবিষ্যতে অসাধারণ লোক হইবে তাহা বুঝিলেন। এবং তদবধি তাহাকে সযত্নে পালন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের মস্তকে সর্পে ফণা ধারণের প্রবাদবাক্য এদেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে, এবং অনেকের প্রতিই সেই প্রবাদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ইহার অল্পকাল পরে, তথাকার বন্যজাতীয় রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে রাজভবনে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। বালকের প্রতিপালক ব্রাহ্মণও তাহাকে লইয়া রাজ-নিকেতনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে বসিয়াছেন— অর্দ্ধভোজন হইয়াছে মাত্র, এই সময় মৃত রাজার পাটহস্তী, বালক রঘুকে শুণ্ডদ্বারা জড়াইয়া লইয়া চলিল। এই ঘটনায় সকলেই বালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন বলিয়া অধীর হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে কোলাহল উত্থিত হইল। হস্তী কিন্তু কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া শান্তভাবে রাজসিংহাসনের নিকটে যাইয়া বালকটীকে তদুপরি বসাইয়া দিল। তখন বিপুল জন-মণ্ডলী এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা বিধাতার বিচিত্র ঘটন!

সর্পে মস্তকে ফণা ধারমের ন্যায়, পাটহস্তী কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচনের প্রবাদ বাক্যও বহু প্রাচীন। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল।

রঘুনাথ মল্লবংশীয় রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, তিনিই বিষ্ণুপুরের প্রথম মল্লরাজা বলিয়া গৃহীত হইলেন, তিনি 'আদিমল্ল' উপাধিতে ভূষিত হইলেন, এবং বিষ্ণুপুর রাজ্য 'মল্লভূমি' নাম লাভ করিল।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ বহু প্রাচীন এবং সমাজে সম্মানিত। এই বংশ মহাঋষি বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত।

'মল্ল রাজবংশ' নামে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে জানা যায়, আমাদের আলোচ্য হাম্বীরমল্ল বা বীর হাম্বীর, আদিমল্ল রঘুনাথের অধস্তন ৪৯শ স্থানীয়। ইনি ৮৬৮ মল্লাব্দে (১৫৮৩ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৮৮১ মল্লাব্দে (১৫৯৬ খ্রীঃ) ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বীর হাম্বীরের চারিজন মহিষী ও ২২টী পুত্র ছিল। ইনি সম্রাট আকবরের শাসনকালে বঙ্গের ভৌমিকগণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নামেমাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। মুর্শিদকুলি খাঁ-এর সময় এই বংশের সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়।

প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর লক্ষাধিক বৈষ্ণবগ্রস্থ লইয়া যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন বীর হাম্বীরের প্ররোচনায় বিষ্ণুপুরের অরণ্যময় পথে সেই সকল গ্রন্থ লুণ্ঠিত হয়। পরিশেষে রাজা, আচার্য্য গোস্বামীর প্রযত্নে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লুণ্ঠিত গ্রন্থসমূহ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই লুণ্ঠন ব্যাপারে তিনি বৈষ্ণব সমাজের আশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই ত্রুটী সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিস্তর লাঘব হইয়া থাকিলেও সামাজিক মর্য্যাদা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৯। কংসনারায়ণ ঃ ইনি বঙ্গের ভৌমিক সমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কংসনারায়ণ বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে ভট্টনারায়ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহিরপুর জমিদারীর স্থাপয়িতা বিজয়লস্কর, সম্রাট বা বঙ্গের কোনও স্বাধীন শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার পাইয়া, ২২ (বাইশ)-টী পরগণা ও সিংহ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে। বারাহী নদীর তীরবর্ত্তী রামবামা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদীয় পুত্র উদয়নারায়ণের কালে, একুশটী পরগণা বাজেয়াপ্ত করিয়া, একমাত্র তাহিরপুর তাঁহার অধিকারে রাখা হয়। কংসনারায়ণ এই উদয়নারায়ণের পৌত্র। ইনি বরেন্দ্র সমাজের সংস্কার ও তদানীন্তন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়া বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বঙ্গেশ্বর সুলেমান কররাণীর অনুগ্রহে ফৌজদারের পদ লাভ করেন। টোডরমল্ল কর্ত্তৃক ইনি রাজা উপাধি এবং বঙ্গ ও বিহারের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুমেন খাঁ-এর পরলোক প্রাপ্তির পর, কংসনারায়ণ কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৌড়ের সুবেদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গের ভূঞাগণ সকলেই ইঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইনি দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন।

১০। রামকৃষ্ণ ঃ— গৌড়েশ্বর সামস্উদ্দিন্ ইলিয়াস্ স্বাধীনতা ঘোষণাকালে শিখাই বা শিখিবাহন ও সুবুদ্ধি ভাদুড়ী নামক দুইজন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই খাঁ উপাধিধারী ও বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধীশ্বর ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে সুবুদ্ধি ভাদুড়ীর বংশধরগণ ভাদুড়ীচক্র বা ভাতুরিয়া পরগণা জমিদারীসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

সুবুদ্ধির বংশোদ্ভব রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি হইয়াছিলেন। ইনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছেন। 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' ও 'তবকাৎ-আকবরী' প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইঁহার নাম 'কানস্' লিখিত হইয়াছে। এই 'কানস্' শব্দ হইতে কোন কোন ঐতিহাসিক 'কংস' এবং কেহ বা 'গণেশ' নাম গ্রহণ করিয়াছেন; কেহই প্রকৃত নাম স্থির করিতে পারেন নাই। এই পৃষ্ঠার পাদটীকায় রাজার যে আদেশ সন্নিবেশিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, তাঁহার নাম 'গণেশ' ছিল। ইনি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। পরিশেষে বিপাকে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন ; কিন্তু পত্নীর অনুরোধে স্বয়ং সেই ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া, স্বীয় পুত্র যদুকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে রাজত্ব প্রদান দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সে-কালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ বৈদ্যজাতির প্রতি নানা কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। রাজ্য গণেশের রাজত্ব সময়ে রাজা, ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এক আদেশ দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে একত্র ভোজন রহিত করিয়া দেন, তদবধি সমাজে সেই আদেশ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।* রাজা গণেশের কার্য্যের মধ্যে ইহা একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

শিখিবাহনের পুত্র বলাই সাতৈরের আধিপত্য লাভ করেন। এই বংশের আমাদের আলোচ্য রাজা রামকৃষ্ণ, টোডরমল্ল কর্ত্তৃক সামন্ত রাজা বলে স্বীকৃত এবং ভূঞা শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

---

* রাজা গণেশের উপরিউক্ত আদেশ কোল-ব্রুক প্রণীত "History of the Rituals Rural Bengal" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা বর্ত্তমান কালে এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত হইতেছে। উক্ত আদেশের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করা হইল।

"সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেষু বৈদ্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তা। বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া বিপ্রাণাম্ অনুরোধাৎ, অদ্য প্রভৃতি এতে বৈশ্যাচারিণো ভবিষ্যান্তি, মূল-ব্রাহ্মণা এভিঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেযুঃ। যে চ ব্রাহ্মণা অমীভিঃ-সহ ভোজনাদি করিষ্যান্তি, তে পতিতা ভবিষ্যান্তি।।"

মর্ম্ম ঃ— "সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদ্যগণ তপোজ্ঞানযুক্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন। এখন তাঁহারা শক্তিহীন ও আচারভ্রষ্ট হওয়ায় শ্রীমন্ মহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র নৃপতি বিপ্রমণ্ডলীর অনুরোধে আদেশ করিতেছেন যে, অদ্য হইতে বৈদ্যগণ বৈশ্যাচারী হইবেন, মূল ব্রাহ্মণ সমাজ ইঁহাদের সহিত ভোজনাদি আচারণ করিবেন না, যে ব্রাহ্মণ ইঁহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন, তিনি পতিত হইবেন।"

রামকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহী, দয়ালু এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। রামকৃষ্ণের পত্নীর পরলোক গমনের পর সাতৈর রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। সাতৈরের শীতল-পাটি অত্যুৎকৃষ্ট ও বিশেষ আদরণীয় ছিল; গবর্ণমেন্ট রিপোর্টেও একথার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

১১। পীতাম্বর ও নীলাম্বর ঃ— ইঁহারা পুঁটিয়ার অধিপতি ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বৎসাচার্য্য, ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীন এবং বাগ্‌চী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বৎসাচার্য্যের পুত্র পীতাম্বর, সম্ভবতঃ টোডরমল্ল হইতে লস্করপুর পরগণা জমিদারীসূত্রে লাভ করেন। তাঁহার অনুজ নীলাম্বর প্রথম 'রাজা' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন নীলাম্বরের বংশধরগণই পুঁটিয়ার অধীশ্বর। পীতাম্বর একজন ভৌমিক ছিলেন, কিন্তু তিনি দেশের কোন কাজ করিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১২। ঈশা খাঁ লোহানী ও ওস্‌মান খাঁ ঃ—সুলেমান কররাণীর উড়িষ্যা বিজয়ের সময় হইতে কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহানীকে উকীলস্বরূপ রাজধানীতে রাখা হয়। সুলেমানের পুত্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পর, আকমহলের যুদ্ধে নিহত হইলেন তদবধি কতলু খাঁ উড়িষ্যার প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া, ঈশা খাঁকে তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। কতলু খা-এর পরলোক গমনের পর, তাঁহার নাবালক পুত্রগণের পক্ষ হইতে ঈশা খাঁ, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঈশা খাঁ, হিজলীতে এক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার হিজলীর রাজধানী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, বর্ত্তমানকালে তাহা প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হইয়াছে।

ঈশা খাঁ-এর পুত্র ওস্‌মান খাঁ † উড়িষ্যা রাজ্যে কতলু খাঁ-এর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার পরলোকগমনের পর তিনি উড়িষ্যা প্রদেশে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে, বঙ্গের সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ওসমানকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

ওস্‌মানের পরাজয় স্থান নির্দ্দেশ উপলক্ষে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এখনও সে বিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই, সুতরাং এতৎবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিরর্থক কথা বাড়াইব না।

---

* Statistical Accounts of Dacca. Faridpur and Backergunj. (Hunter).

† ষ্টুয়ার্ট সাহেব ওস্‌মানকে কতলু খাঁ-এর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডর্ণের মতে ওস্‌মান দায়ুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বঙ্কিমবাবু ওস্‌মানকে কতলুর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়াছেন। ঈশা খাঁ কতলুর জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়া জানা গিয়াছে, সুতরাং ওস্‌মান, কতলু খাঁ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, ইহাই সঙ্গত নির্দ্ধারণ বলিয়া মনে হয়।

ঈশা খাঁ ও ওস্‌মান ভৌমিকগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাশালী ও বীর ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ইতিহাস আলোচনায় ইঁহাদের অসীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শেষ কথা ঃ— আমরা যে-সকল নাম দ্বারা ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিলাম; তাহা সকলে স্বীকার করিবেন, এমন আশা করা যাইতে পারে না। কারণ, ইঁহাদের নাম লইয়া যে ঘোর মতবৈষম্য চলিতেছে, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা নয় নাই; কত কালে এই বিতর্কের শেষ হইবে তাহাও অনিশ্চিত। এরূপক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত যে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহিত হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা সহজবোধ্য। তবে, আমরা এ স্থলে স্বীয় মত প্রচলনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই, ঐতিহাসিকের মত অনুসরণ করিয়ছি মাত্র। আর এক কথা, ভৌমিকগণের বিবরণ নিতান্তই অসম্পূর্ণভাবে প্রদান করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের বিবরণ বিশেষ জ্ঞাতব্য বেং গ্রহণীয় হইলেও তাহা লইয়া রাজমালার কলেবর অত্যধিক পুষ্ট করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, এবং তাহা সঙ্গত হইবে না। প্রধানতঃ এই কারণে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান পক্ষে অক্ষম হইলাম।

ষোড়শ শতাব্দীর ভৌমিকগণের অবস্থা আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, পাঠান রাজত্বের শেষ অবস্থার সময় হইতেই নানাবিধ শাসন বিশৃঙ্খলার দরুণ ভৌমিকগণ প্রাধান্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মোগল রাজত্বের প্রারম্ভে, পরাজিত পাঠান শক্তির সহিত মিলিতভাবে ভৌমিকগণ দেশময় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া, মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পাঠনগণ ৩০০ বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানেহ মধ্যে অনেক পরিমাণে সদ্ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছিল। এমনকি, ধর্ম্মক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে মিশামিশির ভাব দেখা যাইত। হিন্দুগণ পীড়ের সিন্নি করিতেন, মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দিরে পূজা দিতেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। মোগল বিজয়ের পর হিন্দুগণ পাঠানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল— তাহারা মোগল শাসন পছন্দ করিল না। মোগলগণও নানারূপ অবিচার ও অত্যাচার দ্বারা হিন্দুগণের বিদ্বেষ বহ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিতেছিল। ইহার ফলে, দেশময় অরাজকতা, এবং বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠিল। যাঁহার শক্তি আছে, প্রতিভা আছে, তিনিই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিলেন, ভূম্যধিকারিগণ স্বাধীনতা প্রয়াসী হইলেন, যাঁহার পুর্ব্বে কিছুই ছিল না, দৈহিক শক্তিবলে তিনিও খণ্ড খণ্ড ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া বসিতে লাগিলেন। "যাহার লাঠী তাহার মাটি" এই প্রবাদবাক্য তৎকালে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধিকালে এদেশে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

দেশময় অত্যাচার, অশান্তি ও বিপ্লবে প্রজাগণ ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল। এই সময় যে শক্তিশালী ব্যক্তি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া, নিরুদ্বেগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেশের উপর অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা বীরত্বের যুগ, দেশময় অশান্তি উদ্বেগের মধ্যে ধনপ্রাণ ও পরিবার রক্ষার নিমিত্ত সকলকেই সচেষ্ট থাকিতে হইত, একে অন্যের সাহায্য করিতে বাধ্য হইত, এই সূত্রে দেশময় একটা সজীবতার সাড়া পড়িয়াছিল। ভৌমিকগণ মধ্যে অনেকেই এই সময় স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, বাকলার কন্দর্প রায়, ভূষণার মুকুন্দ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও হিজলীর ওস্‌মান খাঁ লোহানী প্রধান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কৃতিত্ব অধিক, এস্থলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক।

বিজিত পাঠান ও বঙ্গের ভৌমিকগণের প্রচেষ্টায় মোগলগণ অনেককাল বঙ্গে সুশাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই। অগত্যা তাঁহাদিগকে অনেক সময় ভৌমিক সমাজের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সে কালের ভৌমিকগণ সামরিক সম্ভারে নিতান্ত হীন ছিলেন না। আইন-ই-আকবরী আলোচনায় পাওয়া যায়, সম্রাট আকবরের সময়, তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত বঙ্গদেশের জমিদারগণের প্রতি নিম্নলিখিত যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন।

অশ্বারোহী	....	২৩,৩৩০
পদাতিক	....	৮,০১,১৫০
হস্তী	....	১৭০
তোপ	....	৪,২৬০
যুদ্ধ-পোত	....	৪,৪০০

ইহা সম্রাট কর্ত্তৃক ভূম্যধিকারিগণের শক্তি স্বীকারের পরিচায়ক নহে কি? বঙ্গের অতীত বিভব লইয়া আলোচনার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার সুবিধা নাই।

বঙ্গের ভৌমিক সমাজের সহিত ত্রিপুরেশ্বরগণের সৌহৃদ্য থাকিবার বিস্তর প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। ভৌমিকগণ হইতে ত্রিপুরেশ্বর সাহায্য লাভ করিবার প্রমাণ এই আখ্যায়িকার প্রথম ভাগে প্রদান করা হইয়াছে। ভৌমিকগণও ত্রিপুরার সাহায্য-লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ত্রিপুর সৈন্য ছিল। মানসিংহ বিক্রমপুর আক্রমণ করিতে আসিয়া কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে পাওয়া যায় ;—

> "ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলি কাচালী।
> সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।।" ইত্যাদি।

এস্থলে প্রথমেই 'ত্রিপুর' নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রতাপাদিত্যের কুকি সৈন্য থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরী ও কুকি সৈন্য যে ত্রিপুরেশ্বরের সম্পদ, ইহা বুঝিতে চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

রাজধর্ম্ম

রাজমালার আলোচ্য লহরে নানা স্থানে 'রাজধর্ম্ম' বাক্য বার বার প্রয়োগ করা হইয়াছে। মহারাজ অমরমাণিক্যের বিবরণে পাওয়া যায় ;—

"চতুর্দ্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাজা।
রাজা হৈয়া ধর্ম্মে চলে তাকে সহে প্রজা।।"

অমরমাণিক্য খণ্ড—২ পৃষ্ঠা।

"রাজা হৈয়া ধর্ম্মে চলে" এই বাক্যদ্বারা রাজধর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রাজধরমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;—

"রাজধর্ম্মে লিখিয়াছে বিচার রাজার।
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্ব্বার।।"

রাজধরমাণিক্য খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা।

মহারাজ রাজধরের রাজোচিত কর্ত্তব্য পালন বিষয়ক বিবরণ প্রদানের পর বলা হইয়াছে ;—

"এই মত রাজধর্ম্ম ছিল নৃপতির।
শান্ত দান্ত মহারাজা প্রজা রাখে স্থির।।"

রাজধরমাণিক্য খণ্ড—৫১ পৃষ্ঠা।

এই সকল 'রাজধর্ম্ম' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা রাজার অনন্ত কর্ত্তব্য পালনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। রাজা হইয়া রাজোচিত ধর্ম্ম পালন না করিলে প্রকৃতি-পুঞ্জ বশে রাখা যায় না, এবং সুবিচারের অভাবে রাজার পতন অনিবার্য্য, একথাও বলা হইয়াছে।

রাজধর্ম্ম কাহাকে বলে, এস্থলে তদ্বিষয় আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজার স্বরূপ, রাজা ও প্রজার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে যে-সকল কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এস্থলে তাহাই প্রদান করা যাইতেছে।

"রাজধর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ।। ১
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েন যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণং।। ২
অরাজকে হি লোকেহস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।। ৩

ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ।। ৪
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা।। ৫
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং।। ৬
সোহাগ্নির্ভবতিবায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।। ৭
বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি।। ৮
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্য সঞ্চয়।। ৯
কার্য্যং সোহবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশ কালৌচ তত্ত্বতঃ
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃপুনঃ।। ১০
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্ব্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃতুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ।। ১১
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ।। ১২
তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ।। ১৩
তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজং।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ।। ১৪
তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চারণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ।। ১৫
তং দেশ কালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নবেদ্বন্যায় বর্ত্তিষু।। ১৬
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।। ১৭
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ।। ১৮
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ।। ১৯
যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেম্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বালান্ বলবত্তরাঃ।। ২০
অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিং প্রবর্ত্তেতা ধরোত্তরং।। ২১

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎসর্ব্বা জগদ্ভোগায় কল্পতে।। ২২
দেবদানবগন্ধর্ব্ব রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ।। ২৩
দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ।। ২৪
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরিত পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি।। ২৫
তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনং।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্ম কামার্থ কোবিদং।। ২৬
তং রাজা প্রণয়ন্সম্যক্ ত্রিবের্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে।। ২৭
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং।। ২৮
ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরং।
অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈব মুনীন্ বেদাংশ্চ পীড়য়েৎ।। ২৯
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃত বুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ।। ৩০
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা।। ৩১
স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্‌ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ।। ৩২
এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি।। ৩৩
অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি।। ৩৪
স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা।। ৩৫
তেন যদ্‌যৎ সভৃত্যেন কর্ত্তব্যং রক্ষতা প্রজাঃ।
তত্তদ্বোঽহং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।। ৩৬
ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ শাসনে।। ৩৭
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধ সেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে।। ৩৮
তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্নবিনশ্যতি কর্হিচিৎ।। ৩৯

বহবোহবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাং।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে।। ৪০
বেণো বিনষ্টোহবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।। ৪১
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ ৪২
ত্রৈবিদ্যেভস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম বিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।। ৪৩
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্টেদ্দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ।। ৪৪
দশ কাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যাসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।। ৪৫
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যাসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেহর্থ ধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু।। ৪৬
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।। ৪৭
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসুয়ার্থ দূষণং।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ।। ৪৮
দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ।। ৪৯
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমং।
এতৎ কষ্ট তমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে।। ৫০
দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেহপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতত্রিকং সদা।। ৫১
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ব্যসনমাত্মবান্।। ৫২
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোহধো ব্রজতি স্বর্য্যাত্য ব্যসনীমৃতঃ।। ৫৩
মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদগতান্।
সচিবান্ সপ্ত চষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্।। ৫৪
অপিষৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করং।
বিশেষতোহসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং।। ৫৫
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহং।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ।। ৫৬
তেষাং স্বং সমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধতমাত্মনঃ।। ৫৭

সর্ব্বোষাস্ত বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড় গুণ্যসংযুতং।। ৫৮
নিত্য তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্ব্ব কার্য্যাণি নিঃক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ।। ৫৯
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থ সমাহর্ত্ত নমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্।। ৬০
নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতিকর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোহতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্।। ৬১
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তনিবেশনে।। ৬২
দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদং।
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতং।। ৬৩
অনুরক্তঃ শুচির্দ্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্ব্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।। ৬৪
অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধি বিপর্য্যয়ৌ।।। ৬৫
দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন বা ন বাঃ।। ৬৬
স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগুঢ়েঙ্গিত চেষ্টিতৈঃ।
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ তিকীর্ষিতং।। ৬৭
বুদ্ধা চ সর্ব্বং তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতং।
তথা প্রযত্নমাতিষ্টেদ্যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ।। ৬৮
জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলং।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ।। ৬৯
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরং।। ৭০
সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যত।। ৭১
ত্রীণ্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্তেষাং মৃগগর্ত্তাশ্রয়াপ্সরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামরাঃ।। ৭২
যথা দুর্গাশ্রিতান্যেতান্নোপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথারয়ো ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গ সমাশ্রিং ।। ৭৩
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে।। ৭৪
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ।। ৭৫

তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং।। ৭৬
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাং।। ৭৭
পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণয়াদেব চর্ত্বিজং।
তেহস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্ব্বৈতানিকানি চ।। ৭৮
যজেত রাজা ক্রতুভির্ব্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্ম্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ভোগান্ ধনানি চ।। ৭৯
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু।। ৮০
আধ্যাক্ষান বিবিধান্ কুর্য্যাত্তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেহস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাং।। ৮১
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ নির্ধির্ব্রাহ্মোহভিধীয়তে।। ৮২
ন তং স্তেনা ন চা মিত্রা হরন্তিন চ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষবক্ষয়ো নিধিঃ।। ৮৩
ন স্কন্দতে ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতং।। ৮৪
সমম ব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে।। ৮৫
পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্ধধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য জানস্যাবাপ্যতে ফলং।। ৮৬
সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্।। ৮৭
সংগ্রামেযবনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনং।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং।। ৮৮
আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরংশক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।। ৮৯
ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজ নৈঃ।। ৯০
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনং ।। ৯১
ন সুপ্তং ন বিষণ্ণাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধং।
ন যুধ্যমা ন পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতং।। ৯২
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরীক্ষিতং।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরণ।। ৯৩

যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।। ৯৪
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতং।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু।। ৯৫
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যাং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্ব দ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ।। ৯৬
রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্ব্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্ জিতং।। ৯৭
এযোহনুপস্কৃতঃ প্রোক্তো যোধধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মাদ্ধর্ম্মান্ন চ্যবেত ক্ষত্রিয়োঘ্নন্ রণে রিপূন্।। ৯৮
অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ।। ৯৯
এতচ্চতুর্ব্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থ প্রয়োজনং।
অস্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।। ১০০
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্‌বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ।। ১০১
নিত্য মুদ্যত দণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃত পৌরুষঃ।
নিত্যং সংবৃতসংবার্য্যো নিত্যং ছিদ্রানুসার্য্যরেঃ।। ১০২
নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য কৃৎস্নমুদ্বিজতে জগৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ।। ১০৩
অমায়য়ৈব বর্ত্তেন ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারি প্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ।। ১০৪
নাস্য চ্ছিদ্রং পরো বিদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কুর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবর মাত্মনঃ।। ১০৫
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ।। ১০৬
এবং বিজয়মানস্য যেহস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপ ক্রমৈঃ।। ১০৭
যদি তে তু ন নিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈ স্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্চনকৈর্ব্বশমানয়েৎ।। ১০৮
সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে।। ১০৯
যথোদ্ধরতি নির্দ্ধাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষিত।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ।। ১১০
সোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোহচিরাদ্‌ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধববঃ।। ১১১

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্র কর্ষণাৎ।। ১১২
রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীত রাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে।। ১১৩
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্।। ১১৪
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রাম পতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ।। ১১৫
গ্রাম দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ং।
শংসেদগ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্।। ১১৬
বিংশতীশস্তু তৎসর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদগ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্।। ১১৭
যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপুয়াৎ।। ১১৮
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্।। ১১৯
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্কার্য্যাণি চৈব হি।
রজ্ঞোহন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ।। ১২০
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্।। ১২১
সতাননু পরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ।। ১২২
রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।। ১২৩
যে কার্য্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্।। ১২৪
রাজকর্ম্মসু যুক্তাণাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পযেদ্বৃত্তিং স্থান কর্ম্মানুরূপতঃ।। ১২৫
পণো দেয়োহবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
যান্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্য দ্রোণস্তু মাসিকঃ।। ১২৬
ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্।। ১২৭
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্।। ১২৮
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো বৎস ষট্ পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।। ১২৯

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা।। ১৩০
অদদীতাথ ষড় ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ।। ১৩১
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বন্যাশ্মময়স্য চ।। ১৩২
ম্রিয়মাণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্।। ১৩৩
যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা।
তস্যাপি তৎক্ষুধা রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি।। ১৩৪
শ্রুতবিত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিংধর্ম্ম্যাংপ্রকল্পয়েৎ।
সংরক্ষেৎ সর্ব্বতশ্চৈনং পিতা পুত্র মিবৌরসম্।। ১৩৫
সং রক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা যঃ কুরুতে ধর্ম্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্ব্বর্দ্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ।। ১৩৬
যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ কর সংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্‌জনম্।। ১৩৭
কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ।। ১৩৮
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ।। ১৩৯
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃতুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ।। ১৪০
অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদগতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাম্।। ১৪১
এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।। ১৪২
বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সংপশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি।। ১৪৩
ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্ট ফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে।। ১৪৪
উত্থায় পশ্চিমেযামে কৃতশৌচঃ মমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্।। ১৪৫
তত্রস্থিতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ।। ১৪৬
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ১৪৭

যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্ জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্ক্তে কোষহীনোহপি পার্থিবঃ।। ১৪৮
জড়মূকান্ধবধিরাং স্তৈর্য্যগয্যোনান্ বয়োহভিগান্।
স্ত্রী ম্লেচ্ছব্যাধিত ব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেহপসারয়েৎ।। ১৪৯
ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্রং তৈর্য্যগ্ যোনাস্তথৈব চ।
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ তস্মাত্তত্রাদৃতো ভবেৎ।। ১৫০
মধ্যন্দিনেহর্দ্ধরাত্রে বা বিশ্রান্তো বিগতক্লমঃ।
চিন্তয়েদ্ধর্ম্মকামার্থান্ সার্দ্ধং তৈরেক এব বা।। ১৫১
পরস্পর বিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জ্জনং।
কন্যানাং সংপ্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণং।। ১৫২
দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুর প্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতং।। ১৫৩
কৃৎ স্নং চাষ্টবিধং কর্ম্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ।। ১৫৪
মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং।
উদাসীন প্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ।। ১৫৫
এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ।। ১৫৬
অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থ দণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ।
প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ।। ১৫৭
অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেব চ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়ো পরম্।। ১৫৮
তান্ সর্ব্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নয়েন চ।। ১৫৯
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং শংশ্রয়ঞ্চ ষড়গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা।। ১৬০
আসনঞ্চৈব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ।। ১৬১
সন্ধিস্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ।। ১৬২
সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তদাত্বায়তি সংযুক্তঃ সন্ধির্জ্জেয়ো দ্বিলক্ষণঃ।। ১৬৩
স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ।। ১৬৪
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে।। ১৬৫

ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্যচানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্।। ১৬৬
বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ গুণ বেদিভিঃ।। ১৬৭
অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শক্রভিঃ।
সাধুষু ব্যবদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ।। ১৬৮
যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বেচাল্পিকাং পীড়াংতদাসন্ধিং সমাশ্রয়েৎ।। ১৬৯
যদাপ্রকৃষ্টামন্যেতসর্ব্বাস্তু প্রকৃতির্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদাকুর্ব্বীত বিগ্রহম্।। ১৭০
যদামন্যেত ভাবেন হৃষ্টংপুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি।। ১৭১
যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্।। ১৭২
মন্যেতারিং যদা রাজা সর্ব্বাথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ।। ১৭৩
যদা পরবলানাস্তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্।। ১৭৪
নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্য্যাদ্ যোহরি বলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা।। ১৭৫
যদি তত্রাপি সম্পশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতং।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ।। ১৭৬
সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীন শত্রবঃ।। ১৭৭
আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সবের্বষাং গুণ দৌষৌ চ তত্ত্বতঃ।। ১৭৮
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্র নিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শক্রভির্নাভিভূয়তে।। ১৭৯
যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্ম্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ।। ১৮০
যদা তু যানমাতিষ্ঠেদরিরাষ্ট্রং প্রতিপ্রভুঃ।
তদানেন বিধানেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ।। ১৮১
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াদ্যাত্রাং মহীপতিঃ।
ফাল্গুনং বাথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলং।। ১৮২
অন্যেম্বপি তু কালেষু যদা পশ্যেদ্ধ্রুবংজয়ং।
তদা যায়াদ্বিগৃহ্যৈব ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ।। ১৮৩

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চারান্ সম্যগ্বিধায় চ।। ১৮৪
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্বিধঞ্চ বলং স্বকং।
সাম্পরায়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ।। ১৮৫
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ।। ১৮৬
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহ মকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ।। ১৮৭
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলং।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ং।। ১৮৮
সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বাদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীন্য তাং কল্পয়েদ্দিশং।। ১৮৯
গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূপবিকারিণঃ।। ১৯০
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারযেদ্বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন বূহ্য যোধয়েৎ।। ১৯১
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে।। ১৯২
কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘুংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোধয়েৎ।। ১৯৩
প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি।। ১৯৪
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনং।। ১৯৫
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার পরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা।। ১৯৬
উপজপ্যানুপজপেদ্বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতং।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্ সুরপেতভীঃ।। ১৯৭
সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ন যুদ্ধেন কদাচন।। ১৯৮
অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।। ১৯৯
ত্রয়ানামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সংযত্তো বিজয়েত রিপূন যথা।। ২০০
জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ।। ২০১

সর্ব্বেষাস্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতং।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াং।। ২০২
প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ।। ২০৩
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকং।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে।। ২০৪
সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া।। ২০৫
সহবাপি ব্রজেদ্যুক্তঃ সন্ধিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
মিত্রং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশ্যং স্ত্রিবিধং ফলং।। ২০৬
পার্ষ্ণিগ্রাহঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য তথা ক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে।
মিত্রাদথাপ্যমিত্রাদ্বা যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ।। ২০৭
হিরণ্য ভূমি সংপ্রাপ্তা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধা কৃশমপ্যায়তিক্ষমং।। ২০৮
ধর্ম্মজ্ঞঞ্চ কৃতজ্ঞঞ্চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে।। ২০৯
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।। ২১০
আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ।। ২১১
ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেৎ নৃপো ভূমিমাত্মার্থ মবিচারয়ন।। ২১২
আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি।। ২১৩
সহ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্নাঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভৃশং।
সংযুক্তাংশ্চ বিযুক্তাংশ্চ সর্ব্বোপায়ান্ সৃজেদ্বুধঃ।। ২১৪
উপেতারমুপেয়ঞ্চ সর্ব্বোপায়াংসচ কৃৎস্নশঃ।
এপুত্রয়ং সমাশ্রিত প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে।। ২১৫
এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তু মন্তঃপুরং বিশেৎ।। ২১৬
তত্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরাহার্য্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যান্মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ।। ২১৭
বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্ব্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা।। ২১৮
পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেশাভরণ সংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ।। ২১৯

এবং প্রযত্নং কুর্ব্বীত যানশয্যাশনাশনে।
স্নানে প্রসাধনে চৈব সর্ব্বলঙ্কারকেষু চ।। ২২০
ভুক্তবান্ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরন্তঃপুরে সহ।
বিহৃত্য তু যথাকালং পুনঃ কার্য্যানি চিন্তয়েৎ।। ২২১
অলঙ্কৃতশ্চ সম্পশ্যেদায়ুধীয়ং পুনর্জ্জনং।
বাহনানি চ সর্ব্বাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।। ২২২
সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়াদন্তর্ব্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ।
রহস্যাখ্যায়িনাঞ্চৈব প্রাণিধীনাঞ্চ চোষ্টিতং।। ২২৩
গত্বা কক্ষান্তরং ত্বন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনং।
প্রবিশেদ্ভোজনার্থঞ্চ স্ত্রীবৃতোহন্তঃপুরং পুনঃ।। ২২৪
তত্র ভুক্তা পুনঃ কিঞ্চিৎ তুর্য্যঘোষৈঃ প্রহর্ষিতঃ।
সংবিশেৎ তু যথাকালমুক্তিষ্ঠেচ্চ গতক্লমঃ।। ২২৫
এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ।
অস্বস্থঃ সর্ব্বমেতত্তু ভৃত্যেষু বিনিযোজয়েৎ।। ২২৬
ইতিমানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগু প্রোক্তায়াং সংহিতায়াং রাজ-ধর্ম্মোনাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের মর্ম্ম

ঈশ্বর যে প্রকারে জনপদ প্রভৃতির প্রতিপালক, অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার সৃষ্টি করিয়াছে এবং রাজার আচরণ যেরূপ হওয়া আবশ্যক, যে-সকল কার্য্যানুষ্ঠান রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি ঐহিক ও পারলৌকিক সেই সমস্ত রাজধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় শাস্ত্রসম্মত বিধানানুযায়ী উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসরণে নিজ নিজ অধিকারস্থ প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। জগৎ অরাজক হইলে বলীয়ানগণ সকলেরই ভীতির কারণ হইবে, এইজন্য জগদীশ্বর সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্ট দিকপালের সারসত্তা লইয়া ঈশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল প্রভাবশালী দিক্পালের অংশে সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই রাজা শৌর্য্য-বীর্য্যের আধিক্য দ্বারা প্রাণীদিগকে পরাভব করিতে সক্ষম। রাজা দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মন সূর্য্যের ন্যায় দাহ করেন, কোন ব্যক্তিই রাজাকে সম্মুখবর্ত্তীভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। রাজা প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, যম, কুবের ও বরুণের সমতুল্য। রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না। তিনি মনুষ্যরূপে অবস্থিত মহান্ দেবতা। অনবধানতা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি অগ্নির অতি সন্নিহিত হয়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজারূপ অগ্নি অপরাধীর প্রতি কোপান্বিত

হইলে বংশ, পালিত পশ্বাদি ও সঞ্চিত সম্পত্তিসহ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। রাজা প্রয়োজনীয় কার্য্য, আপন শক্তির এবং দেশ-কালের পর্য্যালোচনা করিয়া, ধর্ম্মকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বারম্বার নানা রূপ ধারণ করেন। যাঁহার প্রসন্নতায় মহতী সম্পদ লাভ হয়, যাঁহার প্রভাবে দুর্দ্দান্ত শত্রু নিহত ও বিজয় লাভ হয়, যিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোক বিনাশ হইয়া থাকে, তিনিই সর্ব্বতেজময় এবং তিনিই চন্দ্রসূর্য্যের তেজ ধারণ করিতেছেন। যে অজ্ঞান ব্যক্তি রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, তাহার বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া নিশ্চিত। রাজা সত্বর তাহার বিনাশের নিমিত্ত মনোযোগী হইয়া থাকেন।

রাজা ইষ্ট লোকের (শিষ্টের) প্রতি শাস্ত্রোক্ত ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে-সকল নিয়ম করিবেন, তদ্রূপ অনিষ্টের (দুষ্টের) প্রতিও উপযুক্ত নিয়ম করিতে উপেক্ষা করিবেন না। ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ভূপতির প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রাণীসমূহের রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ রাজদণ্ডকে স্বীয় তেজ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজদণ্ড ভয়ে জগতের সর্ব্বপ্রাণী স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজা, অপরাধী ব্যক্তির শক্তি, বিদ্যা ও দেশ-কাল বিবেচনাপূর্ব্বক, যে-প্রকার অপরাধের শাস্ত্রসম্মতভাবে যেরূপ দণ্ড হওয়া উচিত, তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিয়া দণ্ডবিধান করিবেন। এই দণ্ডই রাজা—দণ্ডই পুরুষ—দণ্ডই শাসনকর্ত্তা, এবং দণ্ডকে চতুরাশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভু বলিয়া জানিবে। দণ্ড প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করিয়া থকে, দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলে দণ্ডই জাগ্রত থাকিয়া সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থকে। পণ্ডিতমণ্ডলী দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া প্রজাগণের দেহ ও ধনাদিতে সেই দণ্ড পাতিত করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার প্রতি অনুরক্ত হয়, আর বিবেচনা না করিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিরপরাধ প্রজার দণ্ড করিলে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্তি হয়। রাজা আলস্যপরতন্ত্র হইয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান না করিলে, বলশালী লোকেরা, মৃত মৎস্য পাক করার ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে নিরতিশয় যাতনা প্রদান করিতে পারে। রাজা যদি দণ্ড বিধান না করিতেন, তবে যজ্ঞকর্ম্মে হব্যভোজনের অযোগ্য কাক সর্ব্বদা হবিঃ ভোজন করিত, কুক্কুর পায়সাদি হব্য লেহন করিত, কাহারও কোন বিষয়ে প্রভুত্ব থাকিত না। সকল লোকই একমাত্র দণ্ডভয়ে সুপথগামী হইয়া থাকে। দণ্ডভয় না থাকিলে, জগতে বিশুদ্ধস্বভাব মনুষ্য তি বিরল হইত। দণ্ডের প্রভাবেই সমগ্র জগৎ প্রয়োজনীয় ভোজ্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পক্ষী ও সর্প প্রভৃতিও পরমেশ্বরের দণ্ডভয়ে বর্ষণাদি দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিতেছে। দণ্ড বিধান না করিলে বা অনুচিত দণ্ড করিলে সকল বর্ণের লোকই ইতরের স্ত্রী সংসর্গে সংকীর্ণ জাতির উৎপাদন করিতে পারে, ধর্ম্ম-সেতুর উৎপাদন করিতে পারে, এবং চৌর্য্য সাহসাদিদ্বারা লোকসমাজের

ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে। যেখানে শ্যামবর্ণ পাপনাশক দণ্ড বর্ত্তমান আছে, এবং যে স্থানে দণ্ড বিধাতা ন্যায়ানুসারে সেই দণ্ডের প্রয়োগ করেন, তথাকার প্রজাবর্গ কোন ক্রমেই কাতর হয় না। উক্ত দণ্ডের প্রবর্ত্তক রাজা সত্যবাদী হইবেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন, এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্ম্মার্থ কামের জ্ঞাতা হইবেন। রাজা যদি দণ্ডের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন, তবে তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ ও কামনা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর তিনি বিষয়াভিলাষ জনিত রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ড প্রদান করিলে সেই অধার্ম্মিক রাজা স্বকৃত দণ্ডদ্বারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিত নৃপতি, মহা তেজস্বী দণ্ড ধারণের অযোগ্য। যাঁহার সদ্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি দণ্ডবিধান করিবেন না। রাজধর্ম্ম বিরহিত নৃপতি দণ্ডবিধান করিলে সবান্ধবে বিনাশপ্রাপ্ত হন। যিনি দোষাদোষ বিচার ব্যতীত দণ্ডবিধান করেন, সেই রাজা প্রথমে বন্ধুবর্গ সহিত বিনষ্ট হন, তৎপর দুর্গ, স্থাবর জঙ্গমময় পৃথিবী, অন্তরীক্ষগত ঋষি ও দেবতাগণের পীড়াদায়ক হইয়া থাকেন। সহায়হীন (মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতি না থাকা), মুর্খ, লোভী, শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিত নৃপতি শাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান, করিতে সক্ষম নহেন। শুদ্ধাচারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারকারী, সুযোগ্য সচিবাদি সহায়সম্পন্ন রাজা দণ্ডবিধান করিবার যোগ্য হন। রাজা স্বীয় রাজ্যে শশস্ত্র সঙ্গত ব্যবহার করিবেন, শত্রুর প্রতি তীব্র দণ্ডবিধান করিবেন, সুহৃদ্ ও স্নেহের পাত্রাদির সহিত সকল ব্যবহার করিবেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। রাজা শিলোঞ্ছ বৃত্তি (অল্প ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী) হইয়াও যদি পূর্ব্বোক্তরূপ সদাচর সম্পন্ন হন, তবে তাঁহার যশ জলে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় লোকসমাজে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। আর, রাজা ইহার বিপরীত আচারবিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইলে তাঁহার যশ জলে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতবিন্দুর ন্যায় লোকসমাজে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। প্রজাপতি, স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতাবর্গের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষাকর্ত্তারূপে রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মন্ত্রী প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের সহযোগে রাজা যে ভবে প্রজাপালন করিবেন, সেই সকল বিষয় যথাযথ ভাবে ক্রমশঃ তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা প্রতিদিন প্রাতরোত্থান করিয়া ত্রিবেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবেন। বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বেদবেত্তা ও শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। হিংস্রক রাক্ষসাদিও বৃদ্ধসেবী রাজার সতত হিতসাধন করিয়া থাকে। রাজা স্বাভাবিক বিনীত হইলেও বৃদ্ধদিগের নিকট অধিকতর বিনয় শিক্ষা করিবেন; বিনীতাত্মা রাজা কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না। কত সম্পত্তিশালী রাজা অবিনীত দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন, এবং চিরবনবাসী কত লেক বিনয়ের বলে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বেণ রাজা, নহুষ রাজা, যবনকুলোদ্ভব

সুদাস, সুমুখ ও নিমি অবিনয় দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন। পৃথু ও মনু বিনয় বলে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। বিনয় গুণে কুবের ধনের আধিপত্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

রাজা, ত্রিবেদ বেত্তাগণের নিকট ঋগ্, যজুঃ ও সাম বেদত্রয় অধ্যায়ণ করিবেন। অর্থশাস্ত্রবিদ্ হইতে আয়, ব্যয় ও স্থিতির বিষয় অভ্যাস করিবেন। সুযোগ্য পণ্ডিত হইতে তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বিষয়াসক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন। জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জকে বশীভূত রাখিতে পারেন। কামজ দশ প্রকার ও ক্রোধজ আট প্রকার, এই অষ্টাদশ প্রকার দুরন্ত ব্যসনকে রাজা অবশ্য ত্যাগ করিবেন। মহীপাল কামজ ব্যসনাসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত রাজা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরের দোষ কথন, কামিনী সম্ভোগ, মদ্যপানাদি দ্বারা মত্ততা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথা পর্য্যটন, সুখেচ্ছাধীন, এই দশটী কামজ। পৈশুন্য (না জানিয়ে অন্যের দোষ বলা), সাহস (নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে বন্ধনাদি দ্বারা লাঞ্ছিত করা), দ্রোহ (ছলক্রমে বধ করা), ঈর্ষা (কাহারও গুণের প্রতি মনে মনে হিংসা করা), অসূয়া (অন্যের গুণে দোষারোপ করা), অর্থ দূষণ (পরধনাপহরণ করা অথবা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া), বাক্ পারুষ্য (অন্যের উপর আক্রোশ করা বা হাত তুলিতে অগ্রসর হওয়া), দণ্ড পারুষ্য (অন্যকে প্রহার করা)), এই অষ্টবিধ ব্যসন ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়। পণ্ডিতগণ, লোভকে পূর্ব্বকথিত কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে সেই লোভকে জয় করা কর্ত্তব্য। লোভকে জয় করিতে পারিলে, অষ্টাদশ প্রকারের পাপকেই জয় করা হইবে। কখনও ধন লোভে, কখনও বা অন্যবিধ লোভে পতিত হইয়া, অনেকে ঐ সকল পাপ করিয়া থাকেন। মদ্যপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, পশু হনন, কামজ ব্যসনগণের মধ্যে এই চারিটী অতিশয় দূষ্য ও দুঃখ দায়ক, কেন না, ইহা হইতে অশেষ প্রকার শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে। ক্রোধজ ব্যসনগণের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, ও প্রাপ্য ধন না দেওয়া এই তিনটী নিতান্তই অনর্থের কারণ বলিয়া সতত দূষণীয় মনে করিবে। মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া, দণ্ডপাতন, বাক্কলহ, পরধন হরণ, এই সাতটী কম ক্রোধজ ব্যসন প্রায় সকল রাজমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যসনসমূহ অতিশয় ক্লেশদায়ক হয়, ইহা রাজা অবগত হইবেন। ব্যসন ও মৃত্যু, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যসন অধিকতর দুঃখদায়ক হয়; কারণ, ব্যসনী ব্যক্তি মৃত্যুর পর, পরলোকে দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

যাঁহারা বংশানুক্রমে রাজকর্ম্মে দক্ষ, নানা শাস্ত্রবিশারদ, শৌর্য্যসম্পন্ন, আয়ুধ বিদ্যায় সুনিপুণ, সদ্বংশজাত, দেবতা স্পর্শনাদিরূপ শপথ দ্বারা পরীক্ষিত,

রাজাদিগকে এই প্রকারের সাত আটটী মন্ত্রী রাখিতে হইবে। অনায়াসসাধ্য কার্য্যও কোন কোন সময় একের দ্বারা সম্পাদন দুষ্কর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ অসহায়ের পক্ষে একাকী রাজ্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে না। রাজা, সন্ধি-বিগ্রহ, যানাদি যাবতীয় বিষয়ে সর্ব্বদা মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। নির্জ্জন স্থানে প্রত্যেক মন্ত্রীর মত পৃথক পৃথক ভাবে এবং মিলিত ভাবে অবগত হইয়া, যাহা হিতজনক মনে করিবেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। সচিবগণের মধ্যে ধার্ম্মিক ও বিদ্যান্ ব্রাহ্মণ সচিবের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়রূপ ষড়্গুণযুক্ত মন্ত্রণা করিবেন। রাজা যে-সকল কার্য্য করিবেন, তাহা উক্ত ব্রাহ্মণে বিশ্বাসপূর্ব্বক অর্পণ করিবেন, অর্থাৎ উহাদের সহিত নির্দ্ধরণপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত অর্থাদি বিষয়ক কার্য্যে শুদ্ধাত্মা, সুবুদ্ধিসম্পন্ন কার্য্য কুশল, ধর্ম্মাদি পরীক্ষায় পরীক্ষিত অন্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। রাজার রাজকার্য্য যত সংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তত সংখ্যক আলস্যশূন্য, কার্য্যকুশল, স্বীয় পদোচিত কার্য্যের মর্ম্মবেত্তা লোক নিযুক্ত রাখিবেন। তন্মধ্যে পরাক্রমশালী, সুচতুর, সদ্বংশজাত, বিশুদ্ধস্বভাব চারিজনকে ধনোৎপত্তি স্থানে (রাজস্ব বিভাগে) নিয়োগ করিবেন। ইক্ষু ও ধান্যাদি সংগ্রহ কর্য্যে, ও স্বীয় ভবনের নিভৃত স্থানে ধর্ম্মভীরু লোককে নিযুক্ত করিবেন।

দৌত্য কার্য্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, নয়ন ভঙ্গিমাদি দ্বারা ইঙ্গিত বুঝিতে সক্ষম, করতালি বা অঙ্গুলি সঙ্কেতে মনোভাব বুঝিতে পারে, বিশুদ্ধ স্বভাব, কার্য্যে সুনিপুণ ও মহৎ বংশজাত লোককে নিযুক্ত করিবেন। সকলের প্রতি অনুরক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, কার্য্যদক্ষ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দেশ ও কালের অবস্থা জ্ঞাতসার, রূপবান, নির্ভীক, বাক্পটু দূত প্রশংসনীয় হয়। সেনাপতির হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিস্বরূপ দণ্ড আয়ত্ত থাকে, ঐ সকল দণ্ডের শিক্ষাকার্য্য তাঁহারই হস্তে থাকিবে, নৃপতিতে কোষ, ও রাষ্ট্র আয়ত্ত থাকে, এই দুইটী কখনও পরহস্তে অর্পণ করিবেন না। সন্ধি ও বিপর্য্যয় (বিগ্রহ) দূতের আয়ত্ত থাকে ; অতএব সেনাপতি দূতকে তাদৃশ গুণশালী করিবেন। দূতই পরস্পরবিরোধী রাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইতে ও মিত্রভাবাপন্ন রাজগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারে। দূত, শত্রু রাজার অনুচরের ইঙ্গিত ও চেষ্টাদ্বারা শত্রুরাজার অভিপ্রায় জানিবে। ক্ষুব্ধ লুব্ধ ও অপমানিত ভৃত্যবর্গের প্রতি শত্রু রাজার কিরূপ অভিপ্রায় তাহাও জানিবে। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দূতদ্বারা শত্রুরাজার অভিপ্রায় যথার্থরূপ অবগত হইয়া, রাজা এ রূপ সতর্ক হইবেন, যেন কোন রকমে আত্ম-পীড়ার আশঙ্কা না থাকে।

যে স্থানে জল ও তৃণ অল্প, বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রচুর রৌদ্রের উত্তাপ পাওয়া যায়, বহুল পরিমাণে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়, অনেক ধার্ম্মিক লোকের বাস, প্রজাবর্গ রোগ শোক বিবর্জ্জিত, ফলপূর্ণ ও বৃক্ষ লতাদি দ্বারা সুশোভিত, যে স্থানের প্রজাগণ

রাজানুরক্ত ও যেখানে কৃষি বাণিজ্যাদির সুবিধা আছে, রাজা তদ্রূপ স্থানে বসতি করিবেন। ধন্বদুর্গ (যাহারা চতুর্দ্দিক পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত জনশূন্য মরুময়), মহীদুর্গ (যাহা প্রস্তর বা ইষ্টকাদি দ্বারা দ্বাদশ হস্তবেধ বিশিষ্ট দেওয়াল দ্বারা নির্ম্মিত, চব্বিশ হস্তেরও অধিক উচ্চ এবং কপাট ও গবাক্ষাদিযুক্ত প্রাচীরে বেষ্টিত), জলদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিক গভীর জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত), বার্ক্ষদুর্গ (যাহার চতুর্দ্দিকে এক যোজন পরিমিত স্থান কন্টকময় গুল্মাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত), নৃদুর্গ (যাহার চারিদিক হস্তী, অশ্ব ও রথদিসহ বহু সৈন্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত), গিরিদুর্গ (মনুষ্যের দুর্গম পর্ব্বতের উপরিভাগে, একটি মাত্র দুর্গম ও নিভৃত পথবিশিষ্ট), এবম্বিধ কোনও দুর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন। রাজা সর্ব্বতো যত্ন সহকারে গিরিদুর্গ আশ্রয় করিবেন, অন্য দুর্গাপেক্ষা গিরিদুর্গ অনেক গুণবিশিষ্ট। উক্ত ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে ধন্বদুর্গ মৃগ কর্ত্তৃক আশ্রিত, নৃদুর্গ মনুষ্য কর্ত্তৃক আশ্রিত এবং গিরিদুর্গ দেবতাদি কর্ত্তৃক আশ্রিত। এই সকল দুর্গাশ্রিত মৃগাদিকে যেমন ব্যাধাদি শত্রুগণ হিংসা করিতে সমর্থ হন না। প্রাকারস্থিত (দুর্গাশ্রিত) একজন যোদ্ধা শত্রুপক্ষের একশত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, এবং একশত যোদ্ধা দশসহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অতএব রাজা অবশ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন। নির্ম্মিত দুর্গ বহু শস্ত্রাদিসম্পন্ন, সুবর্ণ ও ধনধান্যাদি সমৃদ্ধিযুক্ত, হস্তী ও অশ্বাদি বাহনপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাহাতে ব্রাহ্মণ, বিবিধ প্রকারের শিল্পী ও নানাবিধ যন্ত্র থাকিবে, এবং পশ্বাদির ভক্ষ্য ঘাস ও জলের প্রাচুর্য্য থাকিবে। রাজা উক্ত দুর্গমধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে মহিলাগণের বাসভবন, দেবালয়, অস্ত্রাগার ও অগ্নিগৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন। পরিখা ও উচ্চ প্রাকারাদি দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হইবে, এবং ফল পুষ্প ও বাপী কূপাদির দ্বারা সুশোভিত হইবে।

এতাদৃশ গৃহে বাস করিয়া রাজা সবর্ণা, সুলক্ষণান্বিতা, মহাকুল প্রসূতা সুরূপা ও গুণান্বিতা মহিলাকে বিবাহ করিবেন। মারণোচ্চাটন ও বশীকরণাদি অথর্ব্ব বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিতকে ও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ঋত্বিককে বরণ করিবেন। পুরোহিত ও ঋত্বিক আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। রাজা দক্ষিণক-অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু ও ধনাদি দান করিবেন।

রাজা, প্রজাবর্গ হইতে শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সাংবৎসরিক কর গ্রহণ ও তাহাদের প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির তত্ত্বাবধান জন্য রাজা কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীসমূহের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া যাঁহারা গুরুগৃহে

থাকিয়া কৃতবিদ্য হইয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, রাজা ধনাধান্যাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবেন। সামান্য ধনের ন্যায় ব্রাহ্মণে অর্পিত ভূম্যাদিরূপ ধন চোরে চুরি করিতে পারে না, শত্রুগণ অপহরণ করিতে পারে না, এবং সামান্য ধনের ন্যায় কালে বিনষ্ট বা স্থানভ্রমে অদৃশ্য হয় না, ইহা অক্ষয় ফলদায়ক হয়। অগ্নিতে হোম করিতে গেলে কোন কোন সময় ঘৃতের অধঃপতন হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণে যে হবি অর্পণ করা হয়, তাহা কখনও দ্রব হয় না, দাহাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকে যাহা দান করা হয়, তাহার সমফল লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তু দানের যে ফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা লাভ হয়। জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল, অধ্যয়নরত ব্রাহ্মণকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল এবং সর্ব্ব-বেদ পারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। বিদ্যা, তপস্যা ও বৃত্তিভেদে দানযোগ্য পাত্রের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই তারতম্য ও শ্রদ্ধার তারতম্যে পরলোকে অল্প বা মহৎ ফল লাভ হয়, দানের বস্তু অল্প বা অধিক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই।

আপনার তুল্য বলশালী, আপনা অপেক্ষা প্রবল বা হীনবল অন্য রাজা যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসরণ পূর্ব্বক রাজা কখনও যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্ত হইবেন না। যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রজার পালন করা এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা করা রাজগণের শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম। রাজগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পর পরস্পরকে হনন জন্য প্রবৃত্ত হইবেন। যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া হত হইলে স্বর্গ লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে রাজ্যাদি লাভ রূপ দৃষ্ট ফল ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ রাজা স্বর্গরূপ অদৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। কূটাস্ত্র (গুপ্তি) দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না। কণ্যাকার ফলকযুক্ত বাণ, বিষাক্ত বাণ, অগ্নি দ্বারা দীপ্ত-ফলক বাণ দ্বারা যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। রথী রথ পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে অবস্থিত শত্রুকে হিংসা করিবেন না। নপুংসক, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ শত্রু, মুক্তকেশ-ব্যক্তি, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনে সমাসীন ব্যক্তি ও আত্ম সমর্পণকারীকে বিনষ্ট করিবেন না। নিদ্রিত, বর্ম্মবিহীন, উলঙ্গ, নিরস্ত্র, যে কেবল যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত এবং যে ব্যক্তি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে হিংসা করিবেন না। যাহার অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, যে যুদ্ধে নিহত পুত্রাদির শোকে কাতর, শত্রুর অস্ত্রে যাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, যে ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করা রাজার পক্ষে অধর্ম্ম। যে সংগ্রামে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, সেই ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক হত হইলে, সেই হন্তা তাহার পোষণকর্ত্তার পাপরাশি প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধে ভীত ও পলায়িত ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তাহার সঞ্চিত পুণ্যরাশি তাহার ভর্ত্তার লভ্য হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, বস্ত্রাদি, ধনধান্য গবাদি পশু, স্ত্রীলোক, গুড় লবণাদি বস্তু, তৈজস প্রভৃতি যে-সকল বস্তু জয়ান্তে যে ব্যক্তি

পাইবে, তাহা তাহারই হইবে, কিন্তু লব্ধবস্তু মধ্যে সুবর্ণ ও রজতাদি এবং হস্তী অশ্বাদি রাজাকে অর্পণ করিবে। আর পৃথক পৃথকরূপে বিজিত দ্রব্যগুলি রাজা যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন। যোদ্ধাগণের এই সনাতন ধর্ম্ম তোমাদিগকে বলিলাম। ক্ষত্রিয় রাজা অথবা রাজধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন না।

রাজা অলব্ধ ভূমি ও হিরণ্যাদি ধনলাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। লব্ধ ধন সযত্নে রক্ষা করিবেন, তাহা বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন। এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যায় পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, অতএব রাজা নিরলস হইয়া সর্ব্বদা ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। রাজা দণ্ডদ্বারা অলব্ধ জনপদ লাভার্থ ইচ্ছুক থাকিবেন, প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ ধন বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্বাদিকে সুশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন, সর্ব্বদা আপন পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, মন্ত্রণা ও চরের কার্য্য গোপন রাখিবেন, শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্বাদিকে শিক্ষা দান করা হইলে, তদ্দর্শনে তাঁহার ভয়ে সকলে উদ্বিগ্ন থাকে, অতএব রাজা সকল প্রাণীকেই দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন।

রাজা আপন অমাত্যের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন, তদন্যথায় তিনি সকলের অবিশ্বস্ত হইবেন। চর দ্বারা গোপনে শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন। আপন প্রকৃতি ভেদাদি ছিদ্র অন্যে জানিতে না পারে, সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন। কুর্ম্মের স্বীয় মুখ ও চরণাদি গোপন করিবার মত রাজা অমাত্যাদি অঙ্গকে দান-মান দ্বারা আত্মসাৎ করিবেন ; দৈবাৎ প্রকৃতি কুপিত হইলে শীঘ্র তাহার সমতা বিধান করিবেন। বক যেমন মৎস্যকে ধরিবার নিমিত্ত একান্ত মনে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ রাজা একাগ্রচিত্তে পররাজ্য গ্রহণের চিন্তা করিবেন। সিংহ যেমন বৃহৎকায় হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করে, তদ্রূপ নিজে ক্ষীণবল হইলেও শত্রুকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ দ্বারা আক্রমণ করিবেন। বৃক যেমন পালের অসতর্কতা বুঝিয়া পালস্থিত পশু বিনাশ করে, তদ্রূপ দুর্গাদিতে অবস্থিত রাজাকে কিঞ্চিৎ অসতর্ক দেখিলেই বিনাশ করিবেন। শশ যেমন সশস্ত্র ব্যাধে পরিবেষ্টিত হইয়াও কুটিল গমনে পলায়ন করে, তদ্রূপ রাজা বলহীন হইয়া, বলবন্ত পরিবৃত্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিবেন। রাজা বিজয়ার্থ প্রবৃত্ত হইলে যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ে বশীভূত করিবেন। যদি উহারা সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ে নিরস্ত না হয়, তবে রাজা যুদ্ধ দ্বারা দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে আপন বশে আনিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ সাম ও দণ্ড এই দুইটীকে প্রশংসা করিয়া থাকেন ; কারণ, সামে প্রয়াস নাই,

অর্থব্যয় ও সৈন্যক্ষয় হয় না ; দণ্ডে (যুদ্ধে) এই সকল আশঙ্কা থাকিলেও তদ্দ্বারা অতিশয় কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

যেরূপ ধান্য ও তৃণ একত্রে জন্মিলেও কৃষক ধান্য রক্ষা করিয়া তৃণাদি বিনাশ করে, তদ্রূপ রাজা দুষ্টকে বিনষ্ট করিয়া শিষ্টকে রক্ষা করিবেন। যে রাজা দুষ্ট ও শিষ্টের অজ্ঞানতা হেতু অশাস্ত্রীয় উপায়ে সম্পত্তি গ্রহণ ও শারীরিক কষ্ট দ্বারা প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়িত করেন, তিনি প্রকৃতি-কোপে পতিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও সবান্ধবে নিধনপ্রাপ্ত হন। প্রাণী যেমন আহার বিহনে ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ রাষ্ট্রপীড়ক রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের কোপে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। রাজা রাজ্য সুরক্ষার বিধান করিবেন। রাজা ছোট বড় গ্রাম অনুসরে দুই, তিন, পাঁচ অথবা শত গ্রামের মধ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সৈন্যাদিসহ একজন প্রধান রাজপুরুষ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই নির্দ্ধারিত স্থানকে গুল্ম বলা যায়। প্রত্যেক গ্রামের এক এক জনকে অধিপতি (সরদার) করিবেন। তদপেক্ষা প্রবল এক জনকে দশ গ্রামের অধিপতি করিবেন। এই ভাবে বিংশতি গ্রামের, শত গ্রামের ও সহস্র গ্রামের অধিপতি নিয়োগ করিবেন। গ্রামে চৌর্য্যাদি কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, গ্রামপতি তাহার প্রতিকার করিবেন। তিনি সে বিষয়ে অক্ষম হইলে, দশ গ্রামের অধিপতিকে তাহা জানাইবেন। এইরূপ এক অধিপতি প্রতিকারে অপারগ হইলে তাঁহার উর্দ্ধতন অধিপতিকে জানাইবেন। তদ্দ্বারা রাজ্যের চৌর্য্যাদি উপদ্রব নিবারিত হইবে।

এখন গ্রামাধিপতির বৃত্তি বলা যাইতেছে। গ্রাম্য লোকেরা প্রতিদিন এক গ্রামের রাজাকে যে অন্ন পান ইন্ধনাদি প্রদান করিবে, গ্রামাধিপতি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। দশ গ্রামাধিপতি কুল পরিমিত ভূমি* ও বিংশতি গ্রামাধিপতি তাহার পাঁচগুণ ভূমি বৃত্তিস্বরূপ প্রপ্ত হইবেন। শত গ্রামের অধ্যক্ষ একটী গ্রাম ও সহস্র গ্রামের অধীশ্বর একটী পুর (নগর) পাইবেন।

নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে গ্রহ যেরূপ ভয়ঙ্কর, তদ্রূপ নগরে নগরে সর্ব্বোপরি প্রধান ও সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধানক্ষম ভয়ঙ্কর তেজস্বী একজন নগরাধিপতি নিযুক্ত করিবেন। উক্ত নগরাধিপতি পরিভ্রমণ করিয়া গ্রামাধিপতি প্রভৃতির কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। এবং রাজা চর দ্বারা গ্রামাধিপতি ও নগরাধিপতি প্রভৃতির কার্য্যের বিষয় অবগত হইবেন। কারণ, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত রাজ-ভৃত্যগণের মধ্যে অনেকে পরধন গ্রাহক ও বঞ্চক হয়, রাজা বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ শ্রেণীর ভৃত্যবর্গ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত যে-সকল পাপবুদ্ধি

---

* আটটী গো দ্বারা হলকর্ষণকে ধর্ম্ম্য বলা যায়, জীবিকার নিমিত্ত ছয়টি গো দ্বারা হলকর্ষণ বৈধ, গৃহস্থ ব্যক্তি চারিটী গো দ্বারা কর্ষণ করিবেন। দুইটী গরু দ্বারা কর্ষণ নিন্দিত। দুইটী গরু দ্বারা কর্ষিত দুইটী হলে যত ভূমি কর্ষিত হইতে পারে, সেই ভূমিকে কুল বলা হয়।

ভৃত্য লোভপরবশ হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করে, রাজা তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

রাজা, উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত ভৃত্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, সাধারণ ভৃত্যের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কর্ম্মানুসারে দৈনন্দিন বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন। অপকৃষ্ট ভৃত্যের বেতন প্রতিদিন এক পণ হিসাবে দিবেন, ছয় মাসে এক যোড় বস্ত্র ও এক মাসে এক দ্রোণ ধান্য দিবেন।*

বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনীত, পাথেয় ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া, লভ্যাংশ নির্ণয় করতঃ তদনুসারে রাজা বণিকগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ও বণিক আপন আপন কার্য্যে যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন, রাজা তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক কর নির্দ্ধারণ করিবেন।

যেমন জলৌকা অল্পে অল্পে রুধির পান করে, বৎস দুগ্ধ পান ও ভ্রমর মধুপান করে, তদ্রূপ রাজা, প্রজাসাধারণের মূলধনের ব্যাখাত না করিয়া অল্পে অল্পে বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় কর লভ্যের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, ধান্যাদি শস্য সম্বন্ধীয় কর অবস্থা বিবেচনায় ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা লইবেন। বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশ নির্ম্মিত পাত্র চর্ম্মপাত্র, মৃন্ময়পাত্র, প্রস্তরময় দ্রব্য, এই সপ্তদশ প্রকারের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে রাজা তাহার ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ † হইতে কর গ্রহণ করিবেন না, এবং শ্রোত্রিয়ের ক্ষুন্নিবারণে কখনও ক্রটী করিবেন না। যে রাজার রাজ্যে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সেই রাজাকে

---

* আট মুষ্টি ধান্যে এক কুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢ়ক চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়।

†শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত,—

(১) "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞায়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রেত্রিয় স্ত্রিভিরেব হি।।"

পদ্মপুরাণ, — উত্তরখণ্ড, ১১৬ অধ্যায়।

(২) "একাং শাখাং সঙ্কল্পং বা ষড় তিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্ কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মাবৎ।।"

দান কমলাকর।

মনুসংহিতা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণেও শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

জঠরানলে (দুর্ভিক্ষাদিরূপে) নিপাত করে। রাজা, শ্রোতিয়ের শাস্ত্র জ্ঞানাদি বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিবেন। এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ চৌরাদি হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। কারুকার্য্য রত, শিল্পকার, শূদ্র (যাহারা দাস পদবাচ্য) এবং যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, রাজা তাহাদিগকে করের পরিবর্ত্তে প্রতিমাসে এক একদিন কার্য্য করাইয়া লইবেন। রাজা নিজ প্রাপ্য কর ও শুল্ক, স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম মূলোচ্ছেদন করিবেন না, ও লোভবশতঃ সমধিক কর ও শুল্ক গ্রহণ করিয়া পরের মূলোৎপাটন করিবেন না।

রাজা কার্য্য বিশেষে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এবং কোন কার্য্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল স্বভাব হইবেন। এবম্প্রকার রাজা সকলের প্রিয় হন। রাজা স্বয়ং বিচারকার্য্যে অসমর্থ হইলে, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, পণ্ডিত, ও সৎকুলজাত জনৈক শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। উক্ত প্রকারে আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া রাজা উৎসাহের সহিত ও অপ্রমাদে সর্ব্বতোভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রজাগণ চোর ও দস্যুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিলেও যে রাজা তাহার প্রতিবিধান না করেন, সেই রাজা ও তাঁহার অমাত্যবর্গ জীবিত থাকিতেই তাঁহাদিগকে মৃত বলা যায়। রাজার অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালন পরম ধর্ম্ম। রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যাত্যাগ করিয়া, শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ সৎকার করিয়া সভায় প্রবেশ করিবেন। উক্ত সভায় সমাগত প্রজাসকলকে সাদরে বিদায় করিয়া মন্ত্রিবর্গ সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইবেন। পর্ব্বতপৃষ্ঠে, প্রাসাদে, নির্জ্জন স্থানে কিম্বা অরণ্যে বসিয়া মন্ত্রণা করিবেন। যে রাজার মন্ত্রণা অন্য ব্যক্তি জানিতে না পারে, তিনি অল্প ধনশালী হইলেও সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেন। জড়, মূক, অন্ধ, বধির শুকসারিকাদি পক্ষী, অতি বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, রোগী অধিকাঙ্গ ও অঙ্গহীনদিগকে মন্ত্রণা সময়ে দূরে সরাইয়া দিবেন। জড়াদি ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অবমানিত অবস্থায় থাকা হেতু এবং পক্ষী ও স্ত্রীলোক প্রভৃতি স্বভাব দোষে মন্ত্রণা ভেদ করিয়া ফেলে। দিবা দুই প্রহরকলে অথবা অর্দ্ধরাত্রে সুস্থান্তঃকরণে অমাত্যবর্গের সহিত কিম্বা একাকী ধর্ম্মার্থ কাম চিন্তা করিবেন। উক্ত ধর্ম্মার্থ কাম পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত, উক্ত বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। কন্যাদিগকে সৎপাত্রে সম্প্রদান ও কুমারদিগকে রক্ষণ করিবেন। দূত দ্বারা কিরূপে সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, আরব্ধ কার্য্য কি প্রকারে শেষ করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবেন। অষ্ট কার্য্যের প্রতি (আয়, ব্যয়, করাদি গ্রহণ, ভৃত্যাদির বেতন দান, মন্ত্রীদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োগ, বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠানে নিবারণ, সন্দিগ্ধ বিষয়াদিতে শাস্ত্রসম্মত কর নিরূপণ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত) রাজার বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। পঞ্চবর্গের* কর্ত্তব্য বিষয়ে রাজা যথার্থরূপে চিন্তা করিবেন। মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন ও শত্রু রাজগণের কার্য্যাদির অনুসন্ধান করিবেন।

মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন ও শত্রু এই চারিকে মূল প্রকৃতি বলা যায়। মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ্য, আক্রন্দ, পর্ষ্ণিগ্রাহাসার আক্রন্দাসার এই আটটী প্রকৃতি, সর্ব্ব সমেত প্রকৃতি দ্বাদশটী। এতদ্ব্যতীত অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড, এই সমস্তও প্রকৃতি বাচ্য। পূর্ব্বোক্ত বারটী-সহ প্রকৃতির সংখ্যা দ্বিসপ্ততি।

যুদ্ধার্থী রাজার রাজ্যের অব্যবহিতান্তরবর্ত্তী রাজাকে শত্রু বলা যায়। অরি-সেবীকে কৃত্রিম শত্রু বলে। অরি ভূমির অগ্রবর্ত্তীকে মিত্র বলা হয়। এবং অরি রাজা ও যুদ্ধার্থী রাজার ভূমির অনন্তরবর্ত্তী রাজাকে উদাসীন বলা যায়। এই সকল নৃপতিকে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, এই চারিটী উপায়ের কোন একটী দ্বারা অথবা সমস্ত দ্বারা বশীভূত করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান (যুদ্ধার্থ শত্রুরাজার প্রতি যাত্রা), আসন (উপেক্ষা করিয়া গৃহে অবস্থান করা), দ্বৈধ (স্বীয় সৈন্যকে দ্বিধা করা), আশ্রয় (শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলবান রাজার শরণাপন্ন হওয়া), এই ছয়টী নৃপতিগণের উপকারক, এই জন্য গুণ শব্দবাচ্য হইয়াছে। এই সকল গুণের মধ্যে যেটীর আশ্রয়ে নিজের উপকার ও শত্রু-রাজার অপচয় ঘটে, তাহাই আশ্রয় করিবেন। আপনার সমৃদ্ধি, শত্রু-রাজার হানি, অথবা শত্রু-রাজার সমৃদ্ধি দেখিয়া সময়োচিত আসন, যাত্রা, সন্ধি, যুদ্ধ, দ্বৈধীকরণ বা অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান আসন দ্বৈধীভাব ও আশ্রয়, ইহার প্রত্যেকটী দুই প্রকার। উপস্থিত সময়ে ফল লাভার্থ অথবা ভবিষ্যতে ফল লাভ জন্য মিত্র-রাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রুরাজার প্রতি অভিযান জন্য যে সন্ধি করা হয়, তাহাকে সমান যান-কর্ম্মা সন্ধি বলে ; আর পরস্পর ভিন্ন ভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত যে সন্ধি, তাহাকে অসমান যান-কর্ম্মা সন্ধি বলা হয়, অতএব সন্ধি দ্বিবিধ। বিগ্রহ দুই প্রকার— স্বয়ং কৃত ও মিত্র রাজার রক্ষার্থ যুদ্ধ। শক্তিশালী হইলে একাকীই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তদ্বিষয়ে অশক্ত হইলে অন্য রাজার সহিত মিলিত ভাবে অভিযান করিবেন, এই কারণে যান দ্বিবিধ। পূর্ব্বজন্মার্জিত দুষ্কৃত দ্বারা

---

* পঞ্চবর্গ,—কাপাটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহিকব্যঞ্জন ও তাপস্যব্যঞ্জন এই পাঁচটী চরের নাম পঞ্চবর্গ।

প্রগলভ ব্যক্তি কপট ব্যবহারী, এজন্য তাহাকে কাপটিক বলা যায়। ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকে উদাস্থিত বলে। কৃষক ক্ষীণ বৃত্তি প্রজ্ঞাশৌচযুক্ত হইলে, তাহাকে গৃহপতিব্যঞ্জন বলা হয়। ক্ষীণ বাণিজ্য বৃত্তির লোককে বৈদেহিক বলে। ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাদিসম্পন্ন হইলে তাহাকে তাপস্যব্যঞ্জন বলা যায়। এই পঞ্চবর্গ চর দ্বারা শত্রুগণের মনোভাবাদি জানা সঙ্গত।

অথবা দৈবদুর্ব্বিপাকে হস্তী, অশ্ব ও কোষাদি ক্ষয়জনিত আসন, ও মিত্র রাজার অনুরোধে তাঁহার কার্য্য রক্ষার্থ আসন, এই দুই প্রকার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। ষটগুণবেত্তাগণ বলেন, প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সেনাপতিসহ সৈন্যের একত্র অবস্থান ও কতক সৈন্য লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে স্বয়ং রাজার অবস্থান, এই দুই প্রকার দ্বৈধী ভাব। শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং পীড়িত হইবার আশঙ্কায় আশ্রয় গ্রহণ করা, এই দ্বিবিধ আশ্রয়। যখন জানিবেন যে, যুদ্ধের প্রতিনিবৃত্তিতে আপন প্রাবল্য হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু আপাততঃ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তখন যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবেন। আর যখন আপনার অমাত্যাদি প্রকৃতি সকল বলিষ্ঠ, ও নিজে শক্তিসম্পন্ন হইবেন, তখন যুদ্ধ করিবেন। যখন যথার্থরূপে জানিবেন যে, আপনার অমাত্যাদি প্রকৃতি হর্ষযুক্ত ও ধনাদি দ্বারা পুষ্ট ও শত্রু রাজার তদ্বিপরীত অবস্থা দেখিবেন, তখন শত্রু রাজার প্রতি অভিযান করিবেন। আর, যখন আপনার বাহন ও সৈন্যদিগকে ক্ষীন দেখিবেন, তখন ক্রমে ক্রমে উপঢৌকনাদি দ্বারা শত্রু রাজাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক আসন অবলম্বন করিবেন। যখন সর্ব্বতোভাবে বলবান রাজাও সন্ধির অযোগ্য হইবে, তখন আত্মবল দুই ভাগ করিয়া, কতক সৈন্যসহ রাজাও দুর্গ আশ্রয় করিবেন, অবশিষ্ট দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টিত হইবেন। শত্রু সৈন্য দমনে অসমর্থ হইলে, আত্মরক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র ধার্ম্মিক ও বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যে রাজা দুষ্ট প্রকৃতিদিগকে নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এরূপ গুণশালী ও বলবন্ত রাজাকে গুরুর ন্যায় সেবা করিবেন। যদি অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা দুষ্য মনে হয়, তবে নির্ভয় চিত্তে তুমুল সংগ্রাম করিবেন। যাহাতে মিত্র ও উদাসীন শত্রুরাজা প্রবল হইতে না পারে, নীতিজ্ঞ রাজা দানাদি সর্ব্ববিধ উপায় দ্বারা তৎপক্ষে যত্নবান হইবেন।

সকল কর্য্যেরই শেষকালে কি দোষ বা গুণ হইবে, তাহা বিচার করিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্যে ভবিষ্যতে কি দোষ বা গুণ ঘটিবে, ইহা যিনি বুঝেন, তিনি গুণশালীকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং যে কর্য্যে দোষ ঘটিবে তাহাতে বিরত থাকেন। যিনি সত্বরতার সহিত উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করেন, এবং অতীত কার্য্যের গুণাগুণ চিন্তা করেন, তিনি সকল কার্য্যেই ফল লাভ করেন। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ে সাবধান রাজা কখনও শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হন না। মিত্র ও উদাসীন শত্রুরাজগণ যাহাতে পীড়া দিতে না পারে, বিজিগীষু রাজা এরূপ উপায় করিবেন। বিজিগীষু রাজা যখন শত্রুরাজার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তখন শ্লোকোক্ত প্রকারে সেই যাত্রা আরম্ভ করিবেন। শুভ মার্গশীর্ষ মাসে, কিম্বা ফাল্গুন, চৈত্র মাসে যাত্রা করিবেন। আর শত্রুরাজ্যে গমন করা মাত্র জয় হইবে, এরূপ জানিলে গ্রীষ্মাদিকালেও যাত্রা করিবেন। শত্রুরাজার অমাত্যবর্গের পরস্পর

ব্যসন উপস্থিত হইলে, কিম্বা সেই রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জ আত্মপক্ষ হইলে, রাজা যে-কোন কালে যুদ্ধার্থ পররাজ্যে গমন করিতে পারেন।

যাত্রাকালে স্বীয় দুর্গ ও রাজ্যের অনিষ্ট হইতে না পারে, এরূপভাবে প্রধান সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য দুর্গে সংস্থান করিয়া এবং যাত্রার উপযুক্ত বাহন ও অস্ত্রাদির যথাশাস্ত্র যাত্রা করাইয়া এবং পররাজ্যে অবস্থান জন্য শয্যা ও খট্টাদি বস্তু সংগ্রহ করিয়া এবং শত্রুরাজার ভৃত্যদিগকে কৌশলে স্বপক্ষ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কাপটিকাদি পঞ্চবর্গের সাহায্যে প্রতিপক্ষের বার্ত্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া, জাঙ্গল, অনুপ, আটরিক, ত্রিবিধ পথের বৃক্ষ-লতাদি ছেদন ও উচ্চনিম্ন পথের সমীকরণ রূপ শোধন করিয়া এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ভৃত্যবর্গের যথাযোগ্য আহার, ঔষধ ও সম্মানাদি দানের ব্যবস্থা করিয়া, যুদ্ধ শাস্ত্রোক্ত বিধানে উত্তরোত্তর শত্রুদেশে যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি বাহিরে আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া, অন্তরে শত্রুপক্ষাবলম্বী হয়, এবং যে ভৃত্য কোন কারণে একবার অন্তরিত হইয়া পুনর্ব্বার আগত হইয়াছে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না।

যাত্রাকালে চতুর্দ্দিক হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, দণ্ডব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যাত্রা করিবেন। অগ্রে বলাধ্যক্ষ (প্রধান সেনাপতি), মধ্যে স্বয়ং রাজা, পশ্চাদ্ভাগে সেনাপতি, উভয় পার্শ্বে হস্তিযুথ, হস্তীর নিকটে অশ্ব, তৎপর পদাতিবর্গ, এই প্রকার রচনাকে দণ্ডব্যূহ বলে। পশ্চাৎ হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, অগ্রভাগ সূচ্যাকার, পশ্চাৎ স্থূল ব্যূহ রচনা করিবেন, ইহার নাম শকটব্যূহ। উভয় পার্শ্ব হইতে ভয়ের কারণ ঘটিলে, বরাহ ও মকরব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যাত্রা করিবেন। অগ্র ও পশ্চাৎভাগ সুক্ষ্ম, মধ্যভাগ স্থূল, ইহাকে বরাহব্যূহ বলা যায়। উক্ত ব্যূহ অতিশয় স্থূলমধ্য হইলে তাহাকে গরুড়ব্যূহ বলা হয়। বরাহব্যূহের উল্টা অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাৎভাগ স্থূল মধ্যভাগ সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে মকরব্যূহ বলে। অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে ভয় হইলে মকরব্যূহ রচনায় অভিযান করিবেন। অগ্রে ভয় উপস্থিত হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিবেন। অগ্র ও পশ্চাৎভাগে পিপীলিকা পংক্তির ন্যায় অতিশয় নিবিড়রূপে গমনশীল সৈন্যসমূহ, অগ্রভাগে প্রবীর পুরুষ থাকলে তাহাকে সূচীব্যূহ বলে। যে দিকে ভয় উপস্থিত হইবে, সেইদিকে আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন, অথবা পদ্মব্যূহ রচনায় অবস্থান করিবেন। সমভাবে বিস্তৃত মণ্ডলাকার সৈন্য স্থাপন করিয়া মধ্যবাগে রাজার অবস্থান করাকে পদ্মব্যূহ বলে। রাজা পুর হইতে যাত্রা করিয়া সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবেন।

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি দশকের অধ্যক্ষকে পত্তি বলা যায়। পত্তিক দশকের পতিকে সেনাপতি, সেনাপতি দশকের অধ্যক্ষকে বলাধ্যক্ষ বলা হয়। উক্ত সেনাপতি ও বলাধ্যক্ষকে চতুর্দ্দিকে নিয়োগ করিবেন। আর যেদিন হইতে ভয় উপস্থিত হইবে, সেই দিগকে অগ্র বলিয়া কল্পনা করিবেন।

সেনাপতি অধিষ্ঠিত কতক সৈন্য যুদ্ধার্থ, কতক ভেরী পটহাদি বাদ্য দ্বারা সঙ্কেত করিতে, উক্ত উভয় কার্য্যকুশল কতক সৈন্য অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে প্রতিপক্ষের প্রবেশ নিবারণার্থ এবং কতককে শত্রুর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিবেন। অল্প যোদ্ধাস্থলে সৈন্যদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। যোদ্ধার সংখ্যা অধিক হইলে ইচ্ছানুরূপ সেনাদিগকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন, অথচ সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। তিন শ্রেণীর বলদ্বারা যে ব্যূহ হয়, তাহাকে বজ্রব্যূহ বলে।

সমতলক্ষেত্রে অশ্ব বা রথ দ্বারা, জলমধ্যে নৌকা বা হস্তী দ্বারা, বৃক্ষলতাদি দ্বারা আবৃত স্থানে ধনুর্ব্বাণ দ্বারা; গর্ত্ত, কন্টক ও পাষাণাদি রহিত স্থলে খড়গ চর্ম্ম ও ভল্লাদি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। কুরুক্ষেত্র দেশীয়, বিরাট দেশীয় এবং কান্যকুব্জ অহিচ্ছত্র দেশীয় এবং মথুরাবাসী লোকেরা প্রায়ই দীর্ঘাকার, অনতিস্থূল দেহী ও শৌর্য্য-অহঙ্কারশালী হয় ; এই সকল দেশোদ্ভব মনুষ্যকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ করিবেন। স্বপক্ষের যোদ্ধাগণ হর্ষযুক্ত কি ক্রুদ্ধ, তাহা পরীক্ষা করিবেন, এবং শত্রুর সহিত যথার্থরূপে যুদ্ধ করিতেছে, কি ছল যুদ্ধ করিতেছে তাহাও দেখিবেন।

দুর্গস্থিত বা অন্যত্রাবস্থিত শত্রুকে সর্ব্বদা সৈন্যদ্বারা আবৃতাবস্থায় রাখিবেন। এবং শত্রুরাজার দেশ উৎপন্ন করিবেন। শত্রুর অন্ন, ঘাস, উদক ও ইন্ধনাদি দ্রব্যসকলে অপদ্রব্য মিশ্রিত করিবেন। শত্রুগণ যে জলাশয়ের জলে স্নান পনাদি করে, তাহা নষ্ট করিবেন। দুর্গ প্রাকারাদি ভেদ করিবেন, পরিখাদি ছেদন ও পূরণাদি দ্বারা জলশূন্য করিবেন। এই প্রকারে শত্রুরাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন।

রাজ্য লাভাকাঙ্ক্ষী রাজবংশীয়গণ ক্ষুব্ধ অমাত্যবর্গের মধ্যে ভেদ জন্মাইবেন। ভেদ দ্বারা যাহারা আত্মপক্ষ হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যাদির সন্ধান রাখিবেন। শুভগ্রহ, শুভ দশাদিদ্বারা উত্তম সময় জানিয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রীতি ও হিত বাক্যাদি সাম প্রয়োগ, অথবা হস্তী, অশ্ব ও সুবর্ণাদি দান, কিম্বা শত্রুরাজার রাজ্য লালসাযুক্ত অমাত্যবর্গের সহিত ভেদ, ইহার এক একটী অথবা সমস্ত প্রয়োগে শত্রুরাজাকে জয় করিতে চেষ্টিত হইবেন। এতদ্দ্বারা জয় করা সম্ভব হইলে, যুদ্ধদ্বারা জয়াকাঙ্ক্ষী হইবেন না; যেহেতু, যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বহু সৈন্যসামন্তশালীকেও পরাজিত হইতে দেখা যায়, এবং অল্প বলেরও জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। যে স্থলে সাম, দান, ভেদ এই তিন প্রকার উপায় প্রয়োগেও জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, সেস্থলে প্রাণপণে এরূপ যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে শত্রুর পরাজয় ঘটে। এবম্প্রকারে পররাষ্ট্র জয় করিবার পর, শত্রুরাজ্যে সংস্থাপিত দেবতাসমূহ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে জিতবস্তুর কিয়দংশ দান ও সম্মান সহকারে পূজা করিবেন। এবং তত্রত্য সকলকে অভয় দান করিবেন। জিত রাজ্যের অমাত্যবর্গের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নিহত রাজার

বংশোদ্ভব উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এবং তাঁহার অমাত্যবর্গের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। সেই রাজ্যবাসিগণের যে দেশাচার গুরুপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে স্থিরতর রাখিবেন। এবং অভিষিক্ত রাজাকে, তাঁহার অমাত্যবর্গসহ রত্নাদি দানদ্বারা পূজা করিবেন। অভিলষিতবস্তু অন্যে গ্রহণ করা অপ্রিয় এবং অন্য হইতে প্রাপ্ত দান প্রিয়জনক, ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও জয়কালে অভিলষিত বস্তুর দান ও গ্রহণ উভয়ই প্রশংসনীয় হয়। সমস্ত কর্ম্মই পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃত দুষ্কৃতরূপ দৈব ও মানুষ ব্যাপারাধীন হইলেও দৈবদৃষ্টির অগোচর এবং অচিন্তনীয়, পৌরুষ ব্যাপার দৃষ্ট এবং চিন্তনীয়। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে পৌরুষদ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিবেন। শত্রুরাজা যুদ্ধ না করিয়া, যুধ্যমান রাজার সহিত মিত্রতা করিতে চাইলে, অথবা রত্ন দান বা রাজ্যের কিয়দংশ অর্পণ করিলে, যোদ্ধা রাজা তৎসহ সন্ধি বন্ধন করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবেন।

শত্রু রাজার প্রতি গমনোদ্যত বিজিগীষু রাজার রাজ্যের পশচাদ্বর্ত্তী পার্ষ্ণিগ্রাহ এবং উহার উৎসাহবর্দ্ধক পার্ষ্ণিগ্রহের রাজ্যানন্তরবর্ত্তী আক্রন্দ নৃপতি যদি যাত্রাকারীর দেশ আক্রমণাদি আচরণ করে, তবে উহাদের নিকট অগ্রে যাত্রা করিয়া সম্মতিগ্রহণ করিবেন, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিলে, তাহার দোষারোপ করিবে।

স্থিরমিত্রলাভে রাজা যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, হিরণ্য বা ভূমিলাভে তদ্রূপ বর্দ্ধিত হন না। স্থিরমিত্র আপাততঃ হীনবল হইলেও পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত থাকে, যাহার কার্য্যারম্ভের প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি, এতাদৃশ মিত্র আপাততঃ অল্পবল হইলেও প্রশংসনীয় হয়।

বিদ্বান ও মহৎকুল প্রসূত, মহাবলপরাক্রান্ত অতিচতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ ও সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন শত্রু অতিশয় কষ্টদায়ক, ইহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারা যায় না। যিনি অতি সাধু, যিনি মহাপুরুষের দৃষ্টিমাত্র তাহার স্বভাব বুঝিতে পারেন, যিনি মহাবলপরাক্রান্ত, দয়ালু ও দাতা, বিজিগীষু ভূপতি এবম্বিধ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যদি প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে উৎকৃষ্ট জল-বায়ু ও স্বাস্থ্যসম্পন্না, সর্ব্বশস্যশালিনী ও গবাদির পুষ্টিবর্দ্ধক বহু তৃণাদিমণ্ডিতা ভূমি ত্যাগ দ্বারাও আত্মরক্ষা করিবেন। আপৎ প্রতিকারের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিবেন। এবং উক্ত ধন ও পত্নী এতদুভয় পরিত্যাগ করিয়াও আপৎকালে আত্মরক্ষা করিবেন। ধনক্ষয়, অমাত্যাদির কোপ ও মিত্রে ব্যসনাদি আপদ এককালীন উপস্থিত হইলেও তাহাতে মোহযুক্ত না হইয়া প্রতিকারের নিমিত্ত সামাদি উপায়

প্রয়োগ করিবেন। স্বয়ং ও রাজ্যের লাভ্যাংশ এবং সাম প্রভৃতি উপায়, এই তিনটী অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিবেন।

এই প্রকারে রাজা মন্ত্রিবর্গের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সম্যক প্রকারে মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্র শিক্ষাদ্দ্বিারা ব্যায়াম করিয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যাহ্নিক স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপনান্তে আহারের নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। পরমাত্মীয় ভোজনকাল জ্ঞাতা ও অন্যের অভেদ্য সূপকারাদি কর্ত্তৃক প্রস্তুত, চকোর পক্ষী দৃষ্টে* ও বিষঘ্ন মন্ত্রদ্বারা পরীক্ষিত অন্নব্যঞ্জনাদিজ ভোজন করিবেন। যত্নসহকারে বিষঘ্ন ঔষধ সকল খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রণ করাইবেন। এবং বিষঘ্ন রত্ন শরীরে ধারণ করিবেন। গূঢ় চর দ্বারা যেসকল স্ত্রীলোক পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং যাহারা নিয়মিত বেশভূষাযুক্তা, তাহারা চামর ব্যজন, পানীয়জল ও ধূপন দ্বারা নৃপতির পরিচর্য্যা করিবেন। এইরূপ বাহন, শয্যা, আসন, ভোজন, গন্ধানুলেপন ও স্নানাদি বিষয়ের পরীক্ষা প্রণালীতে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন। অন্তঃপুরে ভোজনান্তে শ্রান্তি দূর করিয়া মহিষীগণের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া অষ্টধা বিভক্ত দিনের সপ্তমাংশ অতিবাহিত করিয়া অষ্টমাংশে পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে চিন্তা করিবেন।

অনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া, অস্ত্রশস্ত্রজীবী যোদ্ধাসকল, হস্তী অশ্বাদি বাহন, খড়গাদি অস্ত্রশস্ত্র দর্শন করিবেন। কোন বস্তু কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধান করিবেন। পরে গৃহে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনান্তে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া গুপ্ত সংবাদাদি চরের নিকট শ্রবণ করবেন। তৎপর পরিচারিকা স্ত্রী সকলের সাহিত পুনর্ব্বার ভোজনার্থ অন্তঃপুরে যাইবেন। অন্তঃপুরে শ্রুতিসুখকর বাদ্যধ্বনি দ্বারা হৃষ্ট হইয়া, দেড় প্রহর মধ্যে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া শয়ন করিবেন, অনন্তর শ্রান্তিদূর করিয়া রাত্রির শেষপ্রহরে গাত্রোত্থান করিবেন। রাজা সুস্থাবস্থায় স্বয়ং শাস্ত্রোক্ত প্রকারে প্রজাপালনাদি কার্য্য করিবেন এবং অসুস্থ হইলে অমাত্যাদি ভৃত্যের উপর সকল কার্য্যের ভারার্পণ করিবেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাবলীর ইহাই স্থূল মর্ম্ম।

"যোগযাত্রা" গ্রন্থ হইতে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুইটী অংশ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

(১) "দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পালো ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধি।
অপক্ষপাতোহপ্যরিরাষ্ট্রপীড়া পঞ্চৈব যজ্ঞা কথিতা নিপানাং।।"

(২) "মহীনো দয়য়াহীনো নিষ্কৃপোহশ্লীলবাক্ সদা।
পরস্ত্রী নিরতোহসূয়ারিষ্টচিত্তেহতিলুব্ধকঃ।।
দুর্জ্জনালাপ সততং সাধুলোক প্রপীড়কঃ।
অন্যায়োৎপত্তি বিত্তাচ্য শ্চেতি বিনষ্ট ধর্ম্মিনঃ।।"

* বিষাক্ত বস্তু দর্শনে চকোর পক্ষীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়।

রাজধর্ম্ম বা রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক শাস্ত্রীয় বাক্য বিস্তর আছে, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, কালীপুরণ—৮৫। ৮৬ অধ্যায় ও পদ্মপুরাণ— স্বর্গখণ্ড, ১৩৮ অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যাইবে। চাণক্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণও এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের অল্পাধিক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। কাল বিপর্য্যয়ে শাস্ত্রোক্ত সকল কথা পালন করিয়া চলা রাজগণের পক্ষে অসম্ভব এবং কোন কোন অংশ অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন হইলেও এই সকল মূল্যবান হিতকথা তাঁহাদের আলোচনাযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বাছিয়া লইলে ইহার মধ্যে বর্ত্তমানকালের রাজনীতির পুষ্টি ও উন্নতিজনক অনেক কথা পাওয়া যাইবে ; সম্ভবতঃ এজন্যই রাজমালার রচয়িতা বারম্বার রাজধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন।

সামুদ্রিক বিবরণ

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের অঙ্গের সুলক্ষণ ও চিহ্নাদি বিষয়ে রাজমালায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"রক্তবর্ণ দুইহস্ত মধ্যে উর্দ্ধরেখা।
মধ্যম অঙ্গুলী সীমা রেখা যায় দেখা।।
হস্তের অঙ্গুলী ছোট নখ ছোট নয়।
তর্জ্জনী তাহার ছোট গ্রাসে কষ্ট নয়।।
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অঙ্গুলী।
মধ্যম অঙ্গুলী হইতে অনামিকা বলী।।
ধ্বজ রেখা হস্তেতে ত্রিকোণ দণ্ড সমে।
মধ্যম অঙ্গুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে।।
অপূর্ব্ব বৃষস্কন্ধ বৃষপৃষ্ঠ যেন।
কমনীয় সম অঙ্গ কামদেব হেন।।
উচ্চ দীর্ঘ হনু, গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিল।
দীর্ঘ ললাট নাসা স্থুল দীর্ঘ হৈল।।
পদতলে চিহ্ন আর অন্যহনে ভিন্ন।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হ্রস্ব অতি সুলক্ষণ চিহ্ন।।
পদের তর্জ্জনী দীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জিনি।
উর্দ্ধরেখা দুই পদে আছিল অমনি।।

"ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল পদতলে
অতি সূক্ষ্মতর হয়ে পর্ব্ব করস্থলে।।
ব্রহ্মরন্ধ্রে নাহি কেশ নিতম্ব শোভন।
স্বহস্তের চারিহাত দীর্ঘ যে আপন।।"

রাজমালা—৩য় লহর, ২০ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত পংক্তিসমূহের মধ্যে রেখাদ্বারা চিহ্নিত লক্ষণ বা চিহ্নসমূহের ফল বিষয়ে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে যাহা উক্ত আছে, এস্থলে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইবে। কোন কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তৎসমস্তের আলোচনা করিবার সুবিদা ঘটিল না।

করতল রক্তবর্ণ হইলে, তাহার ফল বিষয়ে সামুদ্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

(১) "পাণিপদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তর নখানি চ।
তালুকোহধর জিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে ।।"

হস্ত ও পদতল, চক্ষুর অন্তভাগ, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা এই সাতটী রক্তবর্ণ হইলে তাহা প্রশস্ত হইয়া থাকে।

(২) "তাল্বোষ্ঠদন্তপালী জিহ্বা - নেত্রান্ত পায়ুকর চরণৈঃ।
রক্তৈস্তু রক্তসারা বহুসুখ বনিতার্থ পুত্রযুতাঃ ।।"

যাহাদের তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কর্ণরন্ধ্র, জিহ্বা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, হস্ত ও পদ রক্তবর্ণ, তাহাদের শরীরে রক্তাধিক্য জানা যায়। এই সকল মনুষ্য বহু সুখশালী, শ্রীসমন্বিত, ধনী ও পুত্রবান হইয়া থাকে।

(৩) "যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ।"

যাহার করতল রক্তবর্ণ, তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ করিবেন।

মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তে ঊর্দ্ধারেখা থাকিবার ফল ;—

"মধ্যমা মূল পর্য্যন্তমূর্দ্ধরেখা চ দৃশ্যতে।
পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্নো ধনবান স সুখী নরঃ।।"

মধ্যম অঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত যাহার ঊর্দ্ধরেখা দেরিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি সুখী, বিভবশালী ও পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সমন্বিত হয়।

হস্তে ধ্বজরেখা অঙ্কিত থাকিবার ফল ;—

(১) "মকরধ্বজ গোষ্ঠাগার সন্নিভাভির্ম্মহা ধনোপেতাঃ।"

যাহার করতলে মকল, ধ্বজা, গোষ্ঠ ও গৃহাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান হইয়া থাকে।

(২) "চক্রশঙ্খধ্বজাকারো মাষাকারশ্চ দৃশ্যতে।
সর্ব্ববিদ্যা প্রদানেন বুদ্ধিমান্ স ভবেন্নরঃ ।।"

যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ এবং মাষাকার চিহ্ন দেখা যায়। সেই ব্যক্তিসকল শাস্ত্রে পারদর্শী ও জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

হস্তে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবার ফল ;—

(১) "বাপী দেবগৃহাদ্যৈর্ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি চ ত্রিকোণাভিঃ।"

করতলে পুষ্করিণী, মন্দির ও ত্রিকোণাকর চিহ্ন দৃষ্ট হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী হয়।

(২) "সূর্য্যচন্দ্রলতানেত্র কোণ ত্রিকোণকম্।
মন্দিরাশ্ব গজেন্দ্রানাং চিহ্নং স্যাৎ স সুখী নরঃ।।"

করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষুঃ, অষ্ট কোণ, ত্রিকোণ, মন্দির, ঘোটক বা গজেন্দ্র চিহ্ন থাকিলে সেই মনুষ্য সুখী হয়।

(৩) "বাপী দেবকুল্যাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধার্ম্মিকে ।।"

তড়াগ, দেবনদী বা ত্রিকোণ রেখা (হস্তে) থাকিলে ধার্ম্মিক হয়।

"বৃষস্কন্ধো গজস্কন্ধঃ কদলীস্কন্ধ এব চ।
মহাভাগো মহাধন্যঃ স সর্ব্ব পার্থিবোপমঃ।।"

যে মনুষ্যের স্কন্ধদ্বয় বৃষ বা গজস্কন্ধের ন্যায় অথবা কদলী স্কন্ধতুল্য, সেই পুরুষ মহাভাগ্যধর, ধন্য ও সর্ব্বরাজতুল্য হইয়া থাকে।

হনু দীর্ঘ হইলে তাহার ফল ;—

"বাহুনেত্রদ্বয়ং কক্ষিঃ (হনুঃ) দ্বৌতু নাসা তথৈব চ।
স্তনদ্বয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চ দীর্ঘ প্রশস্যত ।।"

বাহুযুগল, নয়নযুগল, উদর বা গণ্ডদেশের উপরিভাগ, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল, এই পঞ্চ অঙ্গ যদি হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত।

গণ্ডদেশ পুষ্ট হইবার ফল ;—

"ভোগীত্বনিম্নগণ্ডে মন্ত্রী সম্পূর্ণমাংসগণ্ডো যঃ।"

যে মনুষ্যের গণ্ড নিম্ন নহে সে ভোগশালী, যাহার গণ্ড সম্পূর্ণ মাংসবিশিষ্ট, সে মন্ত্রী হইবে।

ললাট দীর্ঘ (প্রশস্ত) হইলে তাহার ফল —

(১) " উরোললাটং বদনং চ পুং সাং বিস্তীর্ণমেতত্রিতয়ং প্রশস্তম্।"

পুরুষের বক্ষঃস্থল, ললাট ও মুখ, এই স্থানত্রয় হইলে তাহা শুভদায়ক হয়।

(২) "উন্নতৈর্ব্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা।
নিধর্ণা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরাঃ ।।"

যে ব্যক্তির কপাল উন্নত ও বিশাল, শঙ্খাকৃতি, উচ্চনীচ বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও বিভবশালী হয়।

(৩) " উরঃ শিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্যতে।"

বক্ষস্থল, শিরোদেশ ও ললাট এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত হওয়া শুভদায়ক।

নাসিকা দীর্ঘ হইলে তাহার ফল —

" ছিন্নানুরূপয়াগম্যগামিনো দীর্ঘয়া তু সৌভাগ্যম্।"

যাহার নাসিকা ছিন্নের ন্যায় দেখা যায়, সে অগম্যাগামী, যাহার নাসিকা দীর্ঘ সে সৌভাগ্যশালী হয়।

পদে ঊর্দ্ধ রেখা থাকিবার ফল —

(১) " যস্য বৃদ্ধাঙ্গুলের্মূলাৎ পদে রেখা চ দৃশ্যতে।
স রাজ্যাং লভেতন্যূনং ভুঙ্ক্তে বিকন্টকাং মহীম্।।"

যে ব্যক্তির চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হয় এবং নিষ্কন্টকে রাজ্যভোগ করে।

(২) " চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীজম্বুর্দ্ধরেখাম্বুজম্।
বিভ্রাণো হরিরূন বিংশতি মহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ।।"

পদতলে চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পদ্মচিহ্ন ইত্যাদি ঊনবিংশতি চিহ্ন থাকিলে, মহালক্ষ্মী তাহার পদসেবা করেন।

পদতলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন থাকিবার ফল ;— উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে ইহার ফল সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর একটী বচন নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"যস্য পদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণম্।
অঙ্কুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি ধ্রুবম্।।"

যাঁহার পদতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ বা বজ্র চিহ্ন থাকিবে, তিনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন।

করাঙ্গুলির পর্ব্ব সূক্ষ্ম হইলে তাহার ফল; —

(১) " সূক্ষ্মাণি পঞ্চ দর্শনাঙ্গুলি পর্ব্ব কেশাঃ সাকং ত্বচাকররুহাশ্চ নঃ দুঃখিতান্যম্।"

দন্ত, অঙ্গুলির পর্ব্ব, কেশ, চর্ম্ম, ও নখ এই পাঁচটী হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হইবে।

(২) " সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্ব্বাণি দন্তকেশ নখত্বচঃ।
পঞ্চসূক্ষ্মাণি যেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ।।"

অঙ্গুলির পর্ব্ব, কেশ, অথবা লোম, নখ ও চর্ম, এই পঞ্চ অঙ্গ যাঁহার সূক্ষ্ম, তিনি দীর্ঘজীবী হন।

কেশ শূণ্যতার ফল;—

" বিরলা মধুরাঃ কেশাঃ স্নিগ্ধা ভ্রমরসন্নিভাঃ।
মেঘবর্ণাশ্চ যে কেশা স্তে নরাঃ সুখভাগিনঃ।।"

যাহাদিগের কেশ বিরল, সুদৃশ্য, স্নিগ্ধ, ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, কিম্বা মেঘবৎ বর্ণবিশিষ্ট, তাহারা সর্ব্বদা সুখভোগ করে।

নিতম্ব সুশোভন (মাংসল) হইলে তাহার ফল;—

(১) " নিঃস্বোহতিস্থূলস্ফিক্ সমাংসলস্ফিক্ সুখান্বিতো ভবতি।
রোগী মধ্যম স্ফিগ্মণ্ডুকস্ফিগ্নরাধিপতিঃ।।"

নিতম্ব স্থূল হইলে নির্ধন, মাংসল হইলে সুখী, মধ্যবিধ হইলে পীড়িত এবং মণ্ডুকসদৃশ হইলে নরাধিপতি হয়।

(২) " অশীঘ্র মৈথুন্যল্পায়ঃ স্থূলস্ফিক্ স্যাদ্বনোজঝিতঃ।
মাংসলস্ফিক্ সুখী স্যাচ্চ সিংহস্ফিক্ ভূপিতঃ স্মৃতঃ।। "

নিতম্ব স্থূল হইলে পুরুষ নির্ধন, মাংসল হইলে সুখী এবং সিংহের ন্যায় সুদৃঢ় হইলে রাজা হইয়া থাকে।

নরদেহ, স্বহস্তের চারি হস্ত (৯৬ অঙ্গুলি) পরিমিত দীর্ঘ হইলে তাহার ফল ; —

(১) " অষ্টশতং ষণ্নবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্।
উত্তম স মহীনানামঙ্গুল সঙ্খ্যাস্ব মানেন।।"

যাহার শরীর তাহার স্বীয় অঙ্গুলির পরিমাণে ১০৮ একশত অষ্ট অঙ্গুলি উচ্চ হইবে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলি হইলে মধ্যম, এবং ৮৪ চৌরাশি অঙ্গুলি পরিমিত হইলে অধম হইবে।

(২) "রতিসম্ভসি শুক্রসারতা দ্বিগুণাচাষ্ঠতৈঃ পলৈমিতিঃ।

পরিমাণমথাস্য ষড়্যুতা নবতিঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাবুধৈ।।"

হংস পুরুষ জল বিহারাসুক্ত, শুক্রসার বিশিষ্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট-শতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত। ইহার দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল (চারি হস্ত) হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ পরিকীর্ত্তিত হয়।

ত্রিপুরার সামন্তগণ

ভুলুয়া রাজ

ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ও জমিদারবর্গের মধ্যে ভুলুয়ার রাজবংশের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কায়স্থ শূর বংশীয় বিশ্বম্ভর রায়ের বংসধর লক্ষ্মণমাণিক্য বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি বাকলার (চন্দ্রদ্বীপের) রাজ্য কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সমসাময়িক; ডাক্তার ওয়াইজের (Dr. J. Wise) মতে লক্ষ্মণমাণিক্য ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।* এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭-১২৮ পৃষ্ঠায় ও ১৩৮-১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

ভুলুয়ার রাজবংশ ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত নরপতিমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন;—

"বিশ্বম্ভরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুর রাজদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভুলুয়ারাজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ত্রৈপুর নৃপতিগণের অভিষেককালে ইঁহারাই তাঁহাদের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরেশ্বর সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভুলুয়াপতি সর্ব্বপ্রথম 'নজর' প্রদান করিতেন, তদনন্তর অন্যান্য সামন্ত এবং অমাত্যবর্গ নজর দান করিতে সক্ষম হইতেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা, — ৪র্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯৪ পৃঃ

ভুলুয়ার রাজগণ যে ত্রিপুরেশ্বরের সামন্তমধ্যে পরিগণিত ছিলেন, এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভুলুয়াপতি

---

* J. Wise- On the Barah Bhuyas of Bengal
J. A. S. B. - No. 3. 1874. P. P. 203-205

লক্ষ্মণমাণিক্যের সময় হইতেই এই অধীনতা ছিন্ন করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়; ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের বাহুবলে তাঁহাকে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল। অমরমাণিক্যের পরবর্ত্তীকালেও ভুলুয়ার রাজগণ শিরোত্তোলন করিতে যাইয়া বারম্বার ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াছেন। অমরমাণিক্যের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় স্থানীয় মহারাজ যশোধরমাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভুলুয়া রাজ্য ত্রিপুরার রাজদণ্ডের অধীন থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।। অতঃপর মঘ ও মুসলমানগণের সহিত অনবরত সঙ্ঘর্ষণে ত্রিপুরেশ্বর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ভুলুয়াপতি তাঁহাকে কর, নজর ও রাজটিকা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন, অতঃপর ভুলুয়া রাজ্য ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া, মোগলগণের অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হইল। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরকে রাজটিকা প্রদানের অধিকার, মহারাজের নিয়োজিত সুবাগণ লাভ করিয়াছেন। রাজমালা তৃতীয় লহরের সমকালে এই রাজ্য ত্রিপুরার বশীভূত ছিল। উক্ত লহরের সময় মধ্যেই হস্তচ্যুত হইয়াছে।

সরাইলের অধিপতি

ঈশা খাঁ নামক ব্যক্তি সরাইলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভূক্ত ঈশা খাঁ মসনদ আলী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। উক্ত ব্যক্তির ন্যায় ইঁহারও 'মসনদ আলী' উপাধি ছিল, এই উপাধি ত্রিপুরেশ্বর থেকে লব্ধ। বরদাখাত পরগণাও ইঁহার শাসনাধীন ছিল।

ঈশা খাঁ-এর বিবরণ পূর্ববর্ত্তী ২১৩-২১৭ ও ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

তরপের অধিপতি

তরপ রাজ্যের প্রথম রাজা আচাকনারায়ণ। এই 'নারায়ণ' উপাধি ত্রিপুরার সামন্ত দ্যোতক। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট ও তরপ প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুর রাজত্ব ছিল, বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় শামস্উদ্দীন কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট বিজিত ও মুসলমানের হস্তগত এবং বিজেতা সেনাপতি নাসিরউদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হয়। এই প্রদেশ মুসলমানের অধিকৃত হইলেও কার্য্যতঃ তৎপ্রতি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই।

নাসিরউদ্দিনের অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় সৈয়দ মুসা (রাজমালা মতে মুছে লস্কর) ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে অমর সাগর খনন কালে সাহায্য না করায়, মহারাজ অমর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়াছিলেন। মুছে লস্কর ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সে যাত্রায় পরিত্রাণ লাভ করেন।

তরপের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮-১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

গৌড় বা শ্রীহট্ট

বর্ত্তমান শ্রীহট্ট নগরসহ কিয়দংশ লইয়া একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গৌড়নগরের অনুকরণে শ্রীহট্টে 'গৌড়' নাম দিয়া এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ শ্রীহট্টের উত্তরাংশ এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।* ইহার প্রখ্যাতনামা শাসনকর্ত্তার নাম গৌড়গোবিন্দ। গোবিন্দ নামধেয় রাজা গৌড়ের রাজত্ব লাভ করিয়া গৌড়গোবিন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই নাম নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। রাজকার্য্যে ইঁহার 'গোবিন্দদেব' নাম ব্যবহৃত হইত, ইঁহার সম্পাদিত তাম্রশাসন দ্বারা একথা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ভক্তিতত্ত্বনিধি মহাশয় বলিয়াছেন; —

" গোবিন্দের পিতার নাম কি ছিল, জানা যায় না। কিম্বদন্তী মতে তিনি সমুদ্রের তনয়। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ত্রৈপুর রাজবংশীয় কোন রাজার শত শত মহিষী ছিলেন। সমুদ্রদেব (বরুণ দেব) তন্মধ্যে কোন এক মহিষীর সহিত মনুষ্যাকারে সম্মিলিত হন; তাঁহার কৃপাতেই রাণী গর্ভ ধারণ করেন।*** এই মহিষীর পুত্রই গোবিন্দ।"

এই কথা সমর্থন করা যাইতে পারে না। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচন শিল্পের উন্নতিকল্পে, শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা ২৪০টী মহিষী করিয়াছিলেন, ইহা কলিযুগের প্রারম্ভ কালের কথা। ইহার পর উদয়মাণিক্য ২৪০টী বিবাহ করিয়াছেন। এই দুইজন ব্যতীত অন্য রাজগণ একাধিক বিবাহ করিয়া থাকিলেও "শতশত মহিষী" করিবার প্রমাণ নাই। গৌড়গোবিন্দ বা গোবিন্দদেব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ের রাজপাট লাভ করিয়াছিলেন, সুতারাং তিনি বহুবিবাহকারী ত্রিপুরেশ্বর উদয় মাণিক্যের প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া নির্ণীত হইতেছেন। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ, ত্রিপুর রাজ মহিষীর পুত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

গৌড়গোবিন্দের পিতার নাম ইতিহাসের অগোচর নহে। ইনি শ্রীহট্টনাথ শিবের সেবা পূজার জন্য তাম্রপত্র দ্বারা ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাস্তু দান করিয়াছিলেন। উক্ত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বিবরণ আলোচনায় জানা গিয়াছে, গোবিন্দের পিতার নাম নারায়ণদেব, পিতামহ গোকুলদেব এবং প্রপিতামহ খরবাণ দেব। সুতারাং ত্রিপুর রাজবংশের সহিত গোবিন্দদেবের কোনরূপ সংশ্রব থাকা

---

* " Gaur was the Old name of northern Sylhet."

Blochmann's Geography and History of Bengal.

পরিলক্ষিত হইতেছে না। তবে ত্রিপুরার সহিত ইহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন;—

"প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট তিনটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, — (১) গৌড় বা শ্রীহট্ট, (২) লাউড়, (৩) জয়ন্তীয়াপুর। এই তিনটী রাজ্যের মধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্টের অধিপতি অধিক বলশালী ছিলেন। কিন্তু সকলকেই ত্রিপুর রাজদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত। ত্রিপুরেশ্বর এই তিনটী রাজ্যের অধিপতিগণকে আপনাদিগের সামন্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা, — ৩য় ভাগ, ৩য় অঃ, ২৮৭ পৃষ্ঠা।

এই সকল সামন্ত রাজ্য ব্যতীত বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরার শাসনাধীন এবং পূর্ব্বাংশ কাছার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্ট প্রদেশ পাঠান কর্ত্তৃক বিজিত হইলেও* দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালনে সমর্থ হন নাই। অতঃপর যে-সকল মুসলমান প্রতিনিধি শ্রীহট্ট প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ত্রিপুরার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন।

মহারাজ অমরমাণিক্য অমর সাগর খননের নিমিত্ত সামন্ত রাজা ও জমিদারগণের নিকট কুলি চাহিয়াছিলেন। তৎকালে তরপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মুসা (মুছে লস্কর) ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া, কুলি প্রদান না করায়, তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সৈয়দ মুসা উপায়ান্তর না দেখিয়া তদানীন্তন শ্রীহট্টের আলিম আদম বাদশাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুর বাহিনী তরপ জয় করিয়া শ্রীহট্ট আক্রমণ করে। আদম বাদশাহ, ত্রিপুর সেনানী কুমার রাজধরদেব কর্ত্তৃক পরাজিত ও ধৃত হইয়া উদয়পুরে নীত হইবার পর, তিনি কর প্রদান করিতে সম্মত হইয়া মুক্তি লাভ করেন। তদবধি শ্রীহট্ট পুনর্ব্বার ত্রিপুরার সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং মুসলমানগণ পুনরধিকার না করা পর্য্যন্ত এই প্রদেশ ত্রিপুরার করপ্রদ ছিল। কতকাল এই অবস্থা চলিয়াছিল, জানিবার সুবিধা না থাকিলেও রাজমালা তৃতীয় লহরের সময়কাল মধ্যেই তাহা ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, ইতিহাস আলোচনায় এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

ইটা রাজ্যের অধিপতি

বৈদিক যজ্ঞ কার্য্যে সুদক্ষ নিধিপতি নামক ব্রাক্ষণ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মধরের যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার

---

* Hunter's Statistical Accounts of Assam - Vol. II

এই গ্রন্থের শ্রীহট্টের অংশে লিখিত হইয়াছে, শ্রীহট্ট প্রদেশ ১৩৮৪ খ্রিঃ অব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয়।

ব্রাক্ষণ্য-প্রভাব দর্শনে মহারাজ ধর্ম্মধর বিমুগ্ধ এবং দেশস্থ সকল লোকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মজঃফর নামক জনৈক গ্রাম্য কবি, ইঁহার ব্রাক্ষণ্য-তেজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন;---

"অগ্নিহোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি।
মুখ দ্বারা অগ্নি আনি দিলেন আহুতি।।"

ইঁহার বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ১০৫-১০৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। নিধিপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রহ্মোত্রসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত স্থান পূর্ব্বে 'মনুকুল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান ইন্দানগর, ইন্দেশ্বর, ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাল, চৌয়াল্লিশ, সাতগাঁও ও বালিশিরা এই ছয়টি বৃহৎ পরগণা উক্ত মনুকুল প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল।

এই সুবৃহৎ ভূ-ভাগ লাভ করিয়া নিধিপতি, স্বজাতীয় বহু ব্যক্তিকে পঞ্চখণ্ড হইতে আনিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করেন। তৎকালে এইস্থান 'ইটা' নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, নিধিপতি স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণার্থ স্থান নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া, একটি স্থান মনোনীত করেন, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় সেই স্থানে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া, ইটা(ঢিল) ছুঁড়িয়া সেই স্থানটী দেখাইয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম 'ইটা' হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে ইটা সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়; ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি হইয়াছিল। নিধিপতি, 'ভূমিউড়া-এওলাতলী' নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

নিধিপতির পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের বংশপত্রিকা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।
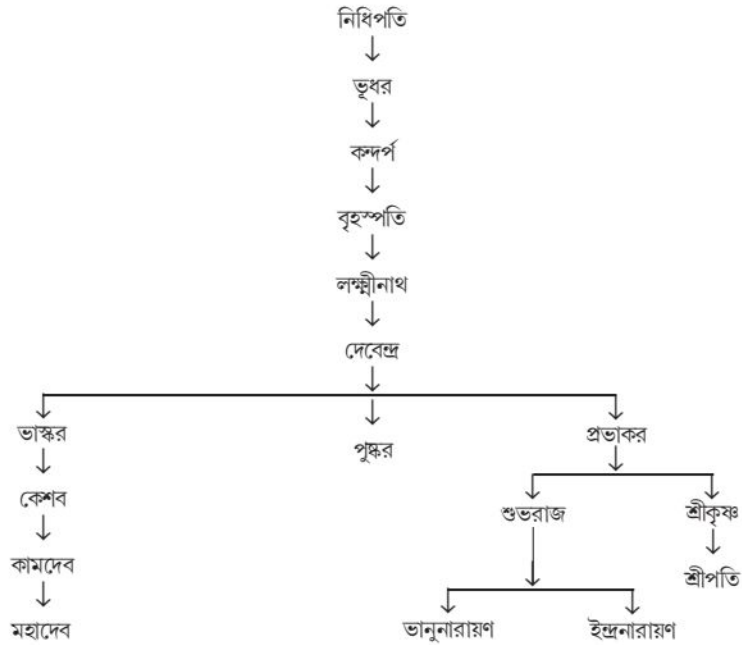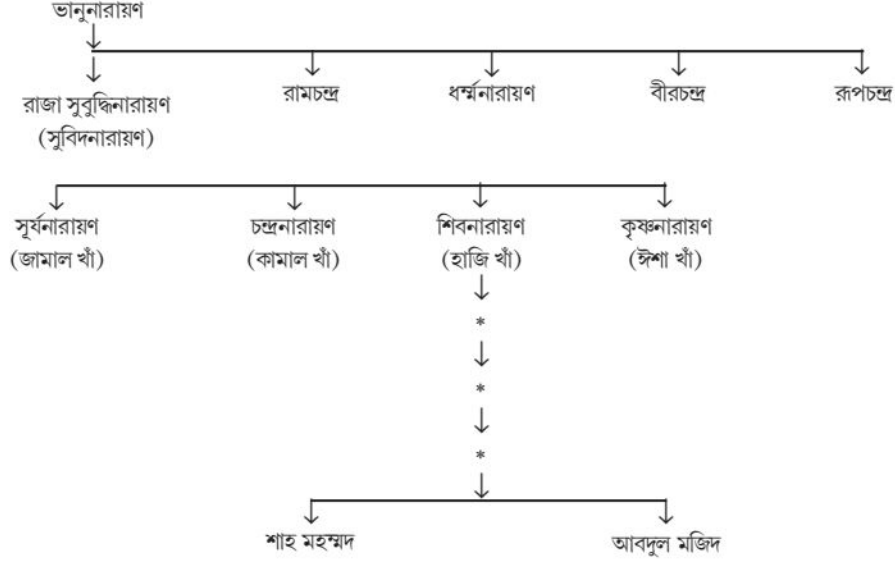
কামদেবের পুত্র মহাদেব পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করেন, তাঁহার বাসভূমি 'মহাদেবী বড় কাপন' নামে বিখ্যাত। ইঁহার বংশধরগণ 'শিকদার' আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

প্রভাকরের পুত্র শুভরাজ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং নানাবিধ গুণশালী ছিলেন। ইনি বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া 'খান' উপাধি লাভ করেন। ইনি যে স্থানে স্বীয় বাসভবন নিম্মার্ণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে 'রাজ খলা'। তৎপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা শুভরাজ বা শুরাজ খাঁ-এর দীঘি নামে পরিচিত হইয়াছে।

প্রভাকরের অপর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের নাম শ্রীপতি। ইটার অন্তর্ব্বর্ত্তী 'শ্রীপাড়া' ইঁহারই নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

শুভরাজের পুত্র ভানুনারায়ণ বিশেষ বিক্রমশালী ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের অধীন সামন্ত সরদার, রাজা চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায়, এই ভানু-নারায়ণ, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ত্রিপুরাব দরবারে প্রেরণ করেন এবং পারিতোষিক স্বরূপ ত্রিপুরেশ্বর হইতে চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূ-ভাগের কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। এই নবাধিকৃত ভূ-খণ্ড ভানুনারায়ণের নামানুসারে ভানুকচ্ছ বা ভানুগাছ নামে অভিহিত হইয়াছে। ভানুগাছ পরগণার অন্তর্গত 'রামেশ্বর' গ্রামে বর্ত্তমানকালেও চন্দ্রসিংহের গড়ের ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভানুনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া এওলাতলীর অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম 'রাজনগর' রাখেন। তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পূর্ব্ব বাসস্থানেই ছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। ভানুনারায়ণই ইটার অধিপতিগণের মধ্যে প্রথম 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।

ভানুনারায়ণের পরে সুবুদ্ধিনারায়ণ বা সুবিদানারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত হইলেও পরোক্ষভাবে দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু তৎকালেও ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত বলিয়া ইনি বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। ইটার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গ পাগড়িয়া টিলায় সুবিদানারায়ণের সুদৃঢ় গড় ছিল। তাঁহার প্রধান দুর্গ ছিল পর্ব্বতপুরে, এই দুর্গে বহু সুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষিত হইত।

সুবিদনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ ও জনহিতৈষী ছিলেন। ইনি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, তদুপলক্ষে মতান্তরের ফলে বহু ব্রাক্ষণ ঢাকাদক্ষিণ প্রভৃতি স্থানে বিতাড়িত হন। অতঃপর রাজা, নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাজা সুবিদনারায়ণের মহিষীর নাম কমলাদেবী। ইঁহার চারিপুত্র ও তিন কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা খঞ্জ(খোঁড়া) ছিলেন। কাত্যায়ণ গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রঘুপতিকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজা সুবিদনারায়ণ তাঁহাকে পাঁচগাও, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, সুরানন্দ ও পশ্চিমভাগ এই পাঁচখানা গ্রাম দান করেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক নিয়োজিত শ্রীহট্টের দেওয়ানের সহিত রাজা সুবিদনারায়ণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, সেই সূত্রে দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে পাঠানবংশসম্ভূত খোয়াজ ওসমান ইটারাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের পঞ্চম দিবসে রাজা সুবিদনারায়ণ সমরশায়ী হইলেন, রাজমহিষী পতির চিতায় আরোহণ করিয়া, এবং কনিষ্ঠা কন্যা বিষপান দ্বারা জাতি-কুল রক্ষা করিলে, রাজভ্রাতাগণ নানাদিকে পলায়ণ করিলেন এবং রাজপুত্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। দিল্লীস্বরের আদেশানুসারে তাঁহারা ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনা হইতে ইটারাজ্য সম্যকরূপে মুসলমানের হস্তগত হইলেও শীঘ্র তাঁহারা নির্ব্বিবাদে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতারাং তৎকালে ঐ অঞ্চলের উপর ত্রিপুরার প্রভাবও পূর্ণমাত্রায় বিলুপ্ত হয় নাই। মুসলমানদিগকে বিদ্রেহ দমন জন্য অনেককাল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। অতঃপর খোয়াজ ওসমান নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হন। কতিপয় জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান করায়, মুসলমানগণের পক্ষে বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল। শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা লোদি খাঁ ওসমানকে নিহত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন; ইহা ১৫৪৮ খ্রীঃঅব্দের ঘটনা।* এই সময় হইতেই ইটারাজ্যের প্রতি ত্রিপুরার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সুতারাং রাজমালা তৃতীয়

---

* শ্রীহট্ট দর্পণ, — মৌলবী মহম্মদ আহমদ প্রণীত।

লহরের অল্পকাল পূর্ব্ব বা তৃতীয় লহরের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশের উপর ত্রিপুরার প্রাধান্য থাকা পরিলক্ষিত হইতেছে।

ত্রিপুরার আরও সামন্ত রাজা ছিলেন। জয়ন্তীয়া, বাণিয়াচঙ্গ, লাউড়, সিংহেরগাও প্রভৃতি প্রদেশের আধিপত্য রাজমালা তৃতীয় লহরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই তিরোহিত হওয়ায়, এস্থলে সেই-সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করা হইল না।

এতদ্ব্যতীত কুকি ও লুসাই রাজগণ, রিয়াং, ত্রিপুরা, হালাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য সরদারগণ আবহমান কাল ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

রাজমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(বর্ণমালানুক্রমিক)

অমরদুল্লর্ভনারায়ণ ঃ--- (২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের তৃতীয় পুত্র। প্রথম বয়সে ইনি পতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, ইঁহার বাহুবলে অনেক দেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নির্বিষ্ট হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইঁহার শেষ জীবনের ইতিহাস নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য।

অমরমাণিক্য ঃ— (২ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৫৯ সংখ্যক ভূপতি। রাজমালা তৃতীয় লহর ইঁহার বিবরণ লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এই লহর আলোচনা করিলে মহারাজ অমরের শৌর্য্য-বীর্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইনি রাজমালা দ্বিতীয় লহর রচনা করাইয়া, যে স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া গিয়েছেন, তাহা অবিনশ্বর ও অতুলনীয় কীর্ত্তি।

অমরাবতীমহাদেবী ঃ-- (২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের পট্টমহিষী। ত্রিপুর রাজ্যে রাজা-রাণীর এক নাম রক্ষিত হইবার নিদর্শন এই সময়ও পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ অমরমাণিক্য, মনু নদীর তীরস্থিত আবাসে গোলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, মহারাণী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুননারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমরের আদেশানুসারে, তদীয় জ্যেষ্ঠকুমার রাজধর-নারায়ণ তরপ ও শ্রীহট্ট বিজয় করিয়াছিলেন। এই অভিযানে অর্জ্জুননারায়ণ

সসৈন্যে তাঁহার সহযাত্রী হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে অর্জ্জুন- নারায়ণের বংশধরের কোনরূপ সন্ধান যাইতেছে না।

আগুয়াননারায়ণ ঃ--- (৪৪ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সন্যোধ্যক্ষ। মহারাজ অমর, রাজ্যভস্ট হয়ে মনুনদী তীরে গমন কালে ইনি রাজার সহচর ছিলেন।

আদম বাদশা ঃ— (৩৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি আরাকানরজের অধীনে রাম্বু ও ছয়কড়িয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আরাকানরাজের সহিত ইঁহার মনোমলিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, ইনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানপতি, আদম বাদশাকে তাঁহার দরবারে পাঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বরকে অনুরোধ করায়, মহারাজ অমর আশ্রিত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিতে অসম্মত হন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৮ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আশাবন্তনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইনি প্রধম সেনাপতি রাজধর দেবের সহযাত্রী হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন।

ইস্পিন্দর ঃ— (৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি দিল্লীশ্বর শাহ সেলিমের ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বাদশাহের আদেশানুসারে ইনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নবাব ফতেজঙ্গের ও ওমরাহ নুরউল্লার সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয়লাভ করিয়া, মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে বন্দী করিয়াছিলেন। সম্রাট দরবারে মুক্তলাভ করিলেও তিনি আর রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তীর্থযাত্রা করেন এবং কিয়ৎকাল পরে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে।

ঈশা খাঁ ঃ--- (৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। ইনি সরাইলের শাসনকর্ত্তা এবং ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি হইতে 'মসনদ আলী' উপাধি লাভ করিয়া ইনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিবরণ পূর্ব্বর্ত্তী ১১৪—১১৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

উড়িয়া রাজা ঃ--- (২৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তি)। উড়িষ্যা হইতে সমাগত কোন ব্যক্তি আরাকানরাজের অধীনে দেয়াঙ্গে (Dianga) এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা উড়িষ্যাবাসী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার "উড়িয়া রাজা" খ্যাতি ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম জানিবার উপায় নাই। ইনি আরাকানরাজ মাং ফুলা ও ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধকালে উড়িয়া রাজাকে আরাকানের দৌত্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ঐরাজিতনারায়ণ ঃ— (অরিজিৎ)। (৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর-মাণিক্যের শাসনকালে যুদ্ধের হস্তীচালক ছিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইনি অশেষ বীরত্ব ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

কচু ফা ঃ— (২১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরার ১৪৮ সংখ্যক রাজা মহামাণিক্যের পৌত্র এবং ১৬২ সংখ্যক কল্যাণমাণিক্যের পিতা ছিলেন। কচু ফা-এর অন্য নাম পুরন্দর। ইনি তুলসী ঘাটে পরলোক গমন করেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৮—২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কন্দর্প রায় ঃ— (১৩ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৭—১০৪ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

কল্যাণ ঃ— (১৯ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মহামাণিক্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতার নাম কচু ফা বা পুরন্দর। ইঁহার মাতামহ রণদুর্ল্লভনারায়ণ কৈলারগড়ে থানাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কল্যাণের সেই স্থানে মাতামহ গৃহে জন্ম হয়। ইঁহার জন্ম পত্রিকার ফল এই লহরের ১৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। ইনি শৈশব হইতে শান্তশিষ্ট এবং অন্যান্য বালক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে ইনি সেনাপতি ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করিয়া 'কল্যাণমাণিক্য' নাম অভিহিত হন।

কল্যাণমাণিক্য ঃ— (৬৫ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি রাজা হইয়া, 'কল্যাণমাণিক্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কামোদকাও ঃ— (৪৪ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের পৌত্র এবং তদীয় কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহের পুত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা চট্টগ্রামে আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হওয়ায়, ইনি পিতামহ কর্ত্তৃক সযত্নে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী জীবনের ঘটনা জানিবার উপায় নাই।

কুড়ামঘি ঃ— (৪২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি আরাকানরাজ সেকেন্দর শাহের সৈনিক বিভাগে সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ অমরমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, মঘগণ রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিবার পর, ইঁহাকে তথাকার সেনানিবাসের কর্ত্তৃত্ব প্রদানপূর্ব্বক আরাকানরাজ স্বরজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

গজঝম্পনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তরপ ও শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত থাকিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। ইনি সেনাপতি বীরঝম্পনারায়ণের পুত্র।

গজসিংহনারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনিও অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কুমার রাজধরনারায়ণের সহিত ইনি তরপ ও শ্রীহট্ট যুদ্ধে উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গন্ধর্ব্বনারায়ণ ঃ— (৫৮ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। রাজমালার মতে ইনি ভুলুয়ার রাজা ছিলেন। এই নাম যে ভুল লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী 'ভুলুয়া' শীর্ষক আখ্যান আলোচনায় তাহা জানা যাইবে।

গরুড়নারায়ণ ঃ— (৬ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের জনৈক সেনাপতি। গরুড়ব্যুহ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ইনি 'গরুড়নারায়ণ' উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি দ্বারাই ইনি পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের প্রয়োজন হইত না। রাজমালায় ইঁহার নামোল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীহট্ট অভিযানকালে ইনি গরুড় ব্যূহের সাহায্যে সৈন্যদিগকে নিরাপদে সমরক্ষেত্রে পৌছাইয়াছিলেন।

গোবিন্দনারায়ণ ঃ--- (৬৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রাজধরমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিতার পরলোক গমনের পর রাজ্যলাভ করেন।

গোবিন্দমাণিক্য ঃ— (১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দনারায়ণ রাজত্ব গ্রহণ করিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৬৩ সংখ্যক ভূপতি। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর মহারাজ গোবিন্দ, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় (ছত্রমাণিক্য) কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কিয়ৎকাল চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রভৃতি প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ছত্রমাণিক্যের পরলোক গমনের পর পুনর্ব্বার রাজ্যে আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। রাজমালা চতুর্থ লহরে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইঁহার আদেশানুসারে রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে।

চন্দ্রদর্পনারায়ণ ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের জনৈক সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্ট যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। রসাঙ্গ যুদ্ধেও ইঁহার যোগদানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চন্দ্রসিংহনারায়ণ ঃ--- (৪ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্ট যুদ্ধে ইনি সেনানায়ক রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি যোগদান করিয়াছেন।

চন্দ্রহাসনারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনিও মহারাজ অমরমাণিক্যের পক্ষে শ্রীহট্ট অভিযোগ যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

চাঁদ রায় ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। ইনি বিক্রমপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী, দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজধানীর নাম ছিল শ্রীপুর। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০—৯৩ পৃষ্ঠায় ইঁহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

ছত্রজিৎ নাজির ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। ইনি অমরমাণিক্যের শ্যালক এবং সেনাপতি ছিলেন। ভুলুয়া যুদ্ধে এবং শ্রীহট্ট অভিযানে ইঁহার অশেষ বীরত্ব প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। ছত্রজিৎ রাজার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহারাজ অমর, মঘ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিবার কালে ছত্রজিৎ তাঁহার সহযাত্রী হইয়া বিস্তর কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তিনি রাজার অবাধ্য হইয়া একটী খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত আছেন বলিয়া মিথ্যা অপবাদ হওয়ায়, রাজা সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ছত্রজিৎকে নিহত করিয়াছিলেন। রাজা কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তি অসদভিপ্রায়ে অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত মহারাজকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়ায় এই শোচনীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

ছোট রায় ঃ— (৩৮ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি চন্দ্রসিংহ নারায়ণের পুত্র এবং নিজেও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। চট্টগ্রামে, আরাকান রাজ্যের সহিত মহারাজ অমরমাণিক্যের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মঘসৈন্য নিহত করিয়া ইনি সমর-শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথনারায়ণ ঃ— (৭৭ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পুত্র এবং গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিষ্ণা পরগণায় অবস্থিত চট্টগ্রাম গমনের রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী সুবিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি ও উদয়পুরে অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি বা পুরাতন দীঘি, ইঁহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। রাজমালা চতুর্থ লহরে ইঁহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

জয়ধ্বজ ঃ— (৩৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। আরাকান যুদ্ধে কুমার রাজধরানারায়ণের সহযাত্রী হইয়া ইনি বিশেষ বিক্রম প্রকাশ ও আরাকানের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

জয়মাণিক্য ঃ— (১ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইঁহার অন্য নাম ছিল— লোকতর ফা। ইনি মহারাজ উদয়মাণিক্যের পুত্র। সুবা গোপীপ্রসাদ স্বীয় জামাতা অনন্তমাণিক্যকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র 'জয়মাণিক্য' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে সেনাপতি অমরদেব (পরে অমরমাণিক্য) কর্ত্তৃক ইনি নিহত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৭২ ও ২৫৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

তাজ খাঁ ঃ--- (১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

ত্রিবিক্রমনারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্ট যুদ্ধে ইনি প্রধান সেনাপতি কুমার রাজধরনারায়ণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। শ্রম সহিষ্ণুতার জন্য ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

দয়াবন্তনারায়ণ ঃ--- (১০ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের জামাতা এবং পার্শ্বচর ছিলেন। শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ যুদ্ধে পরাভূত ও অবরুদ্ধ হইয়া উদয়পুরে নীত হওয়ায়, মহারাজ অমর তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া, দরবারে দয়াবন্তের পার্শ্বে আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

দুগ্ধমান ঃ--- (২১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য শৈশবকালে তদীয় মাতামহ কর্ত্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছিলেন।

দুর্লভ রায় ঃ--- (১৯ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি পুর্ব্বোক্ত কচু ফা বা পুরন্দরের পুত্র এবং মহারাজ কলাণমাণিক্যের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি শৈশবে মাতামহ দুর্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক 'হংসমান' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

দুর্লভনারায়ণ ঃ--- (১৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর কর্ত্তৃক ভুলুয়া বিজয়ের পর স্বীয় পুত্র রাজদুর্লভনারায়ণের সহিত এই সেনাপতিকে ভুলুয়ার সৈন্যাবাসে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। পরে কৈলারগড় দুর্গ ইঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মাতামহ ছিলেন।

দুর্লভনারায়ণ সুর ঃ--- (১১ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। রাজমালা রচয়িতার মতে ইনি ভুলুয়ার রাজা ছিলেন। এই নাম যে প্রমাদপূর্ণ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৩ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইঁহার প্রকৃত নাম লক্ষ্মণমাণিক্য।

নুরউল্লা ঃ--- (৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি ভারতসম্রাট শাহ সেলিমের ওমরাহ ও সেনাপতি ছিলেন। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাসনকালে ইনি ফতেজঙ্গ নবাবের সাহায্যে, অন্যতর ওমরাহ ইস্পিন্দরের সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও মহারাজকে অবরুদ্ধ করেন। ইনি মৃজা নুরউল্লা নামে পরিচিত ছিলেন।

নৌগতর ঃ--- (৬৮ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মধ্যমা মহিষীর গর্ব্ভজাত কুমার। নামান্তর নক্ষত্র রায়। পরে ছত্রমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন।

পাঠান রায় ঃ— (২৬ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি কল্যাণমাণিক্যের মামাত ভগ্নীর স্বামী ছিলেন। কল্যাণদেবের মাতুল গামারিয়া কিল্লায় লস্কর পদে নিযুক্ত ছিলেন, পাঠান রায় শ্বশুরের আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতেন।

প্রতাপনারায়ণ ঃ— (৪০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনানায়ক। আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধেও ইঁহাকে সমরক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। এই স্থলে তিনি 'প্রতাপসিংহ নারায়ণ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি দ্রষ্টব্য।) রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি ছিলেন।

ফতে খাঁ ঃ— (৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। মহারাজ অমরমাণিক্যের সমকালে ইনি শ্রীহট্টের পাঠান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম আদম বাদশাহ। রাজমালাকার ইঁহাকে ফতে খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ফতেজঙ্গ নবাব ;— (৫৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইঁহার প্রকৃত নাম নবাব ইব্রাহিম খাঁ। ইনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া ঢাকায় রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতসম্রাট শাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) অনুমত্যানুসারে ইনি ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা নামক দিল্লীর দুইজন ওমরাহের সাহায্যে ত্রিপুরেশ্বর যশোধরমাণিক্যকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাভুত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। এই যদ্ধে ইনি উপদেষ্টা ও সাহায্যকারী ছিলেন, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ওমরাহদ্বয় দ্বারাই ত্রিপুরা জয় হইয়াছিল। সম্রাট দরবার হইতে ত্রিপুরেশ্বর মুক্তিলাভ ও রাজ্য পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া থাকিলেও তিনি তদবধি রাজ্যভোগ না করিয়া, তীর্থাশ্রমী হইয়াছিলেন।

বাজ খাঁ ঃ— (১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি পাঠান জাতীয় লোক। মহারাজ অমরমাণিক্যের অশ্বারোহী দলের অন্যতর অধ্যক্ষ ছিলেন।

বিজয়মাণিক্য ঃ— (১২ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে ইঁহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিরিঞ্চিনারায়ণ ঃ— (৫০ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রাজধরমাণিক্যের সময়ে রাজপুরোহিত ছিলেন। মহারাজ প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান করিতেন, তাহার এক পাত্র বিরিঞ্চিনারায়ণের প্রাপ্য ছিল।

বীরঝম্পনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। তরপ ও শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইঁহাকে সেনাপতিরূপে উপস্থিত পাওয়া যাইতেছে। ইনি এবং ইঁহার পুত্র গজঝম্পনারায়ণ মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বীরঝম্প, কেশরীসদৃশ বিক্রমশালী ছিল।

বীর রায় ঃ— (১৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা-এর বংশধর, কচু ফা-এর পুত্র ছিলেন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। (পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বীরসিংহনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্ট অভিযানে ইনি ত্রিপুরাবাহিনীর মধ্যে ছিলন। ইনি সমর নিপুণ থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুছে লস্কর ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ মুসা ; ইনি তরপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫১-১৫২ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যশরাণী ঃ— (৬৩ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের মহারাণী। মুসলমান কর্ত্তৃক পতির বন্দী সময়ে ইনি সঙ্গে ছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে তীর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যশোধরমাণিক্য ঃ— (৫৭ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৬১ সংখ্যক ভূপতি। এই লহরের ৫৭ ও ২১৩ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

যাদব ঃ— (৬৮ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের কনিষ্ঠ মহিষীর গর্ব্ভজাত কুমার।

যুঝার মা ঃ— (১৯ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি)। ইনি মহামাণিক্যের বংশোদ্ভব কচু ফা-এর কন্যা ছিলেন। (পুর্ব্ববর্ত্তী ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যুঝার সিংহ ;— (২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার স্বভাব নিতান্ত উগ্র ছিল, এবং এই চরিত্রের দরুণ অনেক সময় অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আরাকানরাজের সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের প্রদত্ত উপঢৌকন গজদন্ত নির্ম্মিত মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের সহিত ইঁহার মনোমালিন্য ঘটে, এই যুদ্ধেই ইনি স্বীয় হস্তীর পদাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন। (পুর্ব্ববর্ত্তী ২০৯ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

রণগিরিনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি অশেষ প্রতাপশালী যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট অভিযানে ইনি ত্রিপুর বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

রণজিৎনারায়ণ ঃ--- (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ যশোধর মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। মোগল বাহিনী উদয়পুর রাজধানী অধিকার করিয়া মহারাজকে অবরুদ্ধ করার পর, আড়াই বৎসরকাল ত্রিপুর রাজ্য মোগলের কর-কবলিত

অবস্থায় ছিল। তাঁহার শাসন শৃঙ্খলার প্রয়াসী না হইয়া, কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচারে রাজ্যটাকে ছারখার করিতেছিল। এই সুযোগে সেনাপতি রণজিৎ আচরঙ্গে যাইয়া এক খণ্ড-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত স্থান বৰ্ত্তমান কালে পাৰ্ব্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত সেইস্থানে রাজত্ব করিয়া, স্বীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রণভীমনারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার বীরত্বে শত্রুপক্ষের সন্তাপ উপস্থিত হইত। শ্রীহট্ট অভিযানের তালিকায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

রণযুঝারনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। রাজমালা বলেন, — "রণযুঝার নারায়ণ রণে মহাবীর" ; ইহার এই সেনাপতির বীরত্বের পরিচায়ক। ইনি শ্রীহট্ট অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

রণসিংহনারায়ণ ঃ--- (৫ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইঁহার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

রাজদুর্লভনারায়ণ ঃ--- (২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর, ভুলুয়া বিজয় করিয়া এই পুত্রকে তথাকার সেনানিবাসের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভুলুয়ার লোণা হাওয়ায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, সেই পীড়ায়ই কুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

রাজধরনারায়ণ ঃ— (২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজদুর্লভের পরলোক গমনের পর, ইনি পিতা কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, পরে 'রাজধরমাণিক্য' নামে ত্রিপুরা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনি পিতার অধীনে প্রতাপশালী প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। ইঁহার বাহুবলে, মঘ ও মুসলমানগণ সৰ্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ইনি ভুলুয়া, তরপ ও শ্রীহট্ট বিজেতা। আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ ইঁহার শৌর্য্যবলে অধিকৃত হইয়াছিল। পুৰ্ব্ববৰ্ত্তী ৪৯, ২১২ পৃষ্ঠায় ইঁহার রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাজবল্লভ ঃ--- (৬৮ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের কনিষ্ঠা মহিষীর গৰ্ব্ভজাত কুমার।

রামমাণিক্য ঃ--- (১ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র এবং ত্রিপুর সিংহাসনের ১৬৫ সংখ্যক নৃপতি। ইঁহার আদেশে রাজমালার

তৃতীয় লহর (আলাচ্য খণ্ড) রচিত হইয়াছে। এই মহারাজের বিস্তৃত বিবরণ রাজমালার চতুর্থ লহরে সন্নিবেশিত হইবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঃ— (৬৯ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি রণজিৎনারায়ণের পুত্র। রণজিৎ আচরঙ্গে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায়, লক্ষ্মীনারায়ণ সেই রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহামারীর ভয়ে মোগল বাহিনী উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ কল্যাণমাণিক্য রাজত্ব লাভ করিয়া, আচরঙ্গে নূতন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ পাইলেন। তিনি তথাকার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণে বিরুদ্ধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেনাপতি গোবিন্দনারায়ণকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। গোবিন্দনারায়ণ আচরঙ্গ জয় করিয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপন করতঃ লক্ষ্মীনারায়ণকে বন্দী করিয়া উদয়পুরে আনিয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণ ইঁহাকে রাজপুত্রের ন্যায় সম্মানে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াছিলেন। রাজমালা প্রথম লহরের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শত্রুমর্দ্দননারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। ইনি বিক্রমে কেশরীতুল্য বীর ছিলেন। শ্রীহট্ট অভিযানে শত্রুমর্দ্দন যোগদান করিয়াছেন।

সমরপ্রতাপনারায়ণ ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। অমরমাণিক্যের সেনাপতিগণের মধ্যে সমরপ্রতাপ অন্যতম। অসিযুদ্ধে ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তরপ ও শ্রীহট্টের সংগ্রামে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

সমরবীরনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের 'অপার প্রতাপশালী' সেনানায়ক ছিলেন। তরপ ও শ্রীহট্ট অভিযানকালে ইনি কুমার রাজধর নারায়ণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

সমরভীম ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। শ্রীহট্ট অভিযানে নিয়োজিত সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইনিও একজন ছিলেন। রাজমালায় ইঁহার নাম মহারাজ অমরমাণিক্যের শ্যালক ও সেনানায়ক—ছত্রজিৎ নাজিরের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রাধান্যের নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

শাহ সেলিম ঃ— (৫৯ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামান্তর। সাম্রাজ্য লাভ করিবার পর, ত্রিপুরার হস্তী-বিভবের সংবাদে লুব্ধ হইয়া ইনি উক্ত রাজা আক্রমণ ও জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজ যশোধরমাণিক্য ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

সিদ্ধান্তবাগীশ ঃ— (১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রামদেব-মাণিক্যের পুর্ববকাল হইতেই দ্বারপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত মহারাজের

অনুজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্তবাগীশ রাজমালার তৃতীয় লহর (আলোচ্য খণ্ড) রচনা করিয়াছেন। ইঁহার নাম ছিল গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৩ - ৮৬ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

সিংহ সরবনারায়ণ ঃ— (১২ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। সর্ব্বসিংহনারায়ণ ইঁহার নাম ছিল। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের ভুলুয়া অভিযান কালে ইনি সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

সুনামা ঃ--- (২৬ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি গামারিয়া কিল্লার লস্করের (কল্যাণ-মাণিক্যের মাতুল) কন্যা এবং পাঠান রায়ের স্ত্রী ছিলেন। এতদতিরিক্ত পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

সুপ্রতাপনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি সর্ব্বদা বীরদর্পে উন্মত্ত থাকিতেন। শ্রীহট্টের অভিযানে ইঁহার যোগদান করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুবুদ্ধিনারায়ণ ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইঁহার 'বিশ্বাস' উপাধি ছিল। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের হিসাব রক্ষক। ইঁহার পিতার নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র, ইনি 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকেন্দর শা ঃ— (৩২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। ইনি আরাকানের রাজা এবং মহারাজ অমরমাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি জাতিতে মঘ, ইঁহার জাতীয় নাম মাং ফুলা। আরাকানপতিগণ কিয়ৎকাল মুসলমানের নাম গ্রহণ করিতেছিলেন, 'সেকেন্দর শা' নাম সেই পদ্ধতির পরিচায়ক। ইঁহার সহিত মহারাজ অমরমাণিক্যের তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আরাকানরাজ প্রথমতঃ পরাজিত হইয়া থাকিলেও পরে ত্রিপুরা জয় করিয়া উদয়পুর রাজধানী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৮—২১১ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত বিবরণ এতদুপলক্ষে দ্রষ্টব্য।

সৈদ্ধিরাম ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ বিরাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত বিবরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সৈয়দ বিরাম, তরপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মুসার পুত্র ছিলেন। কুমার রাজধরনারায়ণ ইঁহার পিতাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, পিতাপুত্র দুইজনকেই বন্দীভাবে উদয়পুরে নিয়াছিলেন।

সৌররাষ্ট্রনারায়ণ ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি কোন কোন স্থানে 'সুররাষ্ট্র' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইনি একাকী শত্রুর সম্মুখীন হইতে সমর্থ ছিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধে এবং আরাকান রাজ্যের সহিত সমরে ইনি যোগদান করিয়াছেন।

হংসমান ঃ--- (২১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইহা রণদুর্লভের শৈশবকালের নাম ; মাতামহ দুর্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বকথিত কচু ফা-এর (পুরন্দরের) পুত্র এবং মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের ভ্রাতা। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৯ পৃষ্ঠায় ইঁহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হরিচক্রনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। রাজমালায় ইহাকে 'বিক্রমনারায়ণ' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। ইনি শ্রীহট্টের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের হিসাব রক্ষক সুবুদ্ধি বিশ্বাসের পিতা এবং রাজসভাসদ ছিলেন। রাজমালাকার ইঁহাকে 'অনর্গল কবি' বলিয়াছেন। কবিত্বশক্তিপ্রভাবে ইনি 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

হামতার ফা ঃ— (২১ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মাতুল ছিলেন। ইহার ভগ্নীর নাম ছিল— হামতার মা।

হামতার মা ঃ— (২১ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি কচু ফা বা পুরন্দরের পত্নী এবং মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মাতা।

হিঙ্গুলনারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইমি মহারাজ অমরমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। তরপ ও শ্রীহট্টের সমরে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

হৈতননারায়ণ ঃ— (৫ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষরূপে তরপ ও শ্রীহট্ট অভিযানে, কুমার রাজধরনারায়ণের সহযাত্রী ছিলেন।

হোসেন শাহা ঃ--- (৫৮ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি আরাকান রাজ্যের অধীশ্বর এবং মহারাজ যশোধরমাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। উভয় রাজার মধ্যে প্রথমতঃ বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে উভয়ের মধ্যে বৈরীভাব পোষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। কি সূত্রে এই বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

রাজমালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(বর্ণমালানুক্রমিক)।

অষ্টগ্রাম ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, জয়নসাহী পরগণার মধ্যবর্ত্তী একটী স্থান। উক্ত স্থানের বিবরণ এই লহরের ১০৫ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আচরঙ্গ ঃ— (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

ইছাপুরা ঃ— (৩৯ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। ইহা চট্টগ্রামের সন্নিহিত একটী স্থান। আরাকান হইতে চট্টগ্রামে আগমনের পথ এই স্থানের উপর দিয়া ছিল।

ইটাগ্রাম ঃ— (১০ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭০ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

উদয়পুর ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। কুমিল্লা হইতে পুর্ব্বদিকে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রাঙ্গামাটী ছিল, মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজত্বকালে তাঁহারই নামানুসারে উদয়পুর নাম প্রদান করা হইয়াছে। ইহা একটী পীঠস্থান। রাজমালা চতুর্থ লহরে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

উড়িয়া রাজ্য ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। উড়িষ্যা হইতে সমাগত এক ব্যক্তি আরাকানরাজ্যের সামন্ত স্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার রাজধানী দেয়াঙ্গ (ডিয়াঙ্গা) নামক স্থানে স্থপিত ছিল। এই স্থান চট্টগ্রামের দক্ষিণে, কর্ণফুলী নদীর মোহনার অপর পারে অবস্থিত। ব্লকম্যান সাহেবের মতে 'দক্ষিণ ডাঙ্গা' শব্দ অপভ্রংশ হইয়া 'ডিয়াঙ্গা' নাম হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আরাকান অভিযানের বর্ণন উপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;—

"চাটিগ্রামে গিয়া সৈন্য শীঘ্র উত্তরিল।
কর্ণফুলি বাঁধ দিয়া সৈন্য পার হইল।।
রাম্বু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়।
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়।।

অমরমাণিক্য খণ্ড—২৭ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে দেয়াঙ্গ প্রদেশ 'উড়িয়া রাজ্য' নামে অভিহিত ছিল। উড়িষ্যা দেশীয় রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইবার দরুণ যে রাজ্যের এরূপ নাম হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মহারাজ অমরমাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, আরাকানরাজ কিয়ৎকালের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবসহ, উড়িয়া রাজাকে দূতরূপে ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ; —

" মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়।
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায়।।
দূতে আসি কহিলেক রাজধর স্থানে।
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোমা সনে।।

অমরমাণিক্য খণ্ড—২৯ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত বক্যের 'উড়িয়া রাজা' যে পুর্বকথিত উড়িয়া রাজ্যের অধীশ্বর, একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই রাজা আরাকানরাজের অধীন ছিলেন, তাঁহার দৌত্যকার্য্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে।

ময়নামতীর গানে উড়িয়া রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালার উড়িয়া রাজ্য ও এই উড়িয়া রাজ্য অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই লহরে ১৮১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উড়িয়া রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে অবস্থা জানা যাইবে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

আরাকান রাজ্য মিন্‌রাজা গাঁইয়ার অধিকারে থাকা কালে, পর্ত্তুগীজগণ উড়িয়া রাজ্যের বিলোপ সাধন ও দেয়াঙ্গ পাহাড় অধিকার করিয়া, তথায় তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানেই পুর্ত্তুগীজগণের প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। এতঃপর এই স্থান মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ, 'কামেল তোমরি' প্রস্তুত কালে দেয়াঙ্গকে চাকলে ইসলামাবাদের অধীন সরকার চাটিগাঁ-এর অন্তর্ভুক্ত করে ৪৪০১ টাকা রাজস্ব অবধারণ করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

উনকোটী তীর্থ ঃ— (১০ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ১০৭ ও ২৭২ পৃষ্ঠায় এই তীর্থের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

কর্ণফুলী নদী ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এই নদী পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, নানা জনপদের উপর দিয়া আসিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত ধৌতকরতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

কল্মীগড় ঃ— (৩২ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

কৈলাগড় ঃ— (১৭ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খুটি মুড়া ঃ— (৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫১ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

গামারিয়া কিল্লা ঃ— (২৬ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর টাউন হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। এই স্থানে মহারাজ বিজয়মাণিক্য ও ঠাকুর পরিবারের অনেক ব্যক্তির বাসস্থান ও সেনানিবাস ছিল। গামারিয়া কিল্লার অবস্থান বিষয়ে হস্তলিখিত 'চম্পক বিজয়' গ্রন্থে নরেন্দ্রমাণিক্য কর্ত্তৃক সেনাপতিকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে বলা হইয়াছে ;—

দক্ষিণের দিকে তুমি হৈলা সেনাপতি।
দক্ষিণের গড় যত তোমার যাবতি।।
চৌদ্দগ্রামের গড় ধরিয়া সাবহিতে।
ভাল যত্নে গড় যে রাখিবা সহাসন্তে।।
কোন পাকে আসি যদি লয় সেই গড়।
গামারিয়ার গড়ে আসি উঠিও সত্বর।।
গামারিয়া গড়ের পথে বড়হি দুর্গম।
এক হাত পাশ পথ চলিতে বিষম।।
আকাশ সমান মুড়া দেখিতে ভয় করে।
আছুক উঠিব, দেখি মুণ্ডে ঘাত পড়ে।।

চম্পক বিজয়।

এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, উদয়পুর হইতে চৌদ্দগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে গামিরিয়া কিল্লা সেই রাস্তার উপর তিষ্ণা পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোধা রাণী ঃ— (৭ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। মহারাজ অমরমাণিক্যের শ্রীহট্ট আক্রমণকালে সুরমা নদী পার হইবার পরে এই স্থানে প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল।

গোপগ্রাম ঃ— (২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর টাউনের সন্নিহিত একটী গ্রাম, গোয়ালগণের বসতি স্থান ছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঘোঙ্গি মুড়া ঃ— (২৮ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। এই স্থান কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যগণ আরাকান আক্রমণ করিয়া রসদের অভাবে বিপন্ন হওয়ায়, জুম ক্ষেত্রে উৎপন্ন ঘোঙ্গা আলু ভক্ষণ করিয়া, এই স্থানের 'ঘোঙ্গিমুড়া' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এখন সেই নাম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে স্থানের পরিচয়ও লোকে বিস্মৃত হইয়াছে।

চণ্ডীগড় ঃ— (৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

চাটিগ্রাম ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। এই স্থনের স্থূল বিবরণ দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ছকড়িয়া ঃ— (৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম ছয়ঘরিয়া গড়। দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

জিকুয়া গ্রাম ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত (তরপ পরগণার) একটী গ্রাম। মহারাজ অমরমাণিক্যের সৈন্যগণ তরপ অভিযান কালে এই স্থানে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এখান হইতেই তরপ রাজ্য জয় ও তথাকার অধিপতিকে ধৃত করা হইয়াছিল।

ডোমঘাট ঃ— (৪১ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহা ডোমঘাটি নামেও অভিহিত হয়। এই স্থানের বিবরণ দ্বিতীয় লহরের ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

ঢাকা ঃ— (৬১ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। ইহা বুড়িগঙ্গার তীরস্থিত বর্ত্তমান ঢাকা নগরী। ইহার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এই স্থানে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি সুদীর্ঘ কাল এই স্থানে বঙ্গের শাসন-কর্ত্তাগণ বাস করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে ঢকা সুক্ষ্ম বস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

তরপ ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। রাজা আচাকনারায়ণ তরপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের বিবরণ, পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮—১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

তুলসীঘাট ঃ— (২১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। এই স্থানে ত্রিপুরার এক সেনানিবাস থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্যাণমাণিক্যের পিতা কচু ফা-এর (নামান্তর পুরন্দর) এই স্থানে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। কালক্রমে স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে তাহার অবস্থা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তেতৈয়া ঃ— (৪২ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। এই স্থান খোয়াই নদীর তীরবর্ত্তী ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্য যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে গিয়াছিলেন, পরে মনু নদীর তীরবর্তী স্থানে যাইয়া অবস্থান করেন।

দাউদপুর ঃ— (১৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। এই স্থান তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত। মহারাজ অমরমাণিক্য তিতাস নদীপথে সরাইলে মৃগয়া যাত্রাকালে দাউদপুরের জমিদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

দিল্লী ঃ— (১৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহা পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ জেলা। হিন্দু রাজত্বকালে এই স্থানের কোন কোন অংশ ইন্দ্রপ্রস্থ, বারণাবত ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এবং তদবধি এই স্থান রাজধানী জনিত

গৌরব লাভ করিয়া আসিয়াছে। ফেরিস্তার মত অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক কনিংহাম সাহেব বলিয়াছেন, রাজা দিলু হইতে দিল্লীর নামকরণ হইয়াছে। দিলু ময়ুর বংশীয় শেষ রাজা, তিনি খ্রীষ্টের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছেন। স্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য মতও আছে। এই স্থান হিন্দু রাজত্ব বিলোপের পর মুসলমানগণের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বেও কিয়ৎকাল যাবৎ এই স্থানে নব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব পৃথিবীময় বিঘোষিত। ফার্গুসন সাহেব তাঁহার 'History of India and Eastern Architecture' নামক গ্রন্থে এই স্থানের প্রাচীন প্রাসাদসমূহের প্রশংসাসূচক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। দিল্লীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন ; এস্থলে সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব।

দুলালীগ্রাম ঃ— (১০ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইহা উত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্গত একটী পরগণা। বর্ত্তমান কালে ১১৮টী মৌজা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই পরগণার রাজস্ব ৪০২৯ টাকা নির্দ্ধারিত আছে।

দেয়াঙ্গ ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইহা কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে সন্নিবেশিত 'উড়িয়া রাজ্য' শীর্ষক নিবন্ধে এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

ধোপা পাথর ঃ--- (২৮ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। এই স্থান কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

ধ্বজনগর ঃ— (৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরা রাজ্যের সদর বিভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয় লহরের ২৮৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বকুল ঃ— (৪২ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। এই স্থান কুকি প্রদেশের অন্তর্গত। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগ ঃ— (৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬০ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ফুলকোয়রি ছড়া ঃ--- (২২ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। এই ছড়া উদয়পুর বর্ত্তমান নগরীর পূর্ব্বদিকে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ইহা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই লহরের ২৪১ পৃষ্ঠায় 'ফুলকুমারী' শীর্ষক বিবরণে এই ছড়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বরবক্র নদী ঃ--- (৪৬ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহার অপভ্রংশ নাম বরাক। এই নদী মণিপুরের উত্তর দিকস্থ আঙ্গামী নাগা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মণিপুর রাজ্যের বক্ষ বাহিয়া কাছাড় জেলায় পতিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রবাহিত হইয়া

বদরপুরের সন্নিহিত স্থানে শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশপূর্ব্বক দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার উত্তর দিকের শাখা সুরমা ও দক্ষিণ শাখা কুশিয়ারা নামে বিখ্যাত। শ্রীহট্ট জেলায় বরবক্র প্রধান নদী। শাস্ত্র গ্রন্থে এই নদীর তীর্থজনিত সম্মানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সমুদ্রস্যোত্তরে দেশে ততো মনু নদী স্মৃতঃ।
যং গত্বাপি মহারাজন্ পিত্বা পানীয় মুত্তমং।।
মনুনদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং।
তত্র স্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোক মনুত্তমঃ।।"

বাকলা ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইহা বাখরগঞ্জের প্রাচীন নাম। পূর্বে বাকলা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এই লহরের ৯৭-১০৪ পৃষ্ঠায় এই রাজ্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বাণিয়া চুঙ্গ ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এই স্থান 'বাণিয়চঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬-১১২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বিক্রমপুর ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০-৯৭ পৃষ্ঠায় ও রজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বার বাঙ্গালা ঃ— (৪ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৯-৩০২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

বিশালগড় ঃ— (৫০ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ প্রথম লহরের ২৬২ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় লহরের ৩০৩ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য।

বৃন্দাবন ঃ— (৬৩ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি)। ইহা মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী সাবডিভিসন, হিন্দুগণের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা বৈষ্ণবগণের বিখ্যাত তীর্থ।

বেয়াল্লিশ ঃ— (১৭ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলাস্থিত সরাইল পরগণার অন্তর্গত। পুর্ব্ববর্ত্তী ১১৫ পৃষ্ঠায় এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তদীয় জ্যেষ্ঠ কুমার রাজধরদেব অরণ্যময় স্থান আবাদ করিয়া এই স্থানে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভাওয়াল ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। এই লহরের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভুলুয়া ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

মথরা ঃ— (৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মনু নদী ঃ— (৪৪ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। এই নদীর বিবরণ দ্বিতীয় লহরের ৩০৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

মিলন ঘাট ঃ— (১৭ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। মহারাজ অমরমাণিক্য কৈলাগড় হইতে সরাইল যাইবার পথে তিতাস নদীর যে ঘাটে দাউদপুরের জমিদারের সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই ঘাট 'মিলন ঘাট' নাম খ্যাত হইয়াছে। এই নাম অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

মেহেরকুল ঃ— (৫৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৫ পৃষ্ঠায় বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যশপুর ঃ— (২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর নগরীর সন্নিহিত একটী গণ্ডগ্রাম।

রণ ভাওয়াল ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

রসাঙ্গ ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

রাইপুর ঃ— (২৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। এই স্থান চট্টগ্রাম হইতে আরাকান যাইবার পথে অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসনকালে এই জনপদ আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল।

রাঙ্গামাটী ঃ— (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৪ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাজধর ছড়া ঃ— (৪৯ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। ইহার অন্য নাম রাতা ছড়া।

রাম্বু ঃ— (২৭ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। ইহা আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত, বর্ত্তমান কক্সবাজারের সন্নিহিত একটী স্থান। ইহা পূর্ব্বে রাম ক্ষেত্র বা রাম টেক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা একটী তীর্থস্থান, এখানে রাম সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীহট্ট ঃ— (৭ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১৫ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সলৈগোয়াল পাড়া ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৪ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সরাইল ঃ— (৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৩ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সুরমা ঃ— (৭ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট্ট জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা একটী নদী, বরবক্র নদীর শাখাবিশেষ। উক্ত নদী হইতে বহির্গত হইয়া, মারকলির নিকট, বরবক্রের অন্য শাখা বিবিয়ানাতে পতিত হইয়াছে। সুরমার আর একটী শাখা ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া যাইয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

অনুক্রমণিকা

(অ)

(আ)

(ই)

(ঈ)

(উ)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(চ)

(ছ)

(জ)

(ন)

(প)

(ভ)

(ম)

(য)

(র)

(ল)

(শ)

(ষ)

(স)

(হ)

(ক্ষ)

রাজমালা সম্বন্ধীয় কতিপয় অভিমত

'বিশ্বকোষ' সম্পাদক এবং 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় রাজমালার প্রথম লহর আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন---

" The book has given me entire satisfaction and hope that the 2nd part will also be executed with the same excellence and finish. The work is calculated to remove a long-felt want by throwing light on the history of the great Raj family of Tippera."

ত্রিপুরার রাজ-পণ্ডিত, কাব্যশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন মহাশয় রাজমালার সম্পাদককে লিখিয়াছেন,---

কল্যাণবরেষু---

বর্ত্তমানের এই ঐতিহাসিকতার যুগে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইতিহাস চর্চ্চার বিশেষ অনুরাগী। এই সময়ে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সাহিত্যানুরাগী ও কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, বর্ত্তমান ভারতের প্রাচীনতম ত্রিপুর রাজবংশের কীর্ত্তিকাহিনী যথোচিত ভাবে আলোচিত হওয়ার বিশেষ সার্থকতা অনুভব করি। এই সময়ে মহাশয়ের সম্পাদকতায় ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস "রাজমালা" প্রকাশিত হওয়ায়, গবেষণাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।

গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিষয়-শৃঙ্খল প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থের নিরাপদ পরিসমাপ্তি ও গ্রন্থকারের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। অলমতিবিস্তারেন।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরেবতীমোহন শর্ম্মণ

রাজপণ্ডিত

হিতবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠান্বিত সম্পাদক ও রাজমালা সম্পাদনের প্রথম অনুষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রাজমালা সম্পাদককে লিখিয়াছেন,---

দীর্ঘজীবেষু---

"শ্রীরাজমালা" দুইখণ্ড পাইয়াছি। এতদিন মত প্রকাশ করি নাই,---তাহার কারণ শারীরিক অসুস্থতা। অন্যের নিকট হইলে হইতাম, আপনার নিকট আমার সে লজ্জার কারণ নাই; আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না, এইজন্য বিশেষ কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই।

"শ্রীরাজমালা" আমাদের হৃদয়ের বস্তু। ইহার দ্বারা কেবল যে ত্রিপুরার রাজবংশ সুশোভিত—তাহা নহে, ইহার সৌরভে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই চিরকাল আনন্দিত। আমার ন্যায় লোকের উপর এক সময়ে "রাজমালা"র সংস্করণের ভার দিয়া স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর আমার গৌরব বাড়াইয়াছিলেন; কিন্তু সেই গৌরবের মর্যাদা আমার দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে আমাকে আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, ইহা আপনি জানেন। আজ আমার অপার আনন্দ যে, আমার আরব্ধব্রত আপনি উদ্‌যাপিত করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আপনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরব্ধব্রত উদ্‌যাপিত করান।

"শ্রীরাজমালার" নূতন সংস্করণে আপনি যে যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক অনন্যসাধারণ। আমি আপনার 'মধ্যমণি' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার 'মধ্যমণি' উজ্জ্বল; তাহার প্রভায় "রাজমালা" সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই 'মধ্যমণি' চিরকাল আপনার অসাধারণ গবেষণা প্রচার করিবে।

আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে যে আমার মতভেদ নাই, এমন নহে। প্রাগৈতিহাসিক বিষয় লইয়া মতভেদ না থাকাই বরং অস্বাভাবিক—থাকাটা বিস্ময়ের কথা নহে।

আপনার গবেষণার বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আপনি যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় সহকারে "মধ্যমণির" উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই প্রভূত প্রশংসার কথা।

"শ্রীরাজমালা" যেরূপ সুদৃশ্যভাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও কম প্রশংসার কথা নহে।

উপসংহারে ভগবৎসমীপে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি আপনাকে সুস্থ রাখিয়া "শ্রীরাজমালার" সংস্করণ কার্য্য সুসম্পন্ন করান, ইতি।

লেসিয়াড়া ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৮ ত্রিপুরা	আশীর্ব্বাদক **শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয়ের অভিমত,—

রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহর প্রাপ্ত হইয়া, ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। ইহা ত্রিপুরা রাজবংশ ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিবৃত্ত। ইহাদ্বারা দ্রুহ্য হইতে

বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি পর্য্যন্ত বংশধারার পরিচয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব-বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যে-সব যুক্তি প্রমাণদ্বারা ঐ তত্ত্বগুলিকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকের প্রত্ন-তত্ত্ব পরিসীলনের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

এই গ্রন্থ হইতে সারসঙ্কলনপূর্ব্বক, যুক্তিতর্কের অংশ বাদ দিয়া স্কুলের পাঠ্য হওয়ার উপযুক্ত ভাবে ত্রিপুরার একখানি ইতিবৃত্ত লেখা হইলে সাধারণ্যে ত্রিপুরার রাজবংশের বিবরণ প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপ হওয়াও উচিত মনে করি, ইতি। ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩২।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ

বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক, কলিকাতা।

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ডাক্তার শ্রীযুত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি-লিট, রাজমালা সম্পাদককে লিখিয়াছেন;—

প্রিয়বরেষু—

আপনার প্রেরিত একজন তরুণ বন্ধু আপনার মূল্যবান দ্বিতীয় খণ্ড রাজমালা দিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তক প্রণয়নে আপনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা সকলেই চলিয়া যাইব; এমনকি, ত্রিপুরা রাজ্যের কেহই চিরদিন থাকিবে না— কিন্তু ত্রিপুরার এই রাজমালা অমর গৌরব, ইহা লোপ পাইবার বিষয় নহে। রাজানুকম্পায়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামও চিরস্মরণীয় হইবে। কালিদাসের দৌলতে মল্লীনাথ স্থায়ী যশের কণিকা পাইয়াছেন, শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বর প্রভৃতি কবিগণের প্রসাদে আপনার প্রতিষ্ঠাও স্থায়ী হইবে। ইচ্ছা আছে, এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করি— কিন্তু শুনিলাম, আপনার তৃতীয় ভাগ শেষ হইয়াছে এবং শেষ ভাগেরও ছাপার কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং যদি সমগ্র পুস্তক পাই, তখন মন খুলিয়া একটা বিস্তৃত সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইব।

*   *   *   *   *   *   *

শুভার্থী—

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

"স্থাপত্য-বিশারদ" প্রখ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ও ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের উদ্ধার প্রয়াসী শ্রীযুক্ত শ্রীসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় A. M. A. E. M. R. A. S.(London) মহাশয় বলিয়াছেন,—

" ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও রাজকাহিনী "রাজমালা" গ্রন্থখানি কি ত্রিপুর রাজবংশের পুরাবৃত্ত হিসাবে, কি বহু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হিসাবে অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার সম্পাদক, সুপণ্ডিত শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তজ্জন্য সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। "রাজরত্নাকর" নামক ত্রিপুর রাজবংশের ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাসখানি পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই, কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুসম্পাদিত 'রাজমালা' খানি পাঠান্তে ভারতের সুপ্রাচীন এক রাজ প্রতিষ্ঠানের যে একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য পাইয়াছি, সেই আলেখ্য অনুসরণ করিয়া, বহু আশা পোষণ করিয়া, আমি ত্রিপুরার প্রাচীন মহিমমাময়ী রাজধানী রাঙ্গামাটী বা উদয়পুর তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলাম।"

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

রবি—৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

জ্যোতিঃ-৫ই পৌষ, ১৩৩৫ সাল

বহু অর্থব্যয়ে সুদক্ষ লেখকের দ্বারা ত্রিপুরা রাজবংশের "রাজমালা" নামে একখণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অতি প্রাচীন রাজ্য, ইহার ইতিহাসের সহিত ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত আছে। গ্রন্থখানি আমরা অভিনিবেশ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে কঠোর শ্রম করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম ও সাধনা সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থখানির ফুটনোটগুলি গবেষণাপূর্ণ, অতিসারবান, অনেক জানিবার বিষয় আছে। বইখানিতে প্রাচীন বারতের ৪খানি অতি সুন্দর মানচিত্র আছে, তাহা দেখিলে কত কথাই মনে পড়ে। এই ইতিহাসখানি মুদ্রাঙ্কন জন্য ত্রিপুরার রাজদরবার মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে অতি বৃহৎ।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

ত্রিপুর রাজবংশের আরও ৪খানি ইতিহাস আমরা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে সংস্কৃত রাজমালাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্নবাবু প্রাচীন হস্তলিখিত ৫ খানি রাজমালা মিলাইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, কোন কথা তিনি গোপন রাখিতে চেষ্ঠা করেন নাই। ইহা ঠিক তিনি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখেন নাই—রাজবংশের ইতিহাসই লিখিয়াছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কম মূল্যবান হয় নাই।

স্বাধীন ত্রিপুরার একখানি ইতিহাস লিখিবার জন্য স্বর্গীয় বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের আকাঙ্ক্ষা ছিল। স্বর্গীয় দানশীল, উদার মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর এই জন্য 'হিতবাদীর' সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রথমে ইহার উপকরণ সংগ্রহ মানসে "শিলালিপি সংগ্রহে" হস্তক্ষেপ করেন। ক্ষোভের বিষয়, এই সময়ে মহারাজা বাহাদুর কাঁশীধামে আকস্মিক ভাবে স্বর্গগমন করিলে, রাজমালা প্রকাশ কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মন্ত্রীবাহাদুরের আগ্রহে পুনরায় 'রাজমালা' প্রকাশের চেষ্টা হয়। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কালীপ্রসন্নবাবু রাজমালার ১ম খণ্ড জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলেন। আমরা জানিয়াছি, "রাজমালা" খানি যাহাতে শীঘ্র মুদ্রিত হয়, তজ্জন্য মন্ত্রীসভার দ্বারা রাজ্য শাসনের প্রাক্কালে, বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনে কালীপ্রসন্নবাবু পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষৎ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ও হিন্দী, ইংরেজী, বাঙ্গালা ভাষার নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সর্ব্বপ্রকার সফল হইয়াছে।

চুন্টা প্রকাশ

আশ্বিন — ১৩৩৮ বাংলা

শ্রীরাজমালা (দ্বিতীয় লহর) পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা "রাজমালা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্রথম লহরের সমালোচনা আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছি। দ্বিতীয় লহর গ্রন্থখানাও বহুদিন হয় আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, সমালোচনা করার সুয়োগ ঘটে নাই। আমাদের এই কর্ত্তব্যহানির জন্য ক্রটি স্বীকার করিতেছি। রাজমালা (দ্বিতীয় লহর) স্বর্গীয় মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন সময়ে রচিত। মহারাজ অমরমাণিক্য ১৫৭৭ হইতে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন সুতারাং রাজমালা দ্বিতীয় লহর তিন শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ কয়েকখানি পুরাতন গ্রন্থ সংগ্রহ ক্রমে পাঠোদ্ধার

করিয়া এই লহর সম্পাদন করিয়াছেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের আদেশে বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুরনারায়ণের নিকট শ্রবণ করিয়া কোনও রাজকবি এই লহর রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থভাগ উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই কবির নাম পাওয়া যায় না। মূল গ্রন্থভাগ ৭৮ পৃষ্ঠা, তৎসহ পূর্ব্বাভাষ ৪৯ পৃষ্ঠা, মধ্যমণি বা টীকা ৩৪২ পৃষ্ঠা। ফুল পেইজ চিত্র ৪০ খানা, মানচিত্র একখানা ও রাজবংশের একখানা পূর্ণটেবল যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

গ্রন্থের পূর্ব্বাভাষে ত্রিপুর নরপতিগণের পূব্বপুরুষ যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু যে পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া সুন্দরবনের সন্নিহিত সগরদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থক ও ত্রিপুর রাজবংশের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক কয়েকটি প্রমাণ আছে। মধ্যমণি বা টীকাখণ্ড যেমন বিস্তৃত — তেমনই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

অংশ সঙ্কলনে বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়। তিনি এ-সকল তত্ত্ব সংগ্রহে গভীর গবেষণা ব্যতীত কোনও বিষয় গ্রহণও করেন নাই — বর্জ্জনও করেন নাই। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার বিচারশক্তি ও ধীরচিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থসমূহের পাঠান্তর স্থলে তিনি পাদটীকায় তাহা উল্লেখ ক্রমে উভয় পাঠই দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক দুরূহ এবং দেশজ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

চিত্রসমূহের প্রায় সমস্তগুলিই দুষ্প্রাপ্য ও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পুস্তকখানা পূর্ণ রাজোচিত ভাবে মুদ্রিত; ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদপট এমনই মনোরম যে, দেখিলেই প্রাণ পুলকিত হয়।